অন্নদাশঙ্কর রায়
বিনুর বই
ও নির্বাচিত ছোটোগল্প

বিনুর বই ও নির্বাচিত ছোটোগল্প

বিনুর বই
ও নির্বাচিত ছোটোগল্প

অন্নদাশঙ্কর রায়

পা রু ল

সূচি

বিনুর বই

প্রথম পর্বের ভূমিকা

'আমি প্রবীণদের মহলে নবীন, নবীনদের মহলে প্রবীণ।....নবীন ও প্রবীণ উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি পরস্পরকে পরিচিত করাতে পারি। প্রবীণদের বোঝাতে পারি নবীনরা কী ভাবে, যদিও নবীনদের সঙ্গে আমার পরিচয় অপ্রচুর। আর নবীনদের বোঝাতে পারি প্রবীণদের মনোভাব, যদিও প্রবীণদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ স্বল্প। ...আধুনিক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্তি আছে, আমি চেষ্টা করব নিরসনের। আধুনিকদের কাছে অত্যাধুনিকদের নানা জিজ্ঞাসা আছে, আমি উত্তরদানের চেষ্টা করব। এই দুই কর্তব্য একসঙ্গে করা হয় যদি অভিভাষণটিকে কাহিনির আকার দিই। ...আমি যার কাহিনি বলতে যাচ্ছি তার নাম দেওয়া যাক বিনু।'

প্রায় চার বছর আগে জামশেদপুর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে এই ছিল আমার গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সে কাহিনি পরে *জীবনশিল্পী*-র অন্তর্গত হয়েছে। কাহিনিটিকে একটু বড়ো আকারে লেখবার ইচ্ছা ছিল। এতদিন পরে তার সুযোগ পাওয়া গেল। এটি কিন্তু কাহিনি হল না। কাহিনি যদি হয়ে থাকে তবে জীবনের নয়, মনের। কিন্তু জীবনকে বাদ দিয়ে নয়।

অন্নদাশংকর রায়

২ অক্টোবর ১৯৪৪

দ্বিতীয় পর্বের ভূমিকা

বিনুর বই লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ সালে। তখন আমার বয়স চল্লিশ বছর। যৌবন তখনও অস্ত যায়নি। শরীর ও মনের যথেষ্ট শক্তি ছিল। দিনের পর দিন এক এক পৃষ্ঠায় এক-একটি অনুচ্ছেদ লিখতুম। লেখা কলমের মুখে আপনি আসত, তাকে সাধতে হত না। ভাবনাও আসত আপনি, তার পিছনে ছুটতে হত না। বই লেখা হয়ে যায় মাস তিনেকের ভিতরে।

তখন থেকেই আমার বাসনা ছিল পরে একসময় অভিজ্ঞতার আলোয় *বিনুর বই দ্বিতীয়* লিখব। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারা গেল না। হাতে অনেক কাজ ছিল। এক এক করে সেসব সারতে হল। অবশেষে দ্বিতীয় পর্বে যখন হাত দিলুম তখন আমার বয়স ছিয়াশি বছর। তখন আমি সূর্যাস্তের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি। শরীর অপটু। মন অবসন্ন। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ ভেবেচিন্তে লিখতে হয়েছে, একটানা লিখে যেতে পারিনি। মাঝে মাঝে বিরত থেকেছি। স্মৃতিশক্তি নির্ভরযোগ্য নয় তাই বিভিন্ন পরিচ্ছেদে কোনো কোনো বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, তার জন্যে আমি দুঃখিত। *জীবনদর্শন* শুরু করতে যাচ্ছি এমন সময় আমার জীবনসঙ্গিনীর প্রয়াণ। চিন্তা ও লেখায় ছেদ পড়ে যায়। যা-ই হোক কোনোরকমে শেষ করা গেল।

উনি আমাকে বলেছিলেন, ‘এবার তুমি একটি Summing Up লেখো। যেমন লিখেছিলে সমরসেট মহম।’ আমারও সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু লিখতে লিখতে দেখা গেল ঠিক সেই জিনিসটি হয়নি। যা হয়েছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট। এখন আমি নব্বইতে পড়েছি। এ বয়সে এর চেয়ে ভালো আশা করা যায় না। তবে কিছু কথা বাকি রয়ে গেল। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করতে অক্ষম।

অন্নদাশংকর রায়

৩০ জুন ১৯৯৩

প্রথম পর্ব

আদি অন্ত

জল না পেলে গাছ শুকিয়ে যায়, রস না পেলে মানুষ। বিনুর জন্ম অবধি রসের অনাবৃষ্টি হয়নি। বলতে নেই, কিন্তু সত্যি বলতে কী, যা হয়েছে তা অতিবৃষ্টি। অতিবর্ষণেও গাছ মরে। বিনুরও মরণ হত। কিন্তু তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তিনিই যিনি অলক্ষে থেকে রসের জোগান দেন। জল যাতে দাঁড়িয়ে না থাকে তারজন্যে কাটতে হয় নালা। রস যাতে নিঃসরণের পথ পায় তারজন্যে সাধতে হয় সংগীত বা কাব্য, অভিনয় বা নৃত্য, ভাস্কর্য বা চিত্র। বিনুকে যিনি রসে অনুগমন করেন তিনিই তার শিরে লিখেছেন কেমন করে কাকে নিবেদন করে রসের উপচয় থেকে উদ্ধার পেতে হয়।

কিন্তু তিনি কী লিখেছেন তা ভালো করে পড়তে তার জীবনের বিশ বছর কাটল। কপালের লেখা তো নিজের চোখে দেখবার জো নেই। দেখতে হয় পরের চোখে। পর হয়তো আপনের চেয়েও আপন। বিনুও একদিন একজনের চোখের তারায় দেখতে পেল নিজের কপালের লেখা। তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সে কবি। আগে সন্দেহ ছিল বলেই তার আগেকার রচনা তাকে তার পথের সন্ধান দেয়নি। সেসব যেন তার সাধন নয়, প্রসাধন।

তা হলেও তার প্রথম বিশ বছর তার সাধনার শামিল, যেমন যুদ্ধের শামিল তার উদ্যোগ। কতকটা তার অজান্তে, কতকটা স্বপ্নের ঘোরে, কতকটা আর পাঁচজনের অনুকরণে, কতকটা সঙ্গদোষে বা সঙ্গগুণে তার সাধনার কয়েকটি সোপান সে অতিক্রম করে এসেছিল। এমনকী তার ভুলগুলোও তাকে সাহায্য করেছিল; যেন ভুল নয়, সুবুদ্ধি।

সাধনার শেষ কথা মোক্ষ। বিনুর সাধনা রসমোক্ষণের, তাই তার অন্তিম সোপান রসমোক্ষ। কবে সেখানে পৌঁছোবে, আদৌ পৌঁছোবে কি না কেমন করে জানবে! কিন্তু সেই তার পথ, নান্যঃ পন্থাঃ। পরবর্তী বয়সে আবার সে সংশয়ে পড়েছে, আলো হারিয়েছে, আলেয়ার দিকে চলেছে, কিন্তু মার্গভ্রষ্ট হয়নি, ঘুরে ফিরে মার্গস্থ হয়েছে।

ছেলেবেলায়

বিনুর একটা সুবিধা ছিল, তার সমবয়সিদের ছিল না। বিনুর ছিল সাতখুন মাফ। রাত্রে আর সবাই পড়া মুখস্থ করে, কিন্তু বিনু তার ঠাকুমাকে কবিকঙ্কণ চণ্ডী পড়ে শোনায়, কিংবা বেরিয়ে যায় কীর্তনে। দিনের বেলা আর সবাই ক্লাসে হাজির থাকে, কিন্তু বিনু কখন একসময় উঠে গিয়ে কমন রুমে মাসিকপত্র ওলটায়, কিংবা লাইব্রেরিতে যত অপাঠ্য বই। বাড়িতেও তার নিজের একটা লাইব্রেরি ছিল, বাবার দেওয়া। সেখানে বসে নভেল নাটক পড়লে কেউ দেখতে যেত না, শুধু তার মা তার হাতে যেকোনো বই লক্ষ করলেই মন্তব্য করতেন, 'হুঁ! নভেল পড়া হচ্ছে!' তার বাবা তাও বলতেন না। কিন্তু বিনু তাঁকে বলবার কারণ দিত না, তাঁকে ভয় করত বলে একটু আড়ালে পড়ত ওসব। কেবল একটা জিনিস পড়ত তাঁকে দেখিয়ে শুনিয়ে। সেটা খবরের কাগজ। আর মাসিকপত্র। এই ছিদ্র দিয়েই শখ প্রবেশ করে। বিনুরও সাধ যায় লিখতে। হাতে লেখা মাসিকপত্র চালাতে। যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না। প্রায় রচনাই নকল। নকলনবিশি করে তার শিক্ষানবিশি শুরু। এ কাজে যদি কারও উৎসাহ থাকে তবে তার নাম বিনু নয়। তার উৎসাহের আরও অনেক ক্ষেত্র ছিল।

উপরে বলা হয়েছে মাসিকপত্রের ছিদ্র দিয়ে শখ প্রবেশ করে। আর একটা ছিদ্র ছিল। সেটা রাজবাড়ির থিয়েটার। তার বাবা ছিলেন থিয়েটারের ম্যানেজার—অবৈতনিক। কেন যে তাঁর মতো রাশভারী লোককে ম্যানেজার করা হয়েছিল সে এক রহস্য। বোধহয় তিনি ম্যানেজ করতে জানতেন বলে। সময়মতো আরম্ভ, সময়ে শেষ, তারপরে ভূরিভোজন, এ ছিল প্রতিবারের প্রোগ্রাম। কোনোরকম বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবার পাত্র

ছিলেন না তিনি। তারপর তাঁর রসবোধ ছিল অন্তঃসলিল। পাশা খেলাই হোক, লীলাকীর্তনই হোক, তিনি উপস্থিত না থাকলে আসর জমত না। কিন্তু তিনি গাইতে পারতেন না, অভিনয়েও বড়ো একটা নামতেন না। মাসে দু-মাসে দু-এক বার থিয়েটার হত। বিনুও যেত। নাটক দেখে তারও সাধ যেত নাটক লিখতে। লিখে অভিনয় করাতে। তার বয়স্যেরা তার ছাইভস্ম অভিনয় করে তাকে কৃতার্থ করত, কিন্তু তাকে কোনো প্রধান ভূমিকা দিত না। কী আফশোস!

তাগিদ

ধীরে ধীরে বিনুর উৎসাহ নিবে গেল। নিবে গেল মানে ক্ষেত্রান্তরে গেল। আমাদের এই আখ্যায়িকা বিনুর জীবনী নয়, এতে তার প্রাকৃত জীবনের সামান্যই থাকবে। ক্ষেত্রান্তরের কথা অবান্তর।

বিনুর মাসিকপত্র বন্ধ হয়ে গেল, ঘরোয়া থিয়েটারও। কারণ কোনো দিক থেকে তাগিদ ছিল না। না ভিতরের দিক থেকে, না বাইরের দিক থেকে। যে সৃষ্টি করে সে নিজের খেয়ালেই করে, কিন্তু খেয়ালের পিছনে একটা গরজ না থাকলে খেয়ালকে ঠেলা দিতে কেউ থাকে না, ঠেলা না খেলে খেয়াল একসময় থেমে যায়। গরজটা হয় স্রষ্টার, নয় সৃষ্টিভোক্তার। নয় দু-পক্ষের। যার গরজ সে তাগিদ করবে, তবেই লেখনীর ঝরনা দিয়ে রস ঝরবে। বাঁশির রব দিয়ে রসের মধু ক্ষরবে। তুলির রং দিয়ে রস রূপ ধরবে।

বাইরে থেকে তাগিদ ছিল না। না থাকারই কথা। এগারো-বারো বছরের বালকের রচনা তার সমবয়সি ভিন্ন আর কে চাইবে! সমবয়সিদের নিজেদেরই কতরকম খেয়াল ছিল, তা ছাড়া ছিল পড়াশুনার চাপ। বিনুর মাসিকপত্রে যারা লিখত তারা লিখতে ভুলল, একাই সবটা ভরাতে গিয়ে সে দেখল মিছে খাটুনি, এক জনও পড়বে না। থিয়েটারে—ঘরোয়া থিয়েটারে—দেখা গেল, অভিনেতারা যা খুশি আওড়ায়, পতন ও মৃত্যুর পর উঠে দাঁড়ায়, আর একহাত লড়াই করে ও বাহবা পায়। নাট্যকারকে কেউ কেয়ার করে না, তার নাটকের যে অভিনয় হচ্ছে এই তার সাতপুরুষের ভাগ্যি। তাহলে নাটক লিখে ভারি তো সুখ!

তার চেয়ে বড়ো কথা ভিতর থেকে তাগিদ ছিল না। খেয়াল বা শখ দু-দণ্ডেই নিবে যায়। তাকে সারা রাত জ্বালিয়ে রাখতে হলে বাইরের উসকানিও যথেষ্ট নয়, ভিতরে থাকা চাই জ্বালা। লিখতেই হবে এমন কোনো ব্যাকুল ব্যগ্রতা ছিল না। বোধহয় তার যথার্থ কারণ অন্তরে রস যা ছিল তা উপচে পড়বার মতো নয়। রস জমতে জমতে একসময় ছাপিয়ে পড়ে, তখন বাইরের চাহিদা থাক বা না থাক ভিতর চায় ভারমুক্ত হতে। তখন রসমোক্ষণ না হলে মানুষ বেদনা বোধ করে। তখন যদি তার হাতে লেখনী থাকে সে লিখবেই। মানা দিলেও লিখবে, বাধা দিলেও লিখবে।

কলাবিদ্যা

লিখবেই, না লিখে মুক্তি নেই। কিন্তু লিখলেও মুক্তি নেই, যদি না জানে কেমন করে লিখতে হয়। তারজন্যে শিখতে হয় কলাবিদ্যা। এ শিক্ষা একদিনের নয়, এক জীবনের। যার এ শিক্ষা হয়নি তার রসোদগার অপরকে পীড়া দেয়।

এ সত্য আবিষ্কার করতে বিনুর বিশ বছর কেন, তার বেশি লাগল। কিন্তু বারো-তেরো বছর বয়সে সে যেন এর আভাস পেয়েছিল অপরের রসরচনা আস্বাদন করতে করতে। *সবুজপত্র* পড়তে পড়তে এই কথাই তার মনে এল যে, লিখতে হয় তো বীরবলের মতো।

আর্ট কথাটা সে*সবুজপত্রে*ই পায়। কথাটা তার মনে তখন থেকে গাঁথা। যদিও তার লিখতে উৎসাহ ছিল না তবু জানতে উৎসাহ ছিল কীসে লেখা আর্ট হয়, কীসের অভাবে আর্ট হয় না, কার কোন লেখা আর্ট, কার কোন লেখা ভালো হলেও আর্ট হতে পারেনি। একবার *সবুজপত্র* পড়বার পর তার দৃষ্টি গেল বদলে। আর যত মাসিকপত্র আগে গোগ্রাসে গিলত এখন থেকে তাদের গ্রাস করবার আগে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল। নভেল নাটক গেলা আগের মতো সোজা বোধ হল না। গিলতে গিয়ে গলায় আটকাল।

ক্লাসে যারা ফার্স্ট সেকেণ্ড হত বিনু তাদের একজন ছিল না। সুতরাং তাকে চতুর বলা চলে না। তখনকার দিনে কেউ তাকে চিনতই না। যারা ভালোবাসত তারা চতুর কিংবা গুণী বলে নয়, বিনু বলেই ভালোবাসত।

এমন যে বিনু তাকে চতুর করে তুললেন *সবুজপত্র*-এর লেখকপুঞ্জ। তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন। ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথও।

চতুর শুধু লিপিচতুর নয়। জীবনচতুর! রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরির লিপিচাতুর্য জীবনের চাতুর্য। তাঁদের চোখ চতুর, কান চতুর, রুচি চতুর। তাঁদের মন চতুর। একপ্রকার মন আছে, বিদগ্ধ মন। যার সে মন নেই সে যদি লিপিচতুর হতে যায় তবে রসের বদলে দেয় রসাভাস। তাতে প্রাণ জুড়োয় না। একটু চমক লাগে এই যা। *ঘরে বাইরে*-র বা *চার ইয়ারী*-র চাতুর্য ওষ্ঠাগত নয়। বৈদগ্ধ্যের বিদ্যুৎস্ফুরণ। 'মেঘদূতে'র চাতুর্যও তাই। এমনি করে ক্ল্যাসিকের প্রতি বিনুর কৌতূহল জন্মায়। কিন্তু তার মনের ছাঁদ রোমান্টিক।

সহজ

কোনো কোনো কবির বেলায় এ নিয়ম খাটে না। তাঁরা লিখতে শিখবেন কী, নিরক্ষর। তাঁরা মুখে মুখে গান বাঁধেন, যেমন মেয়েরা মুখে মুখে ছড়া কাটে। কান সজাগ বলে ছন্দপতন হয় না, পদের সঙ্গে পদ মেলে। তাঁদের কবিতা লোকের ভালো লাগে চাতুরীর জন্যে নয়, অন্তর্নিহিত মাধুরীর জন্যে। মাধুরী অন্তর থেকে উৎসারিত হয়ে রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। কলাবিদ্যার অপেক্ষা রাখেনি।

বাল্যকালে বৈষ্ণব কবিতা আস্বাদন করে বিনুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার বিশ্বাস হত না যে চন্ডীদাস বিদগ্ধ বা চতুর বা কলাবিদ। অথচ তাঁর পদাবলি হৃদয়ের বার্তা হৃদয়ের কাছে পৌঁছে দিত। চোখে জল আসত। সে-জল যেমন বিনুর চোখের, তেমনি কবির চোখের। ব্যথায় ব্যথিয়ে দেওয়া কি সহজ কাজ! অথচ তিনি সহজ কবি। তাঁর রচনার কোথাও কোনো প্রয়াস নেই।

তখন বিনু এর রহস্যভেদ করতে পারেনি, পরে করেছে। রস নিবিড় হলে আপনি আপনার পথ করে নেয়, মনের সাহায্য নেয় না। যেসব কবিতা বুকের রক্তে লেখা, মন তাদের উপর খবরদারি করে একটু-আধটু বদলে দেয়, নতুবা মনের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সুদূর। সে সব ক্ষেত্রে মনের চাতুরী একটা উপসর্গ, সাধক তাকে ভয় করে। সাধক চায় সম্পূর্ণ সহজ সরল নিরলংকার হতে, সব অভিমান ভুলতে। ঐশ্বর্যের লেশ রাখতে চায় না, বিভূতির পরিচয় গোপন করতে চায়। এও একপ্রকার বৈদগ্ধ্য। কিন্তু মনের নয়, হৃদয়ের। সংসারের পোড়খেয়ে নয়, প্রেমের দহনে।

'বড়ো কঠিন সাধনা, যার বড়ো সহজ সুর।' রবীন্দ্রনাথও এ সাধনার সংকেত জানতেন। *গীতাঞ্জলি* তার সাক্ষী। *খেয়া* থেকেই বোধহয় এ সাধনার শুরু। বালক বয়সে যখন *চয়নিকা* তার হাতে পড়ে তখন সবচেয়ে মিষ্টি লেগেছিল *খেয়া*-র কবিতা। উত্তরকালে সে কবির পূর্ব কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছে—*মানসী*, *সোনার তরী*, *চিত্রা*। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজ কবি। বিনুর ভালো লাগত কবির উদাসমধুর সুর। বৈষ্ণবের নয়, বাউলের। পশ্চিমের লোক যে তাঁকে মিস্টিক বলেছিল, ভুল বলেনি। সহজের ছলে যাঁরা পরম সত্য শোনান তাঁরা মিস্টিক।

সাংবাদিকতা

বিনুর ঠাকুরদা তাকে চায়ের নেশা ধরিয়েছিলেন, বাবা ধরিয়েছিলেন খবরের কাগজের নেশা। একটু বড়ো হয়ে সে যখন ইংরেজি পত্রিকা পড়ল তখন তার নেশাকেই করতে চাইল পেশা। তাও স্বদেশে নয়, সারা দুনিয়া জুড়ে, প্রধানত আমেরিকায়। বলা বাহুল্য, ইংরেজি ভাষায়। সুধীন্দ্র বসু, সন্ত নিহাল সিং, এঁদের দৃষ্টান্ত তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। কিছুকালের জন্যে সাহিত্য চলে গেল তার দৃষ্টির আড়ালে।

বিনুর স্বভাবে একটা অস্থিরতা ছিল। সে কোথাও চুপ করে বসে থাকতে পারত না, চারদিক বেড়িয়ে আসত বিনা কাজে। দেশ-বিদেশ বেড়ানো তার আশৈশব সাধ। বিদেশ বলতে যদিও বহু দেশ বোঝায় তবু তার পক্ষপাত অতি অল্প বয়স থেকে আমেরিকার উপর। একদিন তারা বাবা তাকে বলেছিলেন সে বড়ো হলে জর্জ ওয়াশিংটন হবে। একখানা বই তার হাতে পড়েছিল, তাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিকথা ছিল। ওয়াশিংটনের মতো জেফারসনকেও তার ভালো লেগেছিল এবং পরবর্তী যুগের লিংকনকে। স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকা, সেখানে সব মানুষ সমান, সেখানে প্রাচ্য পাশ্চাত্য ভেদ নেই, সেখানে যে-ই যায় সে-

ই উন্নতি করে। ইংরেজি মাসিকপত্রে আমেরিকাপ্রবাসী ভারতবাসীদের জবানবন্দি পড়ে সেদিন গুনত কবে বড়ো হবে, কবে জাহাজের খালাসি হয়ে সাগর পাড়ি দেবে। তারপর আমেরিকায় পৌঁছে খবরের কাগজের আফিসে ভরতি হবে।

সেদেশে বা এদেশে কলেজে পড়বার বাসনা কোনোকালেই তার মনে উদয় হয়নি, তার বাবাও তেমন বাসনা জাগিয়ে দেননি। তিনি নিজের স্কুলের পড়া সাঙ্গ করার আগে জীবনসংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই জীবনসংগ্রামকে স্কুল-কলেজের চেয়ে কার্যকর শিক্ষায়তন বলে বিশ্বাস করতেন। স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে মানুষ হয় ক-জন! প্রায় সবাই তো গোলাম। তাঁকেও চাকরি করতে হয়েছিল বলে চাকরির উপর তাঁর অভিশাপ ছিল। তাঁর ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে এই প্রার্থনা তিনি করতেন, চাকুরের মতো চাকুরে হবে এ প্রার্থনা নয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা লোক, ইস্তফা দিয়েছিলেন একবার। তাঁকে আঠারো বছর বয়সে চাকরি করতে হয়েছিল বাপ-মায়ের খাতিরে, ভাই-বোনের খাতিরে। বিনুকে যেন পরিবারের খাতিরে চাকরি করতে না হয়।

খেলাঘর

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের একটি সনেট আছে, তাতে তিনি বলেছেন স্বাধীনতার খেলাঘর পাহাড় আর সমুদ্র। বিনুর জন্ম পাহাড়ের দেশে। পাহাড়গুলো ছোটো কিন্তু মানুষটি আরও ছোটো। ছেলেবেলায় তাই তার মনে হত এসব পর্বতের চূড়া আকাশে ঠেকেছে, হাত বাড়ালেই স্বর্গ। এদের আড়ালে কি অন্য কিছু আছে? না বোধহয়। পৃথিবী ফুরিয়ে গেছে পাহাড়ের ওপারে।

দিনের পর দিন সকালে বিকালে দুপুরে দেখা হয় তাদের সঙ্গে, দেখা হয় রাত্রে, জেগে থাকলে রাতদুপুরে! বাড়ি থেকে সবসময় দেখা যায়, কষ্ট করে খুঁজে নিতে হয় না। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখতে চাইলে পাহাড় না দেখে উপায় নেই। আষাঢ়ের নব মেঘ পাহাড়েই পতাকা ওড়ায়। বৃষ্টির পরে ধীরে ধীরে যবনিকা ওঠে, রঙ্গমঞ্চে সমাসীন—শৈল।

এইসব খেলার সাথির সঙ্গে একটানা চোদ্দো-পনেরো বছর কাটিয়ে বিনু স্বাধীনতার মূল্য বুঝেছিল। কী করে বুঝল তা কী করে বোঝাবে! কিন্তু তার কাছে স্বাধীনতা বিকিয়ে দেবার প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন স্বাধীনতার চেয়ে মূল্যবান অনুভূতির জন্যে দাম দেবার তাগিদ আসে। তেমন তাগিদ পরে তার জীবনে এসেছে, কিন্তু তার দ্বারা স্বাধীনতার মূল্য কমেনি, বরং স্বাধীনতা যে কত মূল্যবান সেই কথাই মনে হয়েছে। যে নারী তার একমাত্র বাস দান করেছিল প্রভু বুদ্ধের জন্যে, তার কাছে তার একমাত্র বাসের যা মূল্য বিনুর কাছে তার স্বাধীনতারও তাই।

চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে সমুদ্র সন্দর্শন ঘটল। সন্ধ্যা বেলা পুরীতে নেমে তার প্রথম কাজ হল সাগর সম্ভাষণে বেরোনো। অন্ধকারে কানে আসছিল অনাস্বাদিত কলরোল, গায়ে লাগছিল স্নিগ্ধ সিক্ত বাতাস। এমন প্রবল আকর্ষণ সে জীবনে অনুভব করেনি। সমুদ্র তাকে মাতাল করল। তারপরে তার পড়ার ব্যবস্থা হল পুরীতে। দিনের পর দিন রাতের পর রাত সমুদ্রতীরে কাটল। সমুদ্রের সঙ্গে তার পরিচয় পাকা হল, যেন কত কালের সখা। কলেজের বন্ধে সমুদ্র তাকে ডাক দিত পুরীতে। পরে একদিন সে সমুদ্রযাত্রাও করল। তার জীবনের উপর স্বাধীনতার ছাপ আঁকা হয়ে গেল সিন্ধুর নীল রঙে।

মন্দির

বিনুর যেখানে জন্ম সেখানকার প্রাণ ছিল মন্দির। প্রাচীন ভারতের মন্দিরকেন্দ্র সভ্যতা দেশীয় রাজ্য থেকে এখনও বিলুপ্ত হয়নি, অন্তত তখন পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল। বিনুর মা ঠাকুমা প্রায়ই মন্দিরে যেতেন, তাঁদের সঙ্গে বিনুও। মন্দির যেমন বৃহৎ তার বেড়া তেমনি বিস্তৃত। সে যে কেবল মূর্তির পায়ে মাথা ঠেকাত তা-ই নয়, বিরলে বসে এমন কিছু পেত যা সব ধর্মের সার অনুভূতি। বাড়িতে ফিরতে তার ইচ্ছা করত না। ফিরত, কারণ না ফিরলে নয়। এও একপ্রকার পলায়ন। এ পলায়ন সংসার থেকে সংসারের বাইরে নয়, সংসারের মূলে। অনন্ত অসীম অপার বিশ্বের অধিবাসী বিনু, সংসার সে-পরিচয় ভোলে ও ভোলায়, মন্দিরে গেলে মনে

পড়ে। নয়তো পুণ্য করার জন্যে তার মাথাব্যথা পড়েনি। এমন কী পাপ করেছে যে পুণ্যের জন্যে মন্দিরে মাথা খুঁড়বে?

ধর্ম সম্বন্ধে তার একটা কৌতূহলও ছিল। তাই তার কাকার সঙ্গে গির্জায় গেছিল, যোগ দিয়েছিল উপাসনায়। মসজিদে যায়নি, কিন্তু মহরমে লাঠিখেলার জন্যে তাকে ও তার ভাইকে বলা হয়েছিল। ঠাকুমার মানত। বাড়িতে সত্যপিরের সিন্নি আসত, যিনি আনতেন তাঁর নাম বোখারি সাহেব। তাঁকে বিনুরা ভক্তি করত। এই ভক্তিবৃত্তি তাকে একাদশীর উপবাস করিয়েছে, যদিও দয়াময়ী মা তাকে ফলার খাইয়ে উপবাসের জ্বালা জানতে দেননি। নগরকীর্তনে বাহু তুলে নাচিয়েছে, যদিও সেটা হরির লুটের লোভে উদ্বাহু হওয়া।

ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা ক্রমশ তাকে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসবান করে। সে সাকারবাদে আস্থা হারায় চিরকালের মতো। তারপরে যদি-বা মন্দিরে গেছে সেটা উৎসবের টানে, সৌন্দর্যের খোঁজে। ধর্ম বাদ দিলেও আমাদের সভ্যতার অনেকখানি থাকে, মন্দির তার কেন্দ্র। মন্দির বাদ দিলে ঐতিহ্য বাদ দেওয়া হয়, বিনু তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না, প্রস্তুত নয়। সে সাকারবাদী না হয়েও হিন্দু, কারণ সে তার স্বদেশের ধারাবাহিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বিচ্ছেদ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু এর জন্যে যতটা নৈতিক সাহসের দরকার ততটা তার নেই। মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তা-ই শেষপর্যন্ত ঘটল। এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।

রহস্যময়ী

দেবমন্দির বললে শুধু দেবতা নয়, আরও অনেককে বোঝায়। শহরে সকলে সমবেত হয় সেখানে, মেয়েদেরও অবাধ গতি। সব জাতের, সব শ্রেণির মেয়ে। বিনু একটু কম বয়সে পেকেছিল। না-পাকবেই বা কেন? ছ-মাস বয়স থেকে তার বিয়ের নির্বন্ধ লেগে রয়েছিল। অতগুলি কনের সঙ্গে বিয়ে হলে তার বিরাট অন্তঃপুর হত। যাকেই দেখেন তাকেই নাতবউ করবেন বলে কথা দেন তার ঠাকুমা। বেচারা বিনু সবুর করতে করতে নিরাশ হয়। কেন বউ আসছে না সুধোলে জবাব পায়, বড়ো হলে আসবে। বড়ো হওয়া কি তার হাতে? বিনু হাল ছেড়ে দেয় বিয়ের। কিন্তু চোখের দেখার নয়। মন্দিরে গেলে যাঁদের দেখা পায় তাঁরা দেবী নন, মানবী। অথচ বিনুর কাছে তাঁদের আকর্ষণ দেবতার অধিক। এখানে খুলে বলতে হয় যে বেশি বয়সের মেয়েদের উপরেই তার দৃষ্টি ছিল বেশি। কারণ তাঁরা বালিকা নন, নারী! রহস্যরূপিণী!

আমাদের পুরাতন সভ্যতায় নর-নারীর মেলামেশার ও চেনাশোনার প্রধান স্থল ছিল মন্দির বা মেলা। রথযাত্রায়, শিবরাত্রিতে, দোলপূর্ণিমায়, ঝুলনের রাতে, রাসপূর্ণিমার ভোর বেলার স্নানে, বারুণীর যোগে—বিনুর জন্ম বারুণীর দিন—বিনু তাঁদের দেখতে পেত যাঁদের দেখা মিলবার নয়। তখনকার দিনে অবরোধ প্রথা এখনকার মতো শিথিল হয়নি। কয়েকটি পরিচিত পরিবারের মধ্যে যাওয়া-আসা চলত, কিন্তু সেগুলি তো এক-একটি গোষ্পদ। মন্দির না থাকলে, মেলা না থাকলে, স্নান না থাকলে অবরোধ প্রথার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সমাজের সব পুরুষকে বঞ্চিত করত সব রমণীর শ্রী থেকে। কূপের মধ্যে রূপ দেখা যেত না বিচিত্ররূপিণীর।

রথযাত্রার দিন দলে দলে সুসজ্জিতা যাত্রিণী তাদের বাড়ি আসত পল্লি অঞ্চল থেকে। জল খেতে চাইত, গল্প করত বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে, সম্বন্ধ পাতিয়ে যেত চিরদিনের। রথযাত্রার রাত্রে রথের পাশে মহিলাদের সমাবেশ হত, মা ঠাকুরমাদের সঙ্গে বিনুও থাকত। দেবতার প্রতি ভক্তি ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু মানবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি দুর্বার। তখনও সে দেহসচেতন হয়নি, কিন্তু রূপসচেতন হয়েছিল। সাজসচেতন, মাধুরীসচেতন। রহস্যসচেতন।

সম্বন্ধ

সম্বন্ধ পাতানোর প্রথা বোধহয় ভারতবর্ষের বিশিষ্টতা। কোনোদিন যাকে চিনিনে সে একদিন হঠাৎ এসে পরিচয় দিয়ে বলে, আমি তোমার মেসো। কেননা, তোমার মা আমার স্ত্রীকে বোন বলে ডাকতেন। কিংবা আমি তোমার ভাই। তোমার বাবা আমার বাবাকে ভাই বলতেন, কিংবা আমি তোমার শাশুড়ি।

বিনুর জীবনে এরকম হরদম ঘটত। তাদের বাড়ি কেবল যে রথযাত্রার দিন গ্রামের মেয়েরা আসত তা-ই নয়, আসা-যাওয়ার বিরাম ছিল না। একদল সাপুড়ে বছরে এক বার করে অতিথি হত। ঠাকুরদাকে তারা শ্রদ্ধা করত, তিনি সাপের মন্ত্র জানতেন। নানারকম তুকতাক, গাছগাছড়া, ওষুধপত্র জানা ছিল তাঁর। গোরু-বাছুরের সেবা ও চিকিৎসা তাঁর মতো কেউ জানত না। সাপুড়েরা তাঁকে 'জারমহুরা' দিত। সাপের মাথার মণি দিত। বিনুর সঙ্গে তারা সম্বন্ধ পাতিয়েছিল। তাদের একজনকে সে দাদা বলে ডাকত।

দোকানদারদের অনেকেই ছিল তার মেসো। তাদের একজন তাকে একটা 'ডারা' দিয়েছিল। খঞ্জনির মতো। বিনুর সেটা ছিল প্রিয় বাজনা। এমনি রাজ্যিসুদ্ধুর সঙ্গে তার একটা-না-একটা সম্বন্ধ পাতানো হয়েছিল, সাধারণত তার অজ্ঞাতে। সম্বন্ধ পাতানোর ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন তার ঠাকুমা। তাঁর বেয়ানদের সংখ্যা অগণিত, কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা তারা সব জাতের। ধোপানি, গয়লানি, ময়রানি, মালিনী, মেথরানি কেউ বাদ ছিল না। ঠাকুমা যদিও সেকালের লোক, তিনি ছিলেন আশ্চর্যরকম উদার। হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত, মুসলমানদের গোলেবকাওলি, ক্রিশ্চানদের দু-চারটে গল্প ও দেশ-বিদেশের রূপকথা ছিল তাঁর ঝুলিতে। তাই তাঁর পাতানো বেয়ান বা মেয়ে নাতি-নাতনিদের মধ্যে মুসলমান ক্রিশ্চানও ছিলেন। বিনুর মায়ের শুচিবাতিক, তাই তাঁরা বড়ো-একটা আসতেন না বিনুদের বাড়ি। কিন্তু বিনু তাঁদের বাড়ি মাঝে মাঝে যেত। মুরগির ডিম খেতে চাইলে যেতে হত পাঠান মাস্টারনির বাড়ি। তিনি ছিলেন পিসিমা কি খুড়িমা। একদিন তিনি এক হিন্দু ছাত্রের সঙ্গে অন্তর্ধান করেন। হালুয়া আসত এক মুসলমান হাকিমের বাড়ি থেকে। তিনি ছিলেন পাতানো ভগ্নীপতি। বিনুর মা অতটা পছন্দ না করলেও তাঁরও ছিলেন অনেকগুলি পাতানো ভাই-বোন বাপ-মা। বিনু তাঁদের বাড়ি যেত। তাঁদেরও বিভিন্ন জাত। এমনি করে বিনু জাতিভেদে বিশ্বাস হারায়।

শ্রেণিভেদ

রাজবাড়িতে কত বার গেছে, রাজারা কেমন থাকতেন তাও অজানা ছিল না। আবার 'পান'দের পাড়ায়, 'শবর'দের পাড়ায় বেড়িয়েছে, তারা কেমন থাকত তাও তার জানা। সমাজের শ্রেণিবদ্ধ রূপ তার চোখে পড়েছিল, কিন্তু একালের মতো পীড়া দেয়নি। শ্রেণিতে শ্রেণিতে বিচ্ছেদ ও বিরোধ এমন করে দৃষ্টি ছায়নি।

ওই যে পাতানো সম্বন্ধের কথা বলেছি ও-প্রথা যত দিন সজীব ছিল ততদিন উঁচু-নীচুর ব্যবধান সহ্য হয়েছিল। কিন্তু ওটা মৌখিক সম্বন্ধ। বোধহয় তাও নয়, এখন কেউ কারুর সঙ্গে মৌখিক সম্বন্ধও পাতায় না সহজে। মৌখিক সম্বন্ধের দ্বারা এত বড়ো একটা ব্যবধান চাপা পড়বার নয়। মুখোশ খসেছে। তাই শ্রেণিসমস্যা আজকের দিনে মহাসমস্যা।

যে করেই এর সমাধান হোক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সেই সম্প্রীতির স্মৃতি বিনুর মনে উজ্জ্বল রয়েছে ও রইবে। যাদের সঙ্গে তার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তার পিতা-মাতার স্বার্থের সম্পর্ক ছিল না, তারা মুখের সম্বন্ধকেও সত্য সম্বন্ধ বলে তাকে একদিন বিশ্বাস করতে দিয়েছিল। বিশুদ্ধ স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা তার বরাতে জুটেছিল সমাজের অসম স্তরে। এখনকার দিনে এটা স্বপ্ন। তখনকার দিনে কিন্তু বাস্তব। একজনের জীবনে এককালে যা বাস্তব হয়েছে তা সর্বজনের জীবনে সর্বকালে বাস্তব হবে না কেন, যদি তার মধ্যে সত্য থাকে?

কবি তো সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে জন্মায় না, সে কাজ অন্যের। কবি যা দেখে তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তার জীবনে তো সত্য। সে যদি সকলের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সকলের জীবনেও সত্য। যদি সব কালের প্রতিনিধি হয়ে থাকে তবে সব কালের জীবনেও সত্য। বিনু আজ বড়ো হয়েছে বলে তার ছোটোবেলার বিশ্বাস হারাবে না; বিশ্বাস হারানো যে বিশ্বাসঘাতকতা, তার পাতানো মাসি-পিসি ভাই-বোন মিতাদের প্রতি।

কবিরা যদি এই বিশ্বাস নিয়ে বাঁচে, মানুষ বাঁচবে। আর সাহিত্য যদি অবিশ্বাসীদের হাতে পড়ে তবে শ্রেণিসংঘাতের বিষফোড়া সমাজের সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করে সাহিত্যেও সংক্রামিত হবে। হচ্ছেও।

ঐতিহ্য

বিনু যদি কোনোদিন লেখাপড়া না শিখত, পেয়ারা গাছে বসে সারাদিন কাটাত, পুকুরের জলে দিনের বেলা সাঁতার কেটে সন্ধ্যা বেলা আবার ঝাঁপ দিত, তাহলেও রামায়ণ মহাভারত ও বৈষ্ণব কবিতা তাকে ভারতের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত রাখত। কবিকঙ্কণ চন্ডীও। তার ঠাকুমা তাকে মুখে মুখে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি বলেছিলেন; মোটামুটি নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে। বই পড়ে সে তার বেশি শেখেনি। কবিকঙ্কণ চন্ডীর গল্প দুটিও সে তাঁর মুখে শুনেছিল। বাড়িতে চন্ডী পড়া হত সুর করে। বিনু প্রথমে ছিল শ্রোতা, পরে হল পাঠক। আর বৈষ্ণব কবিদের পদাবলি তো কীর্তনের সময় তার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছিল। সেও হত দোহার। থিয়েটার, যাত্রা ও কথকতা তাকে প্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজ্ঞান করেছিল—বিনা অধ্যয়নে।

এর প্রভাব তার জীবনব্যাপী। অতীতের সম্মোহন তাকে স্বকালের প্রতি অচেতন করেনি, সে অতীত বলতে অজ্ঞান নয়, বরং অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্যে বর্তমান ভারতের এ দশা, একথা সে উচ্চকণ্ঠে জানায়। নির্মমভাবে সমালোচনা করে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করলে প্রাণগঙ্গা শুকিয়ে যাবে, দেশ থাকবে বটে কিন্তু দেশের মাটিতে রস থাকবে না। যে-দেশের অতীত নেই, তার ভবিষ্যৎ নেই। অতীত নেই মানে অতীতের সঙ্গে যোগসূত্রও নেই। ভবিষ্যৎ নেই মানে নব নব উন্মেষশালিনী সংস্কৃতি নেই। মিশরের যা হয়েছে।

যোগসূত্র ছিন্ন করা চলবে না। দেশের যেসব সন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাঁদের প্রাণে এই ছেদচেতনা রয়েছে বলেই তাঁদের কাছ থেকে তেমন কোনো সৃষ্টি পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁরা ইসাই হয়েছেন তাঁরা কিন্তু সূত্রচ্ছেদ করেননি। তাই *মেঘনাদ বধ* সম্ভব হয়েছে। বিনুর জীবনে বিভিন্ন ধর্মমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে, বিদেশের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু তার স্বদেশের ঐতিহ্য থেকে, চার-পাঁচ হাজার বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা থেকে, ততোধিক পুরাতন শিকড় থেকে সে তার আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা বঞ্চিত করেনি। ভারতের কবি-পরম্পরায় বিনুও একটি মুক্তো। একসূত্রে গাঁথা।

স্বকাল

কিন্তু কবি হল সে কবে! কবিকে আড়াল করে দাঁড়াল সাংবাদিক। তার সাংবাদিক হতে চাওয়ার হেতু তার স্বকালের প্রতি টান। অক্ষরপরিচয় হতে-না-হতেই তার হাতে পড়ল খবরের কাগজ। তার কাছে দূত পাঠাল বর্তমান কাল। শেষে এমন হল যে, সে নিজেই দূত হতে চাইল। সাংবাদিক হচ্ছে বার্তাবহ। যে-বার্তা সে বহন করে সে-বার্তা যুগের। বার্তাবহের সেইজন্যে দেশ-বিদেশ নেই, যদি থাকে তো আকস্মিক। না থাকলেও চলত। কিন্তু কালবোধ আছে। না থাকলে চলত না।

বিনুর কালবোধ তার দেশবোধকে একেবারে ঢেকে না রাখলেও ধীরে ধীরে ঢাকছিল, মেঘ যেমন করে আকাশকে ঢাকে। দিনরাত আমেরিকার কথা ভাবতে ভাবতে সে হয়তো কিছু দেশবিমুখ হয়েছিল। তাই অমৃতসর তার প্রাণে সাড়া তোলেনি ও অসহযোগের প্রস্তাব তার কাছে সংকীর্ণ চিত্ততার পরিচয় বয়ে এনেছিল। কিন্তু দেশ যখন ক্রমে ক্রমে আগুন হয়ে উঠল তখন আগুনের আঁচ লাগল তার গায়েও। সে অসহযোগ করবে স্থির করল। পরীক্ষাটা নামমাত্র ছিল, ফল খারাপ হবে জানত, এবং খারাপ হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কারণ কলেজে যেতে তার রুচি ছিল না। অথচ জেলে যেতেও মতি ছিল না।

তারপর সাংবাদিক হবার জন্যে সে রওনা হল কলকাতায়। সেখান থেকে একদিন সুযোগ বুঝে আমেরিকা পাড়ি দেবে এই ছিল অভিপ্রায়। কিন্তু জাহাজের চেহারা দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। এ জাহাজে গঙ্গা পারাপার করতে ভরসা হয় না, কালাপানি পারাপার করবে! জাহাজের চেহারা দেখে যেমন বিনুর মুখ গেল শুকিয়ে, তেমনি বিনুর চেহারা দেখে সম্পাদকদের। তাঁরা যখন শুনলেন যে ও-ছেলে ইংরেজি বাংলা দুটো ভাষাতেই লায়েক, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে চায়, তখন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে ভাবলেন। তারপর একজন বললেন, তুমি আপাতত তর্জমা করো। অপরজন বললেন, প্রুফ সংশোধন করো। একজনও একটা 'যৎকিঞ্চিৎ' লিখতে দিলেন না দেখে বিনু অবাক হল। দিন কতক পরে তার শরীর বেঁকে বসল, আর

সহকারী গোছের এক ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন, আগে গ্র্যাজুয়েট হও, তারপরে এ লাইনে আসতে চাও এসো। কথাটা বিনুর মনে বাজল। কিন্তু বাড়ি ফিরে সেরে উঠে কলেজেই ঢুকল সে।

এ ই

শরীর অন্তরায় না হলে বিনু বোধহয় একূল-ওকূল দু-কূল হারাত। না-হত তার আটলান্টিকের পশ্চিম কূলে যাওয়া, অর্থাৎ আমেরিকায়। না-হত আটলান্টিকের পুব কূলে, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে। যেদিন কলেজে ঢুকল ঘাড় হেঁট করে সেদিন জানত না যে নিয়তি তাকে এক কূল থেকে ফিরিয়ে দিল আর এক কূলে টানতে।

কলেজে ঢুকলেও বিনুর সংকল্প অটুট রইল। সে গ্র্যাজুয়েট হয়ে খবরের কাগজের অফিসে কাজ করবে, সেই তার পেশা এবং নেশা। যেখানে যত পত্রিকা পায় পড়ে, মনে মনে লিখতে শেখে। হাতে-কলমেও একটু-আধটু লিখত। কিন্তু ছাপতে দিত না।

ক্রমে তার আদর্শ হয়ে উঠলেন আইরিশ কবি ও সম্পাদক জর্জ রাসেল। তাঁর ছদ্মনাম এ ই। তাঁর একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, তাতে তিনি লিখতেন চাষি গয়লা তাঁতি কামার প্রভৃতির দরকারি কথা। কী করে ফসল বাড়ানো যায়, পোকামাকড়ের উৎপাত থেকে বাঁচানো যায়, কী করে সমবায় পদ্ধতিতে কেনা-বেচা করতে হয়, দালালকে বাদ দিতে হয়, উৎপাদন ও বিনিময়ের ব্যবস্থা কেমন করে ধনশক্তির হাত থেকে জনশক্তির হাতে আসবে, অথচ হানাহানি বাঁধবে না।

তাঁর স্বদেশের কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট ছিল তাঁর জীবন। তাঁর সম্পাদনা ছিল জীবনব্রতের উদ্যাপন। তেমন কোনো জীবনব্রত যার নেই সে যদি সম্পাদনা করে তো সংসার চালানোর জন্যে। বিনুর সংসারী হতে ইচ্ছা ছিল না। বিবাহের উপর তার বিরাগ জন্মিয়েছিল। অথচ প্রণয়ের উপর ছিল পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা। সে ভালোবাসবে কিন্তু বিয়ে করবে না, বাঁধা পড়বে না। ভালোবাসার ফলে যদি সন্তান হয় তার দায়িত্ব নেবে সমাজ। সমাজকে তারজন্যে ঢেলে সাজাতে হবে। সমাজসংস্কার হবে বিনুর অন্যতম ব্রত। তা ছাড়া, দেশ-উদ্ধার তো রয়েছেই। আমেরিকা যদি যায় তো ভারতের স্বাধীনতার জন্যে প্রচারকার্য চালাবে।

নিজের কলমের উপর তার আস্থা ছিল, কিন্তু সে-কলম সাহিত্যিকের নয়, সেবকের তথা সংস্কারকের। তখনও তার অন্তরে রসের উপচয় হয়নি। সে আবিষ্কার করেনি সে রসিক, সে কবি।

গান্ধীজি

যিশু জন্মগ্রহণ করবেন জানতে পেরে কয়েক জন জ্ঞানী তাঁর জন্মস্থানে যাত্রা করেছিলেন নবজাতককে দর্শন করতে। দর্শন করে তাঁদের সন্দেহ জন্মাল। এ কি জন্ম! না এ মৃত্যু! প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁদের মনোভাব কেমন হল তা টি এস এলিয়ট থেকে উদ্ধার করি।

> ...I had seen birth and death,
> But had thought they were different ; this Birth was
> Hard and bitter agony for us, like Death, our death,
> We returned to our places, these Kingdoms,
> But no longer at ease here, in the old dispensation
> With an alien people clutching their gods.

ভারতের রাজনৈতিক আস্তাবলে গান্ধীজি যখন ভূমিষ্ঠ হলেন তখনকার দিনের জ্ঞানীরা বড়ো আশা করে হতাশ হলেন। ছোটো হরফের 'গড'গুলির নাম আধুনিক সভ্যতা, অতিকায় যন্ত্রপাতি, পার্লামেন্টারি শাসন, সশস্ত্র বিপ্লব, যেনতেনপ্রকারেণ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, প্রয়োজন হলে অসত্যাচরণ। বড়ো 'গড'টির নাম স্বরাজ। গান্ধীজিকে তাঁরা বরণ করেছিলেন স্বরাজের খাতিরে। তা বলে তাঁরা মিলের কাপড় ছেড়ে চরকার সুতোর খদ্দর পরবেন কোন দুঃখে! কাউন্সিল অ্যাসেম্বলির মায়া কাটাবেন কত দিন! হানাহানি না করলে তাঁদের পৌরুষ ক্লীবত্ব পাবে যে! উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে অহিংস উপায় মেনে নিলেও সেই উপায় যে একমাত্র বা অব্যর্থ এ বিশ্বাস তাঁরা পোষণ করবেন কোন যুক্তিতে? সত্যের উপর এতখানি জোর দিলে সাধু সন্ন্যাসী

হওয়া উচিত, কর্মক্ষেত্রে ওসব চলবে কেন! আর আধুনিক সভ্যতা! আহা! স্বরাজ চাই বলে দুশো বছর পেছিয়ে যাব!

জ্ঞানীদের জীবন থেকে সোয়াস্তি চলে গেল কিন্তু। বিনুর জীবন থেকেও। গান্ধীজি যে ক্ষণজন্মা পুরুষ সে বিষয়ে তার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তাঁর জন্ম যে একটা যুগের মৃত্যু, শুধু বৈদেশিক শাসনের নয়, সেটাও তো প্রত্যক্ষ। বিনু বিষম দোটানায় পড়ল। গান্ধীজির 'হিন্দ স্বরাজ' তাকে চমৎকৃত করল। সেও হাড়ে হাড়ে নৈরাজ্যবাদী। কোনোরকম শাসন তার সয় না। নিয়ম যদি মানতে হয় তবে তা অন্তরের নিয়ম। অথচ গান্ধীজির কথায় দুশো বছর পেছিয়ে যেতে সে একেবারেই নারাজ ছিল। নাহয় নাই হল স্বরাজ।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করে প্রমাণ করেছিলেন যে তিনি তাঁর দেশের অসম্মান অসহায়ের মতো অবলোকন করবার পাত্র নন। সুতরাং তিনিই যখন গান্ধীজির অসহযোগ নীতির প্রতিবাদী হলেন তখন বিনুর মতো অনেকের একটা জবাবদিহি জুটল। নইলে কলেজে পড়ার কলঙ্ক কপালে জ্বলজ্বল করত। বিনু ইতিমধ্যে কবির পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল, এখন থেকে গোঁড়া রবীন্দ্রপন্থী হল। যাকে বলে অন্ধ ভক্ত। ওদিকে গান্ধীজির সম্বন্ধে তার একটা দুর্বলতা হল। বোধহয় 'হিন্দ স্বরাজ'-এর প্রভাবে। তাই মোটা ভারী খদ্দরের বাহন হল। তার নিজের চেয়ে তার পোশাকের ওজন বেশি। এদিকে রবীন্দ্রনাথের অনুসারক কিনা। তাই ওগুলোকে রাঙিয়ে নিল নানা রঙে। এমন ডগডগে রং যে এক ক্রোশ দূর থেকে ষাঁড় তাড়া করে আসে। জন বুল নয়, জনতার চক্ষু। তখনকার দিনে রঙের দোষ ছিল ওই।

যদিও সে কবির প্রায় সব রচনাই পড়েছিল, পড়ে মুগ্ধ হয়েছিল, তবু তাঁর সঙ্গে তার সম্বন্ধ ঠিক সাহিত্যঘটিত ছিল না। ছিল ধর্মবিশ্বাসজনিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপনিষদের ঋষি, আর বিনু ছিল জীবনজিজ্ঞাসু। তার জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর গান্ধীজির মুখে ছিল না, ছিল রবীন্দ্রনাথের মুখে। তিনি বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের ডাক দিয়ে যেন বলতেন, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ বেদাবমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাবতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেবয়নায়।

মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা তার মনে এল মাতৃবিয়োগের পর থেকে। তার এত বড়ো শোকে শান্তি দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের *নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি*। এগুলি সে সাহিত্য হিসাবে পড়েনি, কাব্য কি না বিচার করেনি। বাণীর জন্যে পড়েছে, অমৃতের সন্ধান পেয়েছে। 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি যাই— কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথা বিচ্ছেদ নাই।' এসব তো পড়ে-পাওয়া তত্ত্ব নয়, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই তো ঋষি, সত্যদ্রষ্টা। বিনু তাঁকে অভ্রান্ত বলে ধরে নিল। সেই জন্যে তিনি যখন গান্ধীজির বিরুদ্ধে 'সত্যের আহ্বান' লিখলেন তখন বিনুর প্রত্যয় হল যে মনের মতো জবাবদিহি মিলেছে।

অমরত্ব

পুথিতে যেমন এক অধ্যায় সারা না হলে আর এক অধ্যায় শুরু হয় না, জীবনে তেমন নয়। জীবনে একসঙ্গে তিন-চার অধ্যায় চলে। বিনুর জীবনে যখন সাংবাদিকতার চন্দ্রগ্রহণ তখন সাহিত্যের আলো একদম নিবে যায়নি, অবচেতনায় অবস্থান করছে। সে যদি মরে তবে তার আত্মা অমর হবে, কিন্তু তাই যদি যথেষ্ট হত মৈত্রেয়ী কেন প্রশ্ন করতেন, যেনাহং নামৃত্যাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম? অতএব আত্মার অমরত্ব যদিও ধ্রুব তা হলেও আর এক অমরত্ব আছে, তার সাধনা করতে হবে। বিনা সাধনায় যা পাবার তা তো পাবই, সাধনা করে যা পাবার তা যেন অর্জন করি।

সে যখন মরে যাবে তখন কি এমন কিছু রেখে যাবে না যা অমর? যা অমর হয়েছে বিশেষ কোনো অনুভূতির বা উপলব্ধির দৌলতে? যা মানবজীবনের চরম অনুভূতির বাঙ্ময় প্রকাশ? রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক। তিনি অমর, যে অর্থে মানবাত্মা অমর। উপরন্তু অমর, যে অর্থে তাঁর বাণী অমর, সৃষ্টি অমর। বিনু কি তাঁরই মতো সৃষ্টি করে যাবে না কিছু যাতে বিনুকেও অমর করে রাখবে? যে অমরত্ব সৃষ্টিসাপেক্ষ তারজন্যে

বিনুর অন্তরে একটা আকুলতা জাত হল। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই আমার কীর্তির মধ্যে। 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

সে সৃষ্টি করবে। কী সৃষ্টি করবে? করতে চাইলেই কি অমনি হয়? পুঁজি লাগে না? কোথায় তার পুঁজি? দেখল, সে যা উপলব্ধি করেছে তা-ই তার পুঁজি, কিন্তু তা কতটুকু! পুঁজি বাড়ানো দরকার। বই কাগজ পড়ে পুঁজি বাড়ে না। বাড়ে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লে। পথের দু-ধারে ছড়ানো রয়েছে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। দু-হাতে তুলে নিলে পুঁজির অভাব হয় না। দশখানা বই পড়ে একখানা বই লিখতে সবাই পারে। কিন্তু সে-বই সবাই পড়ে না। লেখকের আগেই তার লেখার বিলোপ ঘটে। বাকি যা থাকে তা জাদুঘরের কঙ্কাল। তেমন ভাগ্য কে চায়! বিনু চায় তার লেখা জীবনে চিরজীবী হবে, জাদুঘরে নয়। সাধারণের জাদুঘরে নয়, প্রতিজনের জীবনে। তার আবেদন নিত্যকালের প্রতিটি পাঠকের প্রতি। তার আয়োজনও তদনুরূপ হবে।

খাঁচার পাখি

কলেজের ছ-বছর সে খাঁচার পাখির মতো কাটিয়েছে বনের পাখির ব্যাকুলতা নিয়ে। কলেজকে সে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেনি, করবে না। প্রথম যৌবনের ছ-টি বছর যেন ছ-টি যুগ। যৌবন এত অফুরন্ত নয় যে এই নিদারুণ অপচয় সইবে। এর কোনো ক্ষতিপূরণ নেই, এটা নিতান্তই ক্ষতি। তবে লোকসান না পোষালেও মানুষ একেবারে মারা যায় না, বেঁচে থাকলে সামলে নেয়। সেও এক কথা। তা ছাড়া, লোকসানের মধ্যেও সান্ত্বনার বিষয় একটু-আধটু থাকে বই কী। এও এক কথা।

বিনুর সান্ত্বনা, সে পেয়েছিল জন কয়েক অসাধারণ বন্ধু। জীবনে বন্ধুভাগ্য মহাভাগ্য। তাই কলেজ তার অসহনীয় লাগেনি। লেগেছিল শেষের দিকে যখন দয়িতাভাগ্য এসে সব সান্ত্বনা কেড়ে নিল।

অপর সান্ত্বনা, রাশি রাশি বিদেশি গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ। ইউরোপের ইতিহাস এই সময় তার প্রিয়পাঠ্য হয়। তার থেকে ইউরোপ হল প্রিয় প্রবাস। ইউরোপীয় সাহিত্য তাকে উন্মনা করল। ইউরোপের জীবন কত বিচিত্র আর ভারতের জীবন কী একঘেয়ে! এও এক কারণ। আরও এক কারণ, ইউরোপীয় সাহিত্যে দেশকাল নিরপেক্ষ বহু মহৎ সৃষ্টি আছে। বিনু যদি সৃষ্টি করে তো বিনুর সৃষ্টি তাদের সমান হওয়া চাই। তার রচনার আদর্শ যেন তাদের চেয়ে খর্ব না হয়।

কিন্তু অতটা সে একদিনে ভাবেনি। সাংবাদিকতা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল অতি দীর্ঘকাল। তার পরে এল সমাজসংস্কারের সংকল্প। সমাজ ভাঙা-গড়ার স্বপ্ন। বিশুদ্ধ সাহিত্যে পৌঁছোতে বোধহয় পুরো দু-বছরই লেগেছে। গোড়ার দিকে ইবসেন, বার্নার্ড শ, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, এঁরাই ছিলেন তার প্রিয় লেখক বিদেশিদের মধ্যে। অনুরূপ কারণে শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ স্বদেশিদের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালকে সে শৈশবে আবিষ্কার করেছিল, অলক্ষে অতিক্রম করছিল। শরৎচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথ কখন একসময় তাঁদের চেয়েও প্রিয় হয়ে উঠলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির চেয়ে নয়। টলস্টয় ও রম্যাঁ রলাঁর চেয়ে নয়। ডস্টয়েভস্কি ও বালজাকের চেয়ে নয়। শেলি ব্রাউনিং ও শেক্সপিয়ারের চেয়ে নয়। পরবর্তী বয়সের আবিষ্কার গ্যেটের চেয়ে নয়। চেখভের চেয়ে নয়।

পোষা প্রাণী

সে নিজে খাঁচার পাখি বলে তার স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল যেখানে যত খাঁচার পাখি তাদের সকলের প্রতি। মেয়েরাও খাঁচার পাখি। খাঁচার পাখিও বটে, পোষা প্রাণীও বটে। কেবল যে অবরোধ প্রথা আছে বলে বন্দিনি তা নয়, তারা পরনির্ভর, তাদের স্বতন্ত্র জীবিকা নেই। যেখানে স্বতন্ত্র জীবিকা আছে, যেমন নীচের স্তরে, সেখানেও তারা পুরুষের পোষমানা প্রাণী; বনের পাখি নয়। কোনো স্তরেই তাদের স্বভাবে বন্যতা নেই। এমনকী সমাজের বাইরে যাদের স্থিতি তারাও পুরুষের পণ্য হয়ে ধন্য; তাদের আর্থিক স্বাধীনতা ততদিন, পুরুষের নেকনজর যত দিন।

নারীর জন্যে সে যা চেয়েছিল তা বনের পাখির বন্যতা। নিজের জন্যেও তাই চেয়েছিল। মেয়েরা কলেজে পড়বে কি অফিস করবে, এটা অবশ্য নগণ্য দাবি নয়, কিন্তু এতে কি তাদের জীবন ভরবে! এতে কি আছে

পথে বেরিয়ে পড়ার সুখ! পথের ঝড়-বৃষ্টি ধুলো! বজ্রপাত বা সর্পাঘাত! এও তার সেই নিরাপদ প্রাণধারণ যার জন্যে নারী বিকিয়ে দিয়েছে তার বন্যতা। হতে পারে এর নাম নর-নারীর সমানাধিকার। যারা সাম্য চায় তাদের এই লক্ষ্য। কিন্তু সাম্য তো অনেক সময় জেল কয়েদির সাম্য। তেমন সাম্য কি কারও কাম্য!

বিনু যদিও ফেমিনিস্ট বলে নিজের পরিচয় দিল, এক প্রফেসারের ইংরেজি পদ্যের পালটা ইংরেজি পদ্য লিখে ছাপাল, তবু তার ফেমিনিজম নর-নারীর সমানাধিকারে আবদ্ধ ছিল না, সমান স্বাধীনতার আকাশে ডানা মেলত। একথা একবার একটি বাংলা প্রবন্ধে বোঝাতে গেল মাসিকপত্রে। সম্পাদক ছাপলেন। কিন্তু প্রতিবাদ এল মহিলাদেরই তরফ থেকে। তাঁরা যে মহিলা। এরপরে বিনু হৃদয়ঙ্গম করল যে মেয়েরা সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে প্রস্তুত নয়। পুরুষরাও নয়। সত্যিকার স্বাধীনতা আসবে সমাজের আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে। মানুষের কাছে যখন জীবন-যৌবনের অপচয় অসহনীয় হবে, যখন পোষমানা প্রাণ রাখা-না-রাখা এক হবে, তখন চোখের সুমুখে ঝিকিয়ে উঠবে পথ। পথেও নর-নারীর সমান অধিকার।

দোরোখা নীতি

সমাজের আমূল পরিবর্তন কবে হবে, তার জন্যে সংস্কারক অপেক্ষা করতে পারে না। বিনুর মধ্যে যে সংস্কারক ছিল সে সংস্কারমুক্তির জন্যে কলম ধরল। এত দিনে একটা ব্রত পাওয়া গেল যার জন্যে জীবনপাত করা চলে।

তার নিজের সংস্কারগুলো একে একে কাটল। বিধবাবিবাহকে সে ভয় করত। ভয় ভাঙল। বিবাহবিচ্ছেদকে ঘৃণা করত। ঘৃণা ঘুচল। বিবাহ প্রথাটাকে শাশ্বত ভাবত। কোনো প্রথাই শাশ্বত নয়। যার উদ্ভব হয়েছে তার বিলয়ও হবে, নিশ্চিত জানল। সতীত্বকে স্বর্গীয় মনে করত। দেখল ওর মধ্যে সাড়ে পনেরো আনা বাধ্যতা ও দাস্য। যেটুকু স্বেচ্ছা সেইটুকুই মূল্যবান। বিবাহপ্রথার বিলয় হলেও সেটুকু থাকবে। বরং তখনি মর্যাদা প্রতিপন্ন হবে।

তারপর হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল যে নারীর একবার পদস্খলন হলে সে যাবজ্জীবন পতিতা, অথচ পুরুষের পতন নেই এক দিনও। স্ত্রী থাকতে স্বামী অকারণে আবার বিয়ে করে, কিন্তু স্বামী থাকতে—এমনকী স্বামীর মৃত্যুর পরেও—স্ত্রী সকারণে আবার বিয়ে করতে পারে না। বিধবার তবু আইনের বাধা নেই, পতিপরিত্যক্তার সেদিকেও বাধা। নির্যাতিতার দৈব সখা, মানুষ তার শরীরের কষ্ট লাঘব করতে পারে, কিন্তু মনের ওষুধ জানে না, জানলেও কিছু করবে না। রবীন্দ্রনাথের নারীচরিত্রের দশা দেখে কবির প্রতি তার অভিযোগের ভাব এল, ঠিক একই কারণে শরৎচন্দ্রের প্রতি মাথার পাগড়ি খুলে পায়ে রাখার ভাব। ইবসেনের প্রতি। ইবসেনই তো নাটের গুরু।

এই দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ইবসেনকে মহিমান্বিত করেছিল, শরৎচন্দ্রকেও। বিনুরও মনে হল তার কাজ বিদ্রোহ করে যাওয়া, ফল কতটুকু হবে তা ভেবে দেখবার সময় নেই। এমনি করে সাহিত্যের দিকে তার লেখনীর গতি। নিছক সাংবাদিকতায় অতৃপ্তি। একটা ঠেলা, একটা গরজ তাকে চালিয়ে নিল কথকতার আসরে। তার অন্তিম লক্ষ্য স্বাধীন জীবন, স্বাধীন যৌবন। নর-নারী উভয়ের। আপাত লক্ষ্য সংস্কারমুক্তি। দোরোখা নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

কর্তব্য

বিনুর স্বভাবটা আয়াসী। সে আয়াস স্বীকার করতে চায় না। তার ভালো লাগে পায়চারি করতে, পায়চারি করতে করতে সেভাবে। ভালো লাগে শুয়ে থাকতে, শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে, কিংবা পড়ে। কিন্তু ভালো লাগে না বসতে। বসতে ভালো লাগে না বলে তার ভালো করে খাওয়া হয় না, গল্প করা হয় না, হয় না চিঠি লেখা। এমন যে বিনু সে কোন দুঃখে সাহিত্য লিখতে বসে! একটা গরজ, একটা ঠেলা না থাকলে সে লিখতে বসত না, বসলেও উঠে পালাত।

বিশ বছরের বিনুকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করত, কেন লিখবে, তবে উত্তর পেত, কর্তব্য। নামের নেশা আদৌ ছিল না বললে সত্যের অপলাপ হবে, কিন্তু নামের জন্যে আয়াস স্বীকার করা অন্য কথা। কর্তব্য

অবশ্য সামাজিক বা মানবিক। তেমন করে যে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না একথা বেশ বুঝলেও তার ঝোঁক ছিল সাহিত্যসৃষ্টির উপর নয়, সমাজসংস্কারের উপর, সংস্কারমুক্তির উপর। মানুষের কতকগুলো বদ্ধমূল সংস্কার সে ভেঙে চুরমার করবে, মানুষ যেসব প্রথাকে বিশ্বাসকে আচারকে এতকাল মূল্য দিয়ে এসেছে সেসব যে মূল্যহীন তা হাতে-কলমে প্রমাণ করবে। এর জন্যে যদি উপন্যাস লিখতে হয় তাও সই। কালাপাহাড়ির জন্যেই কলম ধরা, কষ্ট করে বসা। তবে বিনুর কালাপাহাড়ি বিশুদ্ধ ভাঙন নয়। সংস্কারকেরা ভাঙে বটে, কিন্তু নদীর মতো এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়তে। কী করে গড়তে হয় তাও জানে। কী গড়তে হয় তাও। নব-সমাজের স্বপ্ন দেখা বিনুর দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়েছিল। ওমর খৈয়ামের মতো সে তার কল্পসহচারীকে বলত—

> Ah, Love could thou and I with Fate conspire
> To grasp this sorry Scheme of Things entire,
> Would not we shatter it to bits—and then
> Re-mould it nearer to the Heart's Desire!

একটু একটু করে অলক্ষিতে বিনুর ঐতিহ্যপ্রীতি শিথিল হয়ে এল। নিজেকে সে হিন্দু বলতেও দ্বিধা বোধ করল এবং ভারতীয় বলতেও কুণ্ঠিত হল। কী তবে সে? যার কোনো লেবেল নেই। নিশ্চিহ্নিত মানুষ।

স্টাইল

কেন লিখবে, এ প্রশ্নের উত্তর—কর্তব্য। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন ছিল। কেমন করে লিখবে? এর উত্তর, যেমন-তেমন করে নয়। লেখার স্টাইল বা শৈলী সম্বন্ধে বিনু বরাবরই খুঁতখুঁতে। বিষয়ের উপর পরের ফরমাশ খাটে, পরীক্ষকদের মর্জি। কিন্তু বিন্যাসের উপর বিনুর নিজের রুচি। আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

আয়াসি বিনু একান্ত আয়াসে তার স্টাইলটি সেধেছিল, কখনো মনে মনে, কখনো মুখে মুখে, কখনো লিখে লিখে। চিঠি লেখাও লেখা। সেই যে একটা কথা আছে, ঈশ্বরকে ডাকতে হয় মনে বনে ও কোণে, এও অনেকটা তাই। এ সাধনায় বিনু এক দিনও ঢিলে দেয়নি, আপোশ করেনি। পরীক্ষার কাগজেও সে তার স্টাইল ফলিয়েছে, সাজা পেয়েছে। আবার পুরস্কারও পেয়েছে। খবরের কাগজের জন্যেও সে যেমন-তেমন করে লিখতে রাজি ছিল না, সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখলেও তার লেখার ধরন তার স্বকীয়। স্টাইল তার ভালো কি মন্দ সে ভাবনা তার নয়। স্টাইল তার নিজের হলেই সে খুশি।

এর জন্যে তাকে অনেকের কাছে শিক্ষানবিশি করতে হয়েছে। প্রথমত, বীরবলের কাছে; দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের; তৃতীয়ত, গান্ধীজির। ইংরেজিতে বলে স্টাইলের নাম মানুষ বা স্টাইলটাই মানুষ। মানুষটাকে বাদ দিয়ে তার স্টাইলটুকু শেখা যেন চাঁদটাকে বাদ দিয়ে তার আলোটুকু দেখা। সেটাও সম্ভব নয়, সংগতও নয়। বিনু যাঁদের শাগরেদ হয়েছে তাঁদের স্টাইলের রূপ নিরীক্ষণ করে নিরস্ত হয়নি, রূপের তলে যে সত্তা, তার অনুসন্ধান করছে। সত্তার প্রভাব সত্তার উপর পড়ে যত দিন না স্বভাব সুনির্দিষ্ট হয়। আত্মস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব কেটে যায়, তার আগে কাটিয়ে উঠতে চাওয়া যেন ঘাটে ভিড়বার আগে নৌকা থেকে লাফ দিতে যাওয়া।

শিক্ষানবিশির একমাত্র উদ্দেশ্য আপনাকে চেনা। একবার আপনাকে চিনলে তারপর আর অনুসরণ বা অনুকরণ নয়, আপনার পরিচয় দেওয়া, আত্মদান। তার আগে, অনুকরণ না হয় লজ্জাকর, অনুসরণেও যার শরম সে সাধক নয়।

কস্মৈ দেবায়

কেমন করে লিখবে, এর উত্তর—নিজের মতো করে। আরও একটি প্রশ্ন আছে, তখনও ছিল। কাদের জন্যে লিখবে? বীরবলের রচনা পড়লে মনে হয় তিনি রসিকদের জন্যে লেখেন, অরসিকের কাছে রসের নিবেদন করতে রাজি নন। সংসারে রসিকজন আর ক-জন! শিক্ষাবিস্তারের পরেও তাঁদের সংখ্যা ডজন ডজন

বাড়বে না। বীরবল সকলের জন্যে লেখেন না, এই সিদ্ধান্তই সার। রবীন্দ্রনাথ? রবীন্দ্রনাথের সব রচনা সকলের জন্যে নয়, কতক রসিকদের, কতক খেয়ালিদের, কতক সাধকদের। কিন্তু প্রচুর সর্বসাধারণের।

কলেজে ভরতি হবার আগে বিনু টলস্টয়কে আবিষ্কার করেছিল, সেই টলস্টয়কে যিনি দ্বিতীয় ধূম্রলোচনের মতো নিজের লেখার সমালোচনা করেছিলেন, *সমর ও শান্তি, আনা কারেনিনা* প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্যে অনুতপ্ত হয়ে কৃষকদের জন্যে উপকথা রচেছিলেন। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা নেই। সচরাচর আমরা আমাদের অপকীর্তিকেও মহাকীর্তি ভেবে আত্মহারা হই, অনুতাপ করা দূরে থাক, সন্তানস্নেহে অন্ধ হই। টলস্টয়ের বিন্দুমাত্র মমতা ছিল না সেরা লেখার উপরেও, যেহেতু সেগুলি চাষি ও মজুরদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। যেহেতু বারো বছরের ছেলেরা সেগুলি পড়ে বাহাত্তুরে বুড়োদের মতো ব্যথিত হবে না, মানুষকে ভাই বলে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করবে না। যেহেতু সেগুলি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত, সভ্য, বিত্তবান ও অবসরবিহারী পরগাছাদের জন্যে। এটা অবশ্য টলস্টয়ের বাড়াবাড়ি। তিনি যখন যা করতেন চরম করতেন। যৌবনকে ভোগ করেছিলেন ভর্তৃহরির মতো, তাই উত্তর বয়সে পাপবোধটা কিছু প্রখর হয়েছিল তাঁর। পাপাচারীদের জন্যে লিখেছেন একথা মনে হলেই তিনি শাপ দিতেন নিজের লেখনীকে, ছাপা বইয়ের মুখ দেখতে চাইতেন না।

সে যা-ই হোক, বিনুও ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে একমত হল যে সবচেয়ে সার্থক সৃষ্টির লক্ষ্য হবে জনসাধারণ বা পিপল। চাষি ও মজুর, মাঝি ও ছেলে। তারা যদি বিদ্বান ও বিদগ্ধ হয় তো ভালোই, না হলেও ক্ষতি নেই, কেননা চোখের জল ও বুকের রক্ত দিয়ে যে-কথা বলা হয় সেকথা সব মানুষের আঁতে ঘা দেয়, হোক-না কেন যতই নির্বোধ বা নিরক্ষর। তা বলে আর সব রচনা যে অসার্থক, তা নয়। আর্ট নয়, তা নয়।

টলস্টয়

টলস্টয়ের কাছে বিনুর শিক্ষানবিশি স্টাইলের জন্যে নয়, স্টাইলকে অতিক্রম করার জন্যে। শিক্ষানবিশির শুরু কবে তা মনে নেই, সারা এখনও হয়নি। লেখকের জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সে পাঠকের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়, মাঝখানে কোনো প্রাচীর রাখতে চায় না। অতি সূক্ষ্ম ব্যবধানও তাকে পীড়া দেয়। সাধকের মতো লেখকেরও শেষ কথা, শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। তন্ময় হওয়ার আগে স্টাইল একটা সহায়, কিন্তু তন্ময় হওয়ার ক্ষণে স্টাইল একটা বাধা। কুঞ্জের দ্বার অবধি গিয়ে সখী বিদায় নেয়, নতুবা সে সখী নয়, সতীন।

টলস্টয়ের কিছুই গোপন নেই, তিনি কিছুই হাতে রাখেননি, যখনকার যা তখনকার তা পাঠকের হাতে সঁপে দিয়েছেন, জীবন-যৌবন পাপ-পুণ্য জ্ঞান-অজ্ঞান। পাঠকের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন, বোধহয় পেরেছেনও। এর জন্যে তাঁকে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে। সাধকের মতো লেখকেরও শত্রু তার বিভূতি, তার অলংকারের ঝংকার, তার অহংকারের টংকার। ঈশ্বরের কাছে যে ঐশ্বর্য নিয়ে দাঁড়ায় সেকি তাঁর আলিঙ্গনের জন্যে জায়গা রেখেছে? সর্বাঙ্গে জড়োয়া ও কিংখাব। সেসব যে খুলে ফেলে দিয়েছে, তাদের আসক্তি কাটিয়েছে, সেই তো উত্তমা নায়িকা, উত্তম সাধক। তেমনি উত্তম লেখক। তার অন্তিম পাঠক সব মানুষের অন্তরাত্মা। 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ।' সেই মানুষের প্রেম পেতে হলে সব ছাড়তে হয়।

এ কেবল স্টাইলের বেলায় তা নয়। টলস্টয় তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে গৃহত্যাগ করেছিলেন। জীবনের কাছে সত্যরক্ষার জন্যে তেমন সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল। যার জীবন সত্য নয় তার লিখন সত্য হবে কোন জাদুবলে? সমাজের চিন্তা থেকে কোনো একসময় জীবনের চিন্তা বিনুকে পেয়ে বসল। সেখানেও টলস্টয় হলেন তার দৃষ্টান্ত। কী যে সার, কী যে অসার, এ সম্বন্ধে টলস্টয়ের সঙ্গে তার নির্ণয়ের সাদৃশ্য ছিল—কিন্তু যুবক টলস্টয়ের সঙ্গে। বর্ষীয়ানের সঙ্গে তার মতভেদই অধিক, কিন্তু সেও স্বীকার করে নিয়েছে সে সাযুজ্যেই মুক্তি। লেখকের মোক্ষ পাঠকের সঙ্গে সাযুজ্যে। পাঠক হচ্ছে দৃশ্যত 'পিপল' বা জনগণ। নেপথ্যে সব দেশের সব কালের পাঠকসত্তম। 'সেই মানুষ।'

জীবনযাপন

কাদের জন্য লিখবে, এই প্রশ্নের উত্তর একজন একভাবে দেয়, আর একজন আর একভাবে। যে যেভাবে দেয় সে সেইভাবে জীবনযাপন করতে প্রস্তুত হয়। কেউ যদি বলে চাষিদের জন্যে লিখব, তা হলে চাষিদের জীবনের সঙ্গে জীবন জড়ানোর আয়োজন করে। না করলে তার লেখায় চাষিদের জীবনের সুর বাজে না। তেমনি কেউ যদি বলে মজুরদের জন্যে লিখব, তা হলে তাকে মজুরদের জীবনের সঙ্গে জীবনের গাঁটছড়া বাঁধতে হয়। না বাঁধলে তার লেখায় মজুরদের জীবনের সুর বাজে না।

জীবনযাপন করার উপর নির্ভর করে শেষপর্যন্ত কার লেখা চাষিরা পড়বে কার লেখা মজুরেরা। অবশ্য এমন হতে পারে যে লেখাপড়া শিখে চাষিরা আর চাষাড়ে থাকবে না, মজুরেরা গোঁয়ার। রাজ্য তাদের হলে তাদের চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু যতদিন চাষিরা চাষ করবে, মজুরেরা গতর খাটাবে ততদিন তাদের জীবনের মূল সুর পালটানো শক্ত। সেইজন্যে তাদের জীবনের সুরের সঙ্গে সুর মেলানোর দরকার থেকে যাবে অনেক কাল। সমাজের সব স্তরের জীবন একাকার হতে ঢের দেরি, সোভিয়েট রাশিয়াতেও। সুতরাং লেখকদের জীবনযাপনের ধারা একরকম হলে চলবে না। যে যাদের জন্যে লিখবে সে সেই অনুসারে বাঁচবে।

বিনুর সাধ যেত পথে বেরিয়ে পড়তে, সকলের সঙ্গে সব কিছু হতে। চাষির সঙ্গে চাষি, মাঝির সঙ্গে মাঝি, কাঠুরের সঙ্গে কাঠুরে, বাউলের সঙ্গে বাউল। এদের মধ্যে চাষির উপরেই ছিল তার পক্ষপাত—টলস্টয়ের প্রভাবে। চাষি কিনা অক্ষয়বট, মাটিতে তার শিকড়। সকলের উচ্ছেদ হলেও চাষির হবে না। চাষির সঙ্গে চাষি হয়ে চাষানি বিয়ে করলে মাটির প্রাণরহস্য আয়ত্ত করতে পারবে বিনু। যেসব উপলব্ধি এলিমেন্টাল অর্থাৎ আদিতন, মৌল; সেসব যদি কোথাও সম্ভব তো কৃষকের জীবনে। বিশেষ করে চাষির কথা ভাবলেও সাধারণভাবে ‘পিপল’-এর কথা তাকে উন্মনা করত গান্ধী আন্দোলনের পর থেকে। তাজা ভাব ও তাজা ভাষা জনস্রোতে ভাসছে। ঝাঁপ না দিলে তাদের নাগাল পাওয়া যায় না। পুথির ভাষা ও পুথিগত ভাবের উপর তার অরুচি এসেছিল।

বাঁচোয়া

জীবনযাপনের ধারা বদলের জন্যে বিনু এক এক সময় অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু যতদিন একা ছিল ততদিন বরং সেটা সম্ভব ছিল, এখন তার জীবন তার একার নয়। এ বড়ো আশ্চর্য যে তার জীবনের জন্যে জবাবদিহি তার একার; ভাবী কাল তাকে একক বলে ধরে নিয়ে বিচার করবে অথচ সে তার একার অভিপ্রেত জীবনযাপন করতে গেলে একাধিকের অভিপ্রেত জীবন বিপর্যস্ত হবে। বিপর্যয় বলতে যে কতখানি বোঝায় ভাবী কাল তা ঠিক বুঝতে পারবে না। যতটুকু অনুমানে বোঝা যায় ততটুকু বুঝবে।

টলস্টয় তাঁর একার অভিপ্রায়ের সঙ্গে একাধিকের অভিপ্রায় মিলছে না দেখে অর্ধেক জীবন তুষের আগুনে দগ্ধেছেন, মৃত্যু আসন্ন আন্দাজ করে আর ইতস্তত করেননি, একার জীবনযাপনের ধারায় ঝাঁপ দিয়েছেন। তাই মরে যাবার আগে তরে গেছেন। ওটুকু যদি না করতেন তা হলে চিরকালের মতো হেরে যেতেন। গান্ধীজির মধ্যে ইতস্তত ভাব নেই, তিনি তাঁর অভীষ্টের জন্যে নিজে তো ভুগবেনই আরও পাঁচজনকেও ভোগাবেন। ক্রমে তাঁর পরিজন বাড়তে বাড়তে পাঁচজনের জায়গায় পাঁচ-দশ লাখ হয়েছে, একদিন হয়তো চল্লিশ কোটি হবে। তাদের সবাইকে টেনে নিয়ে যাবার মতো আত্মার জোর তাঁর আছে, কিন্তু বিনুর অত মনের জোর নেই যে আর পাঁচজনকে নিয়ে সত্যের পরীক্ষা করবে।

বাঁচোয়া এই যে কৃষক শুধু কৃষক নয়, মানুষও বটে। তাই *রামায়ণ মহাভারত* তাকে আনন্দ জোগায়, যদিও যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কৃষকের সঙ্গে কৃষক হননি, কৃষক-জীবনের সুর শোনেননি, বাজাননি। কয়লার মজুর গয়লা নয়, তবু রাধাকৃষ্ণের লীলা তাকে রসের রসায়নে বৃন্দাবনে গোপ-গোপীর একজন করে। পদকর্তারাও গয়লার সঙ্গে গয়লা বনেননি। রসের রসায়নে এক হয়েছে। এইরকমই চলে আসছে এত কাল। জীবনযাপনের ধারা বদলানো অসাধ্য না হলেও দুঃসাধ্য। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা নমস্য, যাঁরা পারেননি তাঁদের জীবন যে ব্যর্থ যায়নি তারও নজির আছে। বিনু যদি না পারে তা হলে যে তার রচনা বুর্জোয়াপাঠ্য হবে, প্রোলিটারিয়ানদের আনন্দ দেবে না, এমন নয়। বাঁচোয়া এই যে তারাও তারই মতো মানুষ।

শ্রেণিসাহিত্য

বিনু বার বার চেয়েছে সাহিত্যে মানবজীবনের সমগ্র রূপ দেখা দিক। সমগ্র সুর বেজে উঠুক। রাজারাজড়ার জীবন ঢের হয়েছে। অভিজাতদের জীবন যথেষ্ট হয়েছে। মধ্যবিত্তদের জীবন বলো, জীবনের দৈন্য বলো, তাও হয়েছে বিস্তর। আরও তো মানুষ আছে, তাদেরও তো রূপ আছে, সুর আছে, সুধা আছে। তাদের পরিচয় না নিলে, সাহিত্যে না দিলে, তারা হয়তো বঞ্চিত হবে না, কেননা পড়ার জন্যে তাদের তাড়া নেই। কিন্তু আমরা তো বঞ্চিত হব, আমরা যারা পড়তে শিখেছি, পড়ে শিখি। আমাদের লেখকরা কেন আমাদের বঞ্চিত করে রাখবেন? কেনই-বা সমগ্র জীবনের স্বাদ পাবেন না, পাওয়াবেন না? রামায়ণ মহাভারতের যুগে না হয় এর একটা কৈফিয়ত ছিল, তখন এত বড়ো পাঠক সম্প্রদায় ছিল না। এ যুগে তেমন কোনো কৈফিয়ত আছে কি?

নেই, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে লেখকদের জীবনযাপনের ধারা সংকীর্ণ ও শুষ্ক। বিনুরই মতো তাঁদের অনেকের সাধ আছে, সাধ্য নেই। টলস্টয় এ যুগের লেখকদের প্রতিভূ। তাঁর শক্তি ছিল বলে তিনি শেষপর্যন্ত ঝাঁপ দিতে পারলেন, সেটাও একটা প্রতীক।

তা হলে উপায় কী? উপায় হচ্ছে গোর্কির মতো শত শত লেখকের জন্ম। যতদিন তাঁরা জন্মাননি ততদিন কৃষক শ্রমিকের জীবন সাহিত্যের বাইরে থেকে যাবে, ভিতরে আসবে না। আসবে কেবল একটা মেঠো সুর হাওয়ার সঙ্গে ভেসে, মিঠে সুর লোকসাহিত্যের জানালা দিয়ে। খিড়কি দিয়ে ঢুকবে একটা বিদ্রোহের সুর, ভাঙনের সুর। এটা সংবাদ-সাহিত্যের শামিল, কারণ এর মধ্যে আছে প্রচারের ভাব। লোকসাহিত্যের জানালা, সংবাদ-সাহিত্যের খিড়কি, আসল সাহিত্যের সদর দরজা নয়। সে দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছেন খ্যাতনামাদের মধ্যে গোর্কি। অখ্যাতনামাদের মধ্যে আরও কয়েক জন।

গোর্কির সৃষ্টি কি শ্রেণিসাহিত্য? পরে যাঁরা আসবেন তাঁদের সৃষ্টি কি শ্রেণিসাহিত্য হবে? না, সাহিত্য চিরদিন সাহিত্য, চিত্র চিরদিন চিত্র, সংগীত চিরদিন সংগীত, আর্ট চিরদিন আর্ট। আর্টের জহুরিরা যেখানে সোনার দাগ দেখবেন সেখানে বলবেন খাঁটি সোনা। অন্যত্র মেকি সোনা। সোনার আর কোনো শ্রেণি নেই।

উপায়ান্তর

গোর্কির মতো শত শত সাহিত্যিকের জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করতে রাজি নন তাঁদের একজনের নাম বিনু। বিনু বরাবর ভেবে এসেছে অপর কোনো উপায় আছে কি না। তার মনে হয়েছে আছে। লোকসাহিত্যের জানালাগুলো কেটে দরজা বসালে সাহিত্যের ঘর আলো-বাতাসে ভরে যায়, লোকসাহিত্যের একটু-আধটু পরিবর্তন করলে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্য। সাহিত্যের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজির। ফাউস্ট ছিল লোকসাহিত্য। গ্যেটে তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করলেন। গ্যেটের আগে মার্লো। বাউলদের গান ঠিক লোকসাহিত্য না হলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন; ওরা নিজেরা পারেনি। বৈষ্ণব কবিতার কুলজি ঘাঁটলে রাখাল-রাখালিদের পূর্বপ্রচলিত গীতি উদ্ধার হবে। সেসব হারামণি হারিয়েই যেত, যদি-না বৈষ্ণবসাধনার অঙ্গ হয়ে পদকর্তাদের জপমালায় যোজিত হত। মাঝিমাল্লাদের ভাটিয়ালি যদি শক্তিসাধনার অঙ্গ হয়ে থাকত তাহলে আমরা পেয়ে থাকতুম আরও এক সার রত্ন। লোকসাহিত্য হিসাবে নয়, আসল সাহিত্য হিসাবে।

পরবর্তী বয়সে বিনু নিজে যত্নবান হয়েছে। সময় পায়নি, যদি কোনোদিন পায় তো দৃষ্টান্ত দেখাবে। কেন যে একালের কবিদের দৃষ্টি এদিকে পড়ে না বিনু ভেবে পায় না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের ভিত ব্যক্তি-বিশেষের মানসে নয়, গোষ্ঠী বা জাতি-বিশেষের চেতনায়। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৃষ্টি করবার, কিন্তু ভিত যার মৃত্তিকাভেদী নয়, চূড়া তার অভ্রভেদী হলেও পতন তার অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব কবিতা এত দিন মাথা তুলে খাড়া আছে কেন? সেই বৈষ্ণবদেরই আরও অনেক কাব্য কেন চিৎপাত হয়েছে? এর উত্তর—পদাবলি সারা দেশের সমসাময়িক চেতনার ভিত্তি স্বীকার করে নিয়ে তার উপর নির্মিত হয়েছে। কাব্যগুলি তেমন নয়। আমাদের আধুনিক কবিতার সঙ্গে যদি আধুনিক লোকগাথার সম্পর্ক থাকত তা হলে আধুনিক কবিতার

ভবিষ্যৎ থাকত। আর লোকগাথাও সেই সূত্রে অমর হত। সাহিত্যেও আমরা পেতুম লোকসাহিত্যের প্রাণরহস্য।

জীবনবেদ

রামায়ণ মহাভারত শিশুবয়স থেকে বিনুর প্রিয়। একালে কেন কেউ এপিক লেখে না, এ প্রশ্ন মাঝে মাঝে তার মনে উদয় হত। একালে ব্যাস নেই, বাল্মীকি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো রয়েছেন, রয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ। ভারতবর্ষের ঋষির অভাব কবে ঘটল? এই এক শতাব্দীর মধ্যে রাজর্ষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহাযোগী, পরমহংস, অংশাবতার, পূর্ণাবতার, মহাত্মা জন্মগ্রহণ করলেন কত! এক দেবর্ষি ব্যতীত আর সকলেই সমুপস্থিত। দেবর্ষিও আছেন অন্য নামে। নইলে কথায় কথায় দাঙ্গা বাঁধে কেন? বাঁধায় কে?

প্রশ্নের উত্তর, এপিক কোনো একজন ব্যক্তির সৃষ্টি নয়। রামায়ণকে বাল্মীকি একটা স্থায়ী রূপ দেবার আগে অস্থায়ী রূপ দিয়েছিলেন আরও অনেকে। তাঁদের কেউ চারণ, কেউ ভাট, কেউ কথক, কেউ ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি বা ঠাকুমা-দিদিমা। বলতে গেলে রামায়ণ একটা জাতির সৃষ্টি। মহাভারতও তাই। একথা বললে বাল্মীকির কি ব্যাসদেবের গৌরবহানি হয় না। না বললে এপিক সৃষ্টির রহস্য অনধিগম্য থাকে। এ কালে এপিক হয় না, তার কারণ জাতির সৃষ্টি এপিক আকার নিতে অক্ষম। রামায়ণ মহাভারতের মতো তেমন কোনো কাহিনি বা কিংবদন্তি প্রচলিত নেই। আছে এক *কৃষ্ণলীলা*। তা এপিকের নয়, লিরিকের বিষয়। তা নিয়ে হাজার হাজার লিরিক রচনা হয়েছে।

তাহলে কি এপিকের আশা ছাড়তেই হবে? না, ব্যক্তির পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা করতে হবে। টলস্টয় রাশিয়াকে তাঁর এপিক উপন্যাস *সমর ও শান্তি* দান করেছেন। রম্যাঁ রল্যাঁ পশ্চিম ইউরোপকে দিয়েছেন *জন ক্রিস্টোফার*। এখানিও এপিক উপন্যাস, সংগীতকার বেঠোফেন এর নায়কের মডেল। বিনুর জীবনে 'জন ক্রিস্টোফার' পড়া এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। এপিকের লক্ষণ ওতে আছে কি নেই অত তর্কে কাজ কী? ও যে আধুনিক ইউরোপের, পশ্চিম ইউরোপের জীবনবেদ। ওর নায়ক যুদ্ধবিগ্রহের বীর নন, জীবনযাপনের বীর। কেমন করে বাঁচতে হয়, বাঁচা উচিত, বেঠোফেনের জীবন তার নিঃশব্দ জবাব। বিনু খুঁজছিল জীবনযাপনের বিভিন্ন ধারা। এ ধারা তাকে অনুপ্রাণিত করল। কিছুকালের জন্যে এ বই হল তার জীবনবেদ। সেও যদি এমন একখানি বই লিখে যেতে পারত!

দুই বিনু

যারা সংগ্রামবিমুখ, যারা অন্যায়ের সঙ্গে আপোশ করে, যারা প্রাণকে মূল্য দেয় সত্যের চেয়ে বেশি, তাদের ক্ষমা করা বিনুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল *জন ক্রিস্টোফার* পড়ার পর থেকে। মানুষ মাত্রেই হবে বীর, হলই-বা দীনদরিদ্র, হলই বা শিক্ষাদীক্ষায় বঞ্চিত। দৈহিক দুর্বলতা কাপুরুষতার অজুহাত হতে পারে না। যে যতরকম অজুহাত দেখায় সে তত বড়ো কাপুরুষ। সাফল্যের জন্যে ব্যস্ত না হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে সংঘাত বাঁধানোই পৌরুষ।

অথচ তার মধ্যে আর এক বিনু ছিল যে রণছোড়। যে খেলা করতে ভালোবাসে, হাসতে ভোলে না। জীবনটা তার চোখে দ্বন্দ্ব নয়, লীলা। বাল্যকালের বৈষ্ণব প্রভাব এর জন্যে দায়ী। দায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। এক কথায় ভারতবর্ষের স্বভাব।

দুই বিনুর দোটানা একদিনও বিরতি পায়নি, একই মানুষের একই লেখনীমুখে ব্যক্ত হয়েছে। কখনো বীরভাব প্রবল, কখনো সলীলভাব। কখনো হাসি, কখনো ট্র্যাজেডি, কখনো কমেডি। দুই বিনুর রচনা এক নামেই চলে।

এই দোটানা হয়তো থাকত না ইউরোপের সঙ্গে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ না পাতালে। দেশ দেখার শখ চিরকাল ছিল, কত লোক দেশ দেখতে যায়, বিনুও যেত। কিন্তু ইউরোপের জীবনকে নিজের জীবনের অঙ্গ করা তো শখ নয়, ওতে বিপদ আছে। ভারতবাসীর ব্যক্তিগত বা ঘরোয়া জীবনে সংঘাত কোথায়? যা আছে তা বাদবিসংবাদ, তা সংঘাত নামের অযোগ্য। আমরা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া

শিখে চাকরি বা ওকালতি করি। তারপরে করি বাপ-মায়ের ইচ্ছায় বিয়ে। তারপরে ছেলেকে পড়াই, চাকরি জুটিয়ে দিই, বিয়ে দিই। আর মেয়েকে দু-পাতা পড়িয়ে বা না-পড়িয়ে পাত্রস্থ করি। এর মধ্যে ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার ঘাতপ্রতিঘাত কোথায়? ট্র্যাজেডির বস্তু কই? আধিব্যাধি আপদবিপদ প্রাণহানি বা ধনহানির নাম ট্র্যাজেডি নয়, দুর্ভাগ্য।

বিনু ক্রমে ক্রমে দেশটার উপর চটে গেল। দেশের জীবনযাপনের ধরনধারণের উপর। এদেশের জীবন যদি এইরকম থাকে তবে এদেশে না হবে এপিক, না ট্র্যাজেডি। অথচ তার ভিতরে আর একটি বিনু ছিল, সে সুরসিক। সে রাগতে জানে না। জানে অনুরাগ ও কেলি।

দায়

বৈষ্ণবদের একটি কবিতা আছে, আমি ঠেকেছি পিরিতের দায়ে, আমায় যেতেই যে হবে গো। বিনুর জীবনেও এমন একটি দিন এল যেদিন তাকেও মানতে হল, আমি ঠেকেছি প্রণয়ের দায়ে, আমায় লিখতেই হবে গো। কেন লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে, কার জন্যে লিখতে হবে, কী লিখতে হবে, এসব পুথিপড়া মনগড়া প্রশ্ন এতদিন আসর জুড়ে বসেছিল, দায় যেদিন এল সেদিন বিদায় নিল অলক্ষে। তাদের জায়গায় বসল লিখতেই হবে—শুধু এই একটি অনুজ্ঞা।

বিনু চেয়ে দেখল তার সামনে অকূলপাথার। পাথার পার হতে হবে, কিন্তু না আছে তরি, না আছে কান্ডারি। কেউ তাকে পার করে দেবেন না, দিতে চাইলেও পারবেন না। না রবীন্দ্রনাথ, না টলস্টয়, না রল্যাঁ। তার একমাত্র ভরসা সে নিজে আর তার লেখনী।

দূরের মানুষ তাকে চিঠি লিখেছে। দূরত্বের পারাবার পার হয়ে তাকে কাছের হতে হবে। কাছের মানুষ হয়ে শান্তি নেই, এক মানুষ হতে হবে। এই তার দায়। দায়ে পড়ে লিখতেই হবে।

বিনু তার হৃদয়গ্রন্থি একে একে খুলল। এক দিনে নয়, একাধিক সহস্র দিবসে। তার অজ্ঞাতসারে একখানি গ্রন্থ রচিত হল, সে গ্রন্থের পাঠিকা মাত্র একজন। অথচ সেই একটি মাত্র পাঠিকার জন্যে লেখকের কী নিদারুণ অধ্যবসায়! নিজের লেখা তার না-পছন্দ হয়। ছিঁড়ে কুটি কুটি করে। আবার লেখে। নিজের বিচারে যদি চলনসই হল পাঠিকা হয়তো ভুল বুঝলেন, অভিমান করলেন। তখন তাঁকে ঠিক বোঝানোর জন্যে, মন পাবার জন্যে, আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসতে হয়, ভাবতে ভাবতে রাত ভোর। লেখা যতক্ষণ-না নিখুঁত হয়েছে, হৃদয় যতক্ষণ-না স্বচ্ছ হয়েছে, রস যতক্ষণ-না মুক্ত হয়েছে, ততক্ষণ তার ছুটি নেই। বুকের রক্ত জল হয়ে চোখের দু-কূল ভাসায়। শ্রান্ত ক্লান্ত ব্যথার্ত দেহমন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। এক-আধ দিন নয়, দিনের পর দিন—একটানা তিন বছর। তখন তো সে জানত না যে শুঁয়োপোকা মরে প্রজাপতি জন্মায় কত দুঃখে! ওই তিনটি বছর যেন মৃত্যু ও জন্মান্তর। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় মেটামরফোসিস (metamorphosis)।

বাঁশি

যে মরল সে সাংবাদিক, যে জন্মাল সে সাহিত্যিক। এ যেমন মানুষের বেলা তেমনি লেখনীর বেলা। যেটা গেল সেটা কাঁসি, যেটি এল সেটি বাঁশি। কখন যে গেল, কখন যে এল তা ঘড়ি ধরে বলা যায় না। কেউ লক্ষ করেনি।

বাঁশির উদ্দেশ্য সংগীতসৃষ্টি নয়, অন্তরের পরিচয় দান। কিন্তু পরিচয় দিতে দিতে সংগীতসৃষ্টিও হয়ে যায়। যার অন্তরে রস জমেছে তার বাঁশিতে রসের মুক্তি ঘটলেও সংগীত সৃষ্ট হয়। বিনুর লেখনী তার বাঁশি। তাই দিয়ে সে অন্তরাত্মার পরিচয় দান করত, পরিচয় দিতে দিতে সাহিত্য সৃষ্টি করত। কখনো অজ্ঞাতে, কখনো সজ্ঞানে।

তখনও তার ভবিষ্যৎ তার কাছে পরিস্ফুট হয়নি। তখনও সে সাংবাদিকবৃত্তির স্বপ্ন দেখছে, যদিও তাতে আর সুখ পাচ্ছে না। সাহিত্যিকবৃত্তি সম্বন্ধে তার পরিষ্কার ধারণা নেই। শুনেছে মাসিকপত্রে লেখা পাঠিয়ে ও মাঝে মাঝে বই ছাপিয়ে কোনো কোনো সাহিত্যিক সংসার চালান। কিন্তু নিজের উপর তার এতটা বিশ্বাস

ছিল না যে সেও ঘরে বসে লেখার উপস্বত্বে জীবিকানির্বাহ করতে পারবে। মূলধন থাকলে সে তার নিজের সাপ্তাহিক বা মাসিক বার করত। পরের চাকরি করত না। কিন্তু তা যখন নেই তখন যত দিন তার পুঁজি জুটছে তত দিন কোনো সংবাদপত্রের বা সাহিত্যপত্রের অফিসে চাকরি করতে বাধ্য। এটার নাম সাংবাদিকবৃত্তি। সাহিত্যিকবৃত্তি কি এর সঙ্গে বেখাপ? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় কি সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক নন? রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কি সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক নন? বিনুও প্রথমে চারুবাবুর মতো চাকুরে ও পরে রামানন্দবাবুর মতো স্বাধীন হবে।

লেখনীকে জীবিকার উপায় করতে তার অন্তরের বাধা ছিল। তার মধ্যে যে বীর জেগেছিল সে তো প্রস্তাব শুনে আগুন। জীবিকার জন্যে আর যা-ই করো, মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ। তার পাঠিকাও বলতেন সেই কথা। যাও, সৈনিক হও, ডাক্তার হও, কর্মী হও। কিন্তু পেটের দায়ে লেখক! ছি! লেখনী যে বাঁশি। বাঁশি বাজিয়ে প্রেম করা যায়। পয়সা? ছিঃ! বিনুর ভিতরে যে রসিক জাগছিল সে বিকারবোধ করল ও প্রস্তাবে। প্রস্তাবটা তা হলে কার? শুঁয়োপোকার। তাতে আপত্তি কার? প্রজাপতির!

নীতিবিচার

লিখে দু-পয়সা রোজগার করা কি অন্যায়? কই, কেউ তো ওকথা বলে না আজকাল। তখনকার দিনে কিন্তু অনেকে বলত। বিনু যে-বংশের ছেলে সে-বংশে কেউ কোনোদিন বীর্য বিক্রয় করেননি, অর্থাৎ বরপণ নেননি। চাকরি করাকে তাঁরা আত্মবিক্রয় মনে করতেন। চাকরি করার রেওয়াজ শুরু করলেন বিনুর বাবা, এর জন্যে তাঁর গ্লানির অবধি ছিল না। বিদ্যা বিক্রয়ের উপরে তখনও দেশের লোকের ধিক্কার ছিল। সুতরাং রচনা বিক্রয় যে নিন্দনীয় হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? লেখনী যে বাঁশি এ বোধ যত দিন ছিল না তত দিন বিনুর জীবিকা সম্বন্ধে দ্বিধাবোধ ছিল না। কিন্তু সাংবাদিক থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসার ঢেউ উঠতে থাকল।

বিনুর সে সব চিঠি যদি কোনোদিন ছাপা হয় তবে হয়তো সাহিত্য বলে গণ্য হবে, হয়তো সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকা দাম দিয়ে সেই বই কিনবেন, হয়তো সেই বই হবে তার মায়ের আকর। কিন্তু লজ্জা করবে না সে আয় স্পর্শ করতে? বিনু কি কখনো সেসব লিখত যদি জানত যে টাকার জন্যে লিখছে, লিখলে একদিন-না-একদিন টাকা হবে? ছি ছি ছি! একজন পাঠিকার জন্যে প্রেমের দায়ে যা লিখেছে তাতে যদি কেউ কোনোদিন পেটের দায় আরোপ করে তবে বিনু বরং মরবে, তবু প্রকাশ করবে না। করতে দেবে না।

একজন পাঠিকার সঙ্গে এক লাখ পাঠক-পাঠিকার তফাতটা কী? কবি যা লেখে তা আপাতত একজনের জন্যে লিখলেও আখেরে সকলের জন্যে লেখে। আপাতত এক দেশের জন্যে লিখলেও আখেরে সব দেশের জন্যে। আপাতত স্বকালের জন্যে লিখলেও আখেরে সব কালের জন্যে। লেখা হচ্ছে ভালোবাসার ধন, প্রাণের জিনিস। যে লেখে সে জানে যে প্রেমের দায় না থাকলে লিখে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই। প্রেমের দায় ব্যতীত অন্য কোনো দায় থাকলে লেখার মর্যাদা নেই। সেইজন্যে লিখে দু-পয়সা উপার্জন করাটা একটা গৌরবের কথা নয়। বিনা মূল্যে দিতে পারছিনে বলে মাথা তুলতে পারছিনে। কী করি, আমারও তো অন্নচিন্তা আছে। সমাজ যদি সে ভার নিত আমি কেন আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে লেখার দাম নিতুম? আমার প্রিয়জন আমার সব পাঠক-পাঠিকা। বিনু ভাবে।

নেশা ও পেশা

শুঁয়োপোকার নীতি ও প্রজাপতির নীতি এক নয়। প্রজাপতির নীতি উচ্চস্তরের। সাংবাদিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে পারেন অকুতোভয়ে, কিন্তু সাহিত্যিক তাঁর নেশাকে পেশা করতে গেলে পদে পদে ভয় পান। যেকোনো দিন যেকোনো দুর্মুখ তাঁর নামে রটাতে পারে, সীতার সতীত্ব যেমন সোনার হরিণকে লক্ষ্য করে সোনার লঙ্কায় হারাল এঁর কবিত্বও তেমনি সোনার মোহরকে মোক্ষ করে সোনার বাংলায় হারাবে।

কারো কারো জীবনে তাই ঘটেছে। বিয়ের বাজারের মতো লেখার বাজার বলে একটা বেচাকেনার হাট বসেছে। সেখানে লেখকের ও পাঠকের ভিড়। ভাগ্যপরীক্ষার জন্যে সেখানে যদি কোনো প্রতিভাবান আসেন

তবে তিনি লাভবান হতে ইচ্ছা করেন। তখন তিনি যা লেখেন তা দাম নয়, ইনভেস্টমেন্ট। একজন ভাগ্যবান পুরুষকে মন্তব্য করতে শোনা গেছে, আমার এক একখানা বই হচ্ছে এক একখানা জমিদারি। আমার জমিদারি মারে কে!

বিনুর বরাত ভালো তখনকার দিনে এই ব্যাবসাদারি বা সওদাগরি ছিল না। থাকলে কী ভয়ংকর বিপদের মাঝখানে গিয়ে পড়ত সে! দুর্মুখের কথাই ফলত। না, তার এক একখানা বই এক একখানা জমিদারি নয়। এক-একটি মালা। প্রিয়জনের পরশ পেলে ধন্য হবে, তারপর ধুলোয় লুটোবে। মাড়িয়ে যাবে যার খুশি সে। মারবে মহাকাল। এর জন্য তার পাওনা যদি থাকে তো প্রীতির বিনিময়ে প্রীতি, মালার বদলে মালা। তার বেশি যদি পায় তবে মাথায় করে নেয়, প্রয়োজন আছে। সে তো পার্থিব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু সেটা মোক্ষ নয়।

লেখনী যে বাঁশি, বাঁশি যে প্রেমের খেয়াতরি, একজনকে আর একজনের কাছে পৌঁছে দেয়, এক হৃদয়কে আর এক হৃদয়ের কাছে, লেখনীর এ মর্যাদা অকলঙ্ক থাকলে লেখকেরও মর্যাদা অকলঙ্ক থাকে। সীতার সতীত্বের মতো সাহিত্যের সম্মান স্বর্ণলঙ্কা থেকে ফিরলেও কালের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

বিভ্রাট

বিনু একরকম ঠিক করে রেখেছিল, কলেজ থেকে বেরিয়েই কোনো একটা পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হবে; ক্রমে সম্পাদক, পরে পরিচালক, শেষে মালিক। কিন্তু এতদিন যার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছে সেই সাংবাদিকতা যে নেশা নয়, পেশামাত্র, এটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। আর সাহিত্যিকতা যে পেশা নয়, নেশামাত্র, এটাও দিন দিন প্রতীয়মান হল। সাহিত্যিকতা ভিন্ন অপর কোনো পেশা যদি স্বীকার করতেই হয় তবে সাংবাদিকতা কেন? কোনখানে তার জাদু? দুনিয়ায় আর কি কোনো পেশা নেই? স্কুলমাস্টারি, প্রফেসারি, ওকালতি, কপালে থাকলে ওকালতি থেকে ব্যারিস্টারি?

না, স্কুলমাস্টারি নয়। প্রফেসারি নয়। পরের ছেলেদের খাঁচায় পুরলে তারাও তো অসুখী হয়। কী করে সে বনের পাখি হয়ে খাঁচার পাখিদের আগলাবে? যদি খাঁচার দ্বার খুলে দিয়ে উড়তে শেখায় তা হলে কি তাদের অভিভাবকেরা তাকে আস্ত রাখবেন? অগত্যা সে নিজেই হয়ে উঠবে চিরকেলে খাঁচার পাখি। তার মুখে বনের বাণী মানাবে না, তার লেখনীর মুখে যৌবনের বাণী, তার বাঁশির মুখে প্রণয়বাণী। কেন সে মস্ত মস্ত থিসিস ফাঁদবে, ডক্টরেট পাবে, স্থবির হবে, কিন্তু চিরতরুণ হবে না, কেলিকুশল হবে না।

না, ওকালতি নয়। ব্যারিস্টারি নয়। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলতে বলতে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য ভুলে যাবে, সত্য বললেও অসত্যের মতো শোনাবে না। রিয়্যালিটির সহজজ্ঞান হারিয়ে রিয়ালিস্ট হবে, সত্যাসত্যবোধ হারিয়ে বাস্তববাদী। বস্তুতান্ত্রিকদের সে ভয় করত।

একজনের ইচ্ছা সে সৈনিক হয়। তার মানে তখনকার দিনে স্যাণ্ডহার্স্টে যাওয়া। খরচ জোগাবে কে? আর ডাক্তার যদিও আধুনিকাদের চোখে প্রায় সৈনিকের মতনই রোমান্টিক তবু বিনুর রোমান্সের ধারণা অমন মেয়েলি ছিল না। বাকি থাকে কর্মী। হ্যাঁ, কর্মী হতে সে রাজি ছিল। কিন্তু কর্মটা কি জুতো সেলাই না চণ্ডীপাঠ, না মাঝামাঝি একটা-কিছু? এর উত্তরে জানতে পেরেছিল, রাজনৈতিক কর্মী। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী হলে তো আর একজনের ভার বইতে পারবে না। ভারবাহীদের জন্যে তেমন কর্ম নয়। চাষের আইডিয়া সে টলস্টয়ের কাছে শিখেছিল। চাষ করতে বেরিয়েছিলেন তার বন্ধুশ্রেষ্ঠ। চাষই হয়তো সে করত। তার ফলে তার সাহিত্য প্রাণপূর্ণ ও মহান হত। কিন্তু—

অন্তঃস্রোত

বিনুর অন্তরে আর একটা স্রোত ছিল, সেটা তাকে অনবরত ইউরোপের দিকে টানছিল, যেমন করে টানে সমুদ্রের অন্তঃস্রোত। আমেরিকা যাওয়া ঘটল না, আমেরিকার স্থান নিয়েছিল ইউরোপ। ইউরোপে যাবার দ্বিতীয় কোনো উপায় না দেখে সে এক এক বার ভাবত সিভিল সার্ভিসের প্রতিযোগিতায় নামলে কেমন হয়।

কিন্তু ভাবনা বাধা পেত দুটি বদ্ধমূল সংস্কারে। একটি, চাকরির প্রতি বিরাগ। আর একটি, সরকারি চাকরির প্রতি। একে চাকরি, তায় সরকারি চাকরি। গ্লানির উপর গ্লানি।

বিনুর তো প্রবৃত্তি ছিল না গ্লানির ঘড়া পূর্ণ করতে। ছিল না আর একজনেরও। কিন্তু দয়িতার দায়িত্ব যার, দায়িত্ব পালনের দুর্ভাবনা তো তারই। রত্নাকরকে দস্যুতা করতে হয়েছিল পারিবারিক দুর্ভাবনায়। পরে আবার তিনিই বাল্মীকি মুনি হলেন। তাঁর পূর্ব পরিচয় পুড়ে ছাই হয়ে গেল তপস্যার তুষানলে। বিনুরও তাই হতে পারে। তবে দ্বিধা কীসের?

দুর্ভাবনার তাপে প্রথমে গলল প্রথমোক্ত সংস্কার। এটা আগে থাকতে অনেকটাই গলেছিল। বাকিটুকু গলতে সময় নিল না। তারপরে গলল দ্বিতীয়োক্ত সংস্কার। চাকরিই করতে হল যদি, তবে সরকারি চাকরি কেন নয়? উট গিলবে, মশা গিলবে না কেন? কিন্তু যুগটা অসহযোগের। বিনুর উপর তার প্রভাব পড়েছিল। তার মনে হত সরকারি চাকরি একপ্রকার দেশদ্রোহিতা। এমনকী, কলেজে পড়া সম্বন্ধেও তার সেইরকম একটা অপরাধবোধ ছিল।

সেইজন্যে বিনুর পক্ষে মনস্থির করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হত, যদি-না তাকে তলে তলে আকর্ষণ করত ইউরোপ। কলেজের গ্লানি ধৌত করেছিল যে অন্তঃস্রোত, সরকারি চাকরির গ্লানিও ধৌত করবার প্রতিশ্রুতি দিল সেই স্রোতই। ইউরোপের আহ্বান তার চরণে টান দিল। কানে কানে বলল, বেশিদিনের জন্যে নয়। *বাল্মীকি*র জীবন মনে থাকে যেন। রত্নাকরের ওপার থেকে ফিরে তুমিও তোমার রত্নাকরত্ব বিসর্জন দিতে পারো।

বিনু বিশ্বাস করল। তখন ছিল বিশ্বাস করবার বয়স। সংসারের কতটুকুই-বা জানত! যারা জানত তারা বলত, অভিমন্যুর মতো যারা ঢোকে তারা বেরোয় না, এমনি সুরক্ষিত ব্যূহ। বিনু রাগ করত। সে যে বিনু, সে যে বিষয়বিমুখ। তাকে ধরে রাখবে কোন ব্যূহ! তার প্রয়োজনই-বা কতটুকু! আর একজন তো এক দিন স্বাবলম্বী হবে। নিজের ভার নিজে বইবে। তারপর?

জীবিকা

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে জীবিকার চেষ্টা করতে হয়, একথা যেমন কীটপতঙ্গের বেলায় তেমনি পশুপাখির বেলায়, তেমনি অধিকাংশ মানুষের বেলায় সত্য। অধিকাংশ মানুষ বলছি এই জন্যে যে, এক শ্রেণির মানুষ পরের পরিশ্রমের উপস্বত্বভোগী। জীবিকার জন্যে তাদের ভাবতে হয় না, যা ভাবার তা পিতামহেরা ভেবে রেখেছেন। তাঁদের কেউ ডাকাতি করে জমিদারি ফেঁদেছেন, কেউ ডাকু-জমিদারকে পরকালের পাথেয় দিয়ে নিষ্কর জমি পেয়েছেন, কেউ দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে ও দুর্ভিক্ষের সময় সাতগুণ দামে ধানচাল বেচে লক্ষ টাকার যক্ষ হয়েছেন, কেউ দু-হাতে ঘুস লুটে সাতপুরুষের সেবাপূজার জন্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ করেছেন। বংশধরেরা জীবিকার জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে না, তবে পরের ঘাড়ভাঙা খাটুনি খাটে বই কী। মামলা-মোকদ্দমা, আদায়-উশুল, হিসাবকিতাব নিয়ে এত ব্যস্ত থাকে যে দেখলে মনে হয় এরাও জীবিকার জন্যে আজীবন পরিশ্রম করছে।

জীবিকার বাইরে বা জীবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবনের কতটুকু বাকি থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু অবশ্য অকিঞ্চিৎকর নয়, অমূল্য। কিন্তু বিনুর তাতে সন্তোষ নেই। সে চায় আরও, আরও, আরও জীবন। আরও যৌবন। আরও অবসর। আরও খেলা। আরও সাধনা। আরও বেদনা। আরও সৃষ্টি। আরও অমৃত। এক কথায় জীবিকার ভাগ পনেরো আনা নয়, চার আনা। জীবনের ভাগ এক আনা নয়, বারো আনা। জীবিকাকে একবারে বাদ দিতে চায় না, বাদ দেবার উপায় নেই যে। কীটপতঙ্গ পশুপাখি সবাই যে নিয়মে বাঁধা তার নাম মর্তের শর্ত। সমাজের ব্যবস্থা যেরকমই হোক-না কেন, মানুষকে তার অন্ন বস্ত্র ও বাসগৃহের জন্যে জীবনের খানিকটা ত্যাগ করতে হবে।

বিনু এ নিয়ম স্বীকার না করে পারে না। কিন্তু এর জন্যে সে লজ্জিত। মানুষ মাত্রেই লজ্জিত। বোধহয় প্রাণী মাত্রেই। সান্ত্বনা এই যে, প্রকৃতি আমাদের জন্য প্রচুর আয়োজন করেছেন, আমরা জানিনে বলেই এত

কষ্ট পাই ও দিই। ভবিষ্যতে জানব। তখন জীবিকার ভাগ কমবে, জীবনের ভাগ বাড়বে। তখন মর্তের শর্ত এত কঠোর মালুম হবে না।

ব্যবস্থা

সমাজের ব্যবস্থা যুগে যুগে বদলেছে, ভবিষ্যতেও বদলাবে। বদলানো উচিত। নইলে মর্তের শর্ত অধিকাংশের অসহ্য হবে। বিনু বরাবর পরিবর্তনের পক্ষে। যারা পরিবর্তনের বিপক্ষে বিনু তাদের বিপক্ষে।

কিন্তু বিনুর দৃষ্টি রাহুর উপরে নয়, চাঁদের উপরে। জীবিকার উপরে নয়, জীবনের উপরে। সমাজের নতুন ব্যবস্থা যদি শুধুমাত্র নতুন হয় তবে তার নূতনত্ব অচিরেই পুরাতন হবে। নতুন ব্যবস্থা চাই, সেইসঙ্গে এও চাই যে, সে-ব্যবস্থা সত্যিকারের ভালো ব্যবস্থা হবে। ভালো ব্যবস্থার কথা বিনু তখন থেকে ভাবছে। বলা বাহুল্য ভালো ব্যবস্থা বলতে নতুন ব্যবস্থাও বোঝায়।

ভালো ব্যবস্থার ভালোটুকু মেপে দেখতে হবে জীবনের মাপকাঠিতে। যারা বলে জীবিকার মাপকাঠিতে, তাদের সঙ্গে বিনুর গোড়ায় অমিল। জীবিকা যে জীবনের অনেকখানি বিনু তা বোঝে ও মানে। রাহু যে চাঁদের অনেকখানি চন্দ্রগ্রহণের সময় একথা না মেনে নিস্তার নেই। তা বলে রাহুকে বাহু বাড়িয়ে বন্দনা করা চলে না। তোমরা জীবিকার ধরনধারণ বদলে দিতে চাও। বেশ তো। কিন্তু জীবিকার ভাগটা কি কমবে তাতে? জীবনের ভাগ কি বাড়বে? হয়তো জীবিকার ভাগ কমবে। কিন্তু কেবল ভাগ কমলে কী হবে, যদি গুণ না কমে? যদি প্রতিপত্তি না কমে? যদি মানুষের পরিচয় দেওয়া ও নেওয়া হয় শ্রমিক বা কিষান বলে? মানুষ যখন ষোলো ঘণ্টা খাটত ও আট ঘণ্টা বাঁচত তখন তাকে শ্রমিক বা কিষান বললে বেমানান হত না। যখন চার ঘণ্টা খাটবে ও বিশ ঘণ্টা বাঁচবে তখনও কি সে তার জীবিকার দ্বারা চিহ্নিত হবে? তাই যদি হল তবে রাহুই জিতল, চাঁদ হারল।

তারপরে আরও এক কথা। জীবিকার সময়টাও জীবনেরই অংশ, আয়ুর শামিল। যখন পেটের দায়ে কাজ করছি তখনও যেন মনে করতে পারি যে প্রাণের আনন্দে বাঁচছি। নইলে জীবনের অখন্ডতার স্বাদ পাব না। জীবনকে দ্বিখন্ডিত করলে জীবিকার ভাগ যত কম হোক-না কেন অখন্ডতার ক্ষতিপূরণ হয় না। বিনু এটা মর্মে মর্মে বুঝেছে। জীবিকাকে জীবন্ত না করতে পারলে মানুষের জীবন অখন্ড হবে না।

ধর্ম

জীবিকাকে জীবন্ত করে ধর্ম। জীবিকাকে জীবন্যাস করে ধর্মবিশ্বাস। নইলে মানুষ অখন্ড জীবনের স্বাদ না পেয়ে মরমে মরে। সে মরণ নরক সমান। তাই তার ইতিহাসে এতবার ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। এখনও ঘটছে। সাম্যবাদ গত শতাব্দীতে ধর্মরূপেই গৃহীত হয়েছিল এই ব্যক্তির জীবনে। এখনও হচ্ছে। তবে এখন তার কর্মকান্ড ধর্মের জায়গা জুড়েছে।

জাতীয়তাবাদও একপ্রকার ধর্ম; বিশেষত যে-দেশ স্বাধীন হতে চেষ্টা করছে সে-দেশে অথবা স্বাধীনতা রাখতে চেষ্টা করছে সে-দেশে। তা যদি না হত কোটি কোটি মানুষ যুদ্ধে যোগ দিত না, বিদ্রোহ করত। রুশ দেশেও জাতীয়তাবাদ এখনও সতেজ। যারা সাম্যবাদী তারা জাতীয়তাবাদীও। একসঙ্গে একাধিক ধর্মে বিশ্বাস মানবচরিত্রের এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। এদেশেও আমরা শাক্ত বৈষ্ণবের সমন্বয় দেখেছি। এমন কথাও শুনেছি যে, যাঁর নাম শ্যামা তাঁরই নাম শ্যাম। যার নাম অসি তারই নাম বাঁশি। আমরা জাত-কে-জাত সমন্বয়বাদী। একদিন এমন কথাও শুনব যে যাঁর নাম কৃষ্ট তাঁরই নাম খ্রিস্ট, যার নাম বাইবেল তারই নাম বেদ।

বিনু কোনোদিন মনে-প্রাণে জাতীয়তাবাদী হতে পারল না, সাম্যবাদীও না। বাদীদের সঙ্গে তার বিবাদ বেঁধে যায়। কিন্তু তারও একটা ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল, এখনও রয়েছে। ধর্মের কাজ জীবনকে অখন্ডতা দেওয়া; কেবল দৈনন্দিন জীবনকে নয়, সমগ্র জীবনকে। সমগ্র জীবন বলতে কি শুধু ইহকালের জীবন বোঝায়? পরকালের জীবন কি নেই? যদি থাকে তবে ইহপরকালব্যাপী অখন্ড মন্ডলাকার জীবন যার দ্বারা ধৃত হয়েছে তারই নাম ধর্ম। ধর্ম ব্যক্তিকে নিবিড় করে বেঁধেছে সমষ্টির সঙ্গে, কিন্তু বাঁধনটা বিধিনিষেধের নয়, স্বার্থের বা সুবিধার নয়, অবিভক্ত জীবনের। সেও একটি অখন্ড বৃত্ত, আমরা তার এক-একটি বিন্দু।

ধর্মই বলো, প্রেমই বলো, তার সার হচ্ছে ঐক্যবোধ। মানুষে মানুষে ঐক্যবোধ, মানুষে পশুতে পাখিতে বনস্পতিতে ঐক্যবোধ, প্রাণীতে বস্তুতে ঐক্যবোধ, বস্তুতে শক্তিতে ঐক্যবোধ, শক্তিতে সত্তায় ঐক্যবোধ। এ শৃঙ্খল কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে! শেষ একটা কথার কথা, যেমন আরম্ভ একটা কথার কথা। আদিও নেই, অন্তও নেই। বিনু অনুভব করে।

লিখব না বাঁচব

লেখাটাকে জীবিকা করলে এ প্রশ্ন উঠত কি না বলা শক্ত। কিন্তু অন্য এক জীবিকা মনোনয়ন করে বিনু পড়ল ফাঁপরে। জীবিকাকে জীবনের বড়ো অংশ দিয়ে বাকি যেটুকু থাকে সেটুকু লিখে কাবার করে তবে বাঁচবে কখন? যদি বাঁচে তবে লিখবে কখন?

লেখা ও বাঁচার এই দোটানা এখনও মেটেনি। দু-পৃষ্ঠা লিখতে-না-লিখতে তার মনে পড়ে যায়, ওই যা! বাঁচতে ভুলে গেছি। আজকের দিনটা ঠিকমতো বাঁচা হল না। আবার, দু-দিন লেখা বন্ধ থাকলে তার মন কেমন করে! কই, কিছুই তো লিখে যেতে পারলুম না। যা লিখতে চাই তার তুলনায় যা লিখেছি তা কতটুকু, তা কত অসার! ওটুকু লেখা কদ্দিন টিকবে!

বিনু একবার ভাবে জীবনটা ব্যর্থ গেল। একবার ভাবে লেখনীটা অক্ষম। তারপর ভাবে এখনও সময় আছে, যদি ঠিকমতো বাঁচতে পারি তো ঠিকমতো লিখতে পারব। বাঁচাটাই আগে।

কিন্তু তাই-বা কেমন করে হবে? জীবিকা ও জীবন মিলে অখন্ড নয় যে। ধর্ম সাহায্য করছে না। যেখানে অখন্ড জীবনের স্বাদ নেই সেখানে আগে বাঁচলে কী হবে? সে বাঁচা কি ঠিকমতো বাঁচা? তার থেকে যা আসবে তা কি ঠিকমতো লেখা?

অথচ জীবিকাকে ছেঁটে বাদ দেবার উপায় নেই। এ জীবিকা না হয়ে আর কোনো জীবিকা হলে তফাত যা হত তা উনিশ-বিশ। একমাত্র সমাধান সাহিত্যকে জীবিকা করা। বিনু একথা অনেক বার ভেবেছে। কিন্তু জীবিকার জন্যে সাহিত্য লিখতে বসলে এত বেশি লিখতে হয় যে বিনু কোনো কালে এত বেশি লিখতে চায়নি, এত বেশি লিখলে বেশিরভাগ লেখা হবে অনিচ্ছায় লেখা। অনিচ্ছায় লেখা কদাচ ভালো হয়। বাজে লেখায় হাত খারাপ করলে সে-হাত দিয়ে পরে ভালো লেখা বেরোয় না। প্রকৃতির প্রতিশোধ।

সুতরাং জীবিকার জন্যে আর যা-ই করো, মা লিখ, মা লিখ। যদিও পরম শ্রদ্ধাস্পদ যামিনী রায় বলেন আর্টকে জীবিকা না করলে ভালো আর্ট হয় না।

আপনাকে চেনা

বিনু আপনাকে চিনল প্রেমিকার চোখে। চিনল, সে কবি। আরও চিনল, সে নায়ক। একাধারে কবি ও নায়ক, *বাল্মীকি* ও *রাম*। যে লেখে ও যাকে নিয়ে লেখা হয়। যে লেখে ও যে বাঁচে।

তার এই যুগ্ম পরিচয় সে একদিনের জন্যেও ভোলেনি। তাই সে লেখা নিয়ে মাতামাতি করেনি। লেখা নিয়ে মশগুল থাকলে যাকে নিয়ে লেখা হয় তার কথা মনে থাকে না। বিনু তাকে মনে রেখেছে, তাই বাঁচার জন্যে ব্যাকুল হয়েছে। যে বাঁচতে জানে সে যদি কবি হয়ে থাকে তো লিখতে জানে। যদি কবি না হয়ে থাকে তো তাকে নিয়ে আর কেউ লিখবে। যেদিক থেকেই দেখা যাক-না কেন যে বাঁচে সে ঠকে না। যে বাঁচে না সে হাজার লিখলেও ঠকে। তার লেখা বাঁচে না, পাঠক-পাঠিকাদের বাঁচায় না। তাতে জীবনের স্বাদ নেই।

পরবর্তী বয়সে বিনু উপলব্ধি করেছে যে, বাঁচাটাও লেখা। কালি-কলম দিয়ে নয়, প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে তনু দিয়ে লেখা। লেখা বলতে যদি শুধু লেখনী চালনা বোঝায় তবে তারজন্যে ঢের লোক রয়েছে, লোকের অভাব হবে না কোনোদিন। কিন্তু তারা নায়ক হবে না, তাদের কারও জীবন নিয়ে কাব্য রচা হবে না। যে নায়ক হবে তাকে বাঁচতে হবে নায়কের মতো, লিখতে হবে বুকের রক্ত দিয়ে প্রেমের তুলিতে। তা যদি না পারে তবে শুধু কাগজ ভরিয়ে কী হবে! কোন মোক্ষলাভ হবে!

বিনু যেমন উপলব্ধি করেছে যে বাঁচাটাও লেখা, তেমনি আরও উপলব্ধি করেছে যে, লেখাটাও বাঁচা। সে যখন তন্ময় হয়ে লেখে তখন তার তন্ময়তা লেখার প্রতি নয়, লক্ষ্যের প্রতি। পাঠিকার প্রতি, পাঠকের প্রতি, যিনি পড়বেন তাঁর প্রতি। দেশকাল অতিক্রম করে যে অন্তিম পাঠক আছেন, যে আলটিমেট রিডার (ultimate reader) তাঁর প্রতি। লেখা দিয়ে তাঁর পরশ পাওয়াও বাঁচা। লিখতে লিখতে অনেকসময় মনে হয়েছে সৃষ্টিরহস্য আমার নখদর্পণে। সৃষ্টি করেই বুঝতে পারি সৃষ্টির অর্থ কী। জ্ঞান দিয়ে যাঁকে পাওয়া যায় না, ধ্যান দিয়েও না, সৃজন দিয়ে তাঁর সঙ্গ পাই। কারণ সৃজন হচ্ছে আত্মদান। আপনাকে দেওয়া।

লেখাটাও বাঁচা, যদি লক্ষ্যের প্রতি শরবৎ তন্ময় হতে পারি। উপলক্ষ্যের প্রতি নয়। লেখাটা উপলক্ষ্য, যিনি পড়বেন তিনি লক্ষ্য।

ডায়ালেকটিক

এটা হল পরিণত বয়সের সিনথেসিস। বিনুর বিশ-একুশ বছর বয়সে এর অস্তিত্ব ছিল না। তখন থিসিসও অ্যান্টিথিসিস। থিসিসের নাম নায়ক। অ্যান্টিথিসিসের নাম কবি। নায়ক মানে যে বাঁচে। কবি মানে যে লেখে। নায়ক, যেমন *রাম।* কবি, যেমন *বাল্মীকি।* প্রকাশ থাকে যে, বিনুর জীবনের আদর্শ রাম নন, কবিত্বের আদর্শ বাল্মীকি নন।

বিনুর বয়স্যেরা পরিহাস করে বলতেন, ডায়ালেকটিকাল রোমান্টিসিজম। বিনু বলত নামে কী আসে-যায়! গোলাপকে যে-নামেই ডাকো সে তেমনি সৌরভ বিলোয়। কিন্তু তার ভালো লাগত একথা ভাবতে যে সে রোমান্টিক। পীত বর্ণের পাঞ্জাবি পরে কলেজে যেত। পীতবসন বনমালী। পাঞ্জাবির নীচে রক্তরাঙা গেঞ্জি। ও তার বুকের রক্ত! তার কথাবার্তার ভাষা ছিল সুভাষিতবহুল। এক-একটা কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত আর বন্ধুরা ঠাওরাত বিনু মুখস্থ করে এসেছে, হেসে উড়িয়ে দিত।

তখনকার দিনে তার মস্ত ক্ষোভ ছিল যে কেউ তাকে ঠিকমতো বুঝল না। যে দু-একজন বুঝতেন তাঁদের সঙ্গে তার আলাপ প্রধানত পত্রযোগে। চিঠি লিখে সে যেমন নিজেকে বোঝাতে পারত কথা বলে তেমন নয়। এমনি করে সে লেখার দুঃখ বরণ করে। নইলে লিখতে যে তার ফুর্তি লাগত না নয়। তার ফুর্তি লাগত হাঁটতে, সাঁতার কাটতে, ক্রিকেট খেলতে, তর্ক করতে, বই ঘাঁটতে, একসঙ্গে পাঁচ-সাতখানা বই পড়তে বা পড়ার ভান করতে, ভিড় দেখলেই ভিড়ে যেতে, তামাশা দেখতে। এমন লোকের উপর ভার পড়ল দিনরাত চিঠি লেখার, কবি হওয়ার। সে যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হবে, ধর্মঘট করবে, তার বিচিত্র কী!

চাইনে লিখতে, শরতের জ্যোৎস্না নষ্ট করতে। যাই, ঘুরে বেড়াই। শীতের সকালটি মিষ্টি লাগছে, লেখা কি তার চেয়ে মিষ্টি! যা-ই বলো, লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার মতো মিষ্টি কিছু নেই, যদি এক বাটি গরম মুড়ি থাকে হাতের কাছে। এক পেয়ালা গরম চা যদি কেউ দয়া করে দিয়ে যায়। বিনুর স্বভাবটা স্বাপ্নিকের। তার স্বপ্ন যদি সকলের হত তা হলে হয়তো সে লিখত না। সকাল-সন্ধ্যা মাটি করত না।

কিন্তু আরেক জনের কথা মনে পড়লেই সে আহারনিদ্রা অবহেলা করে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরাতে বসত, ছিঁড়ত বেশি, পাঠাত কম। তাও কিছু কম নয়।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এত দিনে একটা সিনথেসিস হয়েছে, কিন্তু বড়ো সহজে হয়নি। দুটি গল্প বলব। বিনুর মুখে শুনেছি।

বিনু যখন স্কুল থেকে বেরিয়ে কলকাতা যায়, তার পিতৃবন্ধু তাকে সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তিনিই তাকে বলেছিলেন, এটা কি একটা জীবন! আমার গায়ে যদি জোর থাকত আমি জাহাজঘাটে গিয়ে মোট বইতুম। তখন বিনু ঠিক বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি কেন মুটের জীবন শ্রেয়, লেখকের জীবন হেয়।

পরে তার এক বন্ধু কলেজ থেকে বেরিয়ে ডেপুটি হন। তিনিও বিনুর মতো একটু-আধটু লিখতেন, দুজনের লেখা একসঙ্গে ছাপা হত। তিনি তাকে একদিন বলেছিলেন, আমি তো ভাই আজকাল সময় পাইনে, ঘোড়ার পিঠে বসে লিখি। বিনুর তখন মনে হল, এই তো জীবন। ঘোড়ায় চড়ে গ্রামে ঘোরা। এমনি করে

বেদুইনের মতো বাঁচতেই আমার সময় যাবে, লিখতে সময় থাকবে না, তবু যদি লিখতেই হয় তবে ঘোড়ায় চড়ে লিখব।

ঘোড়ায় চড়ে লেখার উপর তার হঠাৎ এত শ্রদ্ধা সঞ্চার হল যে সে ঘোড়ার অভাবে গাছে চড়ে লিখল। ঘোড়ায় চড়া যত রোমান্টিক গাছে চড়া তত নয়। এ খেয়াল বেশিদিন ছিল না। কিন্তু এই ধরনের খেয়াল আরও কত বার জেগেছে। ঘরে বসে লেখা হচ্ছে নিতান্তই লেখা, আর ঘোড়ায় চড়ে লেখা হচ্ছে লেখা এবং বাঁচা। লেখার চেয়ে বাঁচার ভাগটা প্রধান। লেখার মধ্যে সেই বাঁচার ক্রিয়া চলবে। ফলে লেখাটা হবে প্রাণবান ও বেগবান।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওর মতো কুসংস্কার আর নেই। এখনও শোনা যায় যে-যুদ্ধের কবিতা যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন তাজা হয় দূর থেকে তেমন নয়। একজন ইংরেজ সাহিত্যিক নাকি সরাবখানায় বসে নিত্য নিয়মিত লেখেন, সেখানকার হট্টগোলে তাঁর লেখা জীবন পায়। বিনু আর ওসব বিশ্বাস করে না, কিন্তু এককালে তার মনে হত ঘরে বসে লেখার মধ্যে একটুও পৌরুষ নেই, বীরত্ব নেই, লিখতে হলে বাইরে গিয়ে জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে হবে। যেন বহির্জীবনটাই জীবন, অন্তর্জীবনটা কিছু নয়।

পৌরুষ

লেখা যে একটা ডিসিপ্লিন বিনু ক্রমে উপলব্ধি করল। সৈনিকের ডিসিপ্লিন এর চেয়ে কঠোর হতে পারে না, সুতরাং লেখকের জীবনও সৈনিকের জীবনের সমতুল্য। তার ঘোড়া নেই, কিন্তু ঘোড়ার দরকারও নেই। তার খোঁড়া চেয়ারটাই তার ঘোড়া। ভোঁতা কলমটাই তার সঙিন।

কিন্তু প্রথম বয়সে তার বিশ্বাস ছিল অন্যরকম। সে বলত দূর! এটা কি পুরুষের কাজ! এই যে আমি দিনরাত লেখা নিয়ে খেলা করছি। হ্যাঁ, হত বটে পুরুষোচিত, যদি আমার লেখার স্ফুলিঙ্গ থেকে দাউদাউ করে জ্বলে উঠত একটা দাবানল। সমাজ সংসার ভস্ম হয়ে যেত। আর সেই ভস্ম থেকে উঠে আসত নতুন সমাজ, নবীন সংসার।

তখনও বিশুদ্ধ আর্টের উপর তার আস্থা জন্মায়নি। আর্টকে সে পুরুষের কাজ বলে মানতে প্রস্তুত হয়নি, যদি-না ওর দ্বারা সামাজিক কার্যসিদ্ধি হয়। তবে কি ওটা অকর্তব্য? না, অকর্তব্য কেন হবে? জগতে কি কেবল পুরুষ আছে, নারী নেই? যে কাজ পুরুষোচিত নয় সে কাজ মহিলাযোগ্য তো বটে! জগতে যেমন ফুলের মালা আছে, মালিনীরা গাঁথে, তেমনি রসের কবিতাও থাকবে, যারা লিখবে তারা একটু যেন মেয়েলি। রবীন্দ্রনাথকেও লোকে তাই বলত। বিনুর একমাত্র পাঠিকা বিনুকেও বলতেন মেয়েলি। বিনুর তাতে শরম লাগত না, কারণ মেয়েরা যে দেবী।

তা হলেও বিনুর ঝোঁক চেপেছিল ঘোড়ায় চাপতে, ঘোড়ায় চড়ে লিখতে। পুরুষের কাজ, হয় না। লেখা নয়, ঘোড়ায় চড়ে লেখা। বাকিটা মেয়েদের ও মেয়েলি মেজাজের পুরুষদের। তাঁরা বসে বসে আর্ট সৃষ্টি করুন, আমরা গিয়ে সমাজ ভাঙি-গড়ি। আমাদের অন্য কাজ আছে। আমরা পুরুষ।

আর্ট যে যুদ্ধবিগ্রহের মতো পুরুষেরই কাজ, গৃহযুদ্ধের মতো মেয়েদেরও, এ জ্ঞান এল অভিজ্ঞতার থেকে। এটা পড়ে পাওয়া নয়, ঠেকে শেখা। সেই দারুণ ডিসিপ্লিন তিন বছরে বিনুকে ত্রিশ বছর বয়স্ক করেছিল। পরিণত মন নিয়ে সে অন্যান্য সত্যের সঙ্গে এ সত্যও শিখল যে সামাজিক কার্যসিদ্ধি আর্টের উদ্দেশ্য নয়, আর্ট ফর আর্টস সেক।

আর্ট ফর আর্টস সেক

আর্টের সাধনা যদি প্রেমের সাধনার সঙ্গে তুলনীয় হয় তবে প্রেমের সাধনায় যেমন ফলাকাঙ্ক্ষা রাখতে নেই আর্টের সাধনায়ও তেমনি। ফল হয়তো ফলবে, হয়তো ফলবে না, কিন্তু ফলের কথা ভাবলে লাভের চিন্তা জাগে, পাটোয়ারি বুদ্ধি প্রবল হয়। সেইজন্যে বলা হয়েছে, মা ফলেষু কদাচন। যে সাধক ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেননি তিনি যা লাভ করেন তার নাম সিদ্ধি নয়, সিদ্ধাই। আর যিনি সে আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছেন

তিনি হয়তো সিদ্ধিলাভ করবেন না, কিন্তু কাজ নেই তাঁর সিদ্ধাই নিয়ে। তাঁর সাধনাতেই সুখ। পথ চলাতেই আনন্দ!

যাঁরা কখনো ভালোবেসেছেন তাঁদের বোঝাতে হবে না যে প্রেমের সবটাই দেওয়া। বরাতে থাকলে পাওয়াও ঘটে, কিন্তু যদি না ঘটে তা হলেও প্রেমিকের চিন্তা নেই। প্রেমিক যখন পান তখন আকাশভাঙা অঝোর ধারায় পান। যেমন বেহিসাবি দেওয়া তেমনি বেহিসাবি পাওয়া। কিছুই যদি না পান তা হলেও তিনি খুশি। দু-হাত খালি করে বিলোনোই তাঁকে প্রেমিক করেছে। নইলে তিনি হতেন পাটোয়ারি।

প্রেমের মতো আর্টের সবটাই দেওয়া, দু-হাত খালি করে বিলানো। কেউ দু-হাত ভরে ফিরে পান, কেউ তারও বেশি। আবার কারও কপাল মন্দ, যা পান তা সামান্য, হয়তো কিছুই নয়। সেইজন্যে পাওয়ার প্রত্যাশা পুষতে নেই, তাতে অনর্থক দুঃখ। যদি ব্যাবসা করতে হয় তো আর্ট ভিন্ন আরও কত কারবার আছে। তাতে জমাখরচের হিসাব রাখা চলে, লাভ লোকসানের অঙ্ক কষা যায়। সেসব ছেড়ে যদি কেউ আর্টের পথে পা দেন তবে তাঁর পথ চলাতেই আনন্দ।

আর্ট ফর আর্টস সেক বলতে বিনু বোঝে এই তত্ত্ব। যাঁরা আর্টের কাছে কোনো একটা ফল দাবি করেন তাঁরা হয় তো প্রচলিত অর্থে পাটোয়ারি নন, কিন্তু সমাজের মঙ্গল, দেবত্বের বিকাশ, ইতিহাসের উদ্দেশ্যসিদ্ধি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লব, নৈতিক উন্নয়ন, লোকশিক্ষা প্রভৃতি যতরকম ফল আছে সমস্তই লাভের তুলিকায় লাঞ্ছিত। সে-পথে পথ চলার আনন্দ নেই।

উদ্দেশ্য ও উপায়

> The Swami had once asked Pavhari Baba of Gazipur, 'What was the secret of success in work?' and had been answered, 'To make the end the means, and the means the end.

লিখে গেছেন ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনকথায়।

একথা যেকোনো কর্মের বেলায় সত্য। কলাসৃষ্টিও একটা কর্ম, সুতরাং তার বেলায়ও। উদ্দেশ্যকে উপায় করতে হবে, উপায়কে উদ্দেশ্য, যেকোনো সাধনায় এই হল সিদ্ধির গূঢ় মর্ম। আর্টের সাধনাতেও।

সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উপায়। সেইজন্যে বিনু বলে, আর্টের খাতিরে আর্ট। আর্টই আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টই আর্টের উপায়। আর্ট যখন লক্ষ্যভেদ করে তখন আর্টেরই লক্ষ্যভেদ করে, আর্ট হয়েই তার উত্তীর্ণতা বা উদ্ধার। তখন তাকে সামাজিক মাপকাঠিতে মাপতে পারো, হয়তো তাতেও সে ওতরাবে। কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই নয়। আর্টের মানদন্ড আর্টের ভিতরে। তাই তার সার্থকতা আর্ট হওয়াতে। আর যা-কিছু তা অধিকন্তু। অধিকন্তু ন দোষায়। তাকে দিয়ে যদি সমাজের মঙ্গল বা দেবত্বের বিকাশ হয়, যদি চতুর্বর্গ ফললাভ হয় তবে সেটা অধিকন্তু, তাতে দোষ নেই। কিন্তু আর্টের উদ্দেশ্য সেটা নয়, উপায় তো নয়ই।

গায়ের জোরে সেটাকে সরিয়ে রাখারও দরকার দেখিনে। লেখার মধ্যে যদি সমাজের ভালো-মন্দের কথা আসে তো আসুক। ঠেকাতে যাওয়া ভুল। কিন্তু ভুল হয় যখন সমাজের ভালো-মন্দকে আর্টের ভালো-মন্দ বলে গোলমালে পড়ি। আর্টের ভালো-মন্দ যদিও সংসার ছাড়া নয়, তবু সাংসারিক ভালো-মন্দের সঙ্গে তার সবসময় মেলে না। অনেকসময় সংসারের দিক থেকে যা ভালো, আর্টের দিক থেকে তা মন্দ; আর্টের দিক থেকে যা ভালো, সংসারের দিক থেকে তা মন্দ। তা বলে তাই নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়। ভালো আর্ট যদি আর সব দিক থেকে ভালো হয় তো সবচেয়ে ভালো। কিন্তু প্রথমে তাকে ভালো আর্ট হতে হবে। অন্তত শুধু আর্ট হতে হবে। যা কোনো জন্মে সাহিত্য নয় তাকে সৎসাহিত্য বলা হাস্যকর। যা কোনো কালেই কাব্য নয় তাতে সামাজিক তাৎপর্য থাকলেই কি তা সাম্প্রতিক কাব্য হবে?

কবিত্ব

কবিতার প্রাণ হচ্ছে কবিত্ব। প্রাণ যদি না থাকে তবে সামাজিক তাৎপর্য আছে বলেই তা কবিতা নয়, তা কবিতার ভান। তাকে দেখতে কবিতার মতো, কিন্তু প্রতিমাকেও তো দেখতে সরস্বতীর মতো।

যেখানে কবিত্ব আছে সেখানে যদি সামাজিক তাৎপর্য থাকে তবে সেটা অধিকন্তু, তাতে দোষ নেই। কিন্তু তাতে গুণ যা আছে তাও সাময়িক। সমাজের পরিবর্তন হলে তার গুণটুকুর কদর থাকবে না। আদর থাকবে কিন্তু কবিত্বের। কবিত্বকে গুণ না বলে প্রাণ বলাই সংগত।

যেখানে প্রাণ নেই সেখানে প্রাণের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। সেইজন্যে প্রাণেরই আবাহন করতে হয় আগে। আগে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, জীবন্যাস। তারপরে সামাজিক তাৎপর্য বা আধ্যাত্মিক উচ্চতা। কল্পিত বা প্রকৃত গুণ তারও স্থান আছে কিন্তু প্রাণের স্থান নিতে পারে না সে। কবিত্বই প্রাণ।

গুণ সম্বন্ধে যা বলা হল রূপ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। প্রাণের অভাব পূরণ করার সাধ্য রূপেরও নেই। আগে প্রাণ, তারপরে রূপ। ভাষা, ছন্দ, অলংকার, মিল, এ সকলেরও স্থান আছে, কিন্তু প্রাণের স্থান, কবিত্বের স্থান, যদি এরা দখল করে তো কবিতাই হবে না। যা কবিতাই নয় তাকে আধুনিক কবিতা বললে রূপকেই প্রাণের স্থান দেওয়া হয়। তাতে হয়তো ঠাট বজায় থাকে, কিন্তু পুজোর চার দিন পরে কেউ প্রণাম করে না। প্রাণহীন রূপ যার সম্বল সে নিতান্তই আধুনিক, দু-চার বছর পরে তার আধুনিকতার ইতি।

আঙ্গিক নিয়ে বিনু কোনোদিন মাথা ঘামায়নি, তা বলে আঙ্গিকের উপর তার অবজ্ঞা নেই; যেমন সামাজিক তাৎপর্যের উপর তার অশ্রদ্ধা নেই। যেটা আগে সেটা হচ্ছে কবিত্ব। ভাগ্যবানরা কবিত্ব নিয়ে জন্মায়, বিনু তেমন ভাগ্যবান নয়। তাকে ও-জিনিস অর্জন করতে হয়েছে, এবং রক্ষণ করতে। সে যদি প্রেমে না পড়ত কবিত্বের ধার ধারত না, খোঁজ নিত না যে তার অন্তরে কবিত্বের ধারা ফল্গুর মতো বইছে। কবিত্বকে কবিতা করতে হবে। এই তার সাধনা।

রূপচর্চা

কী লিখব, একথা তাকে ভাবতে হয়নি, একজন তাকে ভাববার সময় দেননি। সকালের ডাকে চিঠি এসেছে, বিকালের ডাকে—হয়তো এক দিন পরের বিকালে জবাব গেছে। কিন্তু কেমন করে লিখব এ প্রশ্ন তাকে প্রত্যহ ভাবতে হয়েছে, সেইজন্যেই চিঠির জবাব গেছে এক দিন দেরিতে।

এটা রূপের প্রশ্ন। লেখা কী করে রূপবান হবে, যা লিখব তাতে কী করে লেখকের রূপ ফুটবে, ভাব কী করে রূপ ধরবে, এসব প্রশ্ন একই প্রশ্নের শাখা-প্রশাখা। বিনু আঙ্গিকের জন্যে মাথা ঘামায়নি, কিন্তু অনঙ্গকে অঙ্গ দেবার জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে। আঙ্গিক যদি এর থেকে স্বতন্ত্র হয় তো বিনু তার মহিমা বোঝে না। যদি এর অন্তর্গত হয় তো আঙ্গিকের প্রতি উদাসীন নয় সে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিস রূপ, সুষমা, সুমিতি, অর্থবোধ, ব্যঞ্জনা। গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, প্রত্যেক বাক্যের একটা ছন্দ আছে, প্রত্যেক শব্দের একটা ধ্বনি আছে। তারজন্যে কান তৈরি করতে হয়। যেমন বাইরের কান তেমনি ভিতরের কান। তারপর কান যে রায় দেয় সে-রায় কলমকে মেনে নিতে হয়।

সংগীতের মতো সাহিত্যের রূপ নয়নগোচর নয়, শ্রুতিগোচর। চোখ দিয়ে নয়, কান দিয়ে দেখবার। পদ্যের ছন্দ যে গীতধর্মী সকলে তা মানবেন, কিন্তু গদ্যেও একইরকম ছন্দ আছে। যারা জানে তারা মানে। অতি সাধারণ আটপৌরে গদ্য তার প্রচ্ছন্ন ছন্দের লীলায় সংগীতের মতো লাগে। ইংল্যাণ্ডে ইংরেজের মুখের কথাবার্তা বিনুর কানে গানের রেশ আনত। বিনু তাই গদ্যকে পদ্যের মতো ভালোবেসেছে। কিন্তু গদ্যকে পদ্যের মতো করে সাজিয়ে পদ্য বলে চালাতে চায়নি। গদ্যের ছন্দ কখনো পদ্যের ছন্দ হবে না, পদ্যের ছন্দ তার ভিন্নতা রক্ষা করবে। পুরুষকে নারীর ও নারীকে পুরুষের পোশাক পরিয়ে ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি করা যায়, কিন্তু তাতে তাদের পার্থক্য দূর হয় না। বিনু দু-রকম ছন্দই অনুশীলন করতে যত্নবান হয়েছে, যার যেখানে স্থান তাকে সেখানে বসিয়েছে, একের জায়গায় অপরকে বসায়নি। তার কবিত্ব গদ্য ও পদ্য উভয়ের আশ্রয় নিয়েছে। যখন পদ্যের আশ্রয় নিয়েছে, তখন তা হয়েছে কবিতা। যখন গদ্যের আশ্রয় তখন প্রবন্ধ বা কাহিনি।

প্রেরণা

বিনু প্রেরণায় বিশ্বাস করে। সম্পাদকের তাগিদে বা প্রিয়জনের সংকেতে যা কলমের মুখ দিয়ে বেরোয় তাতে রূপ গুণ ও প্রাণ থাকলেও তা ডাইনামিক নয়। প্রেরণা যেন অনুকূল বায়ু, যখন বয় তখন তরি আপনি চলে, তাকে চালিয়ে নিতে হয় না, কেবল দিক ঠিক রাখতে হয়। যখন বয় না তখন নৌকা চলে গরজের ঠেলায়। ঘাটে পৌঁছোয় বই কী, কিন্তু তাতে ফুর্তির নাম-গন্ধ নেই। লেখা উতরে যায়, হয়তো হাজার বছর বাঁচে, কিন্তু নাচে না, নাচায় না।

বিনুকে বলেছিলেন এক আলাপী, 'মশাই, গুটিকতক কবিতা কি গল্প লিখুন দেখি, যা পড়ে মউজ পাব, মাতোয়ারা হব। তা নয় তো ভাষার হেঁয়ালি, ভাবের কুহেলি, নিজেও খাটবেন, আমাকেও খাটাবেন।'

কথাটা বিনুর মনে লেগেছিল। লেখার পিছনে বিস্তর খাটুনি থাকে, খুব বড়ো বড়ো লেখকদেরও। কিন্তু তাঁরা যে খাটুনি গোপন করতে জানেন। এমন ভাব দেখান যেন হাওয়ায় উড়ছেন, স্রোতে ভাসছেন, একটুও ভয়-ভাবনা নেই, তাগিদ বা গরজ বা ঠেলা কাকে বলে খোঁজ রাখেন না। অসাধারণ ফুর্তিবাজ লোক তাঁরা, অন্তত রচনা পড়ে তাই মনে হয়। কাউকে তাঁরা বুঝতে দেন না যে ফুর্তির আড়ালে আর এক মূর্তি আছে। দারুণ অধ্যবসায়, অক্লান্ত শ্রম, অসংখ্য কাটাকুটি তাঁদের দৈনিক বরাদ্দ।

রূপ গুণ ও প্রাণচর্চা উত্তম, কিন্তু যথেষ্ট নয়। বিশ্বসৃষ্টির মূলে রয়েছে কী এক দুর্বার প্রেরণা, সে-প্রেরণা জীবসৃষ্টির মূলেও। সে যখন আসে তখন বোবা মানুষ গান গেয়ে ওঠে, পঙ্গুর পায়ে নাচন লাগে, শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। কবির শোক তখন শ্লোক হয়ে উড়ে যায় এমন অবলীলায় যে সকলের মনে হয় স্বতঃস্ফূর্ত। লোকের ধারণা বাল্মীকিকে এক মুহূর্ত ভাবতে হয়নি নিষাদের কান্ড দেখে। হয়তো তাই, কিন্তু তার আগে তপস্যা করতে হয়েছিল একমনে। সে-তপস্যা দিনের পর দিন—দৈনন্দিন। সে-সাধনা বাণীর সাধনা।

প্রতীক্ষা

প্রেরণার জন্যে প্রতীক্ষা করতে হয়। কার বরাতে কখন আসে জোর করে বলা যায় না। সমুদ্রের জোয়ার কখন আসে মাঝিরা তা জানে, আকাশের হাওয়া কখন আসে তাও বোধহয় তাদের জানা। কিন্তু প্রেরণার আসা-যাওয়ার সময়-অসময় নেই। কবিরা এইটুকু খবর রাখেন যে, প্রেরণা হঠাৎ কখন এসে হাজির হয়, কবিকে প্রস্তুত হবার অবকাশ দেয় না, প্রায়ই অপ্রস্তুত অবস্থায় পায়। এমন কবি নেই যিনি প্রেরণার করুণা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু এমন কবির সংখ্যাই বেশি যাঁরা প্রেরণার করুণার মুহূর্তে অন্য কাজে রত। কাজটা হয়তো দরকারি, হয়তো বৈষয়িক। কিন্তু প্রেরণা তার জন্যে দাঁড়াবার পাত্রী নয়।

সেইজন্যে কবিদের মতো দুঃখী আর নেই। কবি অর্থে এখানে শিল্পীদের সবাইকে বুঝতে হবে। শিল্পীরা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও যার দেখা পান না সে হয়তো একদিন অতি অসময়ে এসে দেখা দিল, তখন তার জন্যে না আছে আয়োজন না আছে অবসর। হাতের কাজ ফেলে তার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে-না-হতেই সে হয়তো অদর্শন হয়েছে। তখন অনুশোচনাই সার।

তাঁরই জিত যে-কবি সবসময় সতর্ক থাকেন, অন্য কাজে হাত দিলেও কান খাড়া রাখেন প্রেরণার পদধ্বনির জন্যে। কিন্তু তেমন কবি ক-জন। বিনু তো অনেক চেষ্টা করেও তাঁদের একজন হতে পারল না। দৈবাৎ এক-আধ দিন সে আঁচল দেখে হাতের কাজ ফেলে উঠে আসে, পলাতকার আঁচল চেপে ধরে, ছাড়ে না। কিন্তু তেমন এক-আধ দিন তো আঙুলে গোনা যায়। জীবনে ক-দিন! হাতের কাজ ফেলে উঠে আসার স্বাধীনতা তার নেই, জীবিকার দেবী ঈর্ষাপরায়ণা। তিনি অবশ্য নিত্যনিয়মিত বিশ্রাম দেন। কিন্তু প্রেরণাও এমন মানিনী যে বিশ্রামের সময় আসবে না, যদি আসে তো বিনুর শক্তি থাকে না তাকে ধরবার। সেইজন্যে তার সব থেকেও কিছু নেই। রূপ গুণ প্রাণ তার তূণে রয়েছে, তূণ থেকে নিয়ে ধনুকে জুড়তে পারছে না, প্রেরণা নেই। প্রেরণা যদি পায় তো শক্তি পায় না—শ্রান্ত। কিংবা সময় পায় না—ব্যস্ত।

প্রজ্ঞা

প্রেরণা এমনিতে অন্ধ। তার হাতে ছেড়ে দিলে তরি যে কোন পাথরে আছাড় খেয়ে ডুববে, কোন ঘূর্ণিতে ঘুরতে ঘুরতে তলিয়ে যাবে, তার ঠিকানা নেই। সেইজন্যে প্রেরণার সঙ্গে চাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার কাজ দিক-

দেখানো।

প্রেরণারও প্রয়োজন আছে, প্রজ্ঞারও। কেউ কারও স্থান পূরণ করতে পারে না। বিনুর এক কবি বন্ধুর দিনরাত প্রেরণা আসত, তিনি দিবারাত্রি লিখতেন। কিন্তু কবি ও কবিতা উভয়েরই কেমন এক দিশাহার ভাব। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, ভাব আসে তাই লিখি। আমি তো অত ভেবেচিন্তে লিখিনে যে তোমাদের বুঝিয়ে দিতে পারব কোন দিকে যাত্রা, কী আছে সেদিকে।

এই নিরুদ্দেশযাত্রার একটা উন্মাদনা আছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা নিষ্ফলতাও আছে। ট্রেনে চড়তে প্রথমটা বেশ ফুর্তি আছে, কিন্তু ট্রেন যদি কোথাও পৌঁছে না দেয়, যদি ভুল রাস্তায় চলে বা নামবার স্টেশন অতিক্রম করে যায়, তা হলে ফুর্তির পরে আসে বিরাগ। সেটা কবির জীবনেও অবশ্যম্ভাবী। যদি-না প্রেরণার সাথি হয় প্রজ্ঞা।

নিয়ে যাবার ভার প্রেরণার উপর। পৌঁছে দেবার ভার প্রজ্ঞার উপর। যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা জাগেনি তাঁকে প্রজ্ঞার জন্য তপস্যা করতে হবে। কেবল সৃষ্টির আবেগ নয়, দৃষ্টির আলোকও কবির প্রার্থনীয়। সত্যিকার কবিকে একধারে স্রষ্টা ও দ্রষ্টা হতে হবে। যাঁর দৃষ্টি নেই বা চোখের উপরকার পর্দা খোলেনি তিনি লৌকিক অর্থে কবি হতে পারেন, শিল্পী হতে পারেন, কিন্তু সত্যিকার কবি বা শিল্পী হচ্ছেন মানবজাতির নেতা। জনগণমন অধিনায়ক। তিনিই যদি অন্ধ হন তবে তাঁর দ্বারা নীয়মান যারা তাদের দুর্ভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির এই অংশটি সুবিদিত :

> সদর স্ট্রিটের রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্রই তরঙ্গিত।

সেই দিনই কবি 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনা করেন। অনুরূপ স্বপ্নভঙ্গ অন্য অনেক কবির জীবনে ঘটেছে; বিনুরও।

দৃষ্টিলাভ

বিনুর জীবনের একটি বিশেষ দিনে নয়, একটি বিশেষ বয়সেও নয়, কিন্তু অন্তরে অকস্মাৎ দীপ জ্বলে উঠেছে। তার মনে হয়েছে সে যেন এই বিশ্বব্যাপারের তল পর্যন্ত দেখতে পেয়েছে। তার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোথাও কিছু অপরিচ্ছন্ন নেই। এ যেন সহসা বিদ্যুতের আলোয় দিক দেখা। পর মুহূর্তে সব অন্ধকার। বরং আরও নিবিড় অন্ধকার।

এরকম একটা অভিজ্ঞতা হয়তো পাঁচ-সাত বছরে এক বার আসে। হয়তো আরও দীর্ঘ ব্যবধানে। কিন্তু যখন আসে তখন সংশয় সরিয়ে দেয় একটি চমকে। সেই একটি পলকের পরে স্বপ্নের মতো মনে হয় কী যেন দেখেছি, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস হয় না।

স্বপ্নের মতো অলীক বোধ হলেও বিনু তার নিজের চোখে দেখেছে এ বিশ্বের কোথাও কোনো অপূর্ণতা নেই, সব পূর্ণ। অসার্থকতা নেই, সব সার্থক। অসুন্দর নেই, অশিব নেই, অসত্য নেই, সব সত্য শিব সুন্দর। সব অমৃতময়, উজ্জ্বল।

কিন্তু দেখলে কী হবে, বিশ্বাস করা সহজ নয়। যে-দেশে বারো ঘণ্টা অন্তর দিন হয় সে-দেশে সূর্যের আলোয় বিশ্বাস করা সহজ। কিন্তু যে-দেশে ছ-মাস রাত্রি, ছ-মাস দিন, সে-দেশে যদি কোনো শিশুর প্রত্যয় না হয় যে সূর্যের আলো বলে কিছু আছে, যদি ভ্রম হয় যে আপন চোখে যা দেখেছে তা স্বপ্ন, তবে তাতে আশ্চর্য হতে নেই। সে-দেশের শিশুর পক্ষে সেইটেই স্বাভাবিক।

তেমনি বিনুর পক্ষে। সে যা সত্যি দেখেছে তাও মায়া বলে সন্দেহ করেছে, কিন্তু যতই অবিশ্বাস করুক-না কেন একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেনি। জীবনে যত বারই নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী হয়েছে প্রতি বারই একটি

জায়গায় ঠেকেছে। ধ্যান করলেই এ জগতের পরিপূর্ণ রূপ অন্তরে উদ্ভাসিত হয়, যদিও তা এক নিমেষের তরে, যদিও তা স্বপ্নের মতো অলীক। বাইরের কোনো মাপকাঠি দিয়ে তাকে মাপা যায় না, সেইজন্যে আরও অবাস্তব লাগে।

তা হলেও বিনুকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তার আকস্মিক দৃষ্টিলাভ। স্বপ্নই হোক আর মায়াই হোক, আর মতিভ্রমই হোক, সে যা দেখেছে তা আছে।

রিয়্যালিজম

পলকের জন্যে হলেও বিনুর দৃষ্টিতে পূর্ণতার একটা আভাস ঝলকেছে। সেই আভাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে অতি বাস্তবকেও অপূর্ণ মনে হয়। যথার্থই তা অপূর্ণ কি না বিনু কী করে জানবে! কিন্তু যতদিন পূর্ণতার একটা আলেখ্য হাজার অস্পষ্ট হলেও জাগরূক হয়েছে তার অন্তরে, তত দিন সে আর পাঁচজনের মতো বাস্তববাদী হতে অক্ষম। সাধারণত বাস্তব সত্য বলে যা বিকোয় তা বিনুর মতে অপূর্ণ সত্য।

বিনু যে কেন রিয়্যালিস্ট বলে আত্মপরিচয় দেয় না এই তার কৈফিয়ত। তা বলে রিয়্যালিটি সম্বন্ধে তার বৈরাগ্য নেই। বরং রিয়্যালিটিকেই তার দরকার বলে রিয়্যালিজমে অনাস্থা। মধু চায় বলেই সে গুড় দিয়ে কাজ সারে না। তবে পৃথিবীতে গুড়ও থাকবে, গুড়ের চাহিদাও থাকবে, এমন মানুষও থাকবে যারা গুড় পেলে মধু চাইবে না। এও বড়ো মজার কথা যে, যারা মধু ভালোবাসে তারা গুড়ও ভালোবাসে এবং মাঝে মাঝে মুখ বদলায়। রিয়্যালিজমে অনাস্থা আছে বলে বিনু যে রিয়্যালিস্টদের রচনা দূরে সরিয়ে রাখে তা নয়। পড়ে তারিফ করে।

কিন্তু তার জিজ্ঞাসার নিরসন হয় না তাতে। এর জন্যে তাকে যেতে হয় মিস্টিকদের কাছে। মিস্টিক বলে যাঁদের পরিচয় তাঁদের রচনার সবটা আবার মিস্টিক নয়, তাই নির্বিচারে গ্রহণ করা চলে না। খাঁটি রিয়্যালিজম যত-না দুষ্প্রাপ্য খাঁটি মিস্টিসিজম তার চেয়েও দুর্লভ। কল্পনার মিশাল উভয়ত্র। ভাগ্যক্রমে কল্পনা কাকে বলে বিনু তা বোঝে। দেখলেই চিনতে পারে। নিজেও সে একজন কল্পনাবিহারী। নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর যেটুকু থাকে সেইটুকু সে নেয়। নিতে নিতে সে একসময় রিয়্যালিটির স্বাদ পায়। রিয়্যালিস্ট বলে যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের লেখাতেও। মিস্টিকদের লেখাতেই বেশি। নামে কী আসে-যায়! লোকে যাঁকে রিয়্যালিস্ট বলে তিনি যে আদপেই মিস্টিক নন এটা ভ্রান্তি। আর লোকে যাঁকে মিস্টিক বলে তিনিও এক একসময় রিয়্যালিস্ট। একই মানুষ দুই হতে পারে। হয়ে থাকে।

দুঃখের বিষয়, মিস্টিকরা প্রায়শ সাহিত্যিকগুণে বঞ্চিত। তাঁদের লেখনী সাহিত্যিকের লেখনী নয়, তাই তাঁদের হাতে যা হয় তাকে সাহিত্য বলতে বাধে। পক্ষান্তরে রিয়্যালিস্টরা সাহিত্যনিপুণ।

সত্যের অপলাপ

পূর্ণ সত্য দূরের কথা, আংশিক সত্যকেও যাঁরা সাহিত্যে রূপায়িত করতে চেয়েছেন তাঁরা লিখতে লিখতে আসলটি হারিয়ে ফেলেছেন, জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করেছেন কাল্পনিককে। হামেশা এরকম ঘটে। সত্য, তা সে পূর্ণই হোক আর অপূর্ণই হোক—সহজে ধরা দেয় না; ফাঁক পেলেই পালায়। পলাতকের পশ্চাদ্ধাবন করব না লেখা শেষ করব? যদি লেখা শেষ করার তাড়া থাকে তবে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। রিয়্যালিস্টরা দু-বেলা এই কর্ম করেন, মিস্টিকরাও—তাড়া খেলে।

তাড়া জিনিসটা ভালো নয়। কিন্তু দুনিয়া জায়গাটাও সুবিধের নয়। বিনুর এক লেখক-বন্ধু তাকে একবার বলেছিলেন, 'আমরা যদি ডস্টয়েভস্কি হতুম, পেটের জ্বালায় লিখতুম, আর তাহলে আমাদের লেখা প্রাণ পেত। ক্ষুধার মতো বাস্তব কী আছে!' বিনু লক্ষ করেছে যে যাঁরা নিয়মিত লেখেন তাঁদের সকলের না হোক, অধিকাংশেরই একটা-না-একটা জ্বালা আছে। কিন্তু জ্বালার তাড়নায় লিখতে গেলে কল্পনার মিশ্রণ অপরিহার্য।

যেক্ষেত্রে ত্বরা নেই, প্রচুর অবসর পড়ে রয়েছে, সেক্ষেত্রে লেখনী বিশ্বাসঘাতকতা করে। লিখতে বললে এমন কথা বানিয়ে লেখে যা লেখকের অভিপ্রেত নয়। কার অভিপ্রেত তাও সে জানে না। লেখনীর অভিপ্রেত বললে বিশ্বাসের অযোগ্য হবে। মানতে হয় যে লেখকের ভিতরেই একজন রয়েছেন, যাঁর নাম

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতুকময়ী'। লেখকের কল্পনাবৃত্তি তার কলমের রাশ কেড়ে নেয়, কলম চালায়। লেখক চেয়ে দ্যাখে, তার মন্দ লাগে না।

যেমন করেই হোক কল্পনার সংক্রমণ ঘটে সত্যের সহিত। তাতে যদি সত্যের অপলাপ হয় তবে সাহিত্যে সত্যের চেয়ে সত্যের অপলাপই অধিক। সত্যের সন্ধানীদের তাহলে অন্যত্র যেতে হয়। তাঁরা দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করুন। কিন্তু সাহিত্য কোনোদিন কল্পনার আঁচল ছাড়বে না। কল্পনার সঙ্গে তার আদ্যিকালের সম্পর্ক, বোধহয় অন্ত্য কালেরও।

রক্ষা এই যে কল্পনার সাহায্য নিলে সত্যের অপলাপ ঘটে না। অন্তত বিনুর তো তাই বিশ্বাস।

সাহিত্যের সত্য

সাহিত্যের সত্য দর্শন-বিজ্ঞানের সত্য নয়, কারণ সাহিত্যের সত্য কল্পনামিশ্রিত। দর্শন-বিজ্ঞানের সত্য কল্পনাবর্জিত। এটা একটা মস্ত তফাত। কিন্তু আরও একটা তফাত আছে, সেটা আরও বড়ো।

দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিকরা হৃদয় দিয়ে দেখেন না, হৃদয় দিয়ে লেখেন না। তাঁদের হৃদয় আছে নিশ্চয়, কিন্তু হৃদয়ের জবানবন্দি তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। সত্য তাঁদের হৃদয়ের ভিতর দিয়ে আসে না, আসে মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে। তাতে হৃদয়ের শোক তাপ উল্লাস উন্মাদনা নেই। থাকতে পারত আবিষ্কারের আনন্দ, অন্বেষণের বেদনা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তাঁর আনন্দ বেদনা ব্যক্ত করেন না। তাঁর একমাত্র বচনীয়, সত্য। পক্ষান্তরে সাহিত্যিক তাঁর নিজের অনুভূতির ছাপ রেখে দেন তাঁর সত্যের সর্বাঙ্গে। এমনকী, তাঁর অনুভূতিটাই অনেকসময় তাঁর সত্য। আদিকবির প্রথম শোকে উক্ত হয়েছে, অন্য কোনো মহান সত্য নয়, তাঁর নিজেরই শোকাকুল অনুভূতি।

কবিকে বেশি দূর যেতে হয় না, সে তার ঘরে বসে তার নিজের হৃদয়ে যা অনুভব করে তাও সত্য। তেমন সত্য সে প্রতিদিন জগৎকে দিতে পারে একটা অভিনব আবিষ্কার হিসাবে নয়, একটা পরিচিত অভিজ্ঞতারূপে। সাহিত্যে কেউ কিছু আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায় না। যেসব সত্য নিয়ে সাহিত্যের কারবার সে সব কোন মান্ধাতার আমলের। কবিরা চিরপুরাতনকে নিত্যনূতন অনুভব করেন, আর অপরের অনুভূতি উদ্রেক করেন। যাঁরা পড়েন তাঁদেরও সেটা একটা পুরাতন অথচ নূতন অনুভূতি।

বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সত্যের তুলনা হয় না প্রধানত এই কারণে। সাহিত্য মানুষের জ্ঞানের সীমা বাড়িয়ে দেয় না, সে-কাজ দর্শন বিজ্ঞানের। কিন্তু সাহিত্য মানুষের হৃদয়কে একদিনও নীরস হতে দেয় না, চিরহরিৎ রাখে। সাহিত্যের সত্য হাজার হাজার বছর আগে যা ছিল আজও তাই। জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ নিয়ম-প্রকৃতি বিরহ-মিলন প্রেম-অপ্রেম—এদের নিয়ে অন্তহীন আদিহীন বিশ্বপ্রবাহ। সতত সে পূর্ণ, সার্থক, শিব, সুন্দর, সত্য।

পরিবর্তন

সবই যদি ছিল, রয়েছে ও থাকবে তবে পরিবর্তন কি মিথ্যা? তবে বিবর্তন কি ভ্রম? মানুষ কি মানুষ ছিল দশ লাখ বছর আগে? দশ লাখ বছর পরে মানুষ কি মানুষ থাকবে?

না, পরিবর্তন মিথ্যা নয়। বিবর্তনও নয়। জগতের প্রত্যেকটি কণা পরিবর্তমান। বিবর্তমান। দশ লাখ বছর পরে মানব বলে যদি কোনো জাতি থাকে তবে বিবর্তিতভাবে থাকবে, হয়তো বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে সে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করবে। হয়তো এক-একটি ব্যক্তি এক এক হাজার বছর বাঁচবে। হয়তো জরা ব্যাধি দারিদ্র্য কারও জীবন কালো করবে না। সব অবিচার সব অত্যাচার বিলুপ্ত হবে।

কিন্তু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখ প্রেম-অপ্রেম যাবে কোথায়! দশ কোটি বছরের পরেও বিরহ-মিলনের অবসান নেই। আর মৃত্যু? মর্ত যতকাল মৃত্যু ততকাল। কাল যতকাল মর্ত ততকাল। ততকাল মানুষ হয়তো টিকবে না, বিজ্ঞানের বল অসীম নয়। কিন্তু যে থাকবে সে মানুষের মতো বাঁচবে ও মরবে, হাসবে ও কাঁদবে, পাবে ও হারাবে, ভালোবাসবে ও ভালোবাসা চাইবে। এ সকলের পরিবর্তন নেই, যদি থাকে তো বাইরের দিকে। এদের পরিবর্তন ধরনধারণে।

তখনকার মানুষ বা নরদেব এমনি ব্যর্থ হবে বিশ্বব্যাপারের অর্থ খুঁজে। এমনি পুরস্কৃত হবে অকস্মাৎ চপলা চমকে। এমনি সাধনা করবে অপরূপকে রূপ দিতে, অনির্বচনীয়কে বচন দিতে। দিতে গিয়ে হারাবে, যা দেবে তার অনেকখানি কল্পনা। কৌতুকময়ী তখনও তার লেখনী নিয়ে খেলা করবে। আর তার অনুভূতি তাকে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হতে দেবে না, সাহিত্যিক বা শিল্পী হইয়ে ছাড়বে।

বিনুর সেইজন্যে এক এক সময় মনে হয় কাল একটা মায়া। যা আছে তা সত্তা আর তার রূপ রূপান্তর। এ-ই রিয়্যাল, বাকি আনরিয়্যাল। বিনু মাঝে মাঝে মায়াবাদী হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি

বিনুর হুঁশ হয় যখন খিদে পায়, শীত করে, মাথা ধরে। তখন আর মায়াবাদ নয়, রূঢ় বাস্তববাদ। তখন সে বেশ ভালো করেই বুঝতে পারে সন্ন্যাসীরা কেন প্রকৃতির প্রতি বিরূপ। প্রকৃতি ঠাকরুন এমন সুরসিকা অথবা এমন অরসিকা যে, শীতকালে শীত পাইয়ে দেন, রাত্রিকালে ঘুম পাইয়ে দেন, দিনে অন্তত একবার খিদে পাইয়ে দেন। বয়সকালে আর যা পাইয়ে দেন তা বলে কাজ নেই।

প্রকৃতির এই দাসত্ব কারই-বা সহ্য হয়! মানুষ তাই যুগে যুগে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়েছে এবং তাকেই ঠাওরেছে মুক্তি। বিনুরও বিশ্রী লাগে যখন তার অনুভূতি বা কল্পনার মাঝখানে হঠাৎ এই আবির্ভাব ঘটে ক্ষুধার বা পিপাসার। ওসব ছোটো কথা ভাবতে নেই, কিন্তু যতক্ষণ-না এক গ্লাস জল বা একটা ফল পেটে পড়েছে ততক্ষণ সব বড়ো বড়ো চিন্তা ঘুলিয়ে যায়। ভীষণ রাগ ধরে প্রকৃতি ঠাকুরানির উপর। এ কী রঙ্গ তাঁর! অসময়ে রসভঙ্গ কেন!

বিনুকে কত লোক বলেছে, ‘জীবনটা তো বেশ ভালোই। কিন্তু যদি পেটটা না থাকত!’ বিনু কি সহজে তা মানতে চায়, কিন্তু সময়মতো চারটি খেতে না পেয়ে মানতে বাধ্য হয়েছে। ছেলেবেলায় ভাবতে হয়নি, মা-ঠাকুমা ছিলেন। বড়ো হয়ে কলেজের মেসে হস্টেলে পেট ভরে খেতে পায়নি, অগত্যা মেনেছে। শোনা যায়, জলতেষ্টার সময় একটু জল খেতে না পেয়ে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য শক্তিবন্দনা করেছিলেন—গঙ্গার স্তোত্র। প্রকৃতি আমাদের সকলেরই মাথা হেঁট করিয়ে ছাড়ে! এক ভদ্রমহিলা বেশ একটু ঢং করে বলেছিলেন, ‘ওমা! ভাবতে ঘেন্না লাগে, গুরুদেব দাঁত চিবিয়ে চিবিয়ে খান।’ তিনি নাকি শক পেয়েছিলেন স্বচক্ষে দেখে। তাঁর বোধহয় ধারণা ছিল—গুরুদেব যখন, তখন কোনো অলৌকিক উপায়ে জীবনধারণ করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকেও আহার করতে হয়; দাঁত দিয়ে।

প্রকৃতি দেবীর এই রাগরঙ্গ যে মানুষকে কতরকম শোচনীয় অবস্থায় ফেলে ও অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করায় তার লেখাজোখা নেই। রিয়্যালিস্ট বলে যাঁরা পরিচয় দেন তাঁদের প্রধান কর্ম হল প্রকৃতির হাতে মানুষের বাঁদর নাচ ফলাও করে আঁকা। বিনু কিন্তু ওটাকে পরিহাস বলে উড়িয়ে দেয়। দাসত্বের গ্লানি তার গায়ে লাগে না, কারণ যাঁর দাসত্ব তিনি যে রঙ্গিণী।

নখদন্ত

কিন্তু তামাশা নয়। ইংরেজিতে একটা বচন আছে, প্রকৃতি নখদন্তে রক্তিম। ক্ষুধার আহার আহরণ করবার জন্যেই এসব। প্রতিদিন কী নৃশংস জীবহত্যা চলেছে গ্রামে নগরে জঙ্গলে জলে; এমনকী আকাশেও! পাখিদের ডানা দেওয়া হয়েছে খোরাক জোটানোর জন্যে।

মানুষের সমরসম্ভার—সঙিন বন্দুক মেশিনগান কামান ট্যাঙ্ক এরোপ্লেন—সেই নখদন্ত ও ডানার রকমফের। মানুষ এসব দিয়ে আহার সংগ্রহ করে, দুর্বলের রক্ত শোষে। সভ্যতার মুখোশ খসে পড়ে যুদ্ধবিগ্রহের উত্তেজনায়। শিউরে উঠতে হয় দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাওয়া দেখে। বিনুবাবু যে সন্দেশ খান সে কোন গরিবের ছেলের না-খাওয়া দুধ। তিনি যে নিরামিষাশী হয়ে ত্রাণ পাবেন সে-পথ বন্ধ।

তারপর খবরের কাগজে নারীধর্ষণের বার্তা পড়ে সে আঁতকে ওঠে। কী সর্বনাশা প্রবৃত্তি! দেয়ালে টিকটিকির কান্ড দেখে তার গায়ে কাঁটা দেয়। এই বিভীষিকার নাম বংশরক্ষা! মানুষ বলো, ইতর প্রাণী বলো,

পৃথিবীতে এসেছে এই করে; টিকে আছে এই করে; লক্ষ লক্ষ বছর টিকে থাকার দাবি রাখে এই করে। রূঢ় বাস্তব। নিষ্ঠুর বাস্তব।

প্রকৃতি যার নাম সেটা একটা দুঃস্বপ্ন। তার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সন্ন্যাসী হওয়াই শ্রেয়। কেবল সন্ন্যাসী নয়, পওহারী। বায়ুভুক। একথা বিনু কত বার ভেবেছে। কিন্তু তার অন্তর সায় দেয়নি। আবার এর বিপরীতটাও ভেবেছে, বীরাচারী হতে চেয়েছে। তাতেও অন্তরের আপত্তি। প্রকৃতির সঙ্গে অসহযোগের নাম সন্ন্যাস। অতি সহযোগের নাম বীরাচার। উভয়ের উদ্দেশ্য একই। সেই দুঃস্বপ্ন থেকে নিস্তার।

কিন্তু সত্যিই কি সেটা একটা দুঃস্বপ্ন? না, বিনু যে তাকে শুভদৃষ্টির আলোয় দেখেছে। যদিও চকিতের দেখা তবু চিরকালের চেনা। যা-ই হোক-না কেন তার বাইরের পরিচয়, সে দুঃস্বপ্ন নয়। তার হাত থেকে নিস্তারের কথা ওঠেই না। ওটা একপ্রকার প্রচ্ছন্ন জড়বাদ। ওতে মুক্তি নেই। সত্যিকার মুক্তি প্রকৃতিকে স্বীকার করে, তারসঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে উদ্দেশ্য মিলিয়ে, ছন্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে। সত্যিকার মুক্তিলীলার নামান্তর। নিত্য লীলার।

ছন্দরক্ষা

সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা থেকে অণু-পরমাণু পর্যন্ত যেখানে যে কেউ আছে, যা-কিছু আছে, সকলেই আপন আপন অস্তিত্বে অন্তর্হিত ছন্দ রক্ষা করে চলেছে। কারও মুখে কোনো নালিশ নেই। একমাত্র ব্যতিক্রম মানুষ। প্রকৃতিদেবী বোধহয় জানতেন না যে মানুষ তাঁর শাসন মানবে না, বিদ্রোহ করবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই? প্রতিদিন এ জগৎ মানুষের দেহমনকে আঘাত করছে, মানুষের বুকে বাজছে। কয়েক দিন আগে দেখি একটা বাচ্চা হনুমান আমার অফিসঘরে ঢুকে কী করছে। আমাকে দেখেই চেঁচামেচি করতে করতে জানালা দিয়ে এক লাফ। কিন্তু লাফ দেবার পরক্ষণেই পুনঃপ্রবেশ। তাকে তাড়িয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া গেল। কিন্তু তারপরে যা শুনলাম তাতে আমার মনে হল অন্যায় করেছি। ও ছিল শরণাগত। অনেকক্ষণ ধরে শুনতে থাকলুম বাইরে লাফালাফি দাপাদাপি চলেছে, একটা হনুমান তাকে মারতে তাড়া করে আসছে, তার মা তাকে কোলে চেপে ধরছে, অন্যান্য মায়েরাও তাকে ঘিরে বসছে। শুনলুম হনুমানের দলে একটি মাত্র পুরুষ আর সকলে নারী। যেমন বৃন্দাবনে। এই হতভাগা শিশু হনুমানটি পুরুষ। তাই এর জনক স্বয়ং একে বধ করতে চান। জনকের চোখে ইনি সন্তান নন, ইনি প্রতিদ্বন্দ্বী। একে বড়ো হতে দেওয়া নিরাপদ নয়। এই বয়সেই দাঁত দিয়ে পেট চিরতে হবে। শুনলুম এরকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায় যে, হনুমান তার ছেলের পেট চিরে রাস্তায় ফেলে গেছে। বীভৎস দৃশ্য।

তবে এও শোনা গেল যে মায়েরা তাদের ছেলেদের কোনোমতে বাঁচিয়ে সন্ন্যাসী হনুমানের দলে ছেড়ে দেয়। সে-দলে সকলেই পুরুষ, সকলেই চিরকুমার। সেই চিরকুমার সভার সভ্য হয়ে শিশুটি প্রাণে বাঁচে। আমাদের রামায়ণের হনুমান বোধহয় সন্ন্যাসী হনুমানের দলে 'মানুষ' হয়েছিলেন। পালের গোদা হলে তিনি একপাল স্ত্রী নিয়ে আটকে পড়তেন, শ্রীরামের দূত হয়ে লঙ্কায় লাফ দিতে গেলে হারেমটি বেহাত হত। বালীর হারেম তো সুগ্রীবকে ভজনা করল বালী মরতে-না-মরতে। হনুমানদের সমাজে গণিকা আছে কি না খবর নিলে ভালো হয়। তাহলে মানব-সমাজের প্যাটার্ন মানব-বিবর্তনের পূর্বেই স্থির হয়ে গেছে বলতে হবে।

বিদ্রোহের কারণ কি নেই? মানুষের ন্যায়-অন্যায় বোধ, দয়ামায়া, কেমন করে সহ্য করবে এ ব্যবস্থা!

ছন্দ-জিজ্ঞাসা

মানুষ যা হয়েছে তা বিদ্রোহ করতে করতেই হয়েছে। প্রকৃতির শাসন মেনে নিলে এত দিন হনুমান হয়ে রইত! মানুষের ছন্দরক্ষা তাহলে বিদ্রোহের অধিকার অব্যাহত রাখা। তার ইতিহাসের প্রতিপৃষ্ঠায় রক্তের দাগ। এটা অকারণ নয়। যখনই যে টুঁ শব্দটি করেছে পালের গোদা তার গলা টিপে ধরেছে, কোনোমতে ছাড়ান পেয়ে সে গোদার বিরুদ্ধে দল পাকিয়েছে, পরে একদিন নিজেই গোদা হয়ে গদিয়ান হয়েছে। তখন তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ।

কিন্তু এই কি সব? মানুষ কি কেবল বিদ্রোহ করেছে, বিদ্রোহের দ্বারাই একপ্রকার ছন্দরক্ষা করেছে? না, না। মানুষ তো শুধু মানুষ নয়, সে সত্তা। সে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র নীহারিকার সাথি। সে চলে অণু-পরমাণুর সাথে তাল রেখে। তাকে ডাক দিয়ে যায় শরতের মেঘ, বসন্তের হাওয়া। সে সাড়া দেয় বাঁশের বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে। গুহার গায়ে হিজিবিজি এঁকে। এমনি করে সংগীতের বিবর্তন, চিত্রকলার বিবর্তন হয়েছে—কাব্যের, ভাস্কর্যের, স্থাপত্যের। আর্ট এইভাবে বিবর্তিত হয়েছে। আর্টের সঙ্গে সংগতি রেখে রিলিজন। কিংবা রিলিজনের সঙ্গে সংগতি রেখে আর্ট।

মানুষকে বিদ্রোহী বললে অর্ধেক বলা হয়, হয়তো অর্ধেকেরও কম। মানুষ যে পরিমাণে পৃথক সে পরিমাণে বিদ্রোহী। যে পরিমাণে অভিন্ন সে পরিমাণে সূর্য নক্ষত্রের ধারাবাহী। তার ছন্দরক্ষা তাদেরই মতো অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য মেনে চলা। হঠাৎ মনে হতে পারে এটা একটা নিরুদ্দেশযাত্রা, কিন্তু সেটা আমাদের ভ্রম। এই বিরাট বিশ্বব্যাপারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আমাদের জ্ঞানবুদ্ধির কাছে নিত্য নিয়ত একটা চ্যালেঞ্জ। রহস্যভেদ করতে কৃতসংকল্প হয়ে আমরা দর্শন বিজ্ঞানের শিখরে উঠেছি। কিন্তু শিখরের পরে শিখর, তার পরে শিখর; একটা আর একটার চেয়ে উঁচু। কবে যে আমরা চরম উচ্চতায় উপনীত হব কেউ বলতে পারে না, বোধহয় কোনোদিনই না। ইনটেলেক্ট দিয়ে যতটা রহস্যভেদ সম্ভব ততটা হবে। সঙ্গে সঙ্গে চর্চা চলবে ইন্টুইশনের। আর্ট, রিলিজন, এসব ইন্টুইশনমার্গী।

বিনুর প্রিয়া তার কণ্ঠে শুনেছিলেন একটা বিদ্রোহের সুর, তাই তাকে ভালোবেসেছিলেন। সে বলল, যাকে তুমি ভালোবেসেছ সে আমার সবটা নয়। আমি কেবল বিদ্রোহী নই। আমি স্রষ্টা। আমি দ্রষ্টা।

দ্বন্দ্ব ও ছন্দ

সে ছান্দসিক। সে সুরসিক। সে সুপুরুষ। ‘জনম কৃতারথ সুপুরুষ সঙ্গ।’ যে তাকে ভালোবাসবে সুপুরুষ বলেই ভালোবাসবে, সঙ্গ চাইবে। তা যদি না পারে, যদি ভালোবাসে একালের পালের গোদাদের দুশমন ও ভাবীকালের পালের গোদা বলে, তবে তার অভিমানে বাজে। এই হতভাগা হনুমানগুলোই কি তা হলে পৌরুষের প্রতিমান? এদের সঙ্গে বলপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এদেরই অনুরূপ হওয়া কি তার জীবনের সার্থকতা? যদি এদেরই অনুরূপ না হয় তবে কী রূপ হবে? অতি হনুমান?

দ্বন্দ্বের যেমন একটা বীরত্বের দিক আছে তেমনি আছে একটা অনুকরণের দিক, হনুকরণের। মানুষ যার সঙ্গে লড়াই করে তারই ধারা ধরে, তারই ধাঁচে গড়ে ওঠে। এটা যে তার আন্তরিক অভিলাষ তা নয়, কিন্তু যুদ্ধে জেতার অপরিহার্য শর্ত। নাতসিদের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ডেমোক্র্যাটরাও নাতসি হয়ে উঠছে না কি?

বিনু অবশ্য তখনকার দিনে অতটা ভাবেনি, অত দেখতে পায়নি। কিন্তু এটুকু সে ভালো করেই বুঝেছিল যে তার প্রিয়া তাকে যা হতে বলেছেন তা যদি সে হয় তবে নিজের মনের মতো হবে না; নিজেকে হারিয়ে বসবে। যে-মানুষ তার আপনাকে হারিয়েছে সে যদি সারা দুনিয়াটা পায় তবে তার এমন কী লাভ? বাইবেলে একথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এটা প্রকারান্তরে উপনিষদেরও জিজ্ঞাসা। যাতে আমাকে অমৃত করবে না তা নিয়ে আমি কী করব? বিনু বিদ্রোহী বটে, কিন্তু সেই তার একমাত্র পরিচয় বা শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়। সে তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়টাই বহন করবে। এর জন্য যদি দ্বন্দ্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হয় তাও সই।

না, সরে দাঁড়াতে হবে না। দ্বন্দ্ব করা যাবে, কিন্তু চোখ খোলা রেখে; জয়ের জন্য সর্বস্ব না দিয়ে। সে বরং একশো বার হারবে, তবু আপনাকে হারাবে না। দ্বন্দ্ব বড়ো নয়, ছন্দই বড়ো। বিশ্বব্যাপারের বৃহত্তর বিধান ছন্দরক্ষা। তার মধ্যে দ্বন্দ্বের স্থান আছে। তার উপরে নয়।

বিনুর দ্বন্দ্ব

বিনুকে অনেক দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু আমরা তার জীবনী আলোচনা করছিনে। তার সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে কোন কোন শক্তি চক্রান্ত করছিল তাদেরই উপর আলোকপাত করছি। যারা সে চক্রান্তে যোগ দেয়নি তাদেরও গায়ে হয়তো আলোর ছটা পড়েছে। সেটা অনিচ্ছাকৃত ও অবান্তর। তা বলে তাদের বাদ দেওয়া যায় না।

দ্বন্দ্ব যে অপরিহার্য বিনু তা মানত না। না মেনে উপায় ছিল না। কিন্তু দ্বন্দ্বের জন্য যে সব দিতে হবে, সব দিতে দিতে আত্মাকেও, কিছুতেই এটা তার সইত না। যা সইতে পারে না তারই বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ যখন তার সহনের অতীত হয় তখন বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহী হয়।

তার বন্ধুরা খোঁচা দিয়ে বলেন সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। সে তা স্বীকার করে নেয়। আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী বললে বোধহয় আরও যথার্থ হত। কী করে যে কেউ তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে পারে বিনুর তা বোধগম্য হত না, এখনও হয় না। আত্মসম্মান বিসর্জন দিক দেখি! তখন সকলে ছি ছি করে উঠবে। কিন্তু আত্মস্বাতন্ত্র্যের বেলা উলটো বিচার।

এই নিয়ে ঠোকাঠুকি বেঁধে যায় তার নিজের বন্ধুদের সঙ্গে। সে যে কোনোদিন দল গড়তে পারে না, দলের একজন হতে পারে না, দলে টিকতে পারে না এটা আশ্চর্য নয়। অথচ দলই তো একালের বলপরীক্ষার পূর্বস্থল। দলের আখড়ায় পাঁয়তারা না কষে কেউ কি আজকাল বাইরের ময়দানে কুস্তি লড়ে? কোনো দলেই যার ঠাঁই নেই কুরুক্ষেত্রে সে একলব্য। একলব্যেরই মতো তার বুড়ো আঙুল কাটা।

বিনুর দ্বন্দ্ব সেইজন্যে নিষ্ফল। একা মানুষের কলম চালনায় কোনো হনুমানের হনু ভাঙে না, তার দাঁত আস্ত থাকে। তাহলেও তাকে এক হাতে লড়াই চালাতে হবে।

বিনুর ছন্দ

আমি স্বতন্ত্র এ যেমন সত্য, আমি অভেদ এও তেমনি। বিশ্বের কেন্দ্র যেখানে সেইখানে আমারও কেন্দ্র। জীবনের কোনো অবস্থায় যেন কেন্দ্রচ্যুত না হই। যেন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত থাকি। বিনু যাকে ছন্দ বলে তার অন্য নাম কেন্দ্রানুগত্য।

সে যতই স্বতন্ত্র হোক-না কেন উৎকেন্দ্রিক নয়। তেমন স্বাতন্ত্র্যের ফল ছন্দপতন। নাচতে নাচতে তাল কেটে গেলে স্বর্গের অপ্সরাদেরও স্বর্গ হতে বিদায়। কবিদেরও কারো কারো জীবনে তাই ঘটে। স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাঁদের মত্ত করে, তাঁরা ভুলে যান যে জগতের কোথাও একটা কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রের প্রতি বিশ্বস্ততার দায় আছে; কেননা সেটা তাঁদের নিজেদেরই কেন্দ্র। এই বিস্মৃতির পরিণাম উৎকেন্দ্রিকতা। সেটা একটা অভিশাপ। অবশ্য শাপমোচনের পথ খোলা থাকে।

বিনুর ছন্দের আদর্শ তখন থেকে একইরকম আছে। প্রেমই তাকে তার ছন্দের আদর্শ দেয়। কিন্তু তার প্রিয়ার এতে ঠিক সহযোগ ছিল না। তাঁর চোখে দ্বন্দ্বের আদর্শই বড়ো ছিল। এত বড়ো যে ওর তুলনায় ছন্দের আদর্শ অকিঞ্চিৎকর। বিনু তাঁকে যত বার বোঝাতে যেত তত বার ব্যর্থ হত। তিনি মনে করতেন বিনু দ্বন্দ্বকাতর বলেই ছন্দের আড়ালে মুখ ঢাকছে। তার হাতে তলোয়ার নেই, আছে শুধু ঢাল। কোনোমতে আপনার চামড়াটি বাঁচানো একটা মহৎ আদর্শ নয়, তেমন করে এ ধরণি নবীন হবে না।

এই আদর্শবিরোধ বিনুর ভিতরেই রয়েছে। দুই আদর্শের ঠোকাঠুকি তাকে বিনিদ্র করেছে; সে নিজেই অনেকসময় বুঝতে পারেনি, বোঝাবে কাকে!

কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এসব কথা বোঝাও যায় না, বোঝানোও যায় না। অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। কবিতার ছন্দের জন্যে যেমন কান তৈরি করতে হয় তেমনি জীবনের ছন্দের জন্যে অন্তঃকরণ।

প্রেমের দ্বারা অন্তরের বিকাশ হয়। বিনুর জীবনে যেদিন প্রেম এল সেদিন এল বিকাশের প্রতিশ্রুতি। এক দিনের কাজ নয়, প্রতিদিনের কাজ। হয়তো একজীবনের নয়, কোটি জীবনের। প্রেমের যেমন সীমা নেই, শেষ নেই, বিকাশেরও নেই চরম। সাহিত্য এই বিকাশের প্রকাশিত রূপ।

প্রেম

প্রেম হচ্ছে সেই রস যা বিশ্ববনস্পতির মূল থেকে ফুল পর্যন্ত প্রবাহিত। আদি রস বললে ভুল বলা হয় না, কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আদিরস, মধ্যরস, অন্ত্যরস, অনাদি ও অনন্তরস। সর্বরস। শুদ্ধরস। রস।

বিশ্বব্যাপারের সঙ্গে যার এমন সম্পর্ক তাকে নিছক জৈব ব্যাপার কিংবা মানবিক ব্যাপার বললে খাটো করা হয়। ছোটোখাটো মানুষেরা সেইরকমই ভাবে। তাদের জীবনযাত্রার সুবিধা-অসুবিধার দিক থেকে ভাবলে

আগুনকেও তেমনি ছোটোখাটো দেখায়—উনুনের আগুন, লণ্ঠনের আগুন, বিড়ির আগুন। তাদের বিশ্বাস হয় না যখন শোনে, সেই একই আগুন জ্বলছে আকাশ জুড়ে তারায় তারায়। জলের স্থলের প্রতি কণিকায়।

কার ঘর কখন পোড়ে তারজন্যে আগুনের মাথাব্যথা পড়েনি, সে তার নিজের নিয়মে চলে। সেটাও একটা নৈতিক বিধান। অনীতি বা দুর্নীতি নয়। গার্হস্থ্য নীতির সঙ্গে তার যদিও স্বতোবিরোধ নেই তবু সবসময় মিলও নেই। মাঝে মাঝে হাতও পোড়ে, কালেভদ্রে ঘরও পোড়ে, কদাচিত মানুষও পোড়ে। সকলে স্বীকার করে যে সেটা স্বাভাবিক। এত দূর স্বাভাবিক মনে করে যে বোমার আগুনে যখন শহর-কে-শহর পুড়ে যায় তখনও আগুনকে দোষ দেয় না। যারা আগুন নিয়ে খেলা করে তাদের নিরস্ত হতে বলে না।

অথচ প্রেমের বেলায় অন্য কথা। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক নীতি অগ্রগণ্য। এর বাইরে বা উপরে যদি কিছু থাকে তবে সেটা দুর্নীতি ও অনীতি। ইহুদি সমাজে লোষ্ট্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল, যিশু এসে বললেন, কে আগে ঢিল ছুড়বে! কে এত নির্মল! অন্যান্য সমাজে আর-কিছু না হোক বহিষ্কারের ব্যবস্থা আছে। অসম্মানের ব্যবস্থা। মোটের উপর মানুষের সমাজে প্রেমের স্বীকৃতি ভয়ে ভয়ে, ডুবে ডুবে, চুপে চুপে। এটা প্রেমের পক্ষে কলঙ্কের নয়, মানুষের পক্ষেই কলঙ্কের।

হ্যাঁ, মানুষ এখনও পিছিয়ে রয়েছে। তার নীতিবোধ এখনও সংকীর্ণ। তাই কথায় কথায় প্রেমকে বলা হয় দুর্নীতি বা অনীতি। আর্টকে বলা হয় ইম্মরাল বা আমরাল। বিনু এটা মানে না, মানতে পারে না, কারণ সেএকটা বৃহত্তর নীতির আভাস পেয়েছে। তাতে বিপদ আছে, কিন্তু বিপদ বরণ করাই তো মনুষ্যত্ব।

প্রেমের গুরু

বিনুর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব এই প্রথম নয়। কিন্তু এবার যে এল সে আগুন। এমন প্রচন্ড দাবি তার কাছে কেউ কোনোদিন করেনি। এই দাবির প্রচন্ডতা তাকে পুরুষ করে তুলল। মানুষ করে দিল। সে দায়িত্ব নিতে, বিপদ বরণ করতে শিখল।

প্রেমের রাজ্যে এতদিন তার পথপ্রদর্শক ছিলেন চন্ডীদাস ও দান্তে। চন্ডীদাসের মতো সেও একদিন সহজিয়া হবে, উত্তমা নায়িকার সঙ্গলাভ করবে, নায়িকার মধ্যে দেবতাকে পাবে। ‘এই মানুষে আছে সেই মানুষ।’ ভালোবাসতে জানলে এই মানুষের মধ্যেই সেই মানুষকে ভালোবাসা যায়। যারা ভালোবাসতে জানে না তারাই মানুষকে ফেলে মূর্তিপূজা করে, তীর্থে তীর্থে বেড়ায়, হিমালয়ে অদৃশ্য হয়। বিনুর ভগবান উত্তমা নায়িকা। সে সহজিয়া।

তারপর দান্তের প্রভাব পড়ল তার জীবনে। তখন সে ভাবল, ইহলোকে হয়তো তার বিয়াত্রিসের সঙ্গসুখ পাবে না। কিন্তু ইহলোক আর কতটুকু! মৃত্যুর পরে একদিন তার বিয়াত্রিস তার সঙ্গিনী হয়ে তাকে ধন্য করবে, তাকে নিয়ে যাবে তারা হতে তারায়, লোক হতে লোকান্তরে, স্বর্গ হতে বৈকুণ্ঠে। তাকে পৌঁছে দেবে দেবতার চরণপ্রান্তে। দুজনে মিলে বন্দনা করবে তাঁকে। নারীর হাতেই দেবমন্দিরের চাবি। নারীর করুণা হলে দেবতার করুণা। মধ্যযুগের ইউরোপীয় কবিদের মতো বিনুর মনে হতে লাগল সেও একজন ত্রুবাদুর (troubadour)। সে আর নারীকে ইহলোকের জন্যে চাইল না, দূরে দূরেই রাখল।

দূরের মানুষ যে এই জীবনেই আপনি এসে তার কাছে টানবে এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। কেমন করে তার হাতে পড়ল সুইডিশ লেখিকা এলেন কেই-র লেখা *প্রণয় ও পরিণয়*। তখন থেকে তিনিই হলেন তার পথপ্রদর্শক। সক্রেটিসের যেমন ডিওটিমা, বিনুর তেমনি এলেন। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন বিনু ইউরোপে গিয়ে তাঁর কাছে পাঠ নিত।

পরম প্রেম

এলেন কেই (Ellen Key) বিনুর মতো জিজ্ঞাসুদের জন্যে লিখে গেছেন :

> The power of great love to enhance a person's value for mankind can only be compared with the glow of religious faith or the creative joy of genius, but surpasses both in universal life-enhancing properties. Sorrow may sometimes make a person more tender

> towards the sufferings of others, more actively benevolent than happiness with its concentration upon self. But sorrow never led the soul to those heights and depths, to those inspirations and revelations of universal life, to that kneeling gratitude before the mystery of life, to which the piety of great love leads it.

পরবর্তী জীবনে বিনুর ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল করেছে; কিন্তু প্রেমে বিশ্বাস অটল রয়েছে। প্রেমের বিশ্বাস দৃঢ় থাকায় একে একে দৃঢ় হয়েছে আর্টে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস। শক্তি সবচেয়ে প্রেমেরই বেশি। বিনু তার সাক্ষী।

> How can Love, one of the great lords of life, take its freedom from the hands of society any more than Death, the other can do so?... Love and Death...only these two powers are comparable in majesty.

একথাও লিখে গেছেন তিনি বিনুর মতো বিশ্বাসীদের জন্যে।

প্রেম বনাম সমাজ

বিশ্বের মূলনীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে নর-নারীর প্রেম নীতিসম্মত, সমাজের সম্মতি থাক বা না থাক। তাকে কাম বলে ধিক্কার দিয়ে লাভ নেই, কেননা বিশ্বের মূলনীতি তার স্বপক্ষে। আর ধিক্কার শুনে কেউ কোনোদিন বিরত হয়নি, যদি-না ইতিমধ্যে অবসাদ এসে থাকে।

কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারে অনেকসময় দাম্পত্যপ্রেমও ভর্ৎসিত হয়। কারণ তাতে গুরুজনের সেবাযত্নের ত্রুটি ঘটে। বিবাহের বাইরে যে প্রেম তার নিন্দা সকলের মুখে। কেননা তার দরুন সমাজে বিশৃঙ্খলা জন্মায়। সামাজিক প্রেম গুরুজনের মনঃপূত না হলেও তাকে দুর্নীতি বলার সাহস নেই কারও। কিন্তু অসামাজিক প্রেমকে দুর্নীতি বলতে সাহসের অভাব হয় না, তাই ওটা দুর্নীতি। সকলেই যখন একমত তখন দুটি মাত্র মানুষের প্রতিবাদে কী আসে যায়!

বিনুর মনটা সমাজের বিরুদ্ধে রুখে রয়েছিল তখনকার দিনে। যে সমাজ নারীকে সতী আখ্যা দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে একশো বছর আগে, তার নীতিবোধের উপর বিনুর ভরসা ছিল না। ইংরেজরা চলে গেলে সতীদাহপ্রথার পুনঃপ্রবর্তন হবে না, কে একথা জোর করে বলতে পারে! ইংরেজরা বহুবিবাহ করে না বলে ইংরেজি শিক্ষিতরাও করছে না। কিন্তু সামান্য একটু ছুতো পেলেই আর একটা বিয়ে করতে বাধে না। মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না দেখে খবরের কাগজে বহুবিবাহের জন্যে হা-হুতাশও ছাপা হয়।

তারপর এক এক সমাজের এক এক রীতি। মুসলমান সমাজে তালাক চলে, তিব্বতে এক নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণ। বর্মায় বিবাহের বাঁধাবাঁধি নেই, মালাবারে ক্ষত্রিয় কন্যাদের নামমাত্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একই আসরে ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বিচিত্র সংসার! বিচিত্রতর সংস্কার।

এ সমস্ত দেখেশুনে বিনুর ধারণা দৃঢ় হয় যে, সমাজের বিচারে যা দুর্নীতি তা নিরপেক্ষ বিচারে সুনীতি হতে পারে। নিরপেক্ষ বিচারক সামাজিক মানদন্ড নির্বিবাদে স্বীকার করে নেন না। তাঁর মানদন্ড বৃহত্তর বিশ্বের মূলনীতির মানদন্ড। মূলনীতিও বটে, স্থির নীতিও বটে। তার নড়চড় হয় না।

স্থির নীতি

স্থির নীতি বলে অস্থির জগতে কিছু আছে কি না বিনু দীর্ঘকাল অন্বেষণ করেছে। থাকবে না কেন? চক্রের সবটাই কি অস্থির! যেটা তার কেন্দ্র সেটা কি ঘোরে! গতি যেমন সত্য স্থিতিও তেমনি। তা যদি না হত গতি কোনদিন ফুরিয়ে যেত।

বিনু জড়বাদী বা বস্তুবাদী নয়, যদিও প্রচলিত অধ্যাত্মবাদেও তার অভক্তি। সে বিশ্বাস করে যে ভালো-মন্দ ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি নৈতিক শক্তিও এ জগতে কাজ করছে, যদিও তাদের কেউ দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখতে পায় না, যদিও তাদের কোনো ওজন বা পরিমাণ নেই। তাদের অস্তিত্ব অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায় না, তবু তারা আছে ও আমাদের জীবনের আলো-আঁধারের ছক কাটছে।

একজনের পক্ষে যা ভালো আর একজনের পক্ষে তা ভালো নয়। এই যুক্তি দিয়ে স্থান-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ মঙ্গলকে উড়িয়ে দিতে বিনু পারে না কিংবা স্থান-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ ন্যায়কে। অথচ প্রমাণ করাও তার সাধ্যের অতীত। যার নীতিবোধ জাগেনি সে কিছুতেই বুঝবে না। যার নীতিবোধের চেয়ে স্বার্থবোধ প্রবল সে বুঝেও বুঝবে না। তা বলে কবিরা যদি সন্দিহান হন তবে গ্রিক ট্র্যাজেডি নিরর্থক, রামায়ণ মহাভারত তাৎপর্যহীন। বিনু অবশ্য ইঙ্গিত করছে না যে, ন্যায়ের জয় বা মন্দের ক্ষয় প্রতিপাদন করতে হবে। প্রতিপাদন করা কবিদের কর্ম নয়, কিন্তু জগতে যেমন প্রকৃতির লীলা চলেছে তেমনি নিয়তির খেলা চলেছে, কবিরা তার সাক্ষী। এত বড়ো একটা দৃশ্য যাঁর চোখে পড়েনি তিনি মহাকবি হবার অযোগ্য।

সত্য-অসত্য প্রেম-অপ্রেম—এরাও নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক শক্তি। এদের ঘাত-প্রতিঘাত যেকোনো ডিটেকটিভ নভেলকে হার মানায়, যদি লিপিবদ্ধ হয়। কোনো নাট্যকার কি এদের উপেক্ষা করতে পারেন? কিন্তু প্রচারকের মনোবৃত্তি নিয়ে নাটক বা নভেল লিখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। সেই করেই তো লোকের বিশ্বাস নাশ করা হয়েছে। এখন হয়েছে উলটো ফ্যাসাদ। লোকের বিশ্বাস হয় না বলে কবিদের চোখে পড়ে না। যাঁদের পড়ে তাঁদেরও তটস্থ ভাব, পাছে কেউ বলে প্রচারক। তার চেয়েও বড়ো গালাগাল আদর্শবাদী।

আধ্যাত্মিকতা

বিনু যখন নীতিনিপুণদের খোঁচায় তখন নীতি জিনিসটাকে উড়িয়ে দেয় না। নীতি বলতে বিনু বোঝে উচ্চতর নীতি, দেশ-কাল-পাত্রনিরপেক্ষ। আর তাঁরা বোঝেন দেশাচার, কালাচার; সমাজরক্ষকদের মতে যেটা শিষ্টাচার। যে-দেশে যাই সে-ফল খাই, এ যদি একটা নীতি হয় তবে মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু, লোষ্ট্রবৎ নিশ্চয়ই এক জোড়া নীতি। রাজনীতি যদি নীতি হয় তবে সমাজনীতি কী দোষ করল? রণনীতি যদি নীতি হয়, শস্ত্রনীতি যদি নীতি হয়, তবে শাস্ত্রনীতিও তাই।

কিন্তু উচ্চতর নীতির মধ্যে একটা দ্বৈতভাব আছে, সেটা বিনুকে ব্যাকুল করে। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, প্রেম-অপ্রেম, আলো-ছায়া। কেন এ দ্বৈত? এর উত্তর—এইরকমই হয়ে থাকে, 'ইহাই নিয়ম।' কার নিয়ম? কে তিনি?

তিনি বা তৎ, সগুণ ভগবান বা নির্গুণ ব্রহ্ম দুই নন, এক। সেই এক আমাকে নিয়েই এক, আমার থেকে আলাদা হয়ে নয়। সেই একের মধ্যে সব আছে। সবই এক, একই সব। এ দুটি শব্দ সমার্থক। যখন বলি এক, তখনই বুঝি সব। সবাইয়ের থেকে আলাদা হয়ে এক নয়।

সেই এক-কে যদি হিসাবের মধ্যে আনি তবে এই বিশ্বরহস্যের অর্থ এক নিমেষে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর তাঁকে যদি বাদ দিই তবে এ ধাঁধার জবাব খুঁজে পাইনে। এর জবাব না পেয়ে শান্তি নেই। বিনুকে মহা অশান্তির ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে। সাংসারিক অশান্তি নয়। আধ্যাত্মিক অশান্তি; যাকে বলে স্পিরিচুয়াল আনরেস্ট। সমস্তক্ষণ ভয়াবহ অনিশ্চয়তা—আত্মা আছে কি না, থাকলেও অমর কি না, অমৃতের অধিকারী কি না? সার্থকতা যদি এক জীবনে না জোটে অন্য জীবনে কি জুটবে? এ জীবনে যে কিছুই পেল না তার অপ্রাপ্তিই কি চরম? এমন কি হতে পারে যে না পাওয়াটাই একপ্রকার পাওয়া, যাতে হৃদয় ভরে? অপূর্ণতাই কি পূর্ণতা?

এমনি কত কথা।

আদর্শবাদী

বাস্তববাদী হয়ে সুখ না থাক, সোয়াস্তি আছে। বাস্তববাদীকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না; না পরের কাছে না নিজের কাছে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন এত দুঃখ, কে এত কু? তিনি উত্তর করবেন, আমি কী করে বলব? শুধাও তোমাদের ভগবানবাবুকে! আমি যেমনটি দেখেছি, তেমনটি দেখিয়েছি।

অনেকের ধারণা সাম্যবাদীরা বাস্তববাদী। কিন্তু তাঁরাও তলে তলে একপ্রকার আদর্শবাদী। তাঁরা যেমনটি দেখেন তেমনটি দেখিয়ে হাত গুটোন না। তাঁরা বলেন, এ যা দেখছ সব ক্যাপিটালিজমের কারসাজি। ক্যাপিটালিজম তুলে দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে আদর্শবাদীদের জবাবদিহির দায় অত সহজে মেটে না। সব ঠিক হয়ে গেলেও সব জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। মানুষ তো কেবল সুখ সুবিধায় তৃপ্ত হবে না। 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।' ক্যাপিটালিস্টরা যখন অপসারিত হবে, সোশ্যালিস্টরা যখন নিষ্কণ্টক হবেন, তখন সেই আদর্শ সমাজে এমন প্রশ্ন একদিন উঠবেই, মৃত মনুষ্য সম্বন্ধে এই যে এক সন্দেহ আছে—কেউ কেউ বলেন, 'আছে', কেউ কেউ বলেন, 'নেই'—আমি তোমার কাছে এই বিষয় জানতে চাই, আমার বরের মধ্যে এইটি তৃতীয় বর। তখন নচিকেতাকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বাস্তববাদীরা তাকে হাঁকিয়ে দেবেন। আর লোকায়তবাদীরা তাকে লোভ দেখাবেন, শতবর্ষায়ু পুত্র-পৌত্র প্রার্থনা করো, বহু পশু হস্তী স্বর্ণ অশ্ব এবং বৃহদাকার ভূমি প্রার্থনা করো এবং স্বয়ং যত বৎসর ইচ্ছা জীবনধারণ করো। যদি অন্য কোনো বর এর সমতুল্য মনে করো, যথা বিত্ত এবং চির জীবিকা, তাও প্রার্থনা করো। তুমি প্রশস্ত ভূমিখন্ডের উপর রাজা হও, তোমাকে সব কামনার কামভাগী করব। কিন্তু নচিকেতার সেই একই কাম্য। সে চায় তার প্রশ্নের উত্তর।

তখন ডাক পড়বে আদর্শবাদীদের। যাঁদের কাছে আছে ওর সম্পূর্ণ উত্তর। এ কি কখনো হতে পারে যে দুশো কোটি মানুষের মেলায় এমন এক জনও থাকবেন না যাঁর কাছে থাকবে উপযুক্ত উত্তর! সাহিত্যের তরফ থেকে ওরূপ জিজ্ঞাসার অন্তত আংশিক জবাব দিতে হবে বিনুকে।

দায়িত্ব

তখন থেকেই বিনু দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত হচ্ছে। শুধু ওই একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার দায়িত্ব নয়, জীবন সম্পর্কে যার মনে যে কৌতূহল জাগে সে-কৌতূহল নিরাকরণের। ধার্মিকের বা দার্শনিকের মতো নয়, কবির বা সাহিত্যিকের মতো। উপনিষদ বা গীতা লিখে নয়, মহাভারত বা রামায়ণ লিখে। তা যদি না পারে তবে পদাবলি ও গীতিকা লিখে। তাও যদি না পারে তবে ছড়া ও বচন লিখে।

সেইজন্যে সে কারুর কোনো জিজ্ঞাসায় নিরুত্তর থাকে না। ঠিক হোক ভুল হোক যা হয় একটা জবাব দেয়, তারপর আরও ভাবে। তার মুখে মুখে জবাব শুনে এক বন্ধু তাকে পরিহাস করেছিলেন। বলেছিলেন, কবে এত মুখস্থ করলে? কোথায় পেলে এসব?

এত বড়ো দায়িত্ব যার সে যদি চুরি করে মুখস্থ করে থাকেই, তাতে কী? তাতে তার লজ্জা নেই, লজ্জা নিরুত্তরতায় অথবা সিনিকের মতো ব্যঙ্গবিদ্রূপে—যাও, সুধাও গে তোমাদের ভগবানবাবুকে।

মানুষের বিরুদ্ধে তার হাজার নালিশ, কিন্তু ভগবানের বিরুদ্ধে একটিও নয়। মাঝে মাঝে সে নাস্তিক হয়েছে, তার মনে হয়েছে ভগবান নেই। যিনি নেই তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করার কথা ওঠে না। অরণ্যেরোদন করা, মানুষের কাছে কাঁদুনি গেয়ে বেড়ানো যেমন হাস্যকর তেমনি নিষ্ফল। ব্যঙ্গবিদ্রূপও একপ্রকার রোদন।

তার চেয়ে মহিমা বেশি এগিয়ে গিয়ে দায়িত্ব নেওয়ার। এ বিশ্ব যেমনই হোক আমি একে স্বীকার করলুম। আমিই আমার আপন হস্তে গ্রহণ করলুম এর ভার। এ যদি আমার মনের মতো না হয় কার কাছে অভিযোগ করব! না, আমার কোনো অভিযোগ নেই বিধাতার বিরুদ্ধে। আমি যে দায়িত্বভোগী। আমি যে সৃষ্টিকর।

বাপ তার কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখে। বাপের চোখে সে তাই। এ বিশ্ব হাজার কুৎসিত হোক সৃষ্টিকরের চোখে সর্বাঙ্গসুন্দর। কালোর মধ্যেও সে আলোর দিশা পায়, মন্দের মধ্যে ভালোর।

সংকট

একদিকে অন্তহীন অনিশ্চয়তা, অন্য দিকে সীমাহীন প্রত্যয়। বিনু মন দিয়ে বুঝতে পারত না কী আছে কী নেই। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত সব আছে, এক আছেন। বুদ্ধি বলত, নেতি নেতি। স্বজ্ঞা বলত, ইতি ইতি। দর্শন বিজ্ঞান তাকে শেখাত ক্রিটিক্যাল হতে। কাব্য ও প্রেম শেখাত ক্রিয়েটিভ হতে। ক্ষুরধার পন্থা। কোনো এক দিকে একটু হেলান দিলেই অপঘাত। দায়িত্বের জন্যে প্রস্তুত হওয়া চলেছে, অথচ সংশয়মোচন হচ্ছে না। তখনকার দিনে অর্থাৎ তার বাইশ-তেইশ বছর বয়সে কেউ যদি তাকে দরদ দিয়ে চিনত তাহলে একই দেহে দেখত দুজন মানুষকে। দুজনেই বিনু কিন্তু দুজনের দুই মার্গ, দুই স্বভাব, দুই সাধনা।

এ দুজনকে তফাত থেকে অনাসক্ত ভাবে দেখত আরও একজন বিনু। সে কোনো পক্ষে নয়, অপক্ষপাত। তার দেখার ধরন বৈজ্ঞানিকের মতো বিষয়মুখ বা অবজেকটিভ। অথচ যাদের দেখছে তারা তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, পৃথক নয়। তাই তার দেখাটা প্রকৃতপক্ষে আত্মমুখ বা সাবজেক্টিভ। সে তার আপনাকেই দেখত নাটকের বা উপন্যাসের দুটি চরিত্ররূপে। চরিত্র দুটি সে নিজেই। কিন্তু তাদের উপর তার কোনো হাত নেই। সে শুধু সাক্ষী এবং লিপিকর। লিপিকরপ্রমাদ যদি ঘটে তো তার অজ্ঞাতসারে। ঘটা বিচিত্র নয়, কারণ চরিত্র এবং চরিতকার একই ব্যক্তি।

এমনি করে বিনু কবি থেকে ঔপন্যাসিক হয়। কিন্তু তখনকার দিনে জানত না যে ঔপন্যাসিক হওয়া অনিবার্য। উপন্যাস লেখার সাধ অবশ্য ছিল মনের এক কোণে। সেটা যেন আকাশে ওড়ার সাধ, এরোপ্লেনে চড়ার। সমুদ্রযাত্রার অনিবার্যতা ছিল না তাতে, ছিল কাব্যরচনায়। কী করে যে কী হল, পরবর্তী জীবনে ঔপন্যাসিক এগিয়ে গেল সামনে, কবি পড়ে রইল পিছনে। তেইশ বছর বয়সে এরকম কোনো কথা ছিল না কিন্তু অলক্ষে এর জন্য প্রস্তুত হওয়া চলছিল। প্রস্তুতির সময় বোঝবার উপায় নেই কীসের প্রস্তুতি ও কেন। বিনুর জীবনে এমন অনেক বার ঘটেছে—সে কখন কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে তা টের পায়নি, পরে তার প্রস্তুতির মর্ম অবগত হয়েছে।

তখনকার দিনে তার আভ্যন্তরিক সংকট তাকে দারুণ কষ্ট দিয়েছে। এত কষ্ট যে ক্ষুধা তৃষ্ণাও মানুষকে তত কষ্ট দেয় না।

কথক

ঔপন্যাসিক শব্দটা বিদঘুটে, তার চেয়ে কথক ভালো। বিনু যা হয়েছে তার নাম কথক। কবির সঙ্গে তার তলে তলে যোগ রয়েছে, যেমন নদীর সঙ্গে হ্রদের। সেকালে গদ্য ছিল না, পদ্য ছিল কবি ও কথক উভয়েরই বাহন। বাল্মীকি যেদিন নিষাদকে অভিশাপ দিয়েছিলেন সেদিন ছিলেন কবি, যেদিন রাম সীতা রাবণের তিনকোনা কাহিনি লিখলেন, সেদিন হলেন কথক। কিন্তু পদ্যে লিখলেন আর কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করার পর লিখলেন তাই কথক বলে চিহ্নিত হলেন না; কবি বলেই অমর হলেন।

কিন্তু ব্যাসদেবকে কবি না বলে কথক বললে অসংগত হয় না, কারণ তিনি গদ্যের অনুপস্থিতিতে পদ্য দিয়ে কাজ চালিয়েছিলেন, গদ্যের চল থাকলে পদ্যের শরণ নিতেন না। একালের কথকরা সেকালে জন্মালে এক একজন কবি বলে গণ্য হতেন। কালক্রমে গদ্যের প্রবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে বলে তারা এখন কথক বলে পরিচিত। গদ্যের দ্বারা যে কাজ সহজে হয় সেই কাজ যদি কোনো কথক পদ্যের দ্বারা করাতে যান তবে যে তিনি সত্যি সত্যি কবি হবেন তা নয়, ওটা তাঁর ভ্রান্তি।

কাব্য প্রধানত আত্মমুখ। নাটক উপন্যাস বিষয়মুখ। একই ব্যক্তি এক বয়সে আত্মমুখ ও অপর বয়সে বিষয়মুখ হতে পারেন, হয়ে থাকেন। কেউ কেউ একই বয়সে দ্বিমুখ। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে নাটক উপন্যাসের প্রভেদ সেকালে যেমন ছিল একালেও তেমনি। কাহিনিকে পদ্যের রীতি মানালেই তা কবিতা হয়ে যায় না। কবিতাকে গদ্যের রীতি ধরালেও তা কবিত্বহীন হয় না। তবে গাছের সঙ্গে পাখির যেমন সহজ সম্পর্ক খাঁচার সঙ্গে তেমন নয়। সেইজন্যে পদ্যে কবিতা লেখার রীতি আবহমান কাল চলে আসছে ও চলতে থাকবে। কদাচিৎ এক-আধ জন কবি খাঁচায় পাখি পোষার মতো গদ্যে কবিতা লিখবেন। আর নাটক উপন্যাস এত কাল পরে তাদের উপযুক্ত আশ্রয় পেয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর গাছে গাছে বিচরণের পর মানুষ বেঁধেছে তার কুঁড়েঘর, এরপরে কেউ যদি গাছের ডালে শোয় তো শখ করে। পদ্যে নাটক বা গল্প লেখা একটা শখ।

অনিবার্যতা

বিনুর প্রাণে শখ নেই তা নয়। সে শৌখিন লোক। কিন্তু লেখা জিনিসটার পিছনে অনিবার্যতা থাকলে যেমন হয় শখ থাকলে তেমন নয়। যা অনিবার্য তাকে সাহায্য করছে সমস্ত প্রকৃতি, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি। যে শক্তি ক্রিয়া করছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে, সেই শক্তিই সাহিত্যসৃষ্টির মূলে। মানুষের ভিতর দিয়ে ক্রিয়া করছে বলে মানুষ

তাকে নিজের শক্তি ভেবে আত্মপ্রসাদ পায়। কিন্তু সে-শক্তি যদি কোনো কারণে অসহযোগ করে, মানুষের প্রাণে হাজার শখ জাগলেও লেখা তেমন জোরালো হয় না, হতে পারে না।

কিন্তু অনিবার্যতার অর্থ সম্পাদকের তাগিদ কিংবা অভাবের তাড়না নয়। বিনু তার দয়িতাকে চিঠি লিখত প্রেমের দায়ে। পাঠক-পাঠিকাদের চিঠি লেখে প্রবন্ধ বা কাহিনি আকারে, প্রীতির দায়ে। কোনোদিন তাঁদের চোখে দেখবে না; তাঁদের কেউ ভারতবর্ষে কেউ রাশিয়ায়; কেউ বিংশ শতকে কেউ দ্বাবিংশ শতকে; তবু তার প্রীতির দায় সত্য। সেই অনিবার্যতা তাকে শক্তি জোগায়। সবসময় নয়, কেননা তার অনেক লেখা প্রীতির দায়ে নয়, মত জাহির করার ঝোঁকে; কতক লেখা নামের নেশায়। কিছু লেখা নূতনত্বের মোহে, আধুনিকতার কুহকে। বাকি লেখা শখের খাতিরে, খেয়ালের বশে।

সাহিত্যের ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে, শখের লেখা বা খেয়ালের লেখা অমর হয়েছে, অনিবার্য লেখা দাগ রেখে যায়নি। কাজেই এ বিষয়ে গোঁড়ামি ভালো নয়। কোনো বিষয়েই নয়। কে জানে কী টিকবে, কী টিকবে না! মহাকালের মনে কী আছে! রচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃস্পৃহ হওয়াই বিজ্ঞতা, যেমন সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। তা বলে উদাসীন হওয়া অনুচিত। সংকল্প করতে হবে, সাধনা করতে হবে, প্রীতির দেনা শোধ করতে হবে। তা যদি কেউ করে তবে প্রকৃতি সাহায্য করবে, বিধাতা করবেন। কাজটা তো তাঁদেরই। মানুষের সৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টিরই অঙ্গ।

বিনু সাধারণত অনিবার্য না হলে লেখে না। বাঁচবে কখন যদি দিনরাত লেখে! কিন্তু প্রেরণা পেলে দিনরাত না লিখে শান্তি নেই, মুক্তিও নেই।

পুরস্কার

এর কি কোনো পুরস্কার আছে? একজন যুবক তার যৌবন ক্ষয় করছে ভালো-মন্দ লিখে। যৌবন কি আর ফিরবে? যৌবনের কি কোনো ক্ষতিপূরণ সম্ভব? ধন মান যশ কি তার বিনিময়? অমরত্ব?

না, তাও নয়। দেবতাদের অমরত্বের সঙ্গে অজরত্ব ছিল, না থাকলে নিছক অমরত্ব তাঁদের বিস্বাদ লাগত। বিনু কি শুধু অমরত্ব চেয়েছে? সে চেয়েছে অমৃত, যা পান করে দেবতারা অজর তথা অমর। কে তাকে তেমন কোনো পুরস্কার দেবে?

প্রেমের প্রতিদানে প্রেম? প্রীতির প্রতিদানে প্রীতি? না, তেমন পুরস্কার সে প্রত্যাশা করতে পারে না। সে যা দিচ্ছে তা দায়ে পড়ে। কেউ যদি তারই মতো দায়ে পড়ে দিতেন সে নিত, নিয়ে কৃতার্থ হত। কিন্তু অত বড়ো পুরস্কার প্রত্যাশা করা যায় না। ও তো পুরস্কার নয়, সৌভাগ্য।

বিনু বলে, এই যে আমি আপনাকে পাচ্ছি এই আমার পুরস্কার। আমার পুরস্কার আত্ম-আবিষ্কার। এর জন্যে একটা দিনও অপেক্ষা করতে হয় না। একটা যুগ তো দূরের কথা, যে মুহূর্তে লিখি সেই মুহূর্তে পাই। হাতে হাতে লাভ, নগদ বিদায়।

এই আমার যৌবনের ক্ষতিপূরণ। এও সেই যৌবন। বিশ্বপ্রকৃতির নিত্যযৌবনের প্রবাহ আসে এই উৎস হতে। তিনিও আপনাকে অনবরত দিচ্ছেন, অনবরত পাচ্ছেন, পেয়ালা তাঁর উপুড় হয়েই ভরে উঠছে। শূন্য হলেই পূর্ণ হয়। যার উড়িয়ে দেবার সাহস আছে তার ফুরিয়ে যাবার শঙ্কা নেই। যে ধরে রাখে সেই হারায়।

বিনু বলে, আমি যেন একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেখান থেকে সোনা এনে দু-হাতে বিলিয়ে দিচ্ছি। যত দিচ্ছি তত পাচ্ছি। যেদিন দিইনে সেদিন পাইনে। সঞ্চয় করলেই বঞ্চিত হই। যেদিন ভাবি, আমি দেদার দিয়েছি, আমার দানের ইয়ত্তা নেই, সেদিন আমার বয়স বেড়ে যায়—ভাঁড়ারে সোনা বাড়ন্ত। যেদিন ভাঁড়ার খালি করে বিলিয়ে দিই সেদিন দেখি আপনি ভরে উঠেছে, আমার তারুণ্য ফিরে এসেছে।

'আপনাকে এই পাওয়া আমার ফুরাবে না।' জীবনেও না, মরণেও না। এই অন্তহীন পূর্ণতার নাম অমৃত। বিনু বলে, এই আমার পুরস্কার।

ভাঙন

ওদিকে বিনুর প্রেমে ভাঙন ধরেছিল। যা সে কল্পনা করতেও অক্ষম ছিল তাই বাস্তবিক ঘটল। প্রেম তার নিজের নিয়মে আসে, নিজের নিয়মে যায়। কাউকে দোষ দিয়ে কী হবে? দোষ যদি দিতে হয় তবে নিয়তিকে।

এই অঘটনের জন্যে বিনু কিংবা তার প্রিয়া প্রস্তুত ছিলেন না। দুজনেরই স্বপ্নভঙ্গ হল। এটা অবশ্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ নয়। কাব্য লেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। চিঠিতে রইল না চিঠি লেখার আনন্দ। আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে দায়েরও বিদায়। অনিবার্যতা অন্তর্হিত হল।

যে মানুষ তিন বছর ধরে অবিরাম লিখে আসছে সে কি চুপ করে বসে থাকতে পারে! সে তার শূন্যতা ভরিয়ে নেয় পূর্ণতা দিয়ে—অন্তরের পূর্ণতা।

বিনু দেখল তার অন্তর পূর্ণ, আনন্দে না হোক অনির্বচনীয় বিষাদে। তার প্রেম তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। আর কিছু করবার নেই। এখন তার ছুটি। সে লিখবে। চিঠি নয়, কবিতা-প্রবন্ধ-কথা।

কিছুদিন পরে সে ইউরোপে যাবার ছাড়পত্র পেল। আর একদফা মুক্তি। এতকাল পরে তার বহুবাঞ্ছিত বিদেশযাত্রা। ছ-বছর সবুর করার পর মেওয়া ফলল। আশা ছিল না যে ফলবে। এক স্বপ্ন ভেঙে গেল, আর এক স্বপ্ন জোড়া লাগল। নিয়তি তাকে এক চোখে কাঁদাল, আর এক চোখে হাসাল। বিষাদের মেঘ, আনন্দের রৌদ্র—তার লেখনী দিয়ে সে ব্যক্ত করবে দুই-ই। লিখবে কবিতা, প্রবন্ধ, কথা। লিখবে ভ্রমণকাহিনি। লিখবে সকলের তরে, প্রীতি ভরে।

এমনি করে বিনু তার নিজেকে পেল। আবিষ্কার করল আপনাকে। তার অন্তর পূর্ণ। তার কিছুরই অভাব হল না—ভাষার, ছন্দের, বিষয়ের, কল্পনার, অনুভূতির। কে জানে কোথায় ছিল তার মোহিনীশক্তি বা চার্ম। বোধহয় প্রেমের প্রয়োজনে এর উদ্ভব হয়েছিল সাগরমন্থনে, রসের সাগর। এ শক্তি তার সাহিত্যের প্রয়োজনে লাগল।

যাত্রা

মানুষের জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা আপনাকে পাওয়া। লেখকের জীবনে এর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। লেখক আপনাকে পায় আপনাকে বিলিয়ে।

বিনুর মনে হল, কোনোদিন কোনো অবস্থায় তার পূর্ণতার অভাব হবে না। দুর্ভিক্ষে রাজদ্বারে শ্মশানেও তার পূর্ণতা সমান অফুরন্ত। তখনও তার লেখা আপনি আসবে ভিতর থেকে। সে লিখবে কাব্য, নাটক, উপন্যাস। যেকোনো অবস্থায় পড়ুক সে তার অন্তরের খনি থেকে সোনা তুলে এনে ছড়াবে। সংসার তাকে জব্দ করতে পারবে না। তাকে স্তব্ধ করতে পারে এমন ক্ষমতা সম্পাদকের নেই, প্রকাশকের নেই, সমালোচকের নেই, সেন্সরের নেই, আর কারও নেই, আছে একমাত্র তার নিজের।

এমনই এক গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ক্ষমতাবোধ নিয়ে বিনুর যাত্রা শুরু। সমুদ্রযাত্রা তথা সাহিত্যযাত্রা।

এবার কলকাতা নয়, বম্বে। জাহাজ দাঁড়িয়েছিল তাকে অকূলে নিতে। দুরুদুরু করছিল বুক মায়ের কোল ছাড়তে। জননী জন্মভূমির দিকে ফিরে ফিরে তাকায় আর সজল হয় তার দৃষ্টি। যেদিকে তাকায় সেদিকে দেখতে পায় আরও এক জোড়া চোখ, সজল কাজল। শেষ বিদায় তো নেওয়া হয়ে গেছে। তবে কেন মায়া!

জাহাজ যখন দুলল বিনুর বুকও দুলে উঠল। এতক্ষণে চলল তার তরি; তার জীবনের তরি, তার সাহিত্যের তরি। চলল তার দেখা, চলল তার লেখা। ডেক থেকে ভিতরে গিয়ে সে চিঠির কাগজ নিয়ে বসল। এবার কিন্তু চিঠি নয়, ভ্রমণকাহিনি কবিতা।

দেশে তখন সাত ভাই সাইমন এসেছেন বা আসছেন। কিন্তু বিনুর কাছে দেশ তখন ছায়া। বিদেশও তাই। মাঝখানে বিশাল সিন্ধু। বিষাদ সিন্ধুও বটে। তার যেন কোথাও কেউ নেই, সে সর্বহারা। জাহাজে যারা আছে তারা দু-দিনের সাথি। দু-দিন পরে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, যার যেখানে কাজ। একমাত্র বিনুই চলবে কালের তরিতে করে মহাকালের কূল থেকে অকূলে।

শেষ

শেষ নয়, অশেষ। তবু এখনকার মতো শেষ।

বিনু, তোমার কথা তো সারা হল, এবার আমার কথা বলি। তোমার মনে রাখার জন্যেই বলা—তোমার মতো আরও অনেকের।

বিশ্ব তার আনন্দ বেদনা নিঃশব্দে বয়, তার মুখে ভাষা নেই। মানুষের মুখে ভাষা আছে বলে মানুষ বড়ো গোলযোগ করে। সে যদি মাঝে মাঝে নীরব হত শ্রোতাদের প্রাণ শীতল হত। যাঁদের লেখনীর মুখে ভাষা আছে তাঁরাও যদি নীরব হতে জানতেন তবে সাহিত্য আজ মেছোহাটা হয়ে উঠত না।

‘যেমন চলার অঙ্গ পা তোলা পা ফেলা’ তেমনি বলার অঙ্গ বলা ও না-বলা। যত বলতে হয় তত হাতে রাখতে হয়। নিঃশেষে বলার মতো ভুল আর নেই। তোমরা আধুনিক সাহিত্যিকরা বকতে জান, চুপ করতে জান না। এত উঁচু গলায় কথা কও যে কেউ কারও কথা শুনতে পায় না। তাতে তোমাদেরও গলা ফাটে, বিশ্বেরও তাল কাটে, শান্তিভঙ্গ হয়।

ভুলে যেয়ো না চার দিকে অন্তহীন নৈঃশব্দ্য। বিরাট জগৎ মহামুনির মতো মৌন। যদি কিছু জানতে চায় তো ইশারায় জানায়। মানুষকে শব্দ দেওয়া হয়েছে শব্দ করবার জন্যে নয়। নিঃশব্দতাকে আরও নিঃশব্দ করবার জন্যে নয়। শব্দ দেওয়া হয়েছে নিঃশব্দতার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবার জন্যে নয়, ছন্দ মেলাবার জন্যে। যেমন চলার ছন্দ পা ফেলা ও পা তোলা তেমনি বলার ছন্দ বলা ও না-বলা।

বিনু, তুমি কথা বলার আর্ট শিখেছ। না-বলার আর্ট শেখো।

দ্বিতীয় পর্ব

বিনুর পূর্বকথা

একটি আলোকরেখা কোন সুদূর দ্যুলোক থেকে ভূলোকে এসে একদিন মানব রূপ ধারণ করে। সবাই তাকে বিনু বলে ডাকে। শুনতে শুনতে তারও নামটি আপনার হয়ে যায়। একটু একটু করে সেও ভুলে যায় যে একদা সে ছিল এক নামরূপহীন আলোকরেখা। একটু একটু করে মনে রাখে সে একটি মানুষ, একটি পুরুষ, একটি ব্যক্তি।

এখানে কেউ তাকে চেনে না, সেও চেনে না কাউকে। কিন্তু চিনতে চিনতে সকলেই তার চেনা হয়ে যায়। পরিবারে ও পরিবারের বাইরে সকলেই তাকে চেনে। পাড়া ও পাড়ার বাইরে। যারা জন্মসূত্রে আত্মীয় নয় তারাও পাতানো আত্মীয় হয়। আর তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যায়। পশুপাখি গাছপালাকেও বিনু আপনার করে নেয়—তারাও তাকে। ভালোবাসা পেতে পেতে ও দিতে দিতে সে বড়ো হয়ে ওঠে।

অক্ষরপরিচয়ের পর থেকে সে যা হাতে পেত তাই পড়ত; পাঠ্য-অপাঠ্য বিচার করত না করতে জানত না। একদিন সে চার-ছয় ছত্রের একটি পদ্য লিখে বাড়ির এক জায়গায় টাঙিয়ে রাখে। যার নজরে পড়বে সে-ই পড়বে এটা জানত। এটা কিন্তু তার মনের কথা ছিল না। বিশেষ একটি মেয়ে পড়বে এটাই সে মনে মনে চেয়েছিল। মেয়েটি পড়বে আর ভাববে, বিনু তো সামান্য ছেলে নয়। আর কেউ যা পারে না বিনু তা পারে। সে কবিতা লিখতে পারে। সে একজন কবি।

মেয়েটির প্রশংসাই তার কাম্য ছিল। কিন্তু বিশেষ করে সেই মেয়েটির প্রশংসা কেন? তবে কি বিনু তাকে ভালোবাসত ও তার ভালোবাসা কামনা করেছিল? না, বছর এগারো কি বারো বছর বয়সে সে-বাসনা জাগেনি। বাড়িতে অনেক কাব্যগ্রন্থ ছিল। স্কুলের লাইব্রেরিতে তো ছিলই। বৈষ্ণব পদাবলি পড়তে পড়তে বিদ্যাপতির এ দুটি পদ তার মর্মে গেঁথে যায় :

> জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
> নয়ন না তিরপিত ভেল।
> লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
> তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

আরও বড়ো হয়ে সেও লিখতে চেয়েছে এমনই দুটি কথাই। সে রূপমুগ্ধ। সে প্রেমবদ্ধ। একদিন সেও হয়ে উঠত একজন বৈষ্ণব কবি। সেই মধ্যযুগের মতো। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য প্রেমিক কবিদের সঙ্গে বৈষ্ণব কবিদের কিছু সাদৃশ্য ছিল। বিদ্যাপতির যেমন লছমা দেবী, চন্ডীদাসের যেমন রামী, দান্তের তেমনি বিয়াত্রিস, পেত্রার্কের তেমনি লরা। নর-নারীর সম্পর্ক পরিণয়মূলক নয়, প্রেমমূলক।

বৈষ্ণব সাধকরা তাঁদের সাধনসঙ্গিনীদের বলেন তাঁদের প্রকৃতি। প্রকৃতির সঙ্গেই নারীর তুলনা। ওতে নারীর মর্যাদা বাড়ে। বৈষ্ণবদের কাছে কৃষ্ণের চেয়ে রাধার মর্যাদা বেশি। মধ্যযুগের পাশ্চাত্য ত্রুবাদুর কবিদের চোখেও তাই। সেকালের নাইটরাও সেই মর্মে কবিতা লিখতেন। এক এক নাইটের আরাধ্যা এক এক লেডি। যার সঙ্গে পরিণয় সম্পর্ক নেই। কামগন্ধহীন প্রণয় সম্পর্ক। নিজের বিবাহিতা সহধর্মিণীকে উদ্দেশ্য করে প্রেম নিবেদন সেকালের কবিদের কারও রীতি ছিল না। তাঁদের মতে পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফূর্তি হয়, স্বকীয়াতে নয়।

কলেজজীবনের পূর্বেই বিনু অনেক ইংরেজি বই পড়েছিল। কলেজ লাইব্রেরি লুট করে ইংরেজিতে অনূদিত বিস্তর ইউরোপীয় গ্রন্থ পাঠ করেছিল। দেশের দিক থেকে যা পাশ্চাত্য কালের দিক থেকে তা আধুনিক। বিনু ক্রমে ক্রমে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়। সে কেবল ভারতের সন্তান নয় বিংশ শতাব্দীরও সন্তান। বিংশ শতাব্দীকে ভালো করে চিনতে হলে তার পশ্চিম মুখে যাত্রা করা অত্যাবশ্যক। পশ্চিম

ইউরোপই আধুনিকতার মুখ্য স্রোত। মুখ্য স্রোতে অবগাহন না করলে নয়। পশ্চিমের প্রতি তথা আধুনিকতার প্রতি সে এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করে।

তখন সেটা অসহযোগ আন্দোলনের আমল। দেশ যতদিন না স্বাধীন হচ্ছে ততদিন দেশেই থাকতে হবে। যেতে হবে গ্রামে। জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। করতে হবে চাষবাস বা কারিগরি। লিখতে হলে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করার মতো লেখো। তারা যেমন অকৃত্রিম, তাদের কথাবার্তা যেমন অকপট, তেমনি অকৃত্রিম ও অকপট হবে তাদের জন্যে রচিত কাহিনি বা কবিতা। তাদের উপর তথাকথিত সভ্যতার কৃত্রিমতা ও কপটতা চাপিয়ে দিতে চাওয়া অনুচিত। এই বিষয়ে টলস্টয় যা বলেছেন তাই সার কথা। রুশোও তো বলেছেন প্রকৃতির কাছে ফিরে যেতে। গ্রামে ফিরে যাওয়াও প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া। গান্ধীজির উপদেশই গ্রাহ্য। রবীন্দ্রনাথও তো ডাক দেন—

ফিরে চল মাটির টানে।

বিনু পড়ে যায় দারুণ দোটানায়। জীবন নিয়ে সে কী করবে? কেমন করে কাটাবে? কোথায় কাটাবে? তার ধারণা ছিল সে বেশিদিন বাঁচবে না। তার মা বেঁচেছিলেন মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর। সেও তেমনি দুবলাপাতলা। শেলি, কিটস পড়তে পড়তে তারও মনে হয়েছিল ত্রিশ না পেরোনোই রোমান্টিক। যৌবন চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও যেন চলে যায়, এই মর্মে সে একটা কবিতাও লিখেছিল। কিন্তু তার আগেই যেন সে তার জীবনের কাজ সারা করে যেতে পারে।

সে ভাবতে পারেনি যে ইউরোপে গিয়ে আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে গা মিলিয়ে নিতে নিতে তার লেখালেখির পরিকল্পনাও পালটে যাবে। জীবনের সব দিক দেখাতে হলে লিখতে হয় মহাকাব্য বা এপিক। একালে মহাকাব্যের স্থান নিয়েছে বিরাট ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো এপিক উপন্যাস। যেমন রম্যাঁ রল্যাঁর *জাঁ ক্রিস্তফ* বা টলস্টয়ের *ওয়ার অ্যাণ্ড পিস*। বিনুর সাধ যায় তেমনি একটি এপিক লিখতে, যদিও তার সাধ্য কেবল লিরিক।

একটা প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে সে যখন ইউরোপে যায় তখন তার বয়স তেইশ বছর। দু-বছর বাদে দেশে ফিরে এসে রাজকর্মের অবকাশে সে যখন তার পাঁচ খন্ডের উপন্যাস লিখতে শুরু করে তখন তার বয়স পঁচিশ বছর। সে-বয়সে টলস্টয় বা রল্যাঁ অত বড়ো উপন্যাসে হাত দেননি। জীবনের অভিজ্ঞতা কম। সৃজনের অভিজ্ঞতাও কম। কিন্তু বিনুর কি অপেক্ষা করার জো ছিল? পঁয়ত্রিশ বছরের আগেই তাকে তার বৃহৎ উপন্যাস সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু কেন? কী দরকার অত বড়ো উপন্যাস লেখার? কেনই-বা সে সাধ করে অমন একটা দায় নিজের ঘাড়ে চাপায়? টাকার জন্য নিশ্চয়ই নয়। ওটা তার প্রেমের পরিশ্রম। সে একজন স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।

যার প্রধান পটভূমিকা ইউরোপ তা কি বাংলার মহকুমায় বা জেলা সদরে বসে লেখা যায়? কিছুদিন পরেই বিনুর ইউরোপের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যেত। লিখতে গিয়ে সে বিপাকে পড়ত, যদি-না অপরিচিতা এক নারী তার জীবনে পশ্চিম দেশ থেকে আবির্ভূত হতেন। গ্রিক নাটকে যেমন আসমান থেকে দেবতা নেমে আসেন। এরপর থেকে তিনি তাকে পরামর্শ দিয়ে সাহচর্য করতে থাকেন।

কিন্তু সহধর্মিণীর সাহচর্যে উপন্যাস লেখা এক জিনিস আর পুলিশের সাহচর্যে অপরাধ নিবারণ ও জেলের সাহচর্যে অপরাধ দমন অন্য জিনিস। অহিংস নৈরাজ্যবাদী বিনু পুলিশ বা জেল কোনোটাতেই বিশ্বাস করে না। মার্কসবাদী না হলেও সেও বিশ্বাস করে যে রাষ্ট্র ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু রাজকর্মে নিযুক্ত থাকলে তার আগেই শুকিয়ে যাবে বিনুর অন্তঃকরণ, যা তার সাহিত্য সৃষ্টির উৎস। তাকে হতে হচ্ছে দিন দিন হার্ড হেডেড তথা হার্ড হার্টেড। এমন মানুষ যার মস্তিষ্ক যেমন কঠিন, হৃদয় তেমনি কঠোর। সারস্বত সমাজে হয়তো সে এখন ইন্টেলেকচুয়াল বলে গণ্য হবে, কিন্তু একজন আর্টিস্ট বলে নয়। অথচ আর্টিস্ট হতেই তার দুরাকাঙ্ক্ষা। কেউ যখন বলে বিনু একজন কবি তখন সে ধন্য হয়ে যায়। সে-বর সরস্বতী সবাইকে দেন না।

যাঁরা পান তাঁরাই তাঁর বরপুত্র। এক্ষেত্রে সে রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। তিনি মহাশিল্পী। সে তাঁর মতো মহান না হলেও সেও তাঁরই মতো রূপদক্ষ হতে চায়।

বিনু উপলব্ধি করে অপরাধ নিবারণ ও দমনের প্রকৃষ্ট উপায় লোকটির অন্তর পরিবর্তন। ভয়ের শাসনে কিছুতেই তা হতে পারে না। প্রেমের প্রভাবেই সেটা সম্ভব। বিচারককে হতে হবে দয়াময়ী মাতা ও ক্ষমাশীল পিতা। সাহেবরা তো দাবি করেন যে সরকার মা-বাপ। কতক হিসাবে সেটা সত্য। কিন্তু মোটের উপর সরকারের যে ভাবমূর্তি সেটা একটা বিরাট নৈর্ব্যক্তিক শাসনযন্ত্রের। বিনু সেই যন্ত্রের ক্ষুদ্র একটি অঙ্গ। তাকে আইন মেনে কাজ করে যেতে হয়। সে দয়াও করে না, মায়াও করে না। করলে উপরওয়ালাদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। পুলিশও চটে। পুলিশের চোখে সে একজন প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদী, আর জাতীয়তাবাদীদের চোখে সে একজন প্রকাশ্য দেশদ্রোহী।

কিন্তু একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে যে সে তত্ত্বগতভাবে অহিংস নৈরাজ্যবাদী বলে কার্যক্ষেত্রেও তাই ছিল। বিশের দশক শেষ হবার পূর্বাহ্ণে তার ইংরেজ জেলাশাসক তাকে বলেন, 'আমরা চলে গেলেই জাপানিরা ভারত আক্রমণ করবে। স্বাধীন ভারত আত্মরক্ষা করবে কী করে?' বিনু আশা করে জাপানিরা আক্রমণ করবে না। সেটা কিন্তু যুক্তি নয়, সেটা বিশ্বাস। সে-বিশ্বাস দূর হয় চল্লিশের দশকে। কলকাতায় জাপানি বোমা যখন পড়ে বিনুর কাছে তখন গোপন নির্দেশ আসে জাপানিরা এলে কী কী করতে হবে জেলাশাসককে, জেলা জজকে। ইংরেজরা যে বর্মা রক্ষা করতে পারল না সেটা তো স্পষ্ট। বাংলাদেশ রক্ষা করতে পারবে না সেটাও সম্ভবপর। অথচ ভারতীয়রা যে একাই দেশরক্ষা করতে পারবে এটার মতো প্রস্তুতি কোথায়?

ত্রিশের দশকে বিনু দেখে, হিন্দু-মুসলমান কথায় কথায় দাঙ্গা বাঁধাচ্ছে আর দোষ দিচ্ছে ইংরেজদের। তাদের সংহত করতে যদি নেতারা অক্ষম হন তাহলে তো বিনুর মতো রাজকর্মচারীদেরই সে-কাজ করতে হবে। হ্যাঁ, গ্রেফতার করতে হবে, জেলে পাঠাতে হবে, নাচার হলে গুলি চালাতে হবে। পারতপক্ষে সৈন্য তলব করা চলবে না। তলব করলে সৈন্যদের কর্তাকেই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। বিনুকে ততদূর যেতে হয়নি। সে নিজের হাতেই সব ক্ষমতা রেখেছে। কিন্তু তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে দেশকাল অহিংস নৈরাজ্যবাদের জন্যে প্রস্তুত নয়।

ব্রিটিশ অপসরণের পরও কমিউনিস্টদের সহিংস বিপ্লব প্রয়াস লক্ষ করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়েছে। জনগণ অহিংস বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত নয়। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লবের দ্বন্দ্ব হিংসার সঙ্গে প্রতিহিংসার বলপরীক্ষা। তার পরিণতি হবে অরাজকতায়। বিনু যদি ক্ষমতার আসনে থাকে তাকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের আইনকানুনের প্রয়োগ করতে হবে। পুলিশের সাহায্যে, জেলের সাহায্যে, দরকার হলে সৈন্যদলের সাহায্যে। দেশ নৈরাজ্য বরণ করলে কাল তা মানে না। নৈরাজ্য অরাজকতা নয়। জনগণ বরাবরই একজন না একজন রাজার অধীনে থেকেছে। সে-রাজা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক আর ইংরেজই হোক। রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র বরণ করলেও রাষ্ট্র জিনিসটা থাকবে আর তার সেই চারটি অঙ্গই কায়েম হবে। পুলিশ আর আদালত এবং জেল আর সৈন্য।

সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ না করলে, কখনো ম্যাজিস্ট্রেট ও কখনো জজ না হলে, ভয়ংকর সব পরিস্থিতির সম্মুখীন না হলে বিনুর প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা হত না। সে থিয়োরি নিয়েই দিন কাটাত। তবে কি অভিজ্ঞতার ফলে তার আদর্শের পরিবর্তন হল না? না, শুধুমাত্র স্বীকার করতে হল যে এই শতাব্দীতে নয়, বোধহয় আগামী শতকেও নয়, হয়তো তার পরের একশো বছরেও নয়, কিন্তু একদিন-না-একদিন সমাজে কেউ অপরাধও করবে না, কেউ দন্ডদানও করবে না। রাষ্ট্র শুকিয়ে যাবে।

বিনুর মনে হয় সে পড়ে গেছে এক আখমাড়াই কলে। যদি আরও বেশিদিন বহাল থাকে তার চাকরিতে তবে ভিতরকার রসকষ বেরিয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধু ছিবড়ে। তার সতীর্থদের পক্ষে সেটা উন্নতির সোপান, কিন্তু তার পক্ষে অবনতির। তার সেই এপিক উপন্যাস সমাপ্ত হয় ছয় খন্ডে আটত্রিশ বছর বয়সে।

সেই সময়ই পদত্যাগ করে পশ্চাৎ-অপসরণ করা উচিত ছিল, কিন্তু বিকল্প তো আবার এক চাকরি। গ্রামে গিয়ে চাষবাসের সেই পুরাতন স্বপ্ন সে ভুলে যায়নি, কিন্তু যুদ্ধকালে অবাস্তব। মন্বন্তর আসন্ন। পরবর্তী ন-বছর ধরে বিনু পায়চারি করে। ন যযৌ, ন তিষ্ঠৌ। দেশের স্বাধীনতা তার নিজের স্বাধীনতা নয়, বরং আরও অক্ষমতা। ইতিমধ্যে তার সাহিত্যসৃষ্টি মাথায় উঠেছিল।

সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিনু সেই সিদ্ধান্তটি নেয় যেটি তাকে আর শিল্পী সত্তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। কোনো উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে হয় না। কোনো নীচেওয়ালাকে চালনা করতে হয় না। সে তার ইচ্ছামতো বাঁচে। তার সৃষ্টিশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে। সৃষ্টিশক্তিও একপ্রকার আগুন। যে আগুন নক্ষত্র নীহারিকায় জ্বলছে সে-আগুন বিনুর অন্তরেও। তাকে জ্বালিয়ে রাখাই তো তার সাহিত্যিক হওয়ার পূর্বশর্ত। সঙ্গে সঙ্গে তার দীর্ঘ আয়ুরও, নতুবা সে কবে মরে যেত।

তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শুরু হয় সাতচল্লিশ বছর বয়সে। সেইরকম বয়সে প্রমথ চৌধুরীর প্রার্থনা ছিল দ্বিতীয় যৌবনের।

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান
সভয়ে চলিনু ফের বাণীর ভবনে
যেথায় উঠিছে চির আনন্দের গান
আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে
সেদেশে প্রবেশি গেল মনের আক্ষেপ
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

একদা বিনুর প্রার্থনা ছিল যৌবন চলে গেলে যেন জীবনও চলে যায়। প্রথম যৌবন রইল না, কিন্তু দ্বিতীয় যৌবন তার স্থান নিল। তাই জীবন হল দীর্ঘতর। এটা অপ্রত্যাশিত। জীবনের তৃতীয় পর্ব দ্বিতীয় যৌবন এনে দেয়। বহুদিন ধরে তার মনে লালিত হচ্ছিল আর একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনার সাধ। এবার তার জন্যে চাই সর্বাত্মক প্রস্তুতি। প্রেমের উপন্যাসের ভাষা হবে প্রেমিক-প্রেমিকার মনের মতো ভাষা। কোমল মধুর কান্ত পদাবলি, প্রকারান্তরে বৈষ্ণব কবিতা। আধুনিক যুগ থেকে বিনু ফিরে যায় মধ্যযুগে। মননশীলতা থেকে হৃদয়বত্তায়। যৌবনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনে অন্তর্জীবনে। মাঝখানে কেটে গেছে ত্রিশ বছর। কত কী ঘটে গেছে জগতে। লিখতে বসে সে সব ভুলে যায় বিনু।

কাহিনিটা ছিল বেশ রোম্যান্টিক। এক অচেনা অদেখা তরুণী নায়ককে চিঠি লিখে জানায় তার বিয়ে হয়েছে তার অনিচ্ছায় এমন একজনের সঙ্গে যাকে সে ভালোবাসে না, যার অন্য প্রণয়িনী ছিল ও আছে, যার শয্যা থেকে মুক্তির জন্য সে সংগ্রাম করে চলেছে। কোথায়ই-বা সে যাবে? পিতৃগৃহে নয়, সেখানে সকলের ধারণা অমন স্বামী আর হয় না। একাধারে জমিদার ও কংগ্রেস নেতা। ওদের ধারণা নায়িকা বিমুখ বলে তার স্বামী অন্যাসক্ত।

প্রথম দর্শনেই প্রেম, কিন্তু নায়িকা এমন দুটি বাক্য উচ্চারণ করে যা নায়ককে চমকে দেয়। তার স্বামী তাকে ধর্ষণ করেছে। সে তার স্বামীকে বলেছে গর্ভপাত করবে। নায়কের পরামর্শ চাই। নায়ক বলে, না না, ওতে অজাত সন্তানের প্রতি অন্যায়। নায়িকা জানতে চায়, তাহলে মুক্তির কী উপায়? মুক্তি না পেলে তো আবার ধর্ষণ, আবার সন্তান। তা হলে কি সে আত্মহত্যা করবে? নায়ক বলে, না না, ওতে নিজের প্রতি অন্যায়।

নায়িকার এক আত্মীয়কে নায়ক বিশেষ শ্রদ্ধা করত। কলেজত্যাগী, নির্ভীক দেশসেবক। তিনি তার বন্ধু হন। দুই বন্ধুতে মিলে নায়িকার মুক্তির দায় মাথায় তুলে নেয়। কিন্তু মাঝপথে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়, নায়ক নিঃসঙ্গ। তা সত্ত্বেও সে তার অঙ্গীকারে স্থির থাকে। নায়িকার পুত্রসন্তান লাভের পর স্বামী-স্ত্রীতে সন্ধি হয়। আপাতত নায়িকা স্বেচ্ছাবন্দিনি। তাঁর মুক্তির প্রশ্ন সন্তান বড়ো না হওয়া তক জরুরি নয়। সে নায়ককে বলে ততকাল অপেক্ষা করতে। নায়ক অনুভব করে যে বন্দিনিকে মুক্ত করতে এসে সে নিজেই বন্দি হয়েছে। তার

নিজের মুক্তিই জরুরি। সে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরাযাত্রা করে। প্রেমিক হিসাবে সে দোষী। প্রেমিকা হিসাবে নায়িকা নির্দোষ। নায়ক হেরে গেছে। নায়িকা জিতেছে।

কাহিনিটার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ লেখার পর বিনুর মনে বিষম খটকা বাঁধে। প্রথম দর্শনে নায়িকা নায়ককে যে দুটি উক্তি শুনিয়েছিল সে দুটি কি রাখবে না বাদ দেবে এই নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করছে এমন সময় এক চিঠি। 'ত্রিশ বছর আগে তোমাকে আমি বিশ্বাস করে যা বলেছি তা তুমি যদি প্রকাশ কর তবে তুমি বিশ্বাসভঙ্গ করবে। আমাকে না দেখিয়ে তুমি কিছু প্রকাশ করতে পারবে না। করলে অভিশাপ দেব।'

বিনু লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু বছর দশেক বাদে তার মনে হয় তার বাবার মতো সেও একষট্টি বছর বয়সে দেহ রাখবে। মৃত্যুর পূর্বে অসমাপ্ত উপন্যাসকে সমাপ্ত করাই কর্তব্য। তার জন্যে যদি কিছু বাদ দিতে হয় তো তাও সই। বই থেকে দু-টি বাক্য বাদ যায়। বিনুর ধারণা সে প্রেমের বেলায় হেরেছিল, লেখার বেলায়ও হারল। তার জীবনের তৃতীয় পর্ব শেষ হয় ছেষট্টি বছর বয়সে। দ্বিতীয় যৌবনও নিঃশেষ।

বিনুর উত্তরকথা

বিনুর বয়স যখন মাত্র দশ বছর তখনই তার মনে হত এ জীবন যদি সেই বয়সেই শেষ হয়ে যায় তা হলেও তার খেদ নেই। সে যথেষ্ট আনন্দ পেয়েছে। যথেষ্ট আস্বাদন পেয়েছে মাধুর্যের। যথেষ্ট দর্শন পেয়েছে সৌন্দর্যের। ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও জীবন পরিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু একথাও তার মনে হত সে যাবার সময় কেবলই তো নিয়ে গেল, দিয়ে গেল কী? ঋণ শোধ হবে কী করে?

বিনু তার এই আনন্দ ঋণ, সৌন্দর্য ঋণ শোধ করতে লেখার কাজে ব্রতী হয়। কৈশোরে খেলার মতো করে। যৌবনে লীলার মতো করে। তার যৌবন গত হলে সে প্রার্থনা করে দ্বিতীয় যৌবনের। যযাতির মতো নয়। প্রমথ চৌধুরির মতো। দ্বিতীয় যৌবন পেয়ে তিনি *সবুজপত্র* সম্পাদনা করেন, *চার ইয়ারী কথা* লেখেন। বিনুও তার প্রার্থনার উত্তর পায়। লাভ করে দ্বিতীয় যৌবন। সমাপ্ত করে তার প্রেমের উপাখ্যান। কেটে যায় পনেরো বছর। তার বয়স তখন বাড়তে বাড়তে ছেষট্টি।

না, সে-বয়সে আর তৃতীয় যৌবন প্রার্থনা করা চলে না। জীবনই-বা আর ক-দিন? আয়ু যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকু দিয়ে সম্পন্ন করতে হবে বকেয়া যত কাজ। বেশ কিছু কাল ধরে সে ভাবছিল তার স্বদেশের পুনর্যৌবনের কথা। দেশেরও চাই পুনর্যৌবন। পুনঃস্বাধীনতাই সব নয়। পরাধীনতা দূর হলেও পাঁচ হাজার বছরের এই প্রাচীন দেশ জরাগ্রস্তই থাকবে, তার জরা দূর হবে না। বিনু তাই চিন্তা করে তার স্বদেশের পুনর্যৌবনের কথা। চিন্তার ফল তাকে প্রকাশ করে যেতে হবে। এটা তার কর্তব্য। সৃষ্টি নয়, কৃত্য। বিনু কি কেবল একজন স্রষ্টা? সে একজন নাগরিক—ভারতীয় নাগরিক। সেইসঙ্গে বিশ্বনাগরিক। দেশকে সে বিশ্বের একটি অঙ্গ বলেই জানে। ভারত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ নয়। যাকে প্রাচীনরা বলতেন জম্বুদ্বীপ। বোধহয় সেই ধারণায় সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ফলে এদেশের লোক হয়েছিল কূপমণ্ডূক।

সমুদ্রপথে ওপার থেকে কেউ না এলে এপারে রেনেসাঁস হত না। রেনেসাঁস ছিল বিদেশ থেকে আসা রাজপুত্রের সোনার কাঠির স্পর্শ লেগে রাজকন্যার নবজাগরণ। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক যখন শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হয়ে অগৌরবের হেতু হয় তখন তার পালটা রিভাইভাল বা পুনরুজ্জীবন বলে অপর এক শক্তি জেগে উঠে প্রাচীন গৌরবের বাণী শোনায়। ফলে স্বদেশের রেনেসাঁস এক শতাব্দীর মধ্যেই তার গতিবেগ হারায়। জোয়ার পরিণত হয় ভাটায়। অতীতের প্রতি পিছুটান প্রবল হয়ে ওঠে। জরার জয়গান শুনে রবীন্দ্রনাথ লেখেন *সবুজের অভিযান* ও *ফাল্গুনী।* বিনু তার কৈশোরেই সেসব পড়ে মুগ্ধ হয়। পরে সেও যৌবনের প্রবক্তা হয়ে ওঠে; দেশের তথা জাতির যৌবনের।

রেনেসাঁস পশ্চিম থেকে এলেও তার মূল কথা শুধু পাশ্চাত্য নয়। সে বলে এ জগতের কেন্দ্রবিন্দু দেবতা নয়, মানব। ধর্মের পরিবর্তে সে প্রচার করে মানবিকবাদ—হিউম্যানিজম। এতে মানবের মহিমা বাড়ে, দেবতার মহিমা কমে। মানবমহিমার নজির প্রাচীন গ্রিসে ছিল, কিন্তু খ্রিস্টধর্মের প্রচলনের ফলে সে নজির লোকে ভুলে যায়। এই বিস্মৃতির যুগকে ধার্মিকরা বললেন আলোকের যুগ, এর পূর্বের যুগকে অন্ধকার যুগ।

কিন্তু চাকা ঘুরে যায়। তুর্কদের আক্রমণে স্থানভ্রষ্ট হয়ে গ্রিক পন্ডিতরা আশ্রয় নেন ইটালিতে। শুরু হয়ে যায় গ্রিকদের অনুসরণে কাব্য, নাটক, দর্শন, বিজ্ঞান, চিত্রকলা ও ভাস্কর্য চর্চা। দেখতে দেখতে ইটালির তথা পশ্চিম ইউরোপের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। একেই বলা হয় রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। তখন আধুনিকরা বলেন মধ্যযুগটা ছিল অন্ধকার যুগ, আধুনিক যুগটা হল আলোকের যুগ। ধর্মগুরুদের সঙ্গে মনীষীদের মতভেদ যেন উত্তর মেরুর সঙ্গে দক্ষিণ মেরুর। মনীষীদের উপর নির্যাতন আরম্ভ হয়। রেনেসাঁসের বিপরীতে কাউন্টার রেনেসাঁস চালানো হয়। শেষপর্যন্ত যেটা হয় সেটা একপ্রকার সহ-অবস্থান। ধর্মও থাকে, মানবিকবাদও থাকে। যার যাতে অভিরুচি সে তাকে গ্রহণ করে। ক্রমে ধর্মের সঙ্গে মানবিকবাদের একপ্রকার সমন্বয়ও হয় অনেক ব্যক্তির চিন্তায় ও বিশ্বাসে। মানবিকবাদীদের মধ্যে যেমন নিরীশ্বরবাদী আছেন তেমনি ঈশ্বরবিশ্বাসীও রয়েছেন।

আজকাল খুব কম ধর্মীয় নেতাই বিশ্বাস করেন যে প্রাচীন গ্রিকরা ছিল আলোকবর্জিত পেগান, অন্ধকার থেকে তাদের বংশধররা আলোকে উত্তীর্ণ হয় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে। তেমনি খুব কম মানবিকবাদী মনে করেন যে মধ্যযুগটা ছিল আলোকবর্জিত অন্ধকার যুগ, রেনেসাঁসই মধ্যযুগের মানুষকে আলোকে উত্তীর্ণ করে। কোনো যুগই শুধুমাত্র আলোকের বা অন্ধকারের ছিল না বা নয়। তা হলেও মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সেটা সম্ভব হয় রেনেসাঁসের কল্যাণেই। একথা যেমন ইউরোপের ইতিহাসে সত্য তেমনি ভারতের ইতিহাসেও। রেনেসাঁসকে পাশ্চাত্য না বলে আধুনিক বলা ভালো। তা দেশনিরপেক্ষ তথা ধর্মনিরপেক্ষ।

এখানেও আবার এক 'কিন্তু'। পুরাতনের প্রত্যাবর্তন চাইনে, কিন্তু পুরাতনের সমস্তটাই কি পুরাতন? চিরন্তন বা চিরনতুন কি পুরাতনের মধ্যে নেই? নচিকেতার প্রশ্ন, মৈত্রেয়ীর প্রশ্ন কি পুরাতন না সনাতন? বুদ্ধের উপদেশ 'আত্মদীপো ভব' কি সেকালের না সব কালের?

বিনুকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চিন্তা করতে হয় পুরাতনের থেকে বাছাই করে কী কী রাখতে হবে, কী কী ফেলতে হবে। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে, চারুকলায়, দর্শনে, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়। সব কিছুই আজ নতুন আগামী কালে পুরোনো। তারই মধ্যে হয়তো কিছু চিরনতুন। তার লেখাও তো দু-দিন পরে পুরাতন হবে। কালোত্তীর্ণ হবে এমন কিছু কি সে লিখেছে বা লিখবে? বিনু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

চেষ্টা করলে লেখাকে রূপোত্তীর্ণ করা সম্ভব, চেষ্টা করলে রসোত্তীর্ণ করাও সম্ভব, কিন্তু কালোত্তীর্ণ করা লেখকের হাতে নয়। বিশ্বসাহিত্যে যেসব বই ক্লাসিক হয়েছে সেসব বই হাজার দু-হাজার বছরের পুরাতন হয়েও চিরনতুন। যেমন কালিদাসের *মেঘদূত* কিংবা ওমর খৈয়ামের *রুবাইয়াৎ।* বাংলা ভাষায় বহু লেখক অনুবাদ করেছেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের যা কালোত্তীর্ণ তাকে বর্জন না করে স্বাধীন ভারতকে নবীন ভারত করতে হবে। রেনেসাঁসের যুগ পার হয়ে গেছে। এখন যেটা চাই সেটার ইংরেজি নাম রিনিউয়াল, বাংলায় নবায়ন। দম সঞ্চয় করতে করতে বিনুর বয়স হয় পঁচাত্তর। আবার একখানা বৃহৎ উপন্যাস লিখতে বিনুর দম ছিল না। চার খন্ডের উপন্যাস তো দমের কাজ। দেশের জন্যে বইখানা লিখে শেষ করতে অন্তত চার বছর তো লাগবেই। স্বাস্থ্য অনুকূল না হলে আরও ক-বছর কে জানে?

এক জ্যোতিষী বলেছিলেন তার পরমায়ু পঁচাত্তরের বেশি নয়। জ্যোতিষে যদিও তার বিশ্বাস নেই তবু মনে হয় পঁচাত্তরটা পার হয়ে যাক আগে, তারপরে শুরু করা চলবে। যদি বেঁচে থাকে। পঁচাত্তর যথাসময়েই অতীত হয়। জ্যোতিষ যে অভ্রান্ত নয় তা সম্যক উপলব্ধি করার পরে বিনু তার বৃহৎ উপন্যাসে হাত দেয়। আশি বছর তাকে বাঁচতে হবে, যদি চার খন্ডে লিখতে হয়। সে বেছে নেয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ থেকে মহাত্মা গান্ধীর আগে পর্যন্ত সময়সীমা আবদ্ধ ভারত-ইতিহাস। সে আপনি যার ভিতর দিয়ে নিশ্বাস নিয়েছে।

সে নিজে একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। চল্লিশের দশকের অধিকাংশই এই উপন্যাসের ঘটনাকাল। মহাযুদ্ধের অনুষঙ্গে ঘটেছে জাতীয় সংগ্রাম, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক মহামারি, স্বাধীনতা।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার ন-বছর বাদে বিনু বিলেত যায় ও তার ফিরে আসার দশ বছর বাদে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধে। যে দু-বছর সে বিলেতে ছিল সে-সময়টা ছিল দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী শান্তিপ্রচেষ্টার সময়। তখন কারও মাথায় আসেনি যে হিটলার বলে একটা অজানা অচেনা লোক জার্মানদের জননায়ক ও রণনায়ক হয়ে আবার এক মহাযুদ্ধের অঙ্গনে ইংরেজ, ফরাসি, রুশ ও মার্কিনকে সমবেত করবে। দুই ফ্রন্টে লড়তে লড়তে জার্মানরা অবশেষে পরাস্ত হবে এটা তো অবধারিত। কিন্তু নাতসিদের ধারণা ছিল কমিউনিস্ট ও ক্যাপিটালিস্ট কখনো একজোট হবে না, হতে পারে না। সুতরাং ক্যাপিটালিস্টদের ঘায়েল করে তারা কমিউনিস্টদের খতম করবে। ভুলটা হল এই গণনাতেই যে দুই বিপরীত মেরু কখনো পরস্পরের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে না। কিন্তু অঘটন আজও ঘটে। মহাশত্রু স্টালিনের কাছে দূত পাঠিয়ে চার্চিল তাঁকে অবহিত করলেন যে হিটলার তাঁর সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করে যুদ্ধে নামতে উদ্যত। পরে চার্চিল স্বয়ং স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মস্কো যান, স্টালিন লণ্ডনে আসেন না। রুজভেল্টও যান স্টালিনের সঙ্গে মিলিত হতে। স্টালিন তাঁর সঙ্গে ইউরোপ ভাগাভাগি করেন। চার্চিলের পরিকল্পনা মান্য করেন না। তবে চার্চিলই ইংল্যাণ্ডকে বাঁচান। কিন্তু তাঁর প্রেস্টিজ যখন তুঙ্গে তখন ইংরেজরা তাঁকে না করে অ্যাটলিকে করে প্রধানমন্ত্রী আর অ্যাটলি ভারতকে মুক্তি দেন। লেবার পার্টি প্রতিশ্রুত হলেও কার্যকালে চার্চিলের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। তিনি রাজি হন তাঁর চিরশত্রু গান্ধীকে ভারতের একাংশ থেকে বঞ্চিত আর উভয় অংশকে কমনওয়েলথভুক্ত দেখে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গান্ধীজির পলিসি ছিল একরকম, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আরেকরকম, সুভাষচন্দ্রের আরও একরকম, কনিউনিস্টদের আরও একরকম, মুসলিম লিগের আরও একরকম, হিন্দু মহাসভার আরও একরকম। ভারতের জনমত কেবল বিভক্ত নয়, বিভ্রান্ত। ভারতের হয়ে কথা বলার একক অধিকার গান্ধীজির বলে বড়োলাট লিনলিথগাউ স্বীকার করেন না। তিনি জিন্না সাহেবকেও গান্ধীজির সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করতে চান। ফলে গান্ধীজি সরে দাঁড়ান ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের সভাপতি তথা প্রতিভূ করেন। জিন্না সাহেব এটা মেনে নিতে পারেন না, সুতরাং বড়োলাটও মেনে নেন না। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন কংগ্রেসের অনুরোধে গান্ধীজি ব্যক্তি সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন সিভিল লিবার্টির দাবিতে। অর্থাৎ যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্যের স্বাধীনতার ইসুতে। কোনো সরকারই যুদ্ধকালে তা করতে দেয় না। ব্যক্তি সত্যাগ্রহ চলে। বহুসংখ্যক কংগ্রেস কর্মী কারাবরণ করেন।

গান্ধীজি বলেছিলেন পরে একসময় গণ-অভ্যুত্থান আপনা থেকেই হবে। হত হয়তো যুদ্ধের শেষের দিকে, কিন্তু ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যায় জাপানি অভিযান। বর্মা দখল হয়, ভারত আক্রান্ত হবার মুখে নেতা ও কর্মীরা খালাস হন। আবার কথাবার্তা। এবার ক্রিপসের সঙ্গে। জাপানিরা ভারতে এলে ভারত হয়ে উঠবে রণাঙ্গন। তখন ব্রিটিশ সেনা তাদের রুখতে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করবে। সরকারে যোগ দিয়ে কংগ্রেস নেতারা তা ঠেকাতে পারবেন না। মাঝখান থেকে কলকারখানা বন্দর ব্রিজ প্রভৃতি ধ্বংসের জন্যে দায়ী হবেন। তাই তাঁরা দাবি করেন যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষমতা। ব্রিটিশ সেনার উপর এক্তার। ক্রিপস নারাজ। কথাবার্তা বন্ধ। তখন 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব পাস। গণসত্যাগ্রহ করার আগে গান্ধীজি বড়োলাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, কিন্তু বড়োলাট তাঁকে বন্দি করে বিদ্রোহের আগুন উসকে দেন। তাঁর মতে সেটা উসকানি নয়, সেটা তড়িঘড়ি নেবানো। দেশজুড়ে হিংসাত্মক কান্ড ঘটে। গান্ধীজিকে দায়ী করে দুনিয়াময় রটানো হয় যে গান্ধীজি জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয় চান। তিনি জাপানিদের আসার পথ সুগম করে দিচ্ছেন। তাঁকে এই অপবাদের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের স্বাধীনতা না দেওয়ায় তিনি একুশ দিন অনশন করে দুনিয়াকে জানান দেন যে তিনি নির্দোষ।

যুদ্ধ শুরু হবার সময় গান্ধীজি বলেছিলেন এ যুদ্ধ শেষ হবে একটি মরাল ইসুতে। হলও তাই। হিরোশিমার উপর পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে সেই মরাল ইসু। নিরীহ নিরস্ত্র দেড় লক্ষ শিশু, নারী ও বৃদ্ধকে সতর্ক

না করে ও পলায়নের সুযোগ না দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা না করলে জাপানিরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করত না। এটা একটা নৈতিক পরাজয়। বিজেতা পক্ষের। ওদিকে নাতসিরাও যুদ্ধকালে ষাট লক্ষ নিরীহ নিরস্ত্র ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুরে হত্যা করে। সেটাও তাদের নৈতিক পরাজয়। উপরন্তু সামরিক পরাজয়।

যুদ্ধকালে বিনুর অর্ধেক নজর ছিল ইংরেজের উপরে, অর্ধেক নজর কংগ্রেসের উপরে। তখন সে ভাবতেই পারেনি যে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। সেটা জিন্না সাহেবের ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এর বিরুদ্ধে গান্ধীজির কোনো আয়ুধ ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধে তিনি হিন্দু শিবিরের যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুই পক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই পক্ষকে নিবৃত্ত করার জন্যে তৎপর শান্তিবিধায়ক পিসমেকার। ফলে উভয় শিবিরের যোদ্ধাদের চোখে দুশমন। ইংরেজরা যখন স্বেচ্ছায় কুইট করার নোটিস দেয় তখন তিনি পরামর্শ দেন, মুসলিম লিগকে গদি ছেড়ে যাও। কংগ্রেস নেতারা ইতিমধ্যেই গদিয়ান হয়েছিলেন। তাঁরা গদিও ছাড়েন না, গদাযুদ্ধও করেন না। তাঁদের মন্ত্র হল, 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পন্ডিতঃ।' ইতি পন্ডিত নেহরু। তবে অর্ধেক নয়, এক-চতুর্থাংশ। ভারতের মুসলমান সংখ্যাও ছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কাজির বিচারে দেশভাগ ও প্রদেশভাগ হয়ে যায় নিক্তির ওজনে।

গান্ধীজির সত্যিকার কাজ ছিল দুটি। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও অহিংস উপায়ের মাহাত্ম্য প্রতিপাদন। যার জন্যেই তিনি মহাত্মা। স্বাধীনতা যে উপায়ে অর্জিত হল তা যে পুরোপুরি অহিংস নয় তা তিনি জানতেন ও মানতেন। অর্ধেক অহিংসা আর অর্ধেক হিংসার পরিণাম যে খন্ডিত স্বাধীনতা হবে তা তিনি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেন। ইচ্ছা করলে তিনি পার্টিশনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতেন, কিন্তু তাহলে ঘটে যেত তাঁর নিজের সেনার সঙ্গেই বিচ্ছেদ। জওহরলাল ও বল্লভভাই তাঁকে ছাড়তেন, সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী। অসহায় মহাত্মার একমাত্র কর্তব্য হল সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপরে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের সহিংস আক্রমণ অহিংস উপায়ে রোধ। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় নিরাপদ হলে পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ও নিরাপদ হবে। কতক হিন্দু এটা বুঝল, কতক বুঝল না। তাদের মতে এটা মুসলিম তোষণ। তাদের ধারণা মুসলিম বিতাড়নই ছিল হিন্দু বিতাড়ন রোধের মোক্ষম উপায়। তাঁকে পীড়া দেয় তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীদের মধ্যেই উগ্র হিন্দু মনোভাব। তিনি অনশন করেন। সফল হন। সফল হন বলেই নিহত হন। সফল না হলে অবশ্য অনশনে দেহত্যাগ করতেন। তাঁর নিধনের পর অতিপ্রিয় সহকর্মীর মন্তব্য হল, 'তিনি অনশনে মরলেই ভালো হত।'

রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার প্রয়োগ গান্ধীজির সঙ্গেই আরম্ভ গান্ধীজির সঙ্গেই শেষ। বিনু আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত অহিংসার পরীক্ষার মনোযোগী ছাত্র। শুধু ভারত-ইতিহাসে নয়, মানবইতিহাসেও তাঁর অহিংসা নিয়ে পরীক্ষা একটি অভূতপূর্ব অধ্যায়। গান্ধীজি যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের পরীক্ষা শুরু করেছেন তখন টলস্টয় তাঁকে চিঠি লিখে উৎসাহ দেন। যা বলেন তার মর্ম—তিনি যে কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন সেটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে আবশ্যক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্ম। গান্ধীজির পূর্বসূরি ছিলেন টলস্টয় ও থোরো। টলস্টয় প্রেরণা পেয়েছিলেন রুশ দেশের গ্রামীণ কৃষক দুখোবরদের জীবনধারা থেকে। তারা অস্ত্র ধরত না, অস্ত্র ধরতে বাধ্য করলে প্রতিরোধ করত। গণ-প্রতিরোধের অহিংস নজির সেইখানে। শেষপর্যন্ত তাদের দেশান্তরি হতে হয়। *রেজারেকশন* উপন্যাস লিখে টলস্টয় যা উপার্জন করেন তা দুখোবরদের মহানিষ্ক্রমণে সাহায্য করেন।

বিনু পুনর্নবায়ন নিয়ে চিন্তান্বিত ছিল, কিন্তু তার যেটুকু সংকেত পেল সেটুক গান্ধীজির পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেই নিহিত। যুদ্ধবিগ্রহের ভিতর দিয়ে নবায়ন হয়, বিপ্লব-প্রতিবিপ্লবের ভিতর দিয়েও হয়, কিন্তু বিনুর আকাঙ্ক্ষিত নবায়ন হবে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, ত্যাগ ও তপস্যার ভিতর দিয়ে। হিংসার মতো পুরাতন আর কী আছে?

তার তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাস সমাপ্ত হয় বিরাশি বছর বয়সে। আশ্চর্য! তখনও সে বেঁচে আছে! তখনও তার হাতে বহু দিন থেকে ভেবে রাখা অথচ অনারব্ধ লেখা বড়ো মাপের নয়। তবু বিশেষ মূল্যের। পুনর্ভাবনায়

অনেক ভুলভ্রান্তির, অনেক মোহের অবসান হয়েছে। তা বলে অতিবাহিত জীবনকে এডিট করা চলে না। পাপ নেই, তাপ নেই, এমন জীবন রক্ত-মাংসের মানুষের জীবনে দেখা যায় না। বিনু রক্ত-মাংসের মানুষ।

তবে সাহিত্যে সব কিছু খুলে বলা যায় না। মিথ্যা না বললেই হল।

বিনুর বিকাশ

ভবভূতি বলে গেছেন, 'কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।' সেই নিরবধি কালকে মানুষ সুবিধামতো শতাব্দীতে ভাগ করে নিয়েছে, আর সেই বিপুলা পৃথ্বীকে বিভিন্ন দেশে। দেশও সত্য, শতাব্দীও সত্য, তবু পূর্ণসত্য নয়। পূর্ণসত্য হচ্ছে নিরবধি কাল ও অখন্ড দেশ।

যে লেখে তার দেশ আছে, যুগ আছে। কিন্তু যা লেখা হয় তা দেশ থেকে দেশান্তরে ও যুগ থেকে যুগান্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে; সূর্যের আলোর মতো, সমুদ্রের তুফানের মতো। বাইরের মানুষটার জাত কুল বংশপরিচয় আছে, ভিতরের মানুষটার তা নেই। তার লেখনীর মুখ দিয়ে যা নিঃসৃত হয় তা যদি অতি গভীর স্তরের বাণী বহন করে আনে তবে তা গ্রিকের না ভারতীয়ের না চৈনিকের না আরবের না পারসিকের না ইংরেজের না ফরাসির না জার্মানের না রুশের না নরওয়েজিয়ানের ও-গণনা লঘুচেতাদের। উদারচরিতের কাছে বসুধার সকলেই কুটুম্ব।

এ শিক্ষা বিনু তার শৈশব থেকেই পেয়েছিল। তার পিতামহী তাকে তাঁর কাছে শুইয়ে রোজ রাত্রে শোনাতেন রামায়ণ মহাভারতের উপাখ্যান, সেইসঙ্গে গোলেবকাওলি পরির কাহিনি, মহারানি ভিক্টোরিয়ার সম্বন্ধে খোশগল্প। তার কাকারা ও তাদের সহপাঠীরা শেক্সপিয়ারের নাটকের দৃশ্য অভিনয় করতেন। সে ছিল কনিষ্ঠ দর্শক। বিনুদের বাড়িতে যে দুর্গা পূজা হত তাতে প্রতিমা থাকত না, পরিবর্তে থাকত একটা জলচৌকির উপরে কিছু বইপত্র ও একটা তলোয়ার। বইপত্রের মধ্যে ইংরেজি শেক্সপিয়ার গ্রন্থাবলি। সরস্বতী পূজার সময় তলোয়ার অন্তর্হিত, কিন্তু শেক্সপিয়ার সুরক্ষিত। তা ছাড়া বাড়িতে বাইবেলও ছিল, ছোটোকাকার পরীক্ষা পাসের দরুন উপহার।

খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিনুর সম্পর্ক আজন্ম। যাঁর হেপাজতে সে ভূমিষ্ঠ হয় তিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার। বিনুদের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি গাড়ি করে রাজপ্রাসাদে যাতায়াত করতেন। খোঁজ করতেন বিনুর ও তার ভাইবোনের। সকলেরই জন্ম তাঁর হেফাজতে। পাড়ায় একঘর খ্রিস্টানও ছিলেন, তাঁদের পরিবারের ছেলেদের সঙ্গেও বিনু খেলত। বিনুদের বাড়ির পেছনেই থাকতেন একঘর মুসলমান। তাঁদের ছেলে এসে বিনুর সঙ্গে খেলত, মেয়ে বেড়ার ওপার থেকে দুটি-একটি কথা বলত। কাকাদের বন্ধু পাঠান মাস্টার রোজ আসতেন চা খেতে ও গল্প করতে। বোখারি সাহেব মাঝে মাঝে সত্যপিরের সিন্নি দিয়ে যেতেন। রাজকর্মচারী আতাহার মিয়া দিয়ে যেতেন হালুয়া। মহরমের মিছিল বাড়ির সামনে এসে লাঠি খেলা দেখাত। বিনুর ঠাকুমার মানত ছিল বিনুও মহরমে লাঠি খেলবে। বিনু কিন্তু মনে মনে বাঘের নাচ নাচত। নাপিতের ছেলে সিরিয়ার মতো। মহরমে হিন্দুদের উৎসাহ কম নয়। বাজনদাররা সবাই হিন্দু।

অন্দরের দুয়ার খুলে যায় যখন বিনুর আট বছর বয়সে তার মা-বাবা বৈষ্ণব দীক্ষা নিয়ে বাড়িতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তাহে সপ্তাহে কীর্তন, মাসে মাসে মোচ্ছব। আহূত, অনাহূত, রবাহূত সকলেই স্বাগত। কীর্তনিয়ারাও বাইরের লোক বেশিরভাগ। দুর্গা পূজা, সরস্বতী পূজা আর হয় না। বিনুকে বলা হয় না *কবিকঙ্কণ চন্ডী* সুর করে পড়তে। তার মা সুর করে জয়দেব থেকে গান করেন। আর বাবা সুর করে বিদ্যাপতি থেকে আবৃত্তি করেন। শুনতে শুনতে বিনুর ছন্দের কান তৈরি হয়ে যায়। মা-বাবার কাছে ভগবান হচ্ছেন পুত্রের মতো প্রিয়। তাঁদের সাধনা বাৎসল্যরসের সাধনা। কিন্তু লীলাকীর্তন শুনলে মনে হয় বৈষ্ণবদের সাধনা মধুর রসের সাধনা। ভগবান তাঁদের কান্ত। বিনুর বয়সে এসব বোঝা সম্ভব ছিল না। সেও কীর্তনের শেষে জয়ধ্বনি দিয়ে বলত, 'রাধারানি কি জয়'। অথচ রাধারানির বিগ্রহ বাড়িতে ছিল না, কিশোর কৃষ্ণেরও না। এর জন্যে তাকে যেতে হত রাজমাতার প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে—সুন্দর যুগলমূর্তি।

একদিনে নয়, এক বছরেও নয়, দীর্ঘকাল ধরে তার অন্তরে চলতে থাকে ধর্মবিশ্বাসের ক্রমপরিবর্তন। গৃহদেবতা গোপালের প্রতি তার মা-বাবা বাৎসল্যরস অনুভব করতে পারেন, সে কী করে পারবে? ভাইয়ের বেলা যে ভালোবাসা অনুভব করা যায় তা ভগবানের বেলা কি সম্ভব? মা বলতেন গোপাল তার ছোটোভাই। ছোটোভাইকে কি কেউ প্রণাম করে? রবীন্দ্রনাথ তথা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সে ক্রমে ক্রমে একেশ্বরবাদী ও নিরাকারবাদী হয়ে ওঠে।

অথচ বৈষ্ণব মত সে সরাসরি ত্যাগ করতে পারে না। আরও বড়ো হয়ে সে যখন আত্মপরীক্ষা করে তখন উপলব্ধি করে সে লীলাবাদী। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ নিত্যলীলার সম্বন্ধ। বৈষ্ণবদের মতো সেও বিশ্বাস করে যে সমস্তই ভগবানের লীলা।

বোধহয় রক্তের ভিতরে মায়াবাদ নিহিত ছিল। তাই মা বলতেন, 'এটা মায়ার সংসার, কেউ কারও নয়।' শঙ্করাচার্য বলছেন, 'কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।' তিনি মায়াবাদী। কথাটা মাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। সেটা তাঁর অন্তর থেকে স্বতঃ উৎসারিত। মা খুব কম বয়সেই ছেলে-মেয়েদের মায়া কাটিয়ে চলে যান। তাঁর প্রিয় পুত্র গোপালেরও। সংসারের ধকল তাঁর দুর্বল শরীরে সহ্য হচ্ছিল না। কখনো তো বিশ্রাম করেননি। তবে তাঁর মৃত্যুর পরও কীর্তন মোচ্ছব একইভাবে চলতে থাকে। যেটা বন্ধ হয় সেটা প্রতি সন্ধ্যায় জয়দেব থেকে গান। বাবা ক্রমশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অথরিটি হয়ে ওঠেন। স্বয়ং রাজমাতা তাঁকে ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর পরামর্শ নিতেন।

আট-দশ বছরের ছেলেকে কি তার বাপ যা ইচ্ছা তাই পড়ার স্বাধীনতা দেন? বিনু যে কেবল ইংরেজি বাংলা সাপ্তাহিক পড়ত তা নয়, তার একটা লাইব্রেরি ছিল। তাতে ছিল *বৈষ্ণব পদাবলি*, ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলি, *দারোগার দপ্তর* প্রভৃতি বই। বেশিরভাগই *বসুমতী*র উপহার। বুঝুক আর না বুঝুক বিনু গোগ্রাসে গিলত। ওদিকে তার হাই স্কুলের হেডমাস্টারমশাই তার উপর কমনরুমের ভার দিয়েছিলেন। চাবি খুলে যখন ইচ্ছা রাশি রাশি মাসিকপত্র পড়ত। তারমধ্যে কিছু ইংরেজি মাসিক ও সাপ্তাহিকও ছিল। বিনুকে সবচেয়ে আকর্ষণ করত *সবুজপত্র।* ওড়িশার এক দেশীয় রাজ্যে 'সবুজপত্রে'র সমজদার বোধহয় শিক্ষকদের মধ্যে বাঙালি হেডমাস্টারমশাই আর ছাত্রদের মধ্যে বিনু।

স্কুলের লাইব্রেরিটি ছিল আশ্চর্যরকম আধুনিক। প্রাক্তন হেডমাস্টারমশাইরা শিক্ষকদের জন্যে আনিয়ে রেখেছিলেন ইতিহাসের বই। তা ছিল কলেজ স্তরের চেয়েও উচ্চতর স্তরের। ইংরেজি শিশু বিশ্বকোষও ছিল। কিছু ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ। স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির সংক্ষেপিত নভেল। বিস্তর বই রবীন্দ্রনাথের, সত্যেন্দ্রনাথের, রজনীকান্তের, আরও অনেকের। বিনু একদিন আবিষ্কার করে চারখানি ইংরেজি বই। কেউ পড়েনি, পাতা কাটা হয়নি। বাংলা করলে দাঁড়ায় 'যা প্রত্যেক বালকের জানা উচিত', 'যা প্রত্যেক তরুণের জানা উচিত' ইত্যাদি। যৌন বিষয়ক জ্ঞান যথেষ্ট শালীনতার সঙ্গে পরিবেশিত। বিনুটা এমন ন্যাকা সে তার বাবাকে বলে, 'এ বইতে লিখেছে পুরুষের উচিত নয় নারীদের সঙ্গে শোয়া। কেন?'

তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে বসে শাস্ত্র পাঠ করছিলেন। বিনুর প্রশ্ন শুনে দুজনই হেসে ওঠেন। বাবা বলেন, 'তা না হলে সৃষ্টিরক্ষা হবে কী করে?' বন্ধুও পুনরুক্তি করেন।

বন্ধুর কন্যার নামও ছিল 'সৃষ্টি'। মা-মরা মেয়ের বিয়ে দিয়ে যিনি সংসার ত্যাগ করেছেন।

সৃষ্টিরহস্য বিনু সেই সূত্রেই জেনেছিল। ওরকম বই যে কেমন করে ওরকম জায়গায় এল সেইটেই আশ্চর্য। বিষয়টা তখনকার দিনে বিলেতেও নতুন। কিন্তু চিরপুরাতন। সব দেশে সব স্ত্রী-পুরুষ জানে কিন্তু জানায় না। বিনু আরও বড়ো হয়ে অসংখ্য বিদেশি পুস্তক পড়েছে—প্রেমের কাহিনি, অথচ কাম পর্যন্ত এসে সম্পূর্ণ নীরব। কারণটা পরে টের পায়। কড়া আইনকানুন। না মানলে জেল, জরিমানা, বাজেয়াপ্তি। লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক আদালতের কাঠগড়ায়। লাঞ্ছনার শিকার ফ্লোবেয়ার, জোলা, ডি এইচ লরেন্স, জেমস জয়েস, আঁদ্রে জিদ প্রমুখ।

যেখানে যত নিষেধ সেখানে তত কৌতূহল। কৌতূহলই নিষিদ্ধ গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। নিষেধ তুলে নিয়ে দেখা যায় বইখানা সত্যি এমন কিছু মূল্যবান নয়। কৌতূহল মিটে গেলে চলনসই।

একটি বনেদি শাক্ত পরিবার রাতারাতি বৈষ্ণব বনে যাওয়ায় যে পরিবর্তনটা ঘটে সেটা এক হিসাবে বৈপ্লবিক। এতকাল যে দেবীপ্রতিমা বেদিজুড়ে বসেছিলেন তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হয়। গোপাল বসেন রাজআসনে। রান্নাঘরে মাছ-মাংস ঢুকতে পারে না। জীবে দয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম অনুশাসন। জীবহত্যা বারণ। সবাই নিরামিষ খায়, বিনু মাঝে মাঝে বাড়ির বাইরে বাগানের এককোণে মাংস রেঁধে বনভোজন করে। বাবা আঘাত পান। তিনি একদা শিকার করতেন, তাঁর একটি বন্দুক ছিল। সেই তিনি ডুবন্ত পিঁপড়েকে জল থেকে উদ্ধার করেন। মাছি মারলেও তাঁর কষ্ট হয়। এর মধ্যে ভন্ডামি ছিল না। তিনি যখন যেটা করতেন চূড়ান্ত করতেন, মাকেও তা মানতে হত; কিন্তু ছেলে-মেয়েরা যে অবোধ।

বৈষ্ণব ধর্মের দ্বিতীয় অনুশাসন হল নামে রুচি। নামসংকীর্তন! বিনুদের তাতে বিরাগ ছিল না, অনুরাগ ছিল। তিনটে খোল কিনে দেওয়া হয় তিন ভাইকে। মেজোভাই ওস্তাদ হয়ে ওঠে। বিনু বাজাতেই পারে না। কিন্তু নগরসংকীর্তনে বেরিয়ে বাহু তুলে নাচে। কিছুদিন পরে তাতেও অনীহা আসে।

বাবা তাকে বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। সে যেটুকু বিশ্বাস করত সেটুকু স্বাধীনভাবেই করত, কারও কথায় নয়। বাবাকে প্রণাম করলে তিনি বলতেন, 'কৃষ্ণে মতি হোক।' তার বেশি মুখ ফুটে চাইতেন না। কোনো এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন ছেলেদেরও বৈষ্ণব দীক্ষা দিতে। তিনি সে-পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন। তাঁর বিশ্বাস তিনি ওদের উপর চাপিয়ে দেবেন না। ওদের বয়স হলে ওরা নিজেরাই তেমন কোনো সিদ্ধান্ত নেবে, নিলে গুরু বেছে নেবে—তিনি নিজে যা করেছিলেন।

তবে বাবা একবার বিনুকে সকালে কিছুক্ষণ ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে ধ্যান করতেন। কাকে ধ্যান, কীসের ধ্যান, কেন ধ্যান—বিনু দু-চার দিন চোখ বুজে রয় তারপর ছেড়ে দেয়। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সে একদিন তার চোখ থেকে পর্দা সরে যায়। সব আলো হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে সে বিশ্বরূপ দর্শন করে। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে আরও এক জগৎ আছে, এই জগৎই সমগ্র জগৎ নয়, দুই মিলিয়ে সম্পূর্ণ সৃষ্টি। বিনুর আরও একবার এই উপলব্ধি হয় বিশ-একুশ বছর বয়সে। মুহূর্তের জন্যে সব আলো হয়ে যায়। সে সমগ্রকে দেখতে পায়, কিন্তু খোলা চোখে নয়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই আবার এই দিব্যদৃষ্টি লাভ হয় না। এটা পরমাত্মার অনুগ্রহ। আবার কবে তাঁর অনুগ্রহ হবে কে জানে!

বিনুর অন্তরে একজন মিস্টিক ছিল, তাই সে কখনো পুরোপুরি র‍্যাশনালিস্ট হয়নি। তেমনই তার ভিতরে একজন বিশ্বনাগরিক ছিল, তাই সে কখনো পুরোপুরি ন্যাশনালিস্ট হয়নি।

তার বারো-তেরো বছর বয়সে বাবা একবার বলেছিলেন, 'তুই হবি জর্জ ওয়াশিংটন আর চিনু হবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।' শুনে বিনু পুলকিত হয়নি। তার মতে নেপোলিয়নই বীরশ্রেষ্ঠ। ওয়াশিংটন তাঁর দেশকে স্বাধীন করেছিলেন তা ঠিক, তা বলে নেপোলিয়নের চেয়ে বড়ো নন। বাবা কি মনে করেন বিনু চিনুর চেয়ে খাটো? অবশ্য গায়ের জোরে চিনু বিনুকে হারিয়ে দেয়।

বিনু ওয়াশিংটন হতে চায়নি। তবে পিতার আশীর্বাদ তো ব্যর্থ হবার নয়, সে আমেরিকায় পালিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিল। সে-দেশে গিয়ে সন্ত নিহাল সিং বা ধনগোপাল মুখার্জির মতো একজন লেখক হত। সেভাবেও ভারতের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করা যায়। কলম তো তলোয়ারের চেয়ে বলবান। লোকে একদিন স্বীকার করবে যে বিনুও একজন মুক্তিদাতা ওয়াশিংটন।

আমেরিকা গেলে সে সেখানেই বিয়ে করত, এটাও তার কল্পনায় ছিল। রূপকথার রাজপুত্র সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে গিয়ে সে-দেশের রাজকন্যাকে বিয়ে করত। গুরুজন সেটা মেনেও নিতেন। বিনুর বেলা অন্যরকম হবে কেন? সে অবশ্য কোনোদিন একথা কাউকে জানতে দেয়নি। কথাটা সত্যি সত্যি ফলে যায় তার জীবনে অনেক বছর বাদে। সাত সাগর পার থেকে আসেন এক মার্কিন কন্যা। বিনুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। মা তখন নেই, থাকলে কী মনে করতেন কে জানে। বাবার তো আপত্তির কোনো সঙ্গত কারণ

ছিল না। তিনি বলেও রেখেছিলেন যে বিনু জাতপাত ভেঙে বিয়ে করলেও তিনি সম্মতি দেবেন। অতটা ভেবে দেখেননি যে কন্যাটি বিদেশিনি হবে। যা-ই হোক, সব ভালো যার শেষ ভালো। বিনুর বউকে তিনি আশীর্বাদ করেন। বউমাও শ্বশুরকে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রণতি জানায়।

বিনুকে তার বাবা একান্তে বলেন, 'তোদের ছেলে-মেয়ে হলে তাদের বিয়ে হবে কোন সমাজে?'

'হিন্দু সমাজ ততদিনে উদার হবে।' বিনু আশ্বাস দেয়।

বছর ছয়েক বাদে তিনি অকস্মাৎ মারা যান। চিনু মুখাগ্নি করে। বিনু আর তিনু অন্যত্র কর্মরত। শ্রাদ্ধের সময় তিন ভাই একত্র হয়। কুলপুরোহিত বলেন, 'চিনু মুখাগ্নি করেছে, চিনুই শ্রাদ্ধের অধিকারী। বিনু তো হিন্দুমতে বিয়ে করেনি, বিয়েতে আমাকে তো ডাকেনি। আমি কেমন করে ওকে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াব?' বিনু হতবাক। তিনু বলে, 'বাবা তো তাঁর বড়োছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করেননি। বাবার ইচ্ছা মান্য করতে হবে।' কুলপুরোহিত বিধান দেন যে তিন ভাই পাশাপাশি বসে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়বে। তখন সারিবদ্ধভাবে ক্রিয়াকর্ম করে তিন জনে। বিনু মনে মনে আহত হয়, অভিমান ও অপমান চেপে রাখে। মন্ত্রতন্ত্রে ওর বিশ্বাস ছিল না। যন্ত্রের মতো আওড়ায়।

স্থানীয় ব্রাহ্মণরা ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। বলেন, 'উনি মেম বউকে ঘরে নিয়েছিলেন। আমরা ওঁর শ্রাদ্ধে খাব না।' অথচ এঁরাই এককালে বাবার অনুগ্রহে চাকরি বা প্রমোশন পেয়েছেন বা অন্য কোনো সুবিধা। বিনু যদি দোষ করে থাকে তবে তার বাবা কেন শাস্তি পাবেন? চিনু রাগ করে শহরের মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। ঠাকুরঘরের বারান্দায় পরিবারের লোকজনের সঙ্গে তাদের বসিয়ে দেওয়া হয়। বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব। স্থানীয় নন, বহিরাগত। তিনি আপনি এসে হাজির হন ও প্রধান অতিথির আসনে বসেন। ওসব সংস্কার তাঁর ছিল না। বিনুকে তিনি নৈতিক সমর্থন জোগান। সবচেয়ে আনন্দ মুসলমানদের। এ বাড়ির অন্দরে তারা কখনো ঢুকতে পারেনি। তারা তো কীর্তনিয়া নয়।

স্থানীয় ব্রাহ্মণরা না কি পরে অনুতপ্ত হন। চিনুকে বলেন, 'আবার আমাদের ডাকো। ডাকিলেই খাইব।'

প্রকৃত প্রতিবেশী কে? বাইবেলে গুড সামারিটানের প্যারাবল আছে। বিপদের দিনে যে-জন সহায় সে বিদেশি বা বিধর্মী হলেও সে-ই প্রকৃত বান্ধব। সামারিটানদের সঙ্গে ইহুদিদের ছিল নিত্য কলহ। ডাকাতের হাতে জখম ইহুদির দিক থেকে স্বজাতি যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায় তখন বিজাতীয় পথিক তাকে সরাইতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, নিজের খরচে।

হিন্দু-মুসলমানের নিত্য কলহে উদ্‌ভ্রান্ত হলেও বিনু ভুলতে পারে না যে মুসলমানদের মধ্যেও গুড সামারিটান আছে। পার্টিশনের অনতিকাল পূর্বে ময়মনসিংহে এক ভদ্রলোক তার সঙ্গে দেখা করেন। কথাপ্রসঙ্গে বিনু জানতে পারে তাঁর গ্রামে তিনিই একমাত্র হিন্দু গৃহস্থ। বাড়িতে স্ত্রীকে একা রেখে টুর করেন। 'সেকী! আপনার ভয় করে না? বিপদের সময় কে রক্ষা করবে তাঁকে!' বিনু প্রশ্ন করে।

'কেন? পাড়ার মুসলমানরা। তারাই তো এতকাল রক্ষা করে এসেছে। আমরা তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।' তিনি উত্তর দেন।

পার্টিশনের ঠিক আগে ঢাকা থেকে এক ভদ্রলোক ময়মনসিংহে আসেন। বিনু জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি থাকছেন না যাচ্ছেন?' তিনি স্মিতমুখে বলেন, 'আমি থাকছি। মানুষের অন্তর্নিহিত গুডনেসে আমি বিশ্বাস করি।'

এই অন্তর্নিহিত গুডনেসে বিশ্বাস করতেন বিনুর বাবা। তাই তাঁর মুসলিম বন্ধুর অভাব ছিল না। তাঁদেরই একজন বিনুকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার পূর্বে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে কমিশনারের সকাশে নিয়ে যান। একদা তিনি ছিলেন বাবার স্কুলের সহপাঠী। মাঝখানে কেটে গেছে পঁয়ত্রিশ বছর। তিনি উচ্চপদস্থ, বাবা নিম্নপদস্থ। বন্ধুতা জাতধর্মের বিচার করে না, প্রেমও তেমনি।

বিনুর প্রস্তুতি

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় বিনুর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি বেঁচে থাকলে তাকে চোখের আড়াল করতেন না। সে কলেজে পড়তে গেলে তিনিও তাকে নিয়ে বাড়িভাড়া করে বাস করতেন। বিনুর কিন্তু অন্যরকম পরিকল্পনা। সে কলকাতা গিয়ে সংবাদপত্রে শিক্ষানবিশি করবে। তারপর সুযোগ পেলেই জাহাজের খালাসি হয়ে আমেরিকা যাত্রা করবে। তার নিজের জীবনকে সে নিজের মতো করে বাঁচবে, গুরুজনের ইচ্ছামতো নয়। তার বাবার ইচ্ছা সে পরের চাকরি না করে স্বাধীনভাবে চাষবাস করে। কিছু জমিও তিনি কিনেছিলেন। তবে সাংবাদিক বৃত্তিও স্বাধীন বৃত্তি। তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না। বিনু তাঁর অনুমতি নিয়েই কলকাতা যায়। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লেখেন। বন্ধু তাঁর সম্পাদক বন্ধুদের চিঠি লেখেন। বিনু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

বাংলা দৈনিকের সম্পাদক তাকে পরামর্শ দেন আগে ইংরেজি শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং শিখতে। ওই দুটি বিদ্যা শিখতে গিয়ে বিনু দেখে ট্রেনিং ক্লাসে তার সতীর্থরা সকলেই কেরানি হবার জন্যে তালিম নিচ্ছে। সে তো কেরানি হতে চায়নি, তবে কেন সময় নষ্ট করবে? তারপর ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক বলেন আগে প্রুফ-রিডিং শিখতে। যাঁর কাছে পাঠান তিনি বলেন, ‘আপনাকে যদি শেখাই তো আপনি আমার দানাপানি মারবেন।’ বিনু তাঁকে বোঝায় সে প্রুফ-রিডার হতে আসেনি, সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে এসেছে। ‘তাহলে আপনি কলেজে গিয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়ে আসুন।’ ভদ্রলোক পরামর্শ দেন। বিনু অপমানিত হয়ে বিদায় নেয়।

কলকাতায় থাকা নিরর্থক, টাকাও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু কোন মুখে বাড়ি ফিরে যাবে? চাষবাসে তার মন ছিল না। কায়িক পরিশ্রমকে সে চিরকাল এড়িয়ে এসেছে। সে বর্তে যায় যখন তার ছোটোকাকা তাকে কলেজে ভরতি হতে ডেকে পাঠান। তখন অসহযোগের আমল। কলেজ মানে গোলামখানা। মাথা হেঁট করে বিনু সেই গোলামখানায় নাম লেখায়। সান্ত্বনা এই যে, তারই মতো আরও কয়েক জনও সেখানে জুটেছে। তারা তার সঙ্গে মিলে একটি গোষ্ঠী গঠন করে। পাঁচজনে মিলে একটি হাতে-লেখা পত্রিকায় যে যা খুশি লেখে—যেকোনো ভাষায়। বিনু লেখে বাংলা, ওড়িয়া, ইংরেজি তিন ভাষায়। অন্যেরা একটি বা দুটি ভাষায়। অচিরেই বিনু ও তার বন্ধুদের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখা দিল বিভিন্ন ভাষার পত্রিকায়।

তারা তখন জানত না যে ওড়িয়া ভাষায় একটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তারাই সে-যুগের পুরোধা। যুগটির নাম সবুজ যুগ। তার স্থায়িত্ব প্রায় বারো বছর। বিনু কিন্তু ততদিন সে-যুগের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। ছ-বছর পরে সে বিলেত চলে যায় সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষায় সফল হয়ে। তার এক বছর আগেই সে স্থির করে যে কেবল একটি ভাষাতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবে। একই কালে তিনটিতেই সাহিত্যের সাধনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। যেমন একই কালে তিনটি নারীকে নিয়ে প্রেমের সাধনা। তার পক্ষে সেই একটি হবে বাংলা ভাষা। তার এই সিদ্ধান্তে বন্ধুরা বিস্মিত হয়। কারণ ওড়িয়া ভাষায় তার কবিতা *উৎকল সাহিত্য* সম্পাদক প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশ করতেন। এক-একটি সংখ্যায় একাধিক প্রবন্ধ তার স্বনামে বা ছদ্মনামে পত্রস্থ হত। ওদিকে কলেজ ম্যাগাজিনেও তার ইংরেজি প্রবন্ধ বেরোত প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়। তার বাংলা রচনা তুলনায় কম। তবে *প্রবাসী* একবার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গের পর সম্মানের আসন দিয়েছিল তার একটি সুদীর্ঘ কবিতাকে। *ভারতী*-ও তার প্রবন্ধ মাঝে মাঝে প্রকাশ করত। একবার তো *বঙ্গনারী* (অনিন্দিতা দেবী) তার বিরুদ্ধে মসিতে অসিধারণ করেন। লেখা পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল বিনু পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। তিনি জানতেন না যে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের সেই ছেলেটি পুরীর সমুদ্রকূলে প্রতিদিন তাঁর পিছন পিছন বেড়াত, যখন পুরীতে ছুটি কাটাতে যেত। তাঁর পুত্র অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে পরবর্তীকালে বিনুর বন্ধুতা জমে ওঠে।

বিনুর বাংলা ভাষার শিক্ষানবিশি কেবল মুদ্রিত রচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কলেজের শেষ তিন বছর সে রাশি রাশি চিঠি লিখেছিল রোজ এক বার কি দু-বার। ছোটো বড়ো প্রায় হাজার খানেক চিঠি একই নারীকে লেখা। সংগীতের যেমন রেওয়াজ, সাহিত্যেরও তেমন অভ্যাস। নিয়মিত ও নিরলস সেই অভ্যাস ছিল বিনুর আত্মবিশ্বাসের মূলে। সে সব চিঠি হারিয়ে গেছে। সে সব ছিল প্রেমপত্রের চেয়ে কিছু বেশি। বিনু তার অধীত

বিষয়ের অংশ দিত তার পাঠিকাকে। আর তার অধীত বিষয় ছিল প্রধানত ইউরোপীয় সাহিত্য তথা ইউরোপের ইতিহাস। লাইব্রেরি উজাড় করে সে বই নিয়ে আসত ও পড়ত।

এক এক সময় বিনুর মনে হত জীবনে দুটি মাত্র আনন্দ আছে। পাটনার গঙ্গায় সন্তরণ ও ইউরোপের ইতিহাস অধ্যয়ন। পরীক্ষার পড়ার চেয়ে বেশি ছিল তার ইতিহাসচর্চা। ইউরোপের মানসলোকের প্রবেশপত্র তার ইতিহাস। ইউরোপের সাহিত্য তো তার চিরপরিচিত। শেক্সপিয়ার ও বাইবেল তার ছেলেবেলা থেকেই চেনা। প্রাইজও সে পেয়েছে স্কুল থেকে কত ইংরেজি বই। কিন্তু কলেজে গিয়ে পেয়ে যায় বিশ্বসাহিত্যের সম্ভার—ইবসেন, ব্যোর্নসেন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি, আনাতোল ফ্রাঁস, রম্যাঁ রল্যাঁ, বারট্রাণ্ড রাসেল, এইচ ডি ওয়েলস, অস্কার ওয়াইল্ড, বার্নার্ড শ প্রমুখের গ্রন্থ।

এসব বই পড়তে পড়তে লেখার আর্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা জাগে। আশ্চর্যের ব্যাপার, কিছুই টলস্টয়ের মনে ধরে না। আর্ট বলতে তিনি যা বোঝেন তা লোকসাহিত্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। তাঁর নিজের *সমর ও শান্তি* আর *আনা কারেনিনা* তাঁর মতে আর্টের নিকষে উত্তীর্ণ নয়। কেবল তেইশটি উপকথাই উত্তীর্ণ। বিনু তা পুরস্কার স্বরূপ পায় ও তার থেকে একটি বাংলায় অনুবাদ করে; *প্রবাসী*-তে বেরোয়।

সে একদিন শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, 'আর্ট কি এতই ভালো যে মানবচিত্তের প্রতিদিনের আহার্য হতে পারে না?' তিনি উত্তর দেন, 'তা কী করে হবে? উচ্চতর গণিত কি অনায়াসে বোঝা যায়?' তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ে ভাষণ দিতে যাচ্ছিলেন। বিনুকে বলেন তাঁর ভাষণ বিশদ করবেন। বিনু সে-ভাষণ শোনেনি। পরে জেনেছিল তাতে তিনি তার প্রশ্নের উল্লেখ করেছিলেন।

তাঁর সঙ্গে শুধু টলস্টয়ের নয়, রম্যাঁ রল্যাঁরও মতপার্থক্য ছিল। আর বিনু তখন এই দুই মনীষীর প্রভাবেও পড়েছে। এঁদের দৃষ্টি বিদগ্ধ নাগরিকদের উপরে নয়, অন্তেবাসী জনগণের উপরে। বিনুর সহানুভূতিও তাদের উপরে। চিরকাল তারা ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত। উচ্চবর্ণের বা উচ্চশ্রেণির দ্বারা নিষ্পেষিত। গান্ধীজিও তো তাদের জন্যেই চরকায় সুতো কেটে একাত্মতা প্রকাশ করতে বলেন। নিজে শ্রমিক না হলে শ্রমিকের অন্তর বোঝা যায় না।

কিন্তু তাদের জন্যে তাদের মতো করে লিখলেই কি সেটা আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ হবে? যদি আর্ট হিসাবে উত্তীর্ণ না হয়, তবে তা কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে না? বিনু নিজের মতো করে লিখতে চায়, পরের মতো করে নয়। পরের গ্রহণযোগ্য হলে সে প্রীত হয়, না হলেও সে সৃষ্টির আনন্দে বিভোর।

তা হলেও সে স্বীকার করে যে জনগণের জন্যে তারও কিছু করা উচিত। সে চরকা কাটে না, কিন্তু খাদি পরে। এমন কী বিষয় আছে যা নিয়ে জনগণের জন্যে সাহিত্য সৃষ্টি করা যায়? সমসাময়িক রাজনীতি বাদে! বিনু ভাবে।

ইতিমধ্যে সে নারীর মুক্তি ও নর-নারীর সাম্য নিয়ে লিখতে শুরু করেছিল। তার এক বন্ধু জাতপাতের বিরুদ্ধে লিখতেন। একদিন সে দেখে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজিতে এক কবিতা বেরিয়েছে। লিখেছেন তাদের ইংরেজির অধ্যাপক। কবিতার নাম 'অ্যান অ্যান্টিফেমিনিস্ট ক্রাই'। বিনুর গা জ্বলে যায়। সেও ইংরেজিতে কবিতা লিখে কবির গানের চাপানের উতোর দেয়। তার কবিতার নাম, 'আ ফেমিনিস্ট কাউন্টার ক্রাই'। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক সেটাও প্রকাশ করেন। অধ্যাপক আর উচ্চবাচ্য করেন না।

আর একদিন বিনুর বিরোধ বাঁধে সংস্কৃতের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গে। নারী কখনো পুরুষের সমান হতে পারে না শুনে সে দাঁড়িয়ে উঠে প্রতিবাদ করে। তিনি তাকে ক্লাসের শেষে বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একান্তে বলেন, 'তুমি যা-ই বলো-না কেন, প্রকৃতি ওদের নীচু করেছে। যেমন মৈথুনের সময়।' পিতৃবয়সির মুখে এ যুক্তি শুনে বিনু তো লজ্জায় নিরুত্তর। ধরা পড়ে যাবে, যদি বলে বিপরীত বিহারের সময় নারী উপরে পুরুষ নীচে। সে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে পড়েছিল।

ভারতী-তে প্রকাশিত 'বারোয়ারি উপন্যাস' বেরোলে ওইরকম একটি যৌথ উদ্যোগের পরিকল্পনা করে বিনু ও তার বন্ধুরা। বিনুকে লিখতে হয় মাঝখানের তিনটি পরিচ্ছেদ। কষ্ট হয় জোড় মেলাতে। বাইরে থেকে

কয়েক জনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। তাদের তিন জন মহিলা। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। নিন্দা প্রশংসা দুই-ই জোটে।

সমাজ সম্বন্ধে বিনু এত কম জানত যে তার পক্ষে সামাজিক উপন্যাসে হাত দেওয়া ধৃষ্টতা। নিজেকে জেনে কবিতা লেখা যায়, কিন্তু উপন্যাস লিখতে হলে সমাজকে জানতে হয়; বিশেষত পরের জীবনকে। দশখানা উপন্যাস পড়ে একখানা উপন্যাস লিখতে সকলেই পারে, কিন্তু নিজস্ব জ্ঞান ও নিজস্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে তেমন উপন্যাস যেন কাগজের ফুল। বিনু কাগজ দিয়ে কাগজের ফুল বানাতে চায় না, সে ফোটাতে চায় জীবনের ফুল। তারজন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আর ওরকম যৌথ উদ্যোগ সাহিত্যে সাজে না। তবে দুজনে মিলে উপন্যাস লেখার নজির আছে। তার জন্যে হতে হয় অভিন্ন হৃদয়—সেটা দুরাশা।

আর্ট জিজ্ঞাসার মতো জীবনজিজ্ঞাসাও বিনুর চিন্তাজুড়ে ছিল। এ জীবন নিয়ে সে কী করবে? এ জীবন যিনি দিয়েছেন তিনি তাকে কী করতে বলেন? কী হতে? এদেশের রঙ্গমঞ্চে এ যুগের নাটকে তার কী ভূমিকা? একজন শিল্পী না একজন কর্মী না একজন ভাবুক না একজন প্রেমিক? না চারটি ভূমিকায় একই অভিনেতা যখন যেমন তখন তেমন?

তাকে সংকটে ফেলেছিল তার আদর্শের সঙ্গে তার ভাবী জীবিকার অসঙ্গতি। টলস্টয় ও গান্ধীর মতো সেও মনে করত রাষ্ট্র হচ্ছে একটা শাসনযন্ত্র। শাসন বলতে বোঝায় মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য। এর জন্য চাই সৈন্যদল, পুলিশ, আদালত, কারাগার। ইদানীং যোগ দিয়েছে আইনসভা। আইন দিয়ে মানুষ মানুষকে চালনা করেন। আদর্শ সমাজে এসব বালাই থাকবে না। মানুষ শাসনমুক্ত হবে, সেইসঙ্গে শোষণমুক্ত। শাসকরা শোষকদেরই অন্তরঙ্গ।

পার্লামেন্ট সম্বন্ধে বিনুর নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। তা ছাড়া বাকি সব বিষয়ে সে নেতিবাদী। বলা যেতে পারে নৈরাজ্যবাদী। অবশ্য অহিংস নৈরাজ্যবাদী। এমন মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রে শাসনচক্রের একজন চক্রধর হতে চাওয়া কি পরধর্ম নয়? পরধর্ম ভয়াবহ। গ্র্যাজুয়েট হয়ে সাংবাদিক হলেই সে ভালো করত।

কিন্তু *চার ইয়ারী কথা*-র ইংল্যাণ্ড তাকে টানছে। ফরাসি বিপ্লবের ফ্রান্স তাকে টানছে। আধুনিক জগতের মুখ্য স্রোত এই দুই দেশেই। বিংশ শতকের সন্তান সে, তাকে অবগাহন করতে হবে তার স্বযুগের মুখ্য স্রোতে। তা বলে স্বদেশকে সে ভুলবে না। ভারতে ফিরে আসবে দু-বছর বাদে। চাকরি ছাড়বে আরও পাঁচ বছর বাদে। সম্পাদক হতেই তার সাধ। তবে সাধনা তার সাহিত্যিক হওয়ার। তাকে অন্তত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই সাধনা সাঙ্গ করতে হবে। যে বয়সে মা গত হন।

পূর্ব দিক আর পশ্চিম দিক বলে দুটো দিক আছে, বিনু তা জানে ও মানে। ভৌগোলিক অর্থে পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন কোনো কালেই হবে না। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কি সে কথা খাটে? অবশ্য সংগীতের ক্ষেত্রে, নৃত্যের ক্ষেত্রে অন্য কথা। কিপলিং যে বলেছেন, প্রাচী হচ্ছে প্রাচী আর প্রতীচী হচ্ছে প্রতীচী; তাদের মিলন কোনোকালে হবে না—এতে বিনুর আন্তরিক আপত্তি। *সবুজপত্র* থেকে সে যেসব আইডিয়া পেয়েছিল তার একটি হল প্রাচী প্রতীচ্য সমন্বয়। এর জন্যে তাকে প্রতীচ্য সম্বন্ধে সমান অভিজ্ঞ হতে হবে; তারজন্যে প্রতীচ্য দেশে বাস করতে হবে; সেখানকার জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করতে হবে। শুধু বই পড়া ও লেকচার শোনাই যথেষ্ট নয়, বিনুকে সশরীরে ইউরোপ যেতে হবে; ভারতের সঙ্গে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল তা নিজের চোখে দেখতে হবে ও নিজের মন দিয়ে বিচার করতে হবে।

প্রাচীর মানুষ প্রাচীন আর প্রতীচীর মানুষ আধুনিক। এটা কিন্তু এক হিসাবে ঠিক। প্রাচীনত্বের জন্যে ভারতীয়রা গর্বিত। আধুনিকতার জন্যে ইউরোপীয়রা। কিন্তু প্রাচীও আধুনিক হতে পারে, আধুনিকতার জন্যে গর্বিত হতে পারে। তার দৃষ্টান্ত জাপান। ভারতই-বা সেই অর্থে আধুনিক হতে পারবে না কেন? কিন্তু সত্যিকার আধুনিকতা কেবলমাত্র ফলিত বিজ্ঞানের যান্ত্রিক কুশলতায় নয়, মননশীলতায় ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসে। জাপান কি সেই অর্থে অধুনাতন না পুরাতন?

ভারতীয়রাও বাইরে অধুনাতন ও ভিতরে পুরাতন হতে পারে। তার লক্ষণ বিনু স্বদেশের নাগরিক জীবনে লক্ষ করছে। গ্রামগুলি কি শহরগুলোর মতো হবে? গান্ধীজি সেটা চান না। কিন্তু তারা যদি কোনো অর্থেই আধুনিক না হয় তবে তো মধ্যযুগেই থেকে যাবে। শহর আর গ্রামের মধ্যে কি দুই-তিন শতাব্দীর ব্যবধান থাকবে? তবে কি শহরগুলোও মধ্যযুগে ফিরে যাবে? 'গ্রামে ফিরে যাও' মানে কি মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া? বিনু গ্রামে যেতে রাজি আছে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি থাকতে, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে। রুশোর শিক্ষাও তার মনের উপর কাজ করছিল। সভ্যমানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে সরে আসতে আসতে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছে। টলস্টয়, থোরো, গান্ধী এর জন্যে সভ্যতাকেই দোষ দিচ্ছেন। বিনু এর একটা মীমাংসা চায়। এর জন্যেও তার ইউরোপে যাওয়া দরকার।

প্রতীচীর যৌবনের উপর তার অপরিসীম বিশ্বাস। কচ গিয়েছিলেন অসুরগুরুর কাছে মৃতসঞ্জীবনীর মন্ত্র শিখতে। বিনুর মনে হয় সেও যাচ্ছে আধুনিক প্রতীচীর কাছে অনুরূপ জরা সংযুবনী মন্ত্র শিখতে। যা শিখে আসবে তা শেখাবে। ভারতও হবে নবযৌবনের দেশ। অপরপক্ষে ভারতও প্রতীচীকে শেখাবে গান্ধীজির কাছে সত্য ও অহিংসার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ।

বিনু ও তার বন্ধুরা মিলে যে বারোয়ারি উপন্যাসে হাত লাগায়, গোষ্ঠীর বাইরে থেকে তিন জন লেখিকাও তাতে হাত মেলান। তাঁদের একজন বিবাহে অসুখী মুক্তিপ্রাণা। বিনুর ভিতরে একজন মধ্যযুগীয় নাইট ছিল। লেডি ইন ডিসট্রেস দেখে তার শিভালরি জাগ্রত হয়। সে তাঁকে মুক্ত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। সেই সূত্রে সঞ্চারিত হয় প্রেম। প্রণয় থেকে পরিণয়ের অভিলাষ অঙ্কুরিত হয়। ইতিমধ্যেই সাংবাদিকতায় বিনুর অনীহা জন্মেছিল। সে হতে চায় কবি, মনীষী, অন্তর্দর্শী। জীবিকা হিসাবে সে বেছে নেয় ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। প্রতিযোগিতায় সফল হলে আকৈশোর প্রতীক্ষিত সমুদ্রযাত্রা। যাবে আমেরিকার পরিবর্তে ইউরোপে। বিলেতে দু-বছর শিক্ষানবিশি। তাঁকেও সে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়। যেটা সম্ভব নয় সেটা বিদেশে সম্ভব। অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদপূর্বক পুনর্বিবাহ। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে মা হয়েছিলেন। স্বামীর সঙ্গেও সন্ধি হয়েছিল। তিনি মুক্তির প্রশ্ন শিকেয় তুলে রাখেন। বিনু তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি পায়। জীবিকার প্রতিযোগিতায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে প্রথম হলেও প্রেমের পরীক্ষায় সে বিফল হয়। এইটুকু তার সান্ত্বনা যে, সে ইউরোপ দর্শনে যেতে পারছে। সেখানেই তার 'tryst with Destiny'.

প্রেমের উপলব্ধি না হলে প্রেমের কবিতা লেখা যায় না—কিংবা প্রেমের গল্প উপন্যাস। বিশ্বসাহিত্যে প্রেমের কবিতা, প্রেমের কাহিনি আদিকাল থেকেই সর্বমানবের মহামূল্য উত্তরাধিকার। বিনুরও অভিলাষ ভাবীকালের জন্য সেরূপ উত্তরাধিকার রেখে যাওয়া।

তার সে-অভিলাষ কতক পরিমাণে পূর্ণ হয় যখন প্রেম এসে আর্টের সঙ্গে যোগ দেয়। তার জীবনে প্রেম আর আর্ট একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। প্রেম যদি মিলনান্ত নাও হয়, তা হলেও সে আর্টের প্রাণস্বরূপ। বিশ্বসাহিত্যে বিয়োগান্ত প্রেমই তো সংখ্যায় বেশি। কমেডির চেয়ে ট্র্যাজেডিরই আধিক্য। বিদগ্ধ পাঠকের কাছে ট্র্যাজেডিই প্রিয়তর।

বিনুর মনে হয় তার সমবয়সি বন্ধুদের চেয়ে তার বয়স তিন বছর বেড়ে গেছে—বাড়িয়ে দিয়েছে তার প্রেমের অভিজ্ঞতা। তার দেহের তুলনায় হৃদয় হয়েছে আরও পরিণত। তাকে পরিণত করেছে প্রেমের তিক্ত মধুর রস। আনন্দের সঙ্গে বেদনার মিশ্রণ। প্রেম তাকে হাসিয়েছে, কাঁদিয়েছে, নাচিয়েছে, জ্বালিয়েছে, খাটিয়েছে, মাতিয়েছে, খেলিয়েছে, ভাবিয়েছে, লড়িয়েছে। সব কিছু তোলা রয়েছে পরে একসময় সাহিত্যে রূপায়িত হবার জন্যে। শিল্পীর জীবনে কোনো অভিজ্ঞতাই বৃথা নয়। প্রেমের অভিজ্ঞতা তো নয়ই। কারো কারো জীবনে তারই মূল্য সবচেয়ে বেশি। সেদিক থেকে বিচার করলে বিনু একজন ভাগ্যবান শিল্পী।

শেলি, কিটস প্রমুখ রোম্যান্টিক কবিদের সঙ্গেই ছিল তার অ্যাফিনিটি। একইসঙ্গে ছিল বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গেও। কবি হতেই সে চেয়েছিল, ঔপন্যাসিক হতে নয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তাকে ঔপন্যাসিক হতে হয়।

বিনুর নিয়তি

বারো বছর বয়সে *সবুজপত্র* পড়ার পর থেকে বিনুর মনে গেঁথে যায় চার-পাঁচটি আইডিয়া। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির বিকাশ হয়। একটি আইডিয়া হল প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমন্বয়। প্রতীচ্যে না গেলে, নিজের চোখে না দেখলে, লোকের সঙ্গে না মিশলে কেমন করে তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো যায়? ইটারনাল ফেমিনিন আর একটি আইডিয়া। তার অর্থ বুঝুক আর না-বুঝুক সে তার সন্ধানে বেরোত চায় রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আর একটি আইডিয়া হল আর্ট। কথাটার মানে কী তা জানার জন্যে সে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করে টলস্টয়ের 'আর্ট কী' পড়ার পর রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে যায়। আরও এক আইডিয়া অফুরন্ত যৌবন। কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে। এর অর্থ অনুধাবন করতেও আরও কয়েক বছর লাগে। যে আইডিয়াটা সবচেয়ে আগে কাজে পরিণত করা সম্ভব হল সেটা চলতি বাংলায় টলস্টয়ের একটি উপকথা অনুবাদপূর্বক প্রকাশ করায়।

সে সতেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়েছিল আমেরিকার অভিমুখে সমুদ্রপথে। পাগলামি! কলকাতা থেকে ফিরে এসে কলেজে ভরতি হয়। কথা ছিল গ্র্যাজুয়েট হয়েই কলকাতা ফিরে গিয়ে সাংবাদিকতায় ব্রতী হবে ও পরে একসময় আমেরিকায় যাবে। কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হয়ে সে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় সফল হল। এখন তাকে যেতে হবে শিক্ষানবিশির জন্যে বিলেতে, সেখানে থাকতে হবে দু-বছর। এও তো সেই সমুদ্রযাত্রা। যদিও আমেরিকা অভিমুখে নয়, ইউরোপ অভিমুখে। হ্যাঁ, এটাও তার মনের আড়ালে কাজ করছিল বারো বছর বয়সে *চার ইয়ারী কথা* পড়ার পর থেকে। ইউরোপে না গেলে সে কোথায় দেখা পাবে venus de milo-র। আমেরিকার লিবার্টি মূর্তি তার সমতুল্য নয়। কলেজে গিয়ে বিনু ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসে বুঁদ হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে ইউরোপ তাকে চুম্বকের মতো টানে। ইউরোপে যাবার সুযোগটা এনে দেয় প্রতিযোগিতা। সফল না হলে সে সাংবাদিক ব্রতেই ফিরে যেত। তার কাছে সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি নয়, একটা ব্রত। 'ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অব লিবার্টি।' স্বাধীনতার মূল্য অতন্দ্র প্রহরা। সৈনিকদের মতো সংবাদপত্রকাররাও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলে বিনু সেই ব্রত বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সে উপলব্ধি করেছিল যে তার লেখনী সাংবাদিকের নয়, সাহিত্যিকের লেখনী। সে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির পন্থী, তাই সাংবাদিকতার মায়া কাটাতে কষ্ট হয় না। একটি বিশিষ্ট মাসিকপত্রের ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি লেখার জন্যে সে প্রতিশ্রুতি দেয়। জাহাজে ওঠার আগেই লিখতে শুরু করে। বিলেত থেকে প্রতি মাসেই এক-একটি কিস্তি পাঠায়।

দেশ থেকে বিদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল প্রিয় নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষাদ। আর সেই বিষাদের সঙ্গে মিশেছিল মুক্তির স্বাদ। সে ফিরে পেয়েছে তার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা। হয়তো আবার প্রেমে পড়বে—কে জানে কোনো এক দেবযানীর সঙ্গে সেকালের সেই কচের মতো। বিনু তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা রেখেছিল। তার মনের দুয়ার তো খোলা ছিলই নতুন দেশের জন্যে, নতুন মানুষের জন্যে, নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। তবে ইউরোপ তার কাছে পুরোপুরি নতুন নয়। অসংখ্য বই পড়ে, পত্রিকা পড়ে সে ইউরোপের মানসের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। যতসব উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তার চেনা। দেশে থাকতেই সে ইংরেজ অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসেছিল। ইংরেজ লাটসাহেবের হাত থেকে সোনার মেডাল পেয়েছিল।

বিনুকে যিনি পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছিলেন তিনি একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার। বিলেত যাবার আগে সে যায় তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তিনি বলেন, 'তুই ওদেশের মেয়েদের পাল্লায় পড়বি না তো? জানিস ওদেশের মেয়েরা কেন এত ফর্সা হয়? ফল—খুব ফল খায় ওরা। আপেল—আপেল খেয়েই ওরা হয় এত ফর্সা। তুইও যত পারিস আপেল খাস।' বিনু হাসিমুখে বিদায় নেয়। তার মনে পড়ে অ্যাডামকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইভ।

তার জন্মকাল থেকেই বিধাতার নির্বন্ধ সে একদিন পশ্চিমযাত্রা করবে। সেটা সতেরো বছর বয়সে সম্ভব না হয়ে তেইশ বছর বয়সে হল। জাহাজের ডেকে পা রেখে বিনু ভুলতে আরম্ভ করল ভারতকে, ভাবতে আরম্ভ

করল ইউরোপকে। যতদিন ইউরোপে থাকবে ততদিন পুরোপুরি ইউরোপের ভাবনাই ভাববে। দুনিয়াকে দেখবে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, অথচ লিখবে বাংলা ভাষায় বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। এমনি করে দু-বছর কাটাবে।

তার জীবনে কত দু-বছর এসেছে-গেছে, কিন্তু সেই দু-বছরের মতো আর কোনো দু-বছর নয়। দেশে ফিরে আসার পরও সেই দু-বছর তাকে আবিষ্ট করে রাখে আরও বারো বছর। সেই দু-বছরের পটভূমিকায় পাঁচ খন্ডে উপন্যাস লিখতে বসে ছয় খন্ডের উপন্যাস লেখে। একে নিয়তি না বলে আর কী বলা যেতে পারে?

সাত সাগর পারে নয়, তিন সাগর—আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর—পারে বিনুর জাহাজ ছোঁয় ফ্রান্সের বন্দর মার্সেলস। সেই জাহাজেই বিনু লণ্ডন অবধি যেতে পারত, কিন্তু তার সতীর্থদের সঙ্গে সেও নেমে পড়ে। এই সেই মার্সেলস যেখানে রচিত হয়েছিল বিপ্লবগীতি 'লা মার্সেইলেস'। বিপ্লবের প্রাক্কালে, বিপ্লবের প্রেরণা দিতে। এখনও ফরাসিদের জাতীয় সংগীত। বিনু ফ্রান্সের মাটিতে পা রেখে শিহরন বোধ করে।

প্যারিসে ট্রেন বদল। ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি। রোমাঞ্চ। ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার। ইংল্যাণ্ডের মাটি। বিনুর কতকালের স্বপ্ন সার্থক। এরপরে রেলপথে লণ্ডন। বিনু আনন্দে অধীর। ইতিমধ্যেই সে স্থির করেছিল অক্সফোর্ডের একটি প্রসিদ্ধ কলেজে সিট পেলেও লণ্ডনেই থাকবে। সে তো ডিগ্রি চায় না। শিক্ষানবিশি লণ্ডনেও করা চলে। লণ্ডন শুধু সাম্রাজ্যের রাজধানী নয়, বিশ্বনাগরিকধানী। সে সব কিছু দেখতে, সব কিছু শুনতে, সব কিছু জানতে চায়। থিয়েটার, অপেরা, ব্যালে, কনসার্ট, মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, স্টুডিয়ো, সভাসমিতি, হাইড পার্ক, পার্লামেন্ট, সেন্ট পলস। জীবনে এমন সুযোগ আর মিলবে না। দু-বছর লণ্ডনবাস। কিন্তু তার হিতৈষীদের চক্ষে সে একটা বোকা ছেলে। ভারতের হাই কমিশনার স্যার অতুল চ্যাটার্জি একদিন তাকে বকুনি দেন। 'অক্সফোর্ড ছেড়ে লণ্ডন? এক্ষুনি যাও।'

বিনু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়ার জন্যে কার্ড জোগাড় করে। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে বিচিত্র বা নিষিদ্ধ পুস্তক পড়ে। একটি গুপ্তকক্ষে প্রহরীসমেত যাতায়াত করতে হয়। শিক্ষানবিশির অঙ্গ নয় এটা। শিক্ষানবিশ হিসাবে তাকে যেতে হত চারটি কলেজ ও কলেজসদৃশ স্কুলে। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস, লণ্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ। তা ছাড়া তাকে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে গিয়ে মামলার বিচার শুনতে ও টুকে রাখতে হয়। মাঝে মাঝে উলউইচে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তে হয়। কিন্তু এহো বাহ্য। তার আসল কাজ হল তার সহকর্মী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। সার্ভিসটার ব্রিটিশ চরিত্র যেন বজায় থাকে। ওটা নামেই ইন্ডিয়ান।

কিন্তু বিনুর কাছে জীবিকার চেয়ে জীবন বড়ো। তাই সে যত কম সময় সম্ভব তত কম সময় শিক্ষানবিশিকে দিয়ে বাকিটা দেয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে। ডিকেন্স প্রতিদিন লণ্ডনের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। বিনু প্রত্যহ না হলেও প্রায়ই পথে পথে ঘোরে। তবে বাসায় ফিরতে রাত করে না। সে চেয়েছিল কোনো এক ইংরেজ পরিবারে পেয়িং গেস্ট হতে। কিন্তু তার এক বন্ধুর অনুরোধে তার দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়। ফলে সে বাঙালিই থেকে যায়, ইংরেজ বনে না। এতে সাহিত্যের সুরাহা হয়। ওঁদের অগণ্য বাঙালি বন্ধু-বান্ধবী বাঙালি সমাজে। বিনু তাঁদের সঙ্গ পায়। তার উপন্যাসের বহু চরিত্রের মডেল আপনি জোটে। না, উপন্যাস সে লণ্ডনে বসে লিখবে না, দেশে ফিরে এসে লিখবে। ইংল্যাণ্ডে লেখা হয় ভ্রমণকাহিনি ছাড়া কবিতা ও প্রবন্ধ, গল্প ও নাটিকা। পরে সে ইংরেজ পরিবারেও পেয়িং গেস্ট হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সে তেমন বন্ধু সমাগম দেখেনি।

কলেজের অবকাশে বিনু বেরিয়ে পড়ত লণ্ডনের বাইরে সাগরতীরে বা ভিন দেশে। প্রথম অবকাশেই সে চলে যায় সুইটজারল্যাণ্ডে রম্যাঁ রল্যাঁর সন্নিধানে। তার এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বন্ধু সে সময়

সুইটজারল্যাণ্ড প্রবাসী ছিলেন। তিনিই হন দোভাষী। বিনুর সেই একই জিজ্ঞাসা, যা নিয়ে সে রবীন্দ্রসন্দর্শনে গিয়েছিল কলেজজীবনে। 'আর্ট কি এতই ভালো যে মানবপ্রকৃতির প্রতিদিনের আহার্য হতে পারে না?'

'কেন হতে পারবে না?' রল্যাঁ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন, 'রেনেসাঁসের যুগে ইটালির কারিগররা সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সুন্দর করে বানাত। সকলে তা উপভোগ করত।'

রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল এর বিপরীত। রল্যাঁ *পিপলস থিয়েটার* বলে একখানি বই লিখেছিলেন। বিনু জানত জনগণের প্রতিই তাঁর টান। কিন্তু উচ্চতর গণিত কী করে তারা বুঝবে, যদি তার উপযোগী প্রস্তুতি না থাকে? বিনু রল্যাঁর সঙ্গে তর্ক করে না। তিনি তাঁর স্বমতে অটল। আর বিনুও জনগণের কাছে পৌঁছোতে উৎসুক।

বিনুর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রল্যাঁ বলেন, 'হ্যাঁ, সাহিত্যিক সমসাময়িক প্রশ্ন নিয়ে লিখবেন বই কী। শেক্সপিয়ারও লিখেছেন।'

বিনু শেক্সপিয়ার যেটুকু পড়েছিল সেটুকুতে তা লক্ষ করেনি। হয়তো নাট্যকার তির্যকভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন।

আরও কয়েকটি বিষয়ে কথাবার্তা হয়। বিদায় দেবার সময় রল্যাঁ বলেন, 'আপনি টাকার জন্যে আর কিছু করবেন, নিজের খুশির জন্যে লিখবেন।'

আর্ট নিয়ে বিনুর ভাবনাচিন্তা সেইখানেই শেষ হয়ে গেল না। কাদের জন্যে লিখবে তার চেয়ে বড়ো কথা কী লিখবে, বিষয়বস্তুটা কী? যেখানে বলবার বিষয় নেই সেখানে বাগবিস্তার কি সাহিত্য? তারপরে আরও এক জিজ্ঞাসা—কেমন করে লিখবে? যেমন-তেমন করে লিখতে অনেকেই পারে, তারা সবাই কি সাহিত্যশিল্পী? না, জনগণের জন্যে লিখলেও শিল্পী হওয়া যায় না, যদি কেমন করে লিখতে হয় তা না জানে। বিনু পরীক্ষানিরীক্ষা চালায়। লেখাও একপ্রকার রান্না। রান্নাও একপ্রকার কলা। থিয়োরি জানাই যথেষ্ট নয়, প্র্যাকটিস চাই। আর্ট হওয়া না হওয়া নির্ভর করে প্র্যাকটিসের উপর।

ফেরার পথে প্যারিসে বিনু লুভর মিউজিয়াম দেখতে যায়। সেখানে দর্শন পায় Venus de Milo-র। এই সেই ইটারনাল ফেমিনিন। গ্রিক ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। এমনই কিছু নিদর্শন দেখেই রেনেসাঁসের ভাস্কররা উদ্দীপিত হন। তাঁরা সাধারণ কারিগর ছিলেন না। তাঁদের সৃষ্টিও নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী নয়। রল্যাঁ কী বলবেন একে? অপর একটি কক্ষে মোনালিসা। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রহস্যময়ী নারীর প্রতিকৃতি। বিনু রহস্যভেদ করতে পারে না, জনগণ কী করে পারবে!

অগস্ত্য ঋষি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করেছিলেন। বিনুরও অভিলাষ দু-বছরে ইউরোপ গ্রাস। পরে একটি অবকাশে সে বেরিয়ে পড়ে তার সেই অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর সঙ্গে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি বেড়াতে। থিয়েটার, অপেরা, জাদুঘর, ক্যাথিড্রাল কত কী দেখা হয়। মানুষও চেনা হয় পথে, হোটেলে, হসপিসে, পাঁসিঅতে। খাদ্য-অখাদ্য কত কী খাওয়া হয়। মিউনিকের বিয়ার-হলে বিয়ারপান। হিটলারের প্রিয় স্থান। তখন কিন্তু নাতসি নায়কের নাম কেউ বলেননি।

বিনু যে দু-বছর ইউরোপে ছিল সে-সময়টা ছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সন্ধিকাল, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। চার বছর ধরে মানুষ একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করেছিল। তার কুপ্রভাব থেকে জেগে উঠছে। ভাবতেই চায় না যে আবার এক দুঃস্বপ্ন অবশ্যম্ভাবী, দশ বছর পরে নেমে আসবার অপেক্ষায় আছে। মুসোলিনি ইতিমধ্যেই ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ জারি করে দেখিয়েছেন গণতন্ত্র কত ঠুনকো। ওদিকে রাশিয়াতে বিপ্লবী জমানা। জার্মানির কমিউনিস্টরা চান তার সম্প্রসারণ। সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাট সরকার আন্তর্জাতিক ঋণ শোধ করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতিতে হিমশিম খাচ্ছেন। লোকের ধারণা ওই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ইহুদি ব্যবসায়ীরা। সন্দেহ তামাম ইহুদি জাতিটাকে। তারাও জাতি হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর, আর্য জাতীয়তায় বিশ্বাসী জার্মানদের সঙ্গে বেজোড়—তেল আর জল।

লণ্ডনে কয়েক জন শান্তিবাদীর সঙ্গে বিনুর পরিচয় হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ফ্রেণ্ডস অব দা লিগ অব নেশনস। এঁদের বিশ্বাস লিগ যদি শক্তিশালী হয় তবে যুদ্ধ বাঁধবে না, বাঁধলে থামাতে পারা যাবে। কিন্তু

লিগের সদস্য-নেশনদের মধ্যে না আছে আমেরিকা, না রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন, না জার্মানি। অথচ ভারত রয়েছে। ভারতের প্রতিনিধি জাস্টিস স্যার বসন্তকুমার মল্লিক ছিলেন জাহাজে বিনুর সহযাত্রী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সিভিল সার্ভিসের সুবাদে। সার্ভিসের ভিতরে থেকে দেশের কাজ করা সম্বন্ধে।

লিগের বন্ধুজনদের মধ্যে ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। অসমবয়সিনি কুমারী, চিত্রকর, ভারত হিতৈষিণী। তাঁর সঙ্গে বিনুর সম্পর্ক একটু একটু করে পরিণত হয় বন্ধুতায়। তাঁর সৌজন্যে ব্রিটেনের উচ্চবংশীয় সমাজসেবীদের সঙ্গে বিনুর মেলামেশা সম্ভব হয়। তাঁদের অনেকেই মানবদরদি। অনেকেই ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে। তবে তাঁদের একজনের প্রশ্ন হল ভারত স্বাধীন হলে দেশীয় রাজাদের ভাগ্যে কী আছে। দেশীয় রাজ্যে বিনুর জন্ম, রাজবংশের সঙ্গে সদ্ভাব, তবু সে একটা কঠোর উক্তি করে। রাজাদের জোর করে ফেডারেশনভুক্ত করতে হবে। তিনি মিষ্টি করে বলেন, 'না না, ওঁদের বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজি করাতে হবে।'

বান্ধবীর বান্ধবী মুরিয়েল লেস্টার তাঁর যুদ্ধে নিহত ভ্রাতা কিংসলির নামে লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে একটি 'সেটলমেন্ট' স্থাপন করে তার নাম রেখেছেন 'কিংসলি হল'। গরিব এলাকায় শ্রমিকশ্রেণির জীবনের শরিক হবার জন্যে উচ্চশ্রেণির পুরুষ বা মহিলারা এরকম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস করেন। তাঁদের জীবনযাত্রা একান্ত সাদাসিধে। সংসারের বন্ধন নেই। একদা শ্রমিকদলের নেতা অ্যাটলি থাকতেন এইরকম একটি সেটলমেন্টে। মুরিয়েল কিন্তু পলিটিকসের ধার ধারেন না। অথচ ধর্মেরও বাধ্যতা নেই। একনিষ্ঠ মানবহিতৈষী সেবাকর্মী। বিনুর বান্ধবী একদিন তাকে মুরিয়েলের আশ্রমে নিয়ে যান। সেটা এক হিসাবে শ্রমিকশ্রেণির ছেলে-মেয়েদের ক্লাব। অবসর পেলেই তারা সেখানে এসে খেলাধুলা করে। গানবাজনাও হয়। নির্দোষ আমোদপ্রমোদে মুরিয়েল তাদের সাথি। বাসযোগ্য কয়েকটি সেল ছিল। বিনু তার একটিতে শুয়ে রাত কাটায়। দু-বছর বাদে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর দলবল সেইখানেই মুরিয়েলের অতিথি হন। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সের সময় ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হননি। পার্টিশনের পূর্বে মুরিয়েল এসেছিলেন ভারতে। বলেছিলেন, 'এই ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করো। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই।'

অ্যাটলি ছিলেন ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট। তাঁরই মতো সোশ্যালিস্ট সিডনি ওয়েব শ্রমিকদের প্রগতির কথা চিন্তা করে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি মধ্যবিত্তদেরও সুশিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হয়। বিনু সেখানে লেকচার শুনতে যায়। তখনও অন্যান্য কলেজে তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়নি, এখানে হয়েছে। বিনুর সঙ্গে যাঁরা ক্লাস করেন তাঁরা তার সমবয়সিনি। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির সন্ধান করবেন। আগে চাকরি, তারপরে বিবাহ—যদি বর জোটে। বিনু 'নিউ উওম্যান' দেখতে চেয়েছিল। নিউ উওম্যানকে দেখল। যে নারী পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়াশোনা করে তাকে হারিয়েও দিতে পারে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনিও বিনুকে পড়াতেন। নারীস্বাধীনতা ও নারী-পুরুষের সাম্য—দুটোই ছিল ফেমিনিস্টদের অন্বিষ্ট। দুটোরই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে বিনু অতিশয় প্রীত।

একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে সে মায়ের আদরযত্ন পায়। মা সব দেশেই মা। ইতিমধ্যে এক তটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়ে সে তার বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রীর সঙ্গে মাতৃ সম্পর্ক পাতিয়ে এসেছে। তিনি হয়েছেন তার দ্বিতীয় মাতা। অথচ তিনি বিয়েই করেননি। এখন যাঁর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট তার ভাগনি একদিন বেড়াতে আসে। দুজনের দুজনকে এত ভালো লেগে যায় যে সেইদিনই ওরা ভাই-বোন পাতিয়ে বসে। পরে আর দেখা হয় না কিন্তু চিঠিপত্রে ভাই-বোন মত বিনিময় করতে থাকে। বিদুষী কন্যা। শিক্ষিকা হয়। পরে বিয়েও করে। কিন্তু চাকরি ছাড়ে না।

দেশ এক নয়, ভাষা এক নয়, ধর্ম এক নয়, বর্ণ এক নয়, তা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে এত বেশি মিল যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলে দুটো আলাদা সত্তা শনাক্ত করা যায় না। একথাও বলতে পারা যায় না যে প্রাচ্য চিরদিন প্রাচ্য আর প্রতীচ্য চিরদিন প্রতীচ্য, মিলন তাদের কোনোদিন হবে না। কিপলিং-এর উক্তি যেমন

অসার তেমনি অসার ভারতীয় মনীষীদের ধারণা যে প্রাচী হচ্ছে অধ্যাত্মবাদী আর প্রতীচী জড়বাদী। কোলোনের ক্যাথিড্রাল আর প্যারিসের নোতারদাম পরিদর্শন করে বিনু উপলব্ধি করে ইউরোপের মানুষও এশিয়ার মানুষের মতোই ধর্মপ্রাণ। মন্দির, মসজিদ, গির্জা তার সাক্ষ্য।

আসলে যেটা ঘটেছে সেটা ইউরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব, পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লব, রুশ দেশের সমাজবিপ্লব। এসব না ঘটলে ইউরোপ এগিয়ে যেত না, এশিয়া পিছিয়ে থাকত না, অগ্রসর আর পশ্চাৎপদের বৈষম্যকে আধ্যাত্মিকতা বনাম জড়বাদের বৈপরীত্য বলে রায় দিত না। প্রভেদটা আসলে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। পশ্চাৎপদরাও ক্রমে অগ্রগামীদের ধরে ফেলবে। হয়তো ছাড়িয়ে যাবে—যেমন জাপানে।

কিন্তু সেটার জন্যে চাই জরা সংযুবনী শক্তি। বিনু দেখতে পায় যুবকরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। একদল যদি চায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আরেক দল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়ন। এই দ্বিধা একদিন দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করতে পারে। সে দ্বন্দ্ব লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডের সঙ্গে ওয়েস্ট এণ্ডের। কিপলিং যা বলেছেন তা ইস্ট বনাম ওয়েস্ট নয়, ইস্ট এণ্ড বনাম ওয়েস্ট এণ্ডের বেলায় খাটতে পারে। গৃহযুদ্ধ করবে ধনী ও দরিদ্র, নগর ও অঞ্চল। ‘সেটলমেন্ট’ স্থাপন করে হ্যাভ-নট শ্রেণিকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। হ্যাভ শ্রেণিকে ধনসম্পত্তি ভাগ করার কাজে ব্রতী হতে হবে। সেটা কি স্বেচ্ছায় হবে?

শেষের ক-দিন সুধায় গেল ভরে। বিনুর বান্ধবী তাকে নিয়ে গেলেন হল্যাণ্ড হয়ে জার্মানিতে, সেখান থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাঁর বান্ধবীর সমীপে, সেখান থেকে আবার জার্মানিতে। তার আগে দেখা হয়ে গেল গ্যেটের ভাইমার। বার্লিন তেমন পছন্দ হয়নি। কিন্তু ড্রেসডেন বিনুর হৃদয় হরণ করল। ইটারনাল ফেমিনিন রাফেলের আঁকা সিসটিন ম্যাডোনা। যিশুজননী। অতুলনীয়। জার্মানি থেকে বিনু লণ্ডনে ফিরে যায়, পাট গুটিয়ে আবার বান্ধবীর সঙ্গে যোগ দেয় ইটালির মিলান নগরে। দেখতে পায় লেওনার্দোর আঁকা দেওয়ালচিত্র যিশুর শেষ ভোজন—অপূর্ব। ভেনিস আর ফ্লোরেন্সের বিভিন্ন মিউজিয়ামে তাঁর আমলের আরও অনেকের কালজয়ী চিত্রসম্পদ, ভাস্কর্যসম্পদ। পরিশেষে রোম। ভ্যাটিকানে সেন্ট পিটার গির্জায় মিকেল অ্যাঞ্জেলোর আঁকা সিলিংচিত্র। ঈশ্বর অ্যাডামের আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে প্রাণসঞ্চার করেছেন। সেই শিল্পীর গড়া মোজেসমূর্তি দেখল রোমের অন্য এক গির্জায়।

এসব অনবদ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি রেনেসাঁস আমলের। স্রষ্টারা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মমতে গভীর বিশ্বাসী। রিফর্মেশন আমলে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতে বিশ্বাসী শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয়ে মন দেননি। কিন্তু প্রোটেস্টান্ট সংগীতকাররা সে অভাব পূরণ করেছেন কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে মহৎ সংগীত সৃষ্টি করে।

এনলাইটেনমেন্টের আমলে ইউরোপ সেকুলার ধারা অবলম্বন করে। ধর্মবিশ্বাস আর তেমন প্রেরণা জোগায় না। প্যারিসই হয়ে ওঠে আর্টের কেন্দ্রস্থল। সংগীতের কেন্দ্র কোনো এক স্থলে নয়, তবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াই সেরা সংগীতকারদের সাধনাভূমি। বিনু প্যারিসে বেশি সময় দিতে পারেনি। তার বান্ধবীও সময় পাননি সেখানে নিয়ে যাবার। সংগীতে তার বিশেষ অভিনিবেশ থাকলেও বিনু পাশ্চাত্য সংগীত আদপেই বুঝত না। হ্যাঁ, সংগীতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য ভেদ আছে বই কী, নৃত্যেও। বিনু বিভিন্ন সময়ে পাভলোভার ব্যালে দেখেছে, পাডেরেভস্কির পিয়ানো শুনেছে। তারপরে শুনেছে ক্রাইজলারের বেহালা, শালিয়াপিনের কণ্ঠসংগীত। অসাধারণ, অসামান্য, কিন্তু বিনুর পক্ষে দুরূহ। বুঝতে হলে তাকে আরও কয়েক বছর ইউরোপে বাস করতে হত।

মনীষীদের সংসর্গও সে কলেজের বাইরে বড়ো একটা পায়নি। কারণ তাঁদের বাড়ি যায়নি। পাবলিক লেকচার শুনেছে বার্নার্ড শ আর বারট্র্যাণ্ড রাসেলের। দুই মহিরুহের। আরও কিছুকাল থাকতে পারলে ফরাসি ও জার্মান বনস্পতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত, আর ইটালিতে বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে।

তার নিজের লেখার কাজও তো ছিল। দু-বছরে যা লিখেছে তা দিয়ে চারখানা কবিতার বই, দুখানা ভ্রমণের বই, একখানা প্রবন্ধের বই দেশে ফেরার আগে ও পরে ছাপা হয়ে যায়। হাতে থাকে এত বেশি

মালমশলা যে প্রথমে ভাবে তিন খন্ডের উপন্যাস লিখবে তাই দিয়ে, পরে পাঁচ খন্ডের। কিন্তু তাতেও কি সব কথা বা সকলের কথা বলা হবে? আত্মীয়তা সে পাতিয়েছিল অচেনা অজানা কত লোকের সঙ্গে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, চেকোস্লোভাকিয়ায়। ক্ষণিকের জন্যে। সে সব তো তার উপন্যাসের ফ্রেমে আঁটা যাবে না।

তার বান্ধবী তাকে রোম থেকে মার্সেলসে রেলপথে রিভিয়েরার ভিতর দিয়ে নিয়ে যান ও জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। আবার সেই বিষাদ, আবার সেই আনন্দ। বিদায়ের বেদনা, ঘরে ফেরার উল্লাস। বিনু জাহাজের ডেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রান্সের উপকূল ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ইউরোপ হয়ে যায় মায়া।

বিনুর দ্বৈতসভা

পরাধীন দেশে নাগরিক মাত্রই পরাধীন। সরকারি চাকরি যারা করে তারা দ্বিগুণ পরাধীন। আইসিএস যেন একটি সোনার খাঁচা। বিনু সেই খাঁচায় অস্বস্তি বোধ করে। তার সংকল্প সে যৌবন ফুরোবার আগেই আইসিএস থেকে ইস্তফা দেবে। তার বিশ্বাস আইসিএস হয়ে সে ভুল করেছে। সময় থাকতে সংশোধন চাই।

অথচ এটাও তো ঠিক যে আইসিএস প্রতিযোগিতায় সফল না হলে সে বিলেত যেতে পারত না। বিলেত না যেতে পারলে ভ্রমণকাহিনি লিখতে পারত না। ভ্রমণকাহিনি না লিখতে পারলে বাংলা সাহিত্যের আসরে সহজে ঠাঁই পেত না। রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির তারিফ কি কখনো জুটত!

আইসিএস-এর সুবাদেই তার বাংলায় নিযুক্তি। জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর সে বাংলার বাইরেই কাটিয়েছে। ওড়িশায়, বিহারে ও বিলেতে। বাংলার বাইরে নিযুক্ত হলে সে শান্তিতে থাকতে পারত, তার পদোন্নতিও ত্বরান্বিত হত। কিন্তু সে বাংলার জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে রূপসি বাংলাকে চিনত না, তার মানুষের মন জানত না। ভাষাটাও দেশের মাটির সঙ্গে জড়িত। বাংলা ভাষার লেখককে বাংলার মাটির থেকে রস আকর্ষণ করতে হবে। তা নাহলে ওই একখানা কি দুখানা গ্রন্থই রসোত্তীর্ণ হবে। সাহিত্যসাধনা বেশিদূর এগোবে না।

সরকারি চাকরির মতো সাহিত্যেরও নিয়ম অনেক জনকে ডাকা হয়, কয়েক জনকেই বেছে নেওয়া হয়। বিনু হতে চায় সেই কয়েক জনের একজন। এরজন্যে একাগ্র সাধনা করতে হবে, তা সে জানে। সেইজন্যে তার ভয় তার চাকুরে সত্তা আর সাহিত্যিক সত্তাকে অসপত্ন হতে দেবে না। আইসিএস বিনু সাহিত্যসাধক বিনুকে উপরে উঠতে দেবে না। সে নীচে পড়ে থাকবে। আইসিএস-দের পাঁচ-ছ বছর চাকরির পর পদোন্নতি ঘটে। কিন্তু বিনু সেই পাঁচ-ছয় বছরে তার পাঁচ খন্ডের উপন্যাস শেষ করতে পারলে কৃতার্থ হবে। নাই-বা হল পদোন্নতি। তার চেয়ে শ্রেয় সাহিত্যে ঊর্ধ্বগতি।

বিনু নারীশক্তির অভাব অনুভব করে। নারীশক্তির প্রেরণা বিনা কোনো দুঃসাধ্য কীর্তি সম্ভব হয় না। সেই যে আইসিএস প্রতিযোগিতা তার পেছনেও নারীশক্তির প্ররণা ছিল।

‘শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল। সারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন?’ কোথায় সেই নারী যে তার সাহিত্যিক সৃষ্টিতে শক্তিসঞ্চার করবে। আইসিএস পাত্রকে বিয়ে করতে অনেকেই উৎসুক। বিনু সে আইসিএস ছাড়বে শুনলে কেই-বা বিয়েতে রাজি হবে?

বিনু তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে বাঁচতে পারে, পাঁচ খন্ডের উপন্যাস লিখতে পারে, পাঁচ বছর বাদে সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তার নিজের পরিকল্পনা অনুসারে প্রেমে পড়ে প্রেম পেয়ে বিয়ে করতে পারে কি তেমন একটি নারীকে যে তাকে বিনু বলেই ভালোবাসবে, আইসিএস বলে নয়? আর যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে সে আইসিএস ছাড়বে জানা সত্ত্বেও। স্বদেশে কি তেমন কেউ আছে?

বিনু তার জন্যে দুয়ার খোলা রেখে প্রতীক্ষা করতে পারে, কিন্তু তার যৌবন অপেক্ষা করবে না, বিদ্রোহী হবে। জীবনের পক্ষে পাঁচটা বছর খুব বেশি সময় নয়, কিন্তু যৌবনের পক্ষে অনন্ত কাল। বিনু সেই পলাতককে কোন মন্ত্রে বেঁধে রাখবে। যৌবন প্রেম পরিণয় আর্ট জীবিকা একসূত্রে গাঁথা কি সম্ভব? বিনুর

বিশ্বাস হয় না। বিবাহের বেলা সে নেতিবাদী হয়ে প্রত্যেকটি সম্বন্ধ নাকচ করে। কন্যাপক্ষের ধারণা সে নিলামে দর বাড়াতে চায় বলেই নেতি নেতি করছে, বিনু কিন্তু পণ যৌতুক নেবে না, নেবে কন্যাটিকেই।

তবে তার নিজের ভবিষ্যৎ যখন অনিশ্চিত তখন একটি নারীকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা সমীচীন হবে না। বিবাহবন্ধন তো তার নিজের পক্ষেও বন্ধন, সেটাও একপ্রকার খাঁচা। হয়তো বাঁশের খাঁচা। অথচ নীড় বাঁধতে হলে বিবাহই শ্রেয়। বিবাহের বাইরে নীড় বাঁধার নজির ইউরোপে আছে। শিল্পীরা বোহেমিয়ান জীবনধারা পছন্দ করেন। তাঁরা বিবাহবিমুখ। নীড় বাঁধতে চাইলে বিবাহের বাইরেই বাঁধেন। সন্তান হয় না, হলে অবৈধ হয়। বিনু শিউরে ওঠে। না, অবৈধ সন্তান কিছুতেই না। তার চেয়ে নিঃসন্তান থাকা শ্রেয়। তাহলে আবার বাৎসল্যরসটা অনাস্বাদিত থেকে যায়। সে-রসও বিনু আস্বাদন করতে চায়। তার মধ্যে একজন বৈষ্ণব লুকিয়েছিল। যার চক্ষে শিশু মাত্রেই গোপাল। তার ঘরে গোপাল থাকবে না তা কি হয়? তার জায়া হবে 'রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা।' মোহিতলালের উক্তি।

এই অলীক দিবাস্বপ্ন সরিয়ে রেখে বিনু তার কাজেকর্মে মন দেয়। প্রথম কাজটি প্রথমে। মাসকাবারের পর মাইনেটি সব আগে। বিনু সময় পেলেই লিখতে বসে যায়। সময় করে নিতে হয়। টেনিস কোর্টে বিলিয়ার্ডস খেলতে ক্লাবে যায়, কিন্তু তাস খেলতে গেলে রাত বাড়ে তাই তাস খেলে না; আড্ডা দেয় না। তার সাহিত্যিক সত্তা যে অসপত্ন নয়, ম্যাজিস্ট্রেট সত্তা যে ওর সপত্নীসমান এরজন্যে সে দুঃখিত। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যই তার অন্দরে দুয়োরানি। সে ষোলো বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সবচেয়ে ভালো হত যদি সাহিত্যই হত সাহিত্যিকের জীবিকা। কিন্তু রম্যাঁ রল্যাঁ বিনুকে টাকার জন্যে লিখতে বারণ করেছিলেন। টাকার জন্যে লেখা মানে বাজারের চাহিদা অনুসারে জোগান দেওয়া। পাঠকরা দাম দিয়ে কেনে ডিটেকটিভ উপন্যাস, অলৌকিক কাহিনি, ভূতপ্রেতের গল্প, সেন্টিমেন্টাল কমেডি, প্রচ্ছন্ন পর্নোগ্রাফি। তাই সিরিয়াস বিষয়ে যাঁরা লেখেন তাঁদের অন্য কোনো আয়ের উৎস থাকে। কারও চাকরি, কারও জমিদারি, কারও পৈত্রিক বিষয়সম্পত্তি, কারও পিসি-মাসির অর্থসাহায্য। অবশ্য দু-চার জন ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন বার্নার্ড শ, টোমাস মান, ভার্জিনিয়া উলফ, ডি এইচ লরেন্স।

বিনু সিরিয়াস বিষয়ে লিখতে কৃতসংকল্প। তার পাঁচ খন্ডের উপন্যাস ক-জনেই বা পড়বে? ক-জনই বা কিনবে? তার কবিতারই-বা চাহিদা কতটুকু? কিংবা তার প্রবন্ধের। মাসিকপত্রের সম্পাদকরা দক্ষিণা দেন না। প্রকাশক ছাপতে রাজি হন সে যদি ছাপার খরচটা দেয়, কাগজের খরচ তিনি দেবেন। পরে হিসাব-নিকাশ হবে। লাভ হলে সে লাভের অংশ পাবে। বিনু একখানা চটি বইয়ের মুদ্রণব্যয় জোগাতে পারবে, কিন্তু একখানা তিনশো পৃষ্ঠার উপন্যাসের মুদ্রণদায় সে বহন করতে পারবে না, প্রকাশকও নারাজ হবেন কাগজের দাম মেটাতে। হালকা বিষয়ের উপন্যাস হলে অন্য কথা, প্রকাশকই সমস্ত ভার বইবেন। তাহলে বিনুকে কেবল হালকা উপন্যাসই লিখতে হয়, বছরে চারখানা। তাতেও কি জীবনযাত্রার দুই প্রান্ত মেলাতে পারা যাবে। আর কারও পক্ষে সম্ভব হতে পারে, বিনুর পক্ষে নয়। তার ঝুলিতে অতগুলো কাহিনি নেই। স্ত্রীপাঠ্য বা শিশুপাঠ্য কাহিনি লিখে সে সরস্বতীর বর পাবে না। তার অভিপ্রেত পাঠক-পাঠিকারা বিদগ্ধ, জনসংখ্যায় অল্প।

বিনুর আশা এঁরাই তার বড়ো মাপের বই কিনবেন ও এঁদের মুখ চেয়ে প্রকাশক তার বই নিজের ব্যয়ে প্রকাশ করবেন। সত্যি সত্যি তেমন একজন প্রকাশককে পাওয়া গেল। তিনি পাঁচ খন্ডের উপন্যাস শুনে ভয় পেলেন না। বিষয়টা আধুনিক বিশ্বের বিবিধ চিন্তাভাবনা, তাও প্রতীচ্য পটভূমিকায়, একথা শুনেও তিনি প্রকাশ করতে সম্মত। তাঁর অনুরোধ বিনু যে-সপ্তাহে যতটুকু লিখবে ততটুকু তাঁকে পাঠাবে। তিনি অবিলম্বে প্রুফ পাঠাবেন। বিনু প্রুফ দেখে ফেরত পাঠাবার সময় নতুন কপি পাঠাবে। বই বার হবে পুজোর পূর্বে। পুরো বইখানা বিনু প্রেসে দেবার আগে দেখতে পাবে না। সে রাজি হয়ে যায়।

যে-বিষয়ের চাহিদা নেই তার চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে। যে-বিষয়ের পাঠক নেই তার পাঠক তৈরি করে নিতে হবে। পরীক্ষা করে দেখা গেল গুরুপাক উপন্যাসেরও চাহিদা আছে, পাঠক আছে। ওটা প্রকাশকের

পক্ষে লোকসানের কারবার নয়। আর বিনুর পক্ষে দুধে জল মেশাবার ব্যাবসা নয়। সে খাঁটি দুধই সরবরাহ করে, তবে বিক্রি কম।

রম্যাঁ রল্যাঁর কথামতো বিনু নিজের খুশির জন্যে লিখেছে, পাঠকের খুশির কথা ভেবে দেখেনি। পাঠকসাধারণ যদি তার বই না কেনে তবে সে কাকে দায়ী করবে? ইউরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর তথা দ্বিতীয় যুদ্ধপূর্ব মধ্যবর্তী দু-বছরের একটি মানসচিত্র আর কেউ বাংলা ভাষায় আঁকেনি। বিনুই এঁকেছে। তার সঙ্গে মেলাবার প্রয়াস রয়েছে শাশ্বত ভারতের। নতুন ও পুরাতন বহুবিধ জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণ করা হয়েছে। হয়তো মেলেনি, তবু বৃথা নয়। বিনু তার রক্ত দিয়ে যা লিখেছে তা নিছক একজনের খুশির জন্যে নয়। আরও অনেকের অবগতির জন্যেও। তাঁরাও যদি মুষ্টিমেয় হনও তবু তার শ্রম সার্থক। বর্তমান কালের পাঠকরাই একমাত্র পাঠক নন। সত্যভিত্তিক হলে বইটির ভবিষ্যৎ আছে। পাঁচ খন্ডের এই উপন্যাস একটি চওড়া ক্যানভাসে আঁকা মসিচিত্র।

বইটি কি না-লিখলে চলত না? না, চলত না। বিনু ছাড়া আর কেউ কি লিখতে পারত না? না, পারত না। বিনুকেই কি সাহিত্য-সরস্বতী এ কাজের জন্য বরাত দিয়েছেন? তাই তো মনে হয়। সম্পাদক তার ভ্রমণকাহিনি শেষ হবার পর তার কাছে চেয়েছিলেন একটা উপন্যাস। সে লিখতে পারত একখানা বাজারচলতি উপন্যাস। সম্পাদক সানন্দে প্রকাশ করতেন। সে লিখতে শুরু করে দেয় তার পাঁচ খন্ডের উপন্যাস। বলতে গেলে এটা তার ভ্রমণকাহিনির অন্তরালে থাকা অন্তরঙ্গ কাহিনি। এতে ঘটনার চেয়ে ভাবনা বেশি, তথ্যের চেয়ে তত্ত্ব বেশি। দৃশ্যের চেয়ে চরিত্র বেশি। বহি:প্রকৃতির চেয়ে অন্তঃপ্রকৃতি প্রধান। বর্ণনার চেয়ে মানসিক বিবর্তনই প্রধান। বিবরণের চেয়ে বক্তব্য প্রধান। এক কথায় এটি একটি ইন্টেলেকচুয়াল উপন্যাস। যাতে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার ঘাত-প্রতিঘাত ও বোঝাপড়া।

ইউরোপ হতে চলে আসার পর থেকে সেখানকার স্মৃতি ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল। খুঁটিনাটি ভুলে যাওয়ার ফলে লিখতে গিয়ে ভুল হয়ে যাচ্ছিল। অন্য কারও সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার ছিল। কিন্তু বাংলার মফস্সলে কাকেই-বা হাতের কাছে পাবে? এমনসময় ঘটে যায় এক অঘটন। এক বিদেশিনির সঙ্গে অকস্মাৎ পরিচয়, পরিচয় থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে পরিণয়। সমস্তটাই মাস দুয়েকের মধ্যে। মানতে হয় এটা প্রজাপতির নির্বন্ধ। জীবনদেবতার ইচ্ছা। বিনু তার প্রয়োজনের সময় পরামর্শ পায়, না পেলে তার উপন্যাস ত্রুটিগ্রস্ত হত। তাহলে বলতে হয় সরস্বতী এই বিবাহের পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, বিনুকে ও মীরাকে জানতে দেননি। মীরা নামকরণ হয় বিবাহের পরে। বিদেশিনি বনে যান স্বদেশিনি। শাড়ি পরেন, বাংলায় কথা বলেন। নিজের দেশ ছাড়েন, ন্যাশনালিটি ছাড়েন কিন্তু ধর্ম ছাড়েন না। বিনুও ধর্মান্তরিত হয় না। যার যার ধর্ম তার তার। বিনু অসবর্ণ বিবাহে বিশ্বাস করত। অসধর্ম বিবাহও সে বাল্যকাল থেকে দেখে এসেছিল।

মীরাকে বিনু বিয়ের আগেই জানায় সে আইসিএস-এ বেশিদিন থাকবে না। ও যদি তাকে আইসিএস বলে বিয়ে করে তবে ভুল করবে। মীরা তাকে আশ্বাস দেয় যে আইসিএস বলে সে ওকে বিয়ে করছে না, ভালোবাসে বলেই বিয়ে করছে। তবে বিনু নিজেই দু-বার ভাবে। যেটা একজন অবিবাহিত পুরুষের পক্ষে ঠিক, সেটা একজন বিবাহিত পুরুষের পক্ষে ঠিক নয়। সন্তান হলে তো কথাই নেই। আইসিএস ছাড়ার আগে ওদের জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। ওদের সম্মতি নিতে হবে।

গোলাপ। গোলাপ। গোলাপ। সমস্তটা পথ গোলাপ বিছানো। প্রথমে আপত্তি করলেও বিনুর গুরুজন মীরাকে দেখে ও তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে এ বিবাহ মেনে নেন ও তাকে বধূরূপে বরণ করেন। ধর্মভেদ, বর্ণভেদ, দেশভেদ, ভাষাভেদ অন্তরায় হয় না। সবার উপরে মানুষ সত্য।

কাঁটা। কাঁটা। কাঁটা। মীরার গুরুজন এ বিবাহ মেনে নিতে রাজি নন। বিনুকে জামাতা বলে স্বীকার করেন না। মীরাকে বলেন বিবাহভঙ্গ করতে। সে সম্মত হয় না। তখন তাঁরা তাকে পিতৃগৃহ থেকে বহিষ্কার করেন। সে ত্যাজ্য কন্যা হয়।

বিনুর কাছে যা রোম্যান্টিক মীরার কাছে তা ট্র্যাজিক। এমন বিবাহ সাধারণত সুখের হয় না। কিন্তু বিনু ও মীরা দুজনে দুজনকে নিয়ে সুখী। প্রেম তাদের নীড় বাঁধতে শেখায়। দূর দিগন্তের দুটি পাখির মতো প্রেমের সঙ্গে যোগ দেয় সাহিত্য ও সংগীত। মীরা পিয়ানো নিয়ে এসেছিল। সেও রল্যাঁ ও রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি করত। ভারতের স্বাধীনতা তারও কাম্য ছিল। সেও বিনুর মতো খাদি পরত। শ্বেতাঙ্গ সমাজে সে একজন নেটিভ। কে একজন শ্বেতাঙ্গ টিপ্পনি কাটেন, 'উনি ভারতকে ভালোবাসেন বলেই ভারতীয় বিবাহ করেছেন।'

মীরা যে ভারতকে ভালোবাসে একথা সত্য। তা না হলে এদেশে বরাবরের জন্যে থেকে যেত না, গ্রীষ্মকালে দগ্ধ হত না। স্বামীকে ফেলে পাহাড়ে যাবার মতো মেমসাহেব সে নয়। বাংলার যেখানেই গেছে সেখানেই ঘরের মতো বোধ করেছে, বিনু যেমন ইউরোপের সর্বত্র বোধ করেছিল। সব দেশই মানুষের দেশ। সবাই তার স্বজন। প্রেমের বন্ধন থাকলে তো কথাই নেই।

ইউরোপে ইউরোপীয় স্টাইল মানায়, ভারতে নয়। বিনু পারতপক্ষে ভারতীয় ধরনে থাকত। সে জানত তাকে একদিন পদত্যাগ করতে হবে। তখন সাহেবিয়ানা চলবে না। বাবুয়ানাও এই গরিব দেশে বেমানান। একদিন সে গ্রামে গিয়ে চাষি ও কারিগরদের সঙ্গে জীবন যোগ করবে। মীরাকেও সে তার সাথি করবে। সুতরাং জীবনযাত্রা যত সাদাসিধে হয় তত ভালো। ওরা প্রাতরাশের সময় চিঁড়ে মুড়ি খায়। তা শুনে বাঙালি সাহেব মহলে হাসাহাসি পড়ে যায়। ওটা যে আইসিএস ত্যাগের প্রস্তুতি কে তা বিশ্বাস করবে? বিনুর সে-প্রস্তুতি তলে তলে চলছিল ও মীরা তার সক্রিয় সহযোগিনী ছিল। সে কষ্ট সইতে প্রস্তুত।

প্রথম দর্শনের সময় বিনু মীরাকে—তখন তার নাম মীরা ছিল না—দু-তিনটি বাংলা শব্দ শিখিয়েছিল। তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি যে ওর সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বিয়ের পরে মীরা বিনুর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে শেখে ও বাংলাই হয় ওদের ছেলে-মেয়ের মাতৃভাষা। ওদের ইংরেজি শেখানো হয় না। যদিও ওদের মা ইংরেজিভাষিণী। এতে মীরার আন্তরিক সম্মতি ছিল। নইলে ছেলে-মেয়েরা মিশত কাদের সঙ্গে? মফস্সলে ওদের সমবয়সিরা সবাই বাংলাভাষী। দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি? না, তাতেও বিনুর আপত্তি ছিল। মীরা তার সঙ্গেই একমত হয়। আট বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষানীতি রবীন্দ্রপ্রভাবে। গান্ধীজির প্রভাবও কাজ করছিল। পাছে ইংরেজি শিখতে গিয়ে আত্মমর্যাদা হানি হয়। আগে তো পুরোদস্তুর বাঙালি হোক, তারপরে ইংরেজি ফরাসি জার্মান যেকোনো ভাষা শিখবে।

বিনুর চাকরিতে নিযুক্তির কিছুদিন পরে লাহোরে কংগ্রেস স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করে। তার কিছুদিন পরে শুরু হয় গান্ধীজির ডান্ডি যাত্রা ও লবণ সত্যাগ্রহ। ঘটে যায় চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। বিনুকে কাজ করতে হয় অশান্ত পরিবেশে। দেশ দুই শিবিরে বিভক্ত। তার স্থান ইংরেজদের শিবিরে। সে শিবিরে গণ্যমান্য অনেক ভারতীয় ছিলেন। সে তাঁদের তুলনায় নগণ্য। তবু তার বিবেক তাকে দায়ী করছিল। দমনকার্যের জন্যে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে।

অথচ সে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সমর্থকও ছিল না। তার মতে হত্যা মাত্রেই পাপ। দেশের মুক্তির জন্যে পাপ করা কিছুতেই ভালো হতে পারে না। রাজনীতির দিক থেকেও তা অদূরদর্শিতা। কয়েক বছর পরে দেখা গেল ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ বাংলার হিন্দুদের প্রতি প্রতিকূল অথচ অন্যান্য প্রদেশের প্রতি প্রতিকূল নয়। সে-সময় মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট পদে থাকতে বিনুকেও সশস্ত্র বডিগার্ড নিয়ে ঘোরাফেরা করতে হত। ফলে লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে গেলে বিনু বিব্রত বোধ করত।

চাকরির গোড়ায় বিনু যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তখন তার উপর কোনো গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল না, সে আদালতে বসে ছোটো ছোটো মামলার বিচার করত, ক্লাবে গিয়ে টেনিস ও বিলিয়ার্ডস খেলত, রাতে ও সকালে ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করত, তারই ফাঁকে কবিতা বা উপন্যাস লিখত। জেলার সদরে থাকায় সরকারি ও বেসরকারি মহলের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হত। লাটসাহেব থেকে আরম্ভ করে রাজা-মহারাজ, নবাব বাহাদুর, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা জজ, সিভিল সার্জন, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, পুলিশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, জেল বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, এমনই সব

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে খানাপিনা বা খেলাধুলা বা মোলাকাত। অনেকসময় নামমাত্র। তার প্রথম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন শিল্পরসিক। পাল যুগের আর্ট সম্বন্ধে তাঁর একখানি বই ছিল। ইউরোপীয় আর্ট প্রসঙ্গে বিনুর সঙ্গে কথাবার্তার পর তাকে ডেকে পাঠান হলঘরের দেওয়াল কোন রঙে রাঙাবেন তা নিয়ে পরামর্শ করতে। তিনি ইউরোপীয়।

কিন্তু মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট পদে বদলির পর বিনু হয়ে যায় উপরমহলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তার পরিবর্তে আসে গ্রাম অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ। তার দ্বিতীয় ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে উৎসাহ দেন ও পথ দেখান। সেও তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তাঁবুতে রাত কাটায়। সুইস কটেজ তাঁবুতে ঘরের আরাম পায়। ততদিনে সে বিবাহিত। মীরাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়—শিশুপুত্রকেও। দিনের বেলা শিশুকে নিয়ে দুজনে পায়ে হেঁটে বেড়ায়। গ্রামের লোক এসে আর্জি ও অভিযোগ জানায়। কতরকম সমস্যা। সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেয় বিনু। নয়তো নোট করে নিয়ে যায়। পরে ব্যবস্থা নেয়। এমনি করে বিনু বনে যায় একজন ম্যান অব অ্যাকশন। সরকার ও জনগণের মাঝখানে সেতুবন্ধন করে। ক্রমশ উপলব্ধি করে যে রাষ্ট্রের একটা দক্ষিণ মুখও আছে। কেবল রুদ্র রূপ নয়। সে একজন জনসেবক, কেবল দন্ডমুন্ডের কর্তা নয়।

মাঝে মাঝে একজনের বাসযোগ্য কাবুলিপাল তাঁবু নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে ডেরা বাঁধে। একবার কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে কাবুলিপাল যায় উড়ে। ঝড়ের রাতে তাকে আশ্রয় দেন এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থ। বিছানা পাতা হয় একই ঘরে পরিবারের স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে। সকলেই অচেনা। ভদ্রলোক কোনোরকম প্রতিদান চান না। সেটা নিছক অতিথিসেবা।

মাঝে মাঝে হাতির পিঠে চড়েও বিনু আরও দুর্গম অঞ্চলে যায়। জমিদারদের হাতি। একভাবে-না-একভাবে প্রত্যুপকার করতে হয়। তেমনি মাঝে মাঝে হাউসবোট নিয়ে সফর করতে হয়। ঠাকুরবাবুদের কিংবা চৌধুরিবাবুদের হাউসবোট। রবীন্দ্রনাথ যে বোটে চড়তেন পতিসরে যেতে-আসতে বিনুও সেই বোটের যাত্রী। সঙ্গে মীরা। নদীর দু-ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে লেখার কাজও করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই করতেন। বোট এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে দিনের বেলা যেটা লেখার টেবিল বা খাবার টেবিল, রাতের বেলা সেটা মেঝের সামিল। তখন ঢালা বিছানায় শোওয়া যায়। পতিসরে বিনু ও মীরা বোট থেকে নামে না। সেখানেই রাত কাটায়।

মাঝিমাল্লারা মুসলমান। একান্ত অনুগত প্রজা। প্রধানত মুসলমান প্রজাদের নিয়েই হিন্দুদের জমিদারি, তালুকদারি, জোতদারি। জমিদাররা নানা উপলক্ষ্যে খাজনার উপর আবওয়াব আদায় করেন। পরিবর্তে প্রজার জন্য কিছু করেন, এর দৃষ্টান্ত বিনু লক্ষ করে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতেই। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কল্যাণবৃত্তি তহবিলে প্রজারা দেয় খাজনার টাকায় এক আনা চাঁদা, জমিদার দেন টাকায় এক আনা চাঁদা। তহবিলের খরচে তিনটি হাসপাতাল, তিনটি স্কুল চলে। জমিদারির তিনটি বিভাগে। তাদের একটি হাই স্কুল।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে হিন্দু-মুসলিম সমস্যার অপর নাম হচ্ছে জমিদার বনাম প্রজা, মহাজন বনাম খাতক সমস্যা। বিনু বুঝতে পারে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মূলে ব্রিটিশ সরকারের ভেদনীতি যার অন্য রূপ জমিদার ও মহাজনদের শোষণনীতি। আইনে এর কোনো প্রতিকার নেই। বিনু আইনের বাইরে কিছু করতে পারে না। শুধু শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করে। ওদিকে মুসলিম প্রজা ও খাতকদের প্ররোচনা জোগাবার জন্যে রাজনীতিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট গান্ধীপন্থী নেতাও। জমিদারকে খাজনা না দিলে সরকারের রেভিনিউতেও টান পড়ে। সরকারকে বাধ্য হয়ে ধরপাকড় করতে হয়। যেকোনো একটা ইসুতে জেলে যাওয়া কি সত্যাগ্রহ? মুসলমানদের হৃদয় জয় কি অত সহজ?

গাঁজা চাষিদের সমবায় সোসাইটির সদস্যদের নিকট-সংস্পর্শে এসেছিল বিনু। তাদের সকলেই মুসলমান, একজন বাদে। লেখাপড়া না করেও তারা সমিতির পরিচালনায় সুদক্ষ। প্রায় সকলেই সম্পন্ন চাষি। তাদের ছেলেরা সরকারি চাকরির উমেদার না হয়ে যদি কৃষিবিজ্ঞান শিখে আরও ভালোভাবে চাষ করে তবে গাঁজা

চাষের উপর নির্ভর করতে হয় না। সেটা সমাজের পক্ষে অহিতকর। গাঁজা সোসাইটির অর্থসাহায্য নিয়ে তিনটে হাই স্কুল চলত। কিন্তু কোনোটারই মান উচ্চ নয়। বিনুর ইউরোপীয় কালেক্টরের বক্তব্য হল তিনটির জায়গায় একটিই সেন্ট্রাল হাই স্কুল হোক, তার অধীনে থাকুক তিনটি মাইনর স্কুল। বিনুর উপর ভার পড়ে এই বক্তব্য অনুসারে কাজ করার। সে তার নিজের বক্তব্য জুড়ে দেয়—সেন্ট্রাল হাই স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষণীয় বিষয় হবে কৃষিবিজ্ঞান। কালচার আর এগ্রিকালচার এটাই আদর্শ। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল চাষির ছেলেরা কেউ কৃষির ক্লাসে যায় না, যায় বিনুর হেডক্লার্কের ছেলে, ব্রাহ্মণ সন্তান, চাকরির আশায়। ওদিকে তিন হাই স্কুলের পরিচালকরা উপরের চারটি ক্লাস সেন্ট্রাল হাই স্কুলে স্থানান্তরিত করেন না। তাঁরা বরং গাঁজা সোসাইটির অর্থসাহায্য নেবেন না, নিজেরাই ভিক্ষা করে চালাবেন। তাঁদের ছেলেরা চাষি হবে কেন? তারাও পাস করে সরকারি চাকুরে হবে।

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার মূলে এটাও একটা কারণ। সবাই চায় সরকারি চাকরি, অন্যথা ডাক্তারি ওকালতি ইত্যাদি ভদ্রলোকের পেশা। তা হলেই সমাজে মর্যাদা পাবে। এর পেছনে রয়েছে শ্রমের অমর্যাদা, শ্রমকাতরতা, হীনতাবোধ। মুসলমানরাই যৌথ সমাজের নিম্নতর স্তরে। ইংরেজি লেখাপড়া শিখে হিন্দুর সমান স্তরে ওঠাই তাদের স্বপ্ন। এতদিন পরে ওরা সমঝেছে যে ইংরেজি শিক্ষাকে বয়কট করে মাদ্রাসার শিক্ষাকে আঁকড়ে ধরা মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে ভ্রান্তনীতি হয়েছে।

গরিব মুসলমান ছাত্ররা মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে ‘জাগির’ পায়। বিনা খরচে খাবার ও শোবার ব্যবস্থা হয়। খুব একটা ভালো ফল দেখাতে না পারলেও তারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দিষ্ট চাকরির কোটায় জায়গা পেয়ে যায়। যোগ্যতর হিন্দুর ছেলেরা পায় না।

যোগ্যতর হিন্দুকে ডিঙিয়ে কম যোগ্য মুসলমানকে চাকরির ভাগ দেওয়ার এই যে নীতি বিনুও এর ভুক্তভোগী। প্রতিযোগিতার প্রথম বারেই সে পঞ্চম হয়েছিল, কিন্তু তাকে বাদ দিয়ে একজন মুসলমানকে নেওয়া হয়। বিনু তখন প্রতিজ্ঞা করে সে দ্বিতীয় বারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবেই। ভগবান তার মুখরক্ষা করেন। কিন্তু দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্যে যদি তার বয়স না থাকত তাহলে সে কোনোদিনই আইসিএস হতে পারত না, বিলেত যেতে পারত না, ফিরে এসে বাংলায় নিযুক্ত হতে পারত না, এতরকম লোকের সঙ্গে মিশতে পারত না। তার সাহিত্যিক সত্তারও ক্ষতি হত। একজন সাংবাদিক হয়ে সে এমন কিছু লিখতে পারত না যা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরির প্রশংসাযোগ্য হত।

সাম্প্রদায়িক রোমান্সের পর থেকে শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও একটু মুসলিমবিদ্বেষ জাগে। কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেন,

> O Hindu is Hindu and Muslim is Muslim
> And never the twain shall meet.

বিনু তা শুনে ব্যথিত হয়। যারা পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী, এক ভাষায় কথা বলে, এক মাঠে চাষ করে, এক নৌকায় নদী পার হয়, এক বন্যায় ভাসে, এক দুর্ভিক্ষে মরে তারা কি ইংরেজদের মতোই পর, তারা কি সাত-আট শতাব্দীর পরেও আপন হয়নি? হবেও না ব্রিটিশশাসনের অবসানে? ভেদনীতির অন্তর্ধানে? বিনু হিন্দু-মুসলমানদের বেলাও মনে করে—‘কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়, যেখানে উভয়েই ভারতীয়, উভয়েই বাঙালি।’

পরস্পরের প্রতি টান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকের মধ্যেই। তা না হলে মুসলিম প্রধান গ্রামে পাঁচ-দশ ঘর হিন্দু টিকতে পারত না। অথবা হিন্দুপ্রধান পাড়ায় দু-চার ঘর মুসলমান। তার নিজের জন্মস্থানে তাদের পাশের বাড়ির বাসিন্দারা মুসলমান। ধারেকাছে মুসলিম বসতি নেই। কই, কখনো তো মনোমালিন্য হয়নি। রোজ বিকেলবেলা মুসলিম মাস্টার চা খেতে আসতেন। বিনুর আর একজন কাকা আত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতেন ও পেতেন। কলেজেও তার মুসলিম বন্ধু ছিল। তাদের সঙ্গে সে এক হস্টেলে প্রায় দু-বছর থেকেছে।

দাঙ্গার সময় বিনু কড়া হাকিম। হিন্দু বা মুসলমান কাউকেই রেয়াত করে না। সে তখন ধর্মনিরপেক্ষ রাজপুরুষ বা জনসেবক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন তার কর্তব্য, সেটাই সরকারি নীতি। ইংরেজদের মধ্যে দু-একজন কালো ভেড়া থাকতে পারে, কিন্তু মোটের উপর তারা ধর্মনিরপেক্ষ ন্যায়নিষ্ঠ অফিসার। তবে এটাও ঠিক যে বিনু যে-দুজন আইন অমান্যকারীকে ধরে চালান দিয়েছিল, জেলাশাসক তাদের একজনকে সঙ্গে সঙ্গে খালাস দেন, অন্যজনকে সাত দিন পরে। মুসলিমটিকে বলেন, মুসলমানদের সঙ্গে তো ইংরেজদের কোনো বিরোধ নেই। তারা এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে কেন? হিন্দুটিকে বলেন, বাড়ি যান, আর এমন আন্দোলনে যোগ দেবেন না।

আইসিএস না হলে সে সরকারের ভিতরের খবর জানতে পেত না। সেই জেলাশাসক তার দিকে একটা ফাইল বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এঁকে পুলিশের লোক জেল থেকে খালাস করে এনে বিয়ে দিচ্ছে। বিয়ের পরে আর সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত হবেন না।'

ইংরেজদের নীতি নির্বিচারে দমনমূলক ছিল না। পুলিশের ভিতরেও বিবেচক অফিসার ছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যেও। আবার এমন লোক ছিলেন যাঁরা একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে মুনসেফের আদালত শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়িয়েছে আর বিনু তাকে শুধুমাত্র ধমক দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে শুনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গেল গেল বলে আঁতকে উঠেছেন। জেলাশাসক—ইনি অন্য একজন—বিনুকে বলেন, ওই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যুদ্ধে শেল শক পেয়েছেন। তাই একটুতেই অন্ধকার দেখেন।

গান্ধীজির আন্দোলনের আসল ঘাঁটি ছিল মেদিনীপুর জেলা। বিনুর মহকুমা রাজশাহি জেলায়। সে-আন্দোলনের আঁচ অতদূর পৌঁছোয়নি। তাই বিনুকে কড়াহাতে দমন করতে হয়নি। গান্ধীপন্থীদের সঙ্গে তার সদ্ভাব ছিল। সরকারও সেটা জানতেন। বিনুর বরাত ভালো যে সন্ত্রাসবাদী ঘটনা তার এলাকায় ঘটেনি। ঘটলে তাকে মুশকিলে পড়তে হত। দন্ড দিলে দেশের লোক ভাববে দেশদ্রোহী, না দিলে সরকার মনে করবে রাজদ্রোহী। বিনু পাপকে ঘৃণা করত, কিন্তু পাপীকে নয়। অপরাধীর জন্যে তার অন্তরে একটা নরম কোণ ছিল। দন্ড দিলেও সে অত্যন্ত গুরুদন্ড দিত না। তবে ধর্ষণের বেলা সে বজ্রাদপি কঠোর।

লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচন যৌথ পদ্ধতি অনুসারে হত। হিন্দু প্রার্থী, ভোটার মুসলমান। মুসলিম প্রার্থী, ভোটার হিন্দু। সাধারণত মুসলিম ভোটে হিন্দু প্রার্থীরাই অধিকাংশ স্থলে জয়ী হতেন। যদিও এলাকাটা মুসলিমপ্রধান। এই প্রথা কেন্দ্রীয় তথা প্রাদেশিক স্তরে প্রচলিত থাকলে মুসলিমপ্রধান বাংলার নির্বাচিত আইনসভা হিন্দুপ্রধান হতে পারত। সেটা এড়াবার জন্য মুসলিম রাজনীতিকরা স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দাবি তোলেন, পেছনে ইংরেজ শাসকদেরও কূটনীতি ছিল। ওঁরা মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে কয়েকটা প্রদেশ হবে মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর সেই কয়েকটা প্রদেশের নির্বাচিত সরকারও মুসলিমপ্রধান। আবশ্যক স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি। সেই জিনিসটিই দাবি করেন মুসলিম রাজনীতিকরা।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও রাজশাহি—তিনটি জেলাই ছিল মুসলিমপ্রধান। কিন্তু তিনটি জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানরা ছিলেন হিন্দু। তাঁদের যাঁরা সমর্থক তাঁদের মধ্যে মুসলমানও ছিলেন। জেলাবোর্ডের মধ্যে বিনুরও প্রবেশ ছিল। সেখানে সে হিন্দু-মুসলিম বিভেদ লক্ষ করেনি। চেয়ারম্যানের স্বপক্ষে তথা বিপক্ষে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদস্য। কংগ্রেস বা মুসলিম লিগ কোনোটারই অস্তিত্ব জেলাবোর্ডের সভায় ছিল না।

একদিন শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপিকার আর্নল্ড বাকে আসেন বিনুর ও মীরার অতিথি হয়ে। তিনি চান বাংলার লোকগীতি রেকর্ড করতে। সঙ্গে রেকর্ড করার যন্ত্র। বিনুর অনুরোধে লোকগীতি গবেষক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন কোনখান থেকে নিয়ে আসেন এক ফকির ও তার ফকিরনিকে। ফকিরনি গেয়ে শোনায়—

প্রেম করো মন প্রেমের মর্ম জেনে
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু লহ চিনে।

চণ্ডীদাস আর রজকিনী প্রেম করিত তারাই জানি
এক মরণে দু'জন ম'লো রে প্রেমপূর্ণ প্রাণে।

মুসলমানের মুখে চণ্ডীদাস আর রজকিনির প্রেমের আদর্শ শুনে বিনু বিস্মিত হয়। কিন্তু তার জন্যে অপেক্ষা করছিল আরও বিস্ময়কর একটি পদ—

প্রেমের ডোরে আছেন বাঁধা
মহম্মদ আর আপনে খোদা।

বাকিটুকু মনে নেই। বাকে সাহেব গানটি তাঁর যন্ত্রে বাজিয়ে শোনান। মনসুরউদ্দিন সাহেব লিপিবদ্ধ করেন। বিনু বুঝতে পারে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের শ্রীক্ষেত্র বাংলার লোকগীতি। পরে শুনতে পায় চণ্ডীদাস আর রজকিনির প্রেম নিয়ে ওই একই পদ অন্য এক জেলায় এক বৈষ্ণবীর কণ্ঠে। প্রায় পাঁচশো বছর ধরে সেই প্রেমের কাহিনি বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে এক ডোরে বেঁধে রেখেছে।

এক অশীতিপর বয়সি চাষি মুসলমান একদিন বিনুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। তার হাতে এক বাণ্ডিল কাগজপত্র। পাঁচ বছর ধরে সরকারের বিভিন্ন অফিসারকে লেখা চিঠিপত্র। আত্রাই নদী থেকে খাল কেটে জল নিয়ে যায় গাঁয়ের কতক লোক তাদের জমিতে সেচের জন্যে। বর্ষাকালে নদীর প্লাবনের সময় সেই খাল দিয়ে ঢোকে কচুরিপানা। গ্রামকে গ্রাম ছেয়ে যায় কচুরিপানায়। ফসল নষ্ট করে সর্বসাধারণের। প্রতিকারের একমাত্র উপায় খালের মুখ বন্ধ করা ও তারপরে কচুরিপানা উচ্ছেদ করা। ষাটখানা গ্রামের লোক শ্রমদান করতে রাজি, কিন্তু খালের মুখ বন্ধ করতে গেলে সরকারের অনুমতি না নিলে নয়। সরকার শুনছেন না।

বিনু খবর নিয়ে জানতে পারে সরকারি নীতি হচ্ছে নদীনালার জলকে অবাধে বহতা রাখা, বাঁধ দেওয়া বারণ। বিনু জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে। সবাই মিলে পরামর্শ করে এই স্থির হয় যে, বেসরকারিভাবে বাঁধ বাঁধার সময় লোহার কপাট বসাতে হবে। সেটা মাঝে মাঝে খুলে দেওয়া হবে, তারপর বন্ধ করে দেওয়া হবে। দায়িত্ব সরকারের নয়—গ্রামবাসীদের। জেলাশাসক তাঁর দাতব্য তহবিল থেকে কিছু টাকা দেন। স্লুইস গেট কেনা হয়। এইবার আস্তান মোল্লা দেখিয়ে দেয় তার কেরামত। ষাটখানা গাঁয়ের হাজার হাজার মরদ এসে শ্রমদান করে বাঁধ বাঁধে। স্লুইস গেট বসানো হয়। এরপরে সবাই মিলে কচুরিপানা উচ্ছেদ করে। স্থানীয় নেতৃত্বে পল্লির জনগণ কীই-না সাধন করতে পারে। তবে সরকারকেও দরদি হতে হয়।

এইসব পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে বিনুর প্রত্যয় দৃঢ় হল যে সদাশয় রাজপ্রতিনিধিরা উপর থেকে তাঁদের আদর্শ চাপিয়ে দিতে গেলে সাড়া পান না। কিন্তু উদ্যোগটা যদি তলা থেকে আসে আর লোকে শ্রমদানে অগ্রসর হয় তবে সরকারের সামান্য অনুদানেও আশ্চর্য সাড়া পাওয়া যায়। সেন্ট্রাল হাই স্কুলের আইডিয়াটা জেলাশাসকের। কালচার আর এগ্রিকালচারের সংযোজনটা মহকুমাশাসকের। দুটোই উপর থেকে চাপানো। ওঁরা যেই বদলি হয়ে গেলেন, ওঁদের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান কায়েমি স্বার্থের প্রতিরোধে অকর্মক হয়।

তবে আশ্চর্যের ব্যাপার, বদলি হতে হতে বিনু যখন অন্য এক জেলার শাসক তখন তার লঞ্চের সহযাত্রী বাংলার গভর্নরের শাসন পরিষদের সদস্য খাজা স্যার নাজিমউদ্দিন খানা টেবিলে বসে অযাচিতভাবে তাকে বলেন, সরকার তার সেই স্কুলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ততদিনে বিনুর মন উঠে গেছে। সে নির্বিকার।

এর চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা ঘটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরে মুজিব সরকারের নিমন্ত্রণে বিনু যখন ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে ঢাকায় যায়। খানা টেবিলে বসে শিক্ষাসচিব তাকে বলেন তার সেই কৃষিশিক্ষাসংযুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের আইডিয়া নতুন সরকার গ্রহণ করেছেন। বিনু অভিভূত হয়। সময়ের ব্যবধান ১৯৩২ থেকে ১৯৭৫—তেতাল্লিশ বছর। ব্যক্তির জীবনে খুব বেশি, জাতির জীবনে খুব বেশি নয়।

স্রষ্টা বিনুর সঙ্গে ছিল দ্রষ্টা বিনু। তার কাজ জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিক নিরীক্ষণ করা। আইসিএস তাকে যত বেশি সুযোগ দিয়েছিল তত বেশি বোধহয় আর কোনো জীবিকা দিত না। তবু তার মনে একটা অতৃপ্তি ছিল। সে আরও কত কী দেখতে চায়, দেখতে পাচ্ছে না। আরও কত কী করতে চায়, করতে পারছে না। ইউরোপের সেই দু-বছর তো আর ফিরে আসবে না। তার প্রভাব বিনুকে আচ্ছন্ন করেছিল। সে যেখানেই

বদলি হোক-না কেন, তার ইউরোপীয় স্মৃতি তার সঙ্গে সঙ্গে যায়, তার উপন্যাসকে রস ও রসদ জোগায়। ঠিক সেইরকম অভিজ্ঞতা বাংলার মফস্সলে হবার নয়, বিনু তাই অতৃপ্ত। অথচ যা দেখছে, যা শিখছে তাও তো তাকে ভরিয়ে তুলছে। কে জানে হয়তো সাহিত্যের পাথেয় হবে। সে কী লিখবে তা বেছে নিতে পারে, কিন্তু কোথায় বদলি হবে, কী দেখবে, কী করবে তা বেছে নিতে অপারগ।

দিনমান মামলামোকদ্দমা করা পছন্দ নয়; মনে হয় সময়ের অপচয়, জীবনের ক্ষতি। কিন্তু সেই সূত্রে কতরকম চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। যারা খারাপ তাদের মধ্যেও কিছু সদগুণ আছে। যেমন দস্যু রত্নাকরের মধ্যে বাল্মীকির কবিপ্রতিভা। বিনুকে জেলখানা পরিদর্শনেও যেতে হত। কষ্ট হত কয়েদিদের দেখে। দন্ডভোগ করে যারা মুক্তি পেত তারা কাজ না পেয়ে আবার ফিরে যেত। কী দুভার্গ্য!

বিনুর জ্বলন

দেশে ফিরে আসার পরেও বিনুর অন্তরে বিশেষ একপ্রকার জ্বলন, যা সে বয়ে নিয়ে এসেছিল প্রবাস থেকে। পারিবারিক জীবনে সে যতদূর সুখী হতে পারা যায় ততদূর সুখী। চাকরিতে কেউ কোনোদিন সুখী হয়নি, সেও নয়; কিন্তু মোটের উপর ভালোই লাগছিল তার। সামান্য হলেও লোকের কিঞ্চিৎ হিতসাধন করতে পারছিল। আর তার সাহিত্যের কাজ ব্যাহত হলেও বন্ধ ছিল না। বই প্রতিবছরই বার হচ্ছিল।

যে আগুন সূর্য তারকায় জ্বলছে সে আগুন বিনুর অন্তরেও জ্বলছিল, নইলে তার সৃষ্টিকর্ম থেমে যেত। কিন্তু এ জ্বলন যে সৃজনের জ্বালা নয়। এটা একজন স্রষ্টার নয়, একজন চিন্তাশীল মানুষের। সে ভারতে বাস করলেও তার নিশ্বাসবায়ু আসছে দিগদিগন্ত থেকে। তার চক্ষের আলোও সারা আকাশ থেকে।

আধুনিক যুগের সমস্যাগুলো এক দেশে নিবদ্ধ নয়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। বিলেত থেকে আসার আগেই সে জানতে পেরেছিল ডিপ্রেশন বা মন্দা শুরু হয়ে গেছে। তার বান্ধবী একদিন বলেন খরচ না কমালে নয়, তাই সাপ্তাহিক *স্পেকটেটর* পত্রিকার চাঁদা বন্ধ করতে হচ্ছে। মন্দা ক্রমে ক্রমে ভারতের বাজারে এসে হাজির হয়। পাটের দাম পড়ে যায়। প্রজারা জমিদারের খাজনা দিতে গাফিলতি করে। জমিদাররা সরকারের রেভিনিউ দিতে কসুর করেন। একদিন সরকার থেকে নির্দেশ আসে কর্মচারীদের মাইনের শতকরা দশ ভাগ কাটা যাবে; জেলাশাসকেরও, বিনুরও।

জেলাশাসক বিনুকে বলেন, ‘আমাকে দেখছি পাইপ টানা ছাড়তে হবে। তামাক কেনার টাকা ছাড়া আর কিছু ছাঁটাই করতে পারছিনে।’

তিনিও বিবাহিত ও সসন্তান। একজন ইংরেজেরই এই দশা। বিনুও বিবাহিত, তবে তখনও পিতা হয়নি। এমনিতেই টান পড়ছে ভাইকে বিদেশে সাহায্য করতে গিয়ে। মীরা নিজেই রাঁধে, তাকে জোগান দেয় গাঁজা সোসাইটির দেওয়া একটি পিয়োন। নাম সুখলাল। ধুতি পরে, চেহারাও হিন্দুর মতো। দাড়ি নেই। কে বলবে সে মুসলমান? এ তথ্য জানতে বিনুর দেড় বছর লাগল। অন্য এক মহকুমার চাপরাশি বাদলের বেলাও তাই। এসব নাম হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই।

মন্দার দ্বারা আক্রান্ত জার্মানিতে দেখতে দেখতে ষাট লক্ষ শ্রমিক বেকার হয়। সোশ্যাল ডেমক্র্যাট সরকারের পতন ঘটে। ঘটায় ডান দিক থেকে নাতসিরা, বামদিক থেকে কমিউনিস্টরা একযোগে। কিন্তু ক্ষমতায় আসে কেবল নাতসিরাই। কমিউনিস্টরা পালিয়ে বাঁচে। বিনু এ খবর পেয়ে বিচলিত হয়।

ডেমোক্রেসি জার্মানিতে ধোপে টিকল না। সোশ্যালিজম এখন ন্যাশনাল সোশ্যালিজম মূর্তি ধরে এল। রাশিয়ার মতো জার্মানিতেও ডিক্টেটরশিপ। অথচ প্রোলেতারিয়ান নয়। তবে তাদেরও সায় আছে। সৈন্যসংখ্যা বহুত বাড়িয়ে দেওয়ায় বেকারসংখ্যা কমেছে। যুদ্ধোপকরণ নির্মাণের জন্যে কলকারখানা দিনরাত ব্যাপৃত, তাই শ্রমিকদেরও অনেকের বেকার দশা ঘুচেছে। রাস্তা তৈরি হচ্ছে বিরাট আকারে। তাতেও বিস্তর শ্রমিকের কর্মসংস্থান হচ্ছে। হিটলারি দাওয়াইয়ে মন্দার চিকিৎসা সেটা মন্দ হলেও মন্দের ভালো—বুদ্ধিজীবীদের অনেকের ধারণা।

বিনু তো বিকল্প সমাধান বাতলাতে পারছে না। তাই মনে মনে জ্বলছে। ওদিকে স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকারকে গদিচ্যুত করার জন্যেও দেশের ফ্যাসিস্টরা সংগ্রামরত। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ থেকে গণতন্ত্রের পক্ষপাতীরা সে-দেশে লড়তে যাচ্ছেন। গিয়ে দেখছেন কমিউনিস্টরাও নানা দেশ থেকে সমাগত, বিশেষ করে রাশিয়া থেকে। মিলেমিশে লড়লে ফ্যাসিস্টদের হারিয়ে দিতে পারা যেত। কিন্তু গণতন্ত্রীদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ বাঁধে। মাঝখান থেকে ফ্যাসিস্টদের জিত। আরও এক ডিক্টেটরশিপ। বিনুর আরও কষ্ট হয়।

মুসোলিনির দম্ভের সীমা নেই। তিনি আবিসিনিয়া জয় করে তাঁর ফ্যাসিস্ট শক্তি বর্ধন করবেন। বিনু ভেবেছিল ইংরেজ আর ফরাসিরা বাধা দেবে। কেউ যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চান না। মিউনিখে হিটলারের পায়ে চেকদের বলি দিলেন চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের। বিনু চেকদের জন্যে বিষাদ বোধ করে। ইংরেজ ও ফরাসিদের ধিক্কার দেয়।

জার্মানরা এক এক ধাপ করে যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে এটা তো বেশ স্পষ্ট। কিন্তু তারা যদি সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মিত্র হবে কারা? মিউনিখের ভীত ইংরেজ ফরাসি নেতারা? সোভিয়েটকে সাহায্য করা মানে তো কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জিতিয়ে দেওয়া। কে তেমন সিদ্ধান্ত নেবে?

অপরপক্ষে নাতসিদের জিততে দেওয়াও বিপজ্জনক। পূর্বে নিষ্কণ্টক হয়ে ওরা পশ্চিমের উপর চড়াও হবে। কে তেমন ঝুঁকি নেবে? ইংরেজ ফরাসিরা শঙ্কিত। রম্যাঁ রল্যাঁ গত মহাযুদ্ধে শান্তিবাদী ছিলেন। এবার তিনি নাতসিদের আক্রমণ থেকে শ্রমিকদের রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে অস্ত্রধারণের পক্ষপাতী। কমিউনিস্টরা মানবের মঙ্গলের জন্যে অনেক কিছু করেছে ও করবে, নাতসিরা দানব।

বিনু এই ধাঁধার জবাব খুঁজে পায় না। সে ডিক্টেটরশিপের বিরোধী। তবে ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্ট এই দুই মতবাদের মধ্যে দ্বিতীয়টাই ভালো। সে রল্যাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু স্টালিন যেভাবে বিচারের প্রহসন করে তাঁর নিজের দলের অন্যান্য নেতাদের নিধন ঘটালেন তা বিনু সমর্থন করেনি। সেটাও তার অন্তরের জ্বলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। কমিউনিজমের উপরে আর শ্রদ্ধা তার আগের মতো নয়। এ-রকম চলতে থাকলে কমিউনিস্টদেরও পতন হবে।

অদ্ভুত ব্যাপার, জ্বলনের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একপ্রকার অসুখ। ইংরেজিতে যাকে বলে malaise। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেন তার কিছুই হয়নি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। সরকারি কাজকর্ম ঠিকমতো করে। সাহিত্যের কাজও। অতএব মানসিক অসুখ নয়। নিয়মিত টেনিস খেলে অতএব কায়িক অসুখ নয়। কিন্তু বিনু জানে ওটা অসুখ। ওর মূলে আবার এক মহাযুদ্ধের আশঙ্কা আর সভ্যতার বিলোপ। বর্বরতার দিকে উভয় পক্ষেরই গতি। যারা জিতবে তারাও হিংস্রতার শরণ নেবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার রোগই হল অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বণ্টন। তার ফলে সমাজের একটা বৃহৎ অংশের দুর্ভোগ। এরা হয় বেকার, নয় বঞ্চিত, নয় মজুরি-দাস। সমাজতন্ত্র এদের জন্যে আশার বাণী বহন করে এনেছে, কিন্তু তার অর্থ কি এই যে সেই বৃহৎ অংশটা সর্বেসর্বা হয়ে সমাজের উপর চিরকাল কর্তৃত্ব করবে? অন্যেরা তা মাথা পেতে নেবে? বিদ্রোহ করবে না? গৃহযুদ্ধ বাঁধবে না? কিন্তু মুশকিল হচ্ছে তারাও হতে চায় সর্বেসর্বা, অপরের উপর ডিক্টেটর। ধনতন্ত্র বনাম সমাজতন্ত্রের হুংকারে গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই ধারণা গণতন্ত্র সকলের সবার্থসাধক নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে কল্পিত।

বিনুকে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হচ্ছে যে আধুনিক যুগে সকলে ভোট দেবার অধিকারী হলেও সব প্রতিনিধি সরকার গঠন করেন না। যাঁরা অধিকাংশের আস্থাভাজন তাঁরাই সরকার গঠন করেন। অন্যেরা হন বিরোধী পক্ষ। সরকার পক্ষ আস্থা হারালে বিরোধী পক্ষ তাঁদের স্থান নেন। নির্বাচনের সূত্রে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। সাধারণত চার-পাঁচ বছর অন্তর। কিন্তু ডিক্টেটরশিপের বেলা তেমন কোনো সময়সীমা বা দ্বিপাক্ষিকতা

নেই। নির্বাচন সূত্রে আস্থানির্ণয়ও নেই। জোর যার মুলুক তার। সরকারের পেছনে দেশের অধিকাংশ লোক আছে কি না তার প্রমাণ নেই। জোর সেক্ষেত্রে ভোটের জোর নয়, জোটের জোর; কিংবা গায়ের জোর।

গণতন্ত্র বিভিন্ন দলকে শাসনের সুযোগ দেয়। কিন্তু দল যদি শ্রেণির বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হয় তা হলে বিপক্ষের বিপত্তি। সেই বিপত্তির ব্যাখ্যা ওদেশে কমিউনিজম, এদেশে কমিউন্যালিজম। দলপতিরা ক্ষমতা হাতে পেলে নিজেদের শ্রেণির বা সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই দেশের বা জাতির স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেবেন। গণতন্ত্রের কাঠামোর ভিতরে থেকেও দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভারতের মাটিতে পঞ্চায়েতি গণতন্ত্রের শিকড় ছিল, কিন্তু পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ছিল না। সেটা ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তন। বিনুর বিশ্বাস স্বাধীনতার পর সংবিধান প্রণয়নের সময় যখন আসবে তখন দু-রকম গণতন্ত্রের সমাহার করতে পারা যাবে। কিন্তু শ্রেণির বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নয়। তা না হলে ভারত ভাগ হয়ে যেতে পারে। বহু শতাব্দী পরে ভারত এক-শাসনাধীন হয়েছে। সেটা পরাধীনতা। তার অবসান হোক। কিন্তু তার সুফল যেন অটুট থেকে যায়। দেশ যেন বলকান না হয়, তুরস্কের অধীনতার শেষে ইউরোপে যা হয়েছে।

বিনুর উপরওয়ালা ইউরোপীয় জেলা জজ তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ‘প্রাদেশিকতার থেকে সাবধান। খ্রিস্টেনডমকে ভেঙে যেতে দিয়ে আমাদের কী পরিণাম হয়েছে দেখছেন তো। একরাশ নেশন স্টেট, নিত্য কলহ, বার বার যুদ্ধ।’ তার বক্তব্য সমর্থন করেন ইংরেজ কমিশনার। এঁরা ভারতের হিতৈষী। সম্প্রতি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছে, প্রাদেশিকতার বিষময় ফল মধ্যপ্রদেশে দেখা যাচ্ছে। সেখানে মারাঠিভাষী ও হিন্দিভাষী কংগ্রেস মন্ত্রীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব, হাইকমাণ্ডের হস্তক্ষেপ।

ছুটি নিয়ে বিনু সপরিবারে বোম্বাই যায়, সেখান থেকে আরও কয়েকটি জায়গা ঘুরে মাদ্রাজ, সেখান থেকে জাহাজে সিংহল, রেলপথে আবার মাদ্রাজ হয়ে কোচিন। বোম্বাইতে দেখে মারাঠি ও গুজরাতির বিরোধ। মাদ্রাজে তামিল তেলুগুর বিবাদ। সর্বত্র ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতার কলহ। ভারতীয়রা একটা নেশন—এ বোধ দুর্বল। এক সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই। এ ছাড়া তো মুসলমান খ্রিস্টান আছে।

সুদীর্ঘকাল অহিংস সংগ্রাম চালাবার পর কংগ্রেস যখন নির্বাচনে জিতে বেশিরভাগ প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে তখন আইনের অক্ষর মেনে নিয়ে একজন বা দুজন করে মুসলিম মন্ত্রী করা হয় কংগ্রেস থেকেই। অথবা নির্দলীয় একজনকে। আইনের স্পিরিট মানলে মুসলিম লিগ থেকে মন্ত্রী নিতে হত। কারণ আইনসভাগুলির অধিকাংশ মুসলিম সদস্যই লিগপন্থী। ব্যতিক্রম উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। এতে জিন্না সাহেব খেপে যান। তাঁর দলটিও রুষ্ট। লিগই নাকি গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস এটা স্বীকার করে না। দুই দলের মধ্যে সন্ধি অসাধ্য হয়। বিগ্রহই সুনিশ্চিত।

কংগ্রেসের ভিতরেই দেখা গেল দক্ষিণপন্থী বনাম বামপন্থী নামক দুই উপদলের দ্বন্দ্ব। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রকে অধিকাংশ ভোটে জিতিয়ে দেয়।

আসলে তা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের উপর অনাস্থাজ্ঞাপন। কংগ্রেস সভাপতি হলেও সুভাষচন্দ্র হাইকমাণ্ডের একজন ছিলেন না। হাই কমাণ্ড তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয়বার সভাপতি হয়ে সুভাষচন্দ্র ওয়ার্কিং কমিটিকে ঢেলে সাজাতেন, হাই কমাণ্ডেরও অধিনায়ক হতেন। দক্ষিণপন্থীদেরও ওয়ার্কিং কমিটিতে নিতেন, হাই কমাণ্ডেও রাখতেন। কিন্তু তাঁদের পরাজয়ের গ্লানি মুছত না। তাঁরা সদলবলে ফিরে না এলে সহযোগিতা করতে অসম্মত হন। শুধুমাত্র বামপন্থীদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গড়তে সুভাষচন্দ্রও অনিচ্ছুক। তিনি গদিত্যাগ করেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করা হয়। তাঁর নির্দেশ অমান্য করেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজি কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ছয় বছরের জন্যে বহিষ্কার করার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র নিজের দল গড়েন।

এরপরে যুদ্ধের ইসুতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা ইস্তফা দেন। হাই কমাণ্ডের পরিচালনের ক্ষমতা যায়। গোটা যুদ্ধকালটা কংগ্রেস শাসনক্ষমতাহীনভাবে কাটায়। মুসলিম লিগ দেখে কংগ্রেস শাসনের শূন্যতা পূরণ করল

গভর্নরের শাসন। কেন্দ্রেও একদিন কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করলে তাঁদের শূন্যতা পূরণ করবেন রাজপুরুষগণ। কংগ্রেসরাজের বিকল্প ব্রিটিশরাজ। ব্রিটিশরাজের বিকল্প কংগ্রেসরাজ। তা হলে মুসলিম লিগের ভবিষ্যৎ কী? এর উত্তর পাকিস্তান অর্জন। সন্ধিসূত্রে না হলে বিগ্রহসূত্রে।

বিনু উপলব্ধি করে মহাযুদ্ধের পরে বাঁধবে গৃহযুদ্ধ। তার থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ব্রিটিশ শাসনের চিরস্থায়িত্ব? না। অন্তঃপরিবর্তন—হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের। সর্বস্তরে ও সর্বত্র উভয়ের কোয়ালিশন। কংগ্রেসই সর্বভারতের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। মুসলিম লিগ সর্ব মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান নয়। ব্রিটিশরাজের শূন্যতা পূরণ কোনো একটি দলের একান্ত সাধ্য নয়, না কেন্দ্রের না প্রদেশের। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা হলে কোয়ালিশনের সাধ্য।

কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের অপর নাম ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট। ওদেশে সেইরকম একটি গভর্নমেন্ট গঠিত হয়ে থাকে যুদ্ধকালে। এদেশেও হতে পারে। তা হলে ধরে নিতে হয় যে ভারতীয়রাও একটি নেশন। অথচ এ বিষয়ে তীব্র মতভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে। হিন্দু মহাসভার মতে হিন্দুরাই নেশন। মুসলমানরা বহিরাগত বিদেশি অধিবাসী, রেসিডেন্ট এলিয়েন। মুসলিম লিগ বলছে মুসলমানরা আলাদা একটা নেশন। হিন্দু ও মুসলমান দুই নেশন। দুই নেশনের জন্যে চাই দুই কেন্দ্রীয় সরকার। এসব কথা শুনলে বিনুর বুক জ্বলে যায়। এসব সত্য হলে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কী করে সম্ভব!

যুদ্ধে যোগদান নিয়েও তীব্র মতভেদ। গান্ধীজি যুদ্ধে বিশ্বাস করেন না। তিনি স্বয়ং যুদ্ধে যোগ দেবেন না, কিন্তু কংগ্রেস যদি দিতে চায় তিনি বাধা দেবেন না। কংগ্রেসের নেতারা যুদ্ধে যোগদানে রাজি হবেন যদি ব্রিটেন প্রতিশ্রুতি দেয় যে যুদ্ধের পরে ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে ও আপাতত একটা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে। সুভাষচন্দ্র পান আগে স্বাধীনতা, তারপরে যুদ্ধে যোগ দেওয়া না দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মুসলিম লিগ যেখানে ক্ষমতাসীন সেখানে সহযোগিতা করবে, অন্যত্র অসহযোগ, যদি-না স্বতন্ত্র বাসভূমির আশ্বাস পায়। এসব কথা শুনে বিনু অস্বস্তি বোধ করে। তাহলে কি যুদ্ধের প্রশ্নে একমত হওয়া একেবারেই অসম্ভব? ওদিকে ইংরেজরা তাদের নিজেদের দেশেই বিপন্ন। এসব দাবিদাওয়া সময়োচিত নয়।

তার আপনার মধ্যেও একটা মন্থন চলছিল। গত মহাযুদ্ধে ভারত ধন জন ও উপকরণ মুক্তহস্তে জোগায়। লক্ষ লক্ষ জোয়ান প্রাণ দেয়। খেতে না পেয়ে কত লোক মারা যায়। বিনুকেও আধপেটা খেতে হয়। পরিবর্তে ভারত যা লাভ করে তা ব্রিটিশ কর্তাদের কথার খেলাপ। তাই অসহযোগ আন্দোলনে নামতে হয়। এবারেও কি কথার খেলাপ হবে না? ব্রিটিশ কর্তাদের বিশ্বাস কী? অথচ ওদিকে যুদ্ধবাজ জার্মানদের রুখবে কে? ভারত থেকে সিপাহি না গেলে একা ইংরেজ সেনার সাধ্য নয়। নাতসিদের রুখতে না পারলে ওরা তো ইউরোপ জয় করবেই, এশিয়ার দিকেও অগ্রসর হবে। ভারতও বিপন্ন হতে পারে। গান্ধীজি অবশ্য অকুতোভয়। হিংসা যত বলবান হোক-না কেন অহিংসা তার চেয়েও বলবান। বল পরীক্ষার জন্যে তিনি প্রস্তুত। কিন্তু সেকথা কি দেশবাসীদের বলা সাজে! হিটলার আকাশ থেকে নামলে ওরা কি লড়বে না পায়ে পড়বে?

আচমকা জার্মান-সোভিয়েট চুক্তির খবর শুনে বিনু ঘাবড়ে যায়। তার মানে কি এই যে জার্মানরা পশ্চিম ফ্রন্টে যুদ্ধ করুক, পূর্ব ফ্রন্টে নয়? এদেশের হিটলার বিরোধীরা এতদিন স্টালিনের উপর ভরসা রেখেছিলেন। আর কেউ না রুখুন স্টালিন রুখবেন। বিনুও তাঁদের একজন। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, যা শত্রু পরে পরে। যুদ্ধে মরুক ইংরেজ, ফরাসি, জার্মান। অক্ষত থাকুক সোভিয়েট জনগণ। কিন্তু পরে দেখা গেল জার্মানরা ফরাসিদের হারিয়ে দেবার পর রাশিয়ানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের মতলবের খবর স্টালিনকে জানিয়েছেন চার্চিল। চার্চিল ও স্টালিন একদিল। আগের বারের মতো আমেরিকাও জার্মানদের বিপরীত শিবিরে, অথচ ইটালি ও জাপান আগেরবারের মতো নয়, এবার তারা শিবির পরিবর্তন করেছে। তুরস্ক হয়েছে নিরপেক্ষ। জার্মানরা ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে শুধু বিমান থেকে বোমা ফেলে ক্ষতি যা করবার তা করেছে। যাঁরা বলতেন ইংল্যাণ্ডের দুর্যোগই ভারতের সুযোগ, তাঁদের থিসিস ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়। আর

ভারতের কমিউনিস্টরা সোভিয়েট ইউনিয়নের মিত্রদের ভারতের মিত্র বলে তাদেরই পক্ষ অবলম্বন করে। বামপন্থীরা পরস্পরের বৈরী হয়। আর দক্ষিণপন্থীরা তো সত্যাগ্রহে নেমে কারাগারে।

বিনু যখন দেশে ফিরে এসে চাকরিতে নিযুক্ত হয় তখনই তার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আমরা চলে গেলে জাপান এসে ভারত দখল করবে। তখন তাকে রুখবে কারা? ভারতের সৈন্যবল থাকলে তো। সুতরাং এখন থেকেই স্বাধীনতা চাওয়া উচিত নয়।' বিনুর তখন বিশ্বাস হয়নি যে জাপান সত্যি সত্যি এতদূর আসবে, এত শক্তিশালী হবে। কিন্তু তেরো বছর যেতে-না-যেতেই জাপান এসে বর্মা দখল করে ফেলেছে। বর্মা তো ভারতেরই অঙ্গ ছিল। এখন স্বতন্ত্র হলেও ভারতের পূর্ব দুয়ার। বর্মার পরে পূর্ববঙ্গ ও অসম।

সে-সময় পূর্ববঙ্গে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল থাকলে বিনুকে জাপানিদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হত যদি তারা ঢুকত। ভাগ্যক্রমে সে পশ্চিমবঙ্গে জেলা জজ। তাকে একটি গোপন সার্কুলারে জানানো হয় যে জাপানিরা যদি আসে তবে সে প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করে বিহারে চলে যেতে পারে। বিহারে তার এক বন্ধু কর্মরত ছিলেন। তিনি পরে তাকে বলেন গোটা বেঙ্গল গভর্নমেন্টটাই বিহারে আশ্রয় নিত। টেলিগ্রাম যেত—বেঙ্গল কামিং। দুজন ইউরোপীয় মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে বিনুর আলাপ হয়েছিল। তাঁরাও বলেছিলেন যে তাঁরা পিছু হটতে হটতে রাঁচি পর্যন্ত যাবেন ও সেইখানে লাইন টানবেন।

কলকাতায় ব্ল্যাক আউট। বোমার ভয়। বহু লোক মফস্সলে নিরাপত্তার জন্যে সমাগত। কিন্তু মফস্সলটাও যদি জাপানিদের দখলে চলে যায় তবে নিরাপত্তা কোথায়, অধীনতা বরণ করে? সেই অগ্নিপরীক্ষার সময় কংগ্রেসি বন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। ক্রিপস উড়ে আসেন যে প্রস্তাব নিয়ে তা স্বাধীনতার খুব কাছাকাছি। কিন্তু জাপান যদি সত্যি সত্যি এগিয়ে আসত তা হলে ইংরেজরা পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে রেললাইন, নদীর পুল, কলকারখানা, লোহার খনি প্রভৃতি ধ্বংস করে দিয়ে পিছু হটত। ইতিমধ্যেই নৌকা আটক করায় খাদ্য চলাচল বাধা পেয়েছিল। ইংরেজ সেনাপতিরা বলতেন এটা মিলিটারি নেসেসিটি। কিন্তু এরজন্যে দেশের লোক নতুন কেন্দ্রীয় সরকারকেই দোষী করত। হয়তো জাপানিরা ভারতে ঢুকত না, ঢুকলেও বেশি দূর এগোতে পারত না। তবু বলা তো যায় না। কংগ্রেস নেতারা ইংরেজ সেনাপতিদের নিরস্ত করার অধিকার চান। ক্রিপস বলেন ব্রিটেনের মিলিটারি হাই কমাণ্ড ভারতেও যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে দায়ী। তাঁদের ক্ষমতা খর্ব করা চলবে না। আলোচনা ব্যর্থ হয়।

যুদ্ধকালে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আশা নেই দেখে কংগ্রেস গান্ধীর নেতৃত্বে আবার সংগ্রামে নামে। এর নাম কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন। গান্ধীজিকে জেলের বাইরে থাকতে দিলে তিনি হয়তো জনগণকে হিংসা থেকে নিবৃত্ত করতে পারতেন, কিন্তু সরকার সে ঝুঁকি নেন না। হিংসা চরমে ওঠে, প্রতিহিংসাও চরমে। সিপাহিবিদ্রোহের পর এমন ঘাত-প্রতিঘাত ভারতের ইতিহাসে ঘটেনি। সরকার কংগ্রেসকে হিংসার জন্যে দায়ী করেন। গান্ধীজি সরকারকে আরও বড়ো হিংসার জন্যে দায়ী করেন। মুসলিম লিগ আন্দোলনে অংশ নেয়নি। জিন্না মুসলমানদের তফাতে রাখেন। ওটা নাকি হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম। ইংরেজরা ভারত ছাড়লে যা হবে তা নাকি মুসলমানদের মনিব বদল। তাই গান্ধীজি যখন বলেন কুইট ইন্ডিয়া, জিন্না সাহেব জুড়ে দেন ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট। ভাগ করো আর ত্যাগ করো। ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসির পরিণাম।

বিনু মনে মনে গান্ধীজির পক্ষে, কিন্তু তিনি যখন বলেন, কুইট ইন্ডিয়া টু গড অর অ্যানার্কি, বিনু সায় দিতে নারাজ হয়। ভগবানই-বা শূন্যতা পূরণ করবেন কোন উপায়ে যদি রাজনৈতিক দলগুলি একজোট না হয়? আর অরাজকতার হাতে দেশকে সঁপে দিলে জজ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশকে মানবে কে? সৈন্যরাই-বা কার হুকুমে গুলি চালাবে? বাপু আশা করেন পনেরো দিনের মধ্যেই একটা নতুন সরকার গড়ে উঠবে। সম্ভবত কংগ্রেস-লিগ কোয়ালিশন সরকার। বিনুর বিশ্বাস হয় না যে প্রত্যেকটি প্রদেশে কোয়ালিশন না হলে কেবলমাত্র কেন্দ্রেই কোয়ালিশন হবে। না, অরাজকতা একদিনের জন্যেও নয়। চোর ডাকাত ধর্ষক ঘাতক জেল থেকে ছাড়া পেলে কী সর্বনাশ ঘটায় বর্মা থেকে চলে আসা এক বাঙালি অফিসার বিনুকে তার বিবরণ

শোনান। ইংরেজরা জাপানিদের আসার আগে তাঁর হাতে ক্ষমতা সঁপে শহর ছাড়েন। তিনিও জাপানি অধিকর্তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে বিদায় নেন তিনদিন বাদে। মাঝখানের সেই তিনটি দিন তাঁর আয়ত্তের বাইরে। জেলখানা থেকে বেরিয়ে পড়ে দীর্ঘমেয়াদি কয়েদিরা। হাতে রকমারি হাতিয়ার, লুঠতরাজ, খুনজখম, ধর্ষণ ইত্যাদির অবাধ মওকা। পুলিশ বেপাত্তা। লোকে বলে এর চেয়ে জাপানি রাজত্ব ভালো। জাপানি সেনা পায় গণসংবর্ধনা।

ত্রিশের দশকের ইউরোপীয় ঘটনাবলি রবীন্দ্রনাথকে হতাশ করেছিল। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছিল। বিনুও উপলব্ধি করেছিল যে ইউরোপের কাছ থেকে চিন্তাজগতের নেতৃত্ব আশা করা বৃথা। প্রতীচ্য সভ্যতার দেউলিয়াপনা প্রকট। তা হলে কি প্রাচ্য সভ্যতার দিকে মুখ ফেরাতে হবে? প্রাচী বলতে জাপানও বোঝায়, চীনও। ওদের কান্ডকারখানা থেকে শেখবার কী আছে? জাপানিরা কী শেখাতে আসছে বর্মিদের, ভারতীয়দের?

বিনুর একমাত্র ভরসা এখন ভারত। ভারত বলতে গান্ধীজির আদর্শ, তাঁর নৈতিক নেতৃত্ব। সারা বিশ্বের চোখে তিনি অহিংসার প্রতিমূর্তি। কিন্তু তাঁর কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলনে হিংসার প্রাদুর্ভাব বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে তাঁর ভাবমূর্তিকে ম্লান করেছে। ইংরেজরা প্রচার করছে তিনি হিংসার সমর্থক। এটা খন্ডন করা দরকার। কিন্তু আগা খানের প্রাসাদে বন্দি অবস্থায় কী করে তা সম্ভব? তাই তিনি একুশ দিন অনশনের সংকল্প নিয়েছেন। সরকার তাঁকে ছেড়ে দিতে চাইলে তিনি বলেন বাইরে গেলে তিনি অনশন নাও করতে পারেন। তার মানে মুক্তকণ্ঠে তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন। তা শুনে সরকার তাঁকে ছাড় দেন না। তিনিও নাছোড়বান্দা। অনশনে ব্রতী হন।

বিনু ও মীরা কাউকে না জানিয়ে অনশন করে কিন্তু তিন দিনের বেশি চালাতে পারে না। আদালতে না বসার জন্যে বিনুকে জবাবদিহি করতে বলা হলে সে জানায় সে তার এক প্রিয়জনের জন্যে অনশন করেছিল। প্রিয়জনের নাম উল্লেখ করে না বলে তাকে সেই তিন দিনের জন্যে ছুটি নিতে বাধ্য করা হয়। সরকার তখন গান্ধীজির সম্ভবপর সৎকারের জন্যে সচেষ্ট। তার সহযোগী জেলাশাসক একজন মুসলমান। তিনি তাকে জানান যে গান্ধীজির মৃত্যু হলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা সামাল দিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিনু তখন জেলা জজ। সেও যেন প্রস্তুত থাকে।

গান্ধীজি সে-যাত্রা বেঁচে যান। চার্চিল ব্যাখ্যা করেন তিনি নাকি জল খাওয়ার সময় পুষ্টিকর পদার্থ খেয়েছেন। আসলে যা খেয়েছেন তা লেবুরস। যাতে বমন রোধ হয়। তিনি যে একুশ দিন অনশন করেও বেঁচে রইলেন এতে প্রমাণ হল তাঁর নির্দোষিতা। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে লিকুইডেশনে না দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ চার্চিলের বিচারে নয়। বিনুর এক বন্ধুকে বাংলার লাটসাহেব হার্বার্ট বলেন, ‘মিস্টার চার্চিল ইজ নট ইংল্যাণ্ড।’

স্রোতের মাঝখানে ঘোড়াবদল করতে নেই। ইংরেজদের বক্তব্য আগে তো যুদ্ধ শেষ হোক, তারপর ভারতের সঙ্গে মীমাংসা হবে। আর ভারত বলতে শুধু হিন্দু নয় বা শুধু কংগ্রেস নয়। তার মানে মুসলমানদের সঙ্গে বা মুসলিম লিগের সঙ্গেও মীমাংসা করতে হবে। ইংরেজরা আশা করে এমন একটা মীমাংসাসূত্র মিলে যাবে যেটা ইংরেজ, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের গ্রহণযোগ্য হবে। শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটবে। বিনু ইংরেজদের মনোভাবে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছিল। জাপানিদের হাতে বর্মায় ও মালয়ে বন্দি হওয়ার ফলে তাদের প্রেস্টিজ হানি হয়েছিল। পরে অবশ্য জাপানিরা হটে যায় ও ইংরেজরা ফিরে পায়। তবে তারা ভারতীয়দের চোখে অপরাজেয় থাকে না।

তাদের বরাত ভালো। রাশিয়া দেয় জার্মানিকে হারিয়ে আর আমেরিকা জাপানকে। রুজভেল্ট আর স্টালিনের সমকক্ষ হন কিনা চার্চিল। তিনজনে মিলে ইউরোপ ভাগাভাগি করেন। জার্মানি দু-ভাগ হয়ে যায়। বিনু জার্মানদের ভালোবাসত, যদিও নাতসিদের নয়। জার্মানদের দশা দেখে তার মনে দুঃখ হয়। ওদিকে জাপানিদের উপর পারমাণবিক বোমা পড়েছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস হয়েছে। নিরীহ বালবৃদ্ধবনিতা

মরেছে বা মারাত্মক জখম হয়েছে। যদিও সেটা পার্ল হারবারের জন্যে শাস্তি তবু অমানবিক তো বটে। সভ্য মানবিক তো নয়ই, নৈতিকও নয়।

গান্ধীজি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এই যুদ্ধ শেষ হবে একটা মরাল ইসুতে। পারমাণবিক বোমার ব্যবহারই সেই মরাল ইসু। যুদ্ধ শেষ হল ঠিকই কিন্তু গ্লানি থেকে গেল যুদ্ধকালে অমানবিকতার। যে মূল্য দিয়ে জয় কেনা গেল সে মূল্য কি অত্যধিক নয়?

অথচ যুদ্ধ চলতে থাকুক এটাই-বা কে চেয়েছিল? সবাই শান্তির জন্যে অধীর। লোকক্ষয় তো বড়ো কম হয়নি। একটু একটু করে জানাজানি হয় হিটলারের আদেশে জার্মানরা ষাট লক্ষ ইহুদিকে গ্যাস চেম্বারে পুরে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরেছে। এমন কাজ যারা করে তারা কি মানব না দানব না শয়তান? বিনু ভেবে পায় না শত্রুতা কোন স্তরে নামলে মানুষ এমন কর্ম করতে পারে। তবে এরজন্যে গোটা জার্মান জাতিকে দায়ী করা যায় না। হাজার হোক ওরা গ্যেটে শিলার বাখ বেঠোফেন কান্ট হেগেলের জাতি।

যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে তার আভাস পেয়ে গান্ধীজি যান জিন্না সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। উদ্দেশ্য ভাইয়ে ভাইয়ে একটা ঘরোয়া মীমাংসা। কিন্তু সতেরো দিন একতরফা সাক্ষাতের পরও জিন্না সাহেবের সঙ্গে মত মেলে না। দুই ভাই নয়, দুই জাতি—যেমন জার্মান আর ফরাসি। মুসলমানদের দিতে হবে পাকিস্তান। নিজেরা রাখবে হিন্দুস্থান। ভারত একটা দেশ নয়, একটা উপমহাদেশ। উপমহাদেশে একাধিক নেশন থাকতে পারে। গান্ধীজি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন। কংগ্রেসের হয়ে তিনি কথা দিতে পারেন না। সিদ্ধান্ত যা নেবার তা কংগ্রেস নেতারাই নেবেন, তিনি পরামর্শ দেবেন। তিনি বিশ্বাস করেন না যে মুসলমানরা ভারত ভাগের পক্ষে। তবে তিনি একথাও মানেন যে মুসলমানরা যদি একবাক্যে পাকিস্তান দাবি করে তা হলে তাদের বাধা দেবার শক্তি তাঁর নেই।

বিনু তার মুসলমান বন্ধুবান্ধব ও আলাপীদের মুখে দু-রকম কথা শোনে। একজন বলেন, 'পাকিস্তান না গোরস্থান! মুসলমানের তাতে চূড়ান্ত ক্ষতি হবে।' আরেকজন বলেন, 'ব্রিটিশরাজের পর কংগ্রেসরাজ মানে হিন্দুরাজ। মুসলমান কখনো হিন্দু রাজত্বে বাস করতে রাজি হবে না।' অন্যরা বলেন, 'কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ মিলেমিশে রাজত্ব করলে তো ল্যাঠা চুকে যায়। ফিফটি ফিফটি।'

বিনুর ইচ্ছা করে একখানা বই লিখতে। ইংরেজিতে তার নাম হবে 'আনরিয়ালিস্টস', অর্থাৎ অবাস্তববাদীরা। সব মুসলমান পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে পারে না। সেটা অবাস্তব। সব হিন্দু পাকিস্তান থেকে চলে আসতে পারে না। সেটাও অবাস্তব। শতকরা সত্তর আর শতকরা বাইশ কখনো ফিফটি ফিফটি হয়ে সরকার চালাতে পারে না। সৈন্যদল গড়তে পারে না। সিভিল সার্ভিসও না। নেতারা যদি রাজি হন নেতৃত্ব হারাবেন। ওয়েটেজ মেনে নেওয়া যেতে পারে কিন্তু প্যারিটি কখনো নয়।

তাহলে কি ব্রিটিশ রাজত্ব অনন্তকাল? না, তাও চলতে পারে না। যুদ্ধে ইংরেজরা জিতলেও নির্বাচনে চার্চিল হেরেছেন সদলবলে। লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতবন্ধু। তিনি ব্রিটিশ রাজত্ব গুটিয়ে নিতে চান। বিনু যতদূর বুঝতে পারে সেটাই ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষের মত। ইংরেজদের যেটা প্রয়োজন সেটা বাণিজ্য। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। যুদ্ধে তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পূরণ করতে হলে বাণিজ্যবিস্তার চাই, চাই সাম্রাজ্য সংকোচন। শুধু ভারত থেকে নয়, বর্মা থেকে, সিংহল থেকে, আরও অনেক দেশ থেকে সৈন্য অপসারণই ব্রিটিশ পলিসি। সৈন্যদের মোতায়েন করতে হবে পশ্চিম জার্মানিতে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সৈন্যদের মুখোমুখি। তারা এখন পূর্ব জার্মানিতে জাঁকিয়ে বসেছে। যেকোনো দিন লাইন পার হতে পারে। ব্রিটেনের এত বেশি সৈন্য নেই যে একদিকে সোভিয়েটকে সামলাবে, আরেকদিকে সাম্রাজ্যকে। অ্যাটলি শুধু একজন আদর্শবাদী নন, তিনি একজন বাস্তববাদীও।

বিনু একদিন শুনতে পায় তার ইউরোপীয় সিভিলিয়ান সহযোগীরা ক্ষতিপূরণ পেলে ভারত ছাড়বার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। মিশর থেকে ইংরেজরা যখন চলে যান তখন যে হারে ক্ষতিপূরণ পান সে হার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। ক্ষতিপূরণ কি শুধু ইংরেজরাই পাবেন? ভারতীয়রা নয়? বিনুও কি

পেতে পারে না? তা হলে তো তার চাকরিতে থাকার দরকার হয় না। ইংরেজদের ভারত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও চাকরি ছাড়বে। ক্ষতিপূরণ না পেলেও আনুপাতিক পেনশন তো এখন ভারতীয়রাও পেতে পারবে।

প্রতি তিন বছর অন্তর লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে ঘুরে আসাই ব্রিটিশ অফিসারদের নিয়ম। কিন্তু যুদ্ধকালে এই নিয়ম কার্যকর হয় না। ফলে সবাই ছ-বছর ভারতে আটক থাকেন। কেউ কেউ সাত-আট বছর। এখন সবাই চান একই সময়ে ছুটি নিতে। তা তো সম্ভব নয়। অনেকেই চান ছুটির পর অবসর নিতে। যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে চাকরির বাজারে বহু জায়গা খালি ছিল। অবসর নিয়ে যাঁরা যাবেন তাঁরা ইচ্ছা করলে সহজেই চাকরি পেয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করবেন। দেরি করলে সে সব পদ শূন্য থাকবে না। তাই ইউরোপীয় অফিসারদের মধ্যে একটা অধীরতা দেখা দিয়েছিল। তাঁরা ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলেন কবে তাঁদের ক্ষতিপূরণের দায় ব্রিটিশ তথা ভারত সরকার উভয়েই স্বীকার করবেন। ভারত সরকার মানে ভারতীয় রাজনীতিকদের সরকার। যার সদস্যদের মধ্যে থাকবেন কংগ্রেস, লিগ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা। তেমন একটি সরকারের নাম ইন্টারিম গভর্নমেন্ট।

ইন্টারিম গভর্নমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হবে কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। তার কাজ হবে নতুন সংবিধান রচনা। যে সংবিধান রচিত হবে তা ব্রিটিশ সরকার মেনে নেবেন। সেই অনুসারে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। ভারত যদি ইচ্ছা করে কমনওয়েলেথের ভিতরে থাকবে। নয়তো বাইরে যাবে।

কিন্তু সমস্ত নির্ভর করছে কংগ্রেস-লিগ ঐকমত্যের উপরে। মুসলিম লিগ যদি কংগ্রেসের প্রস্তাব নাকচ করে বা কংগ্রেস মুসলিম লিগের প্রস্তাব; তাহলে ব্রিটিশ সরকার কার হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর করবেন? ভগবানের বা অরাজকতার হাতে। তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবে কে? পেনশনই-বা কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে?

জিন্না সাহেবের দাবি হিন্দু-মুসলিম প্যারিটি। কংগ্রেস তাতে নারাজ। বড়োলাট লর্ড ওয়েভেলও কংগ্রেসকে বাধ্য করেন না। স্থির হয় হিন্দু প্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে ছয়, মুসলিম প্রতিনিধিদের পাঁচ। জিন্না এর পরে দাবি করেন মুসলিম লিগই খ্রিস্টান ও পারসি প্রতিনিধি মনোনয়ন করবে। আর কংগ্রেস করবে শিখ প্রতিনিধি মনোনয়ন। বড়োলাট সেটা খারিজ করেন।

এরপর কংগ্রেস তার প্রাপ্য ছয়টি আসনের একটি একজন সংগ্রামী মুসলমানকে দিতে চায়। লিগের তাতে ঘোর আপত্তি। লিগই নাকি তামাম মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক দল। বড়োলাট কংগ্রেস নেতাদের বিনীতভাবে অনুরোধ করেন তাঁদের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের মধ্যে একজন মুসলমানকে না নিতে। তিনি স্বীকার করেন যে কংগ্রেসের সে অধিকার আছে। বড়োলাটের অনুরোধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সম্মত হন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ সরে দাঁড়ান। এমন সময় প্রবেশ করেন গান্ধীজি। বুঝতে পারেন যে এটা জিন্নার জেদের কাছে নতিস্বীকার। কংগ্রেসি মুসলমানরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে প্রচুর দুর্ভোগ সহ্য করেছেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে তো তাঁরাই সরকার গঠন করেছেন। তাঁদের একজনকে নেওয়া কর্তব্য। নইলে কর্তব্যহানি। কংগ্রেস নেতারা গান্ধীজির কথায় বড়োলাটের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন।

বড়োলাটের তখন উভয়সংকট। কংগ্রেস যদি যোগ না দেয় তবে শাসন পরিষদের পুনর্গঠন বৃথা। অপরপক্ষে মুসলিম লিগ যদি যোগ না দেয় তা হলেও পুনর্গঠন বৃথা। দুই প্রধান দলকে দিয়ে মানিয়ে নিতে হবে তাঁরা স্বাধীন হলে ব্রিটিশ অফিসারদের পেনশন ও ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি কি না। ব্রিটেনে সঙ্গে সম্পর্কটাই-বা কী প্রকার হবে। কানাডা-অস্ট্রেলিয়ার মতো না ফ্রান্স-ইটালির মতো।

এমন অচল-অবস্থায় অ্যাটলি নির্দেশ দেন, কংগ্রেসকে সরকার গঠনের ভার দেওয়া হোক। কংগ্রেস লিগকে রাজি করাবে। জিন্না এই পলিসির আঁচ পেয়ে লিগ ওয়ার্কিং কমিটিকে দিয়ে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেন। লিগ সদস্যরা বড়োলাটের শাসন পরিষদে যোগ দেবে না। সংবিধানসভাও বয়কট করবেন। দেশময় চালিয়ে যাবেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সংগ্রামটা শুরু হয় কলকাতায়। বড়োলাট ওয়েভেল গান্ধী ও নেহরুকে অনুরোধ করেন লিগকে কিছু কনসেশন দিতে। তাঁরা নাছোড়বান্দা। ওদিকে জিন্নাও

নাছোড়বান্দা। অ্যাটলি আবার নির্দেশ দেন কংগ্রেসকে সরকার গঠনের অগ্রাধিকার দিতে। সেটাই পার্লামেন্টারি কেতা। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কংগ্রেসিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

জওহরলাল, বল্লভভাই প্রমুখ নেতারা শাসন পরিষদ পুনর্গঠন করেন। সঙ্গে আসফ আলি। দিল্লিতে যৌথ নির্বাচন প্রথা ছিল। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ভোটে নির্বাচিত। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও পাঁচজন গ্রহণযোগ্য মুসলমান পাওয়া গেল না। সুতরাং মুসলিম জনসাধারণ হল পুনর্গঠিত শাসন পরিষদের প্রতি আস্থাহীন। তারপর এটাও দেখা গেল যে সমগ্র ভারতের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্যে দায়ী হলেও বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের পরিস্থিতি সামাল দেওয়া স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বল্লভভাইয়ের ক্ষমতার পরিধির বাইরে। ব্রিটিশ শাসকরা থাকতেই এই, তাঁরা চলে গেলে এসব প্রদেশ তো বিদ্রোহী হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। সময় থাকতে দুটি প্রদেশ ভাগ করাই সঙ্গত। ইতিমধ্যে জিন্না যোগ না দিলেও লিয়াকত আলি প্রমুখ লিগপন্থীরা সরকারের ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকেই লড়ছিলেন। কংগ্রেস না পারে গিলতে না পারে ওগরাতে। নতুন বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসকে ছেড়ে দিয়ে লিগকে সরকারের ভার অর্পণ করতে নারাজ।

কংগ্রেসপন্থীরাই ভিতরে ভিতরে চেয়েছিল যে পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হোক। তা হলে তারা আরও দুটো প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীমন্ডল গঠন করতে পারবে। নইলে তাদের চিরকাল শাসনক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। বিদ্রোহী হয়ে তারা কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে থেকে দল পাকিয়ে তাদের মনোনীত একজনকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন করতে সাহায্য করবে। তিনি হাই কমাণ্ড পুনর্গঠন করবেন। বল্লভভাইরা অপদস্থ হবেন। যেমন হতে হয়েছিল সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের সময়। কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সংকট ক্রমশ ঘনিয়ে আসতই। সময় থাকতে প্রতিকারের একমাত্র উপায় বাঙালি ও পাঞ্জাবি কংগ্রেসপন্থীদের জন্যে দুটো খন্ডিত প্রদেশ গঠন।

ওদিকে পাকিস্তানের নেপথ্য রহস্যও একই প্রকার। পাকিস্তানের প্রয়োজন হয় যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের লিগপন্থী রাজনীতিকদের অন্য কোথাও ক্ষমতার আসনে বসানোর জন্যে। বিহারি মুসলিম লিগ নেতারা যেতেন পূর্ব পাকিস্তানে। যুক্তপ্রদেশের মুসলিম লিগ নেতারা পশ্চিম পাকিস্তানে। এইভাবে মুসলিম লিগের সংহতি রক্ষা করতে পারা যেত। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে সমগ্র বঙ্গ ও সমগ্র পাঞ্জাব তথা সমগ্র অসম পড়বে মুসলিম লিগের ভাগে। কংগ্রেসের আপত্তি সত্ত্বেও চার্চিলের দাক্ষিণ্যে। চার্চিল নিজেই ক্ষমতাহীন হবেন এটা কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি।

নোয়াখালির ঘটনার অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়ে বাংলার হিন্দুরাও তিতিবিরক্ত। যাঁরা সেকালের পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে সন্ত্রাসবাদী হয়েছিলেন ও আন্দামানে গিয়েছিলেন তাঁরাও নতুন করে পার্টিশনের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। বিনুকে তার এক সহযোগী হিন্দু অফিসার বলেন, 'দেশের সেই সোনারচাঁদ ছেলেরা গেল কোথায়? গান্ধীকে গুলি করে হত্যা করতে পারে না?' বিনু জানতে চায় গান্ধীর কী অপরাধ। তিনি বলেন, 'পার্টিশন না হলে বাঙালি হিন্দু বাঁচবে না। গান্ধী পার্টিশন হতে দিচ্ছেন না।' পার্টিশনের পরিণাম দর্শনের পর উলটোটি শোনা গেল। গান্ধী কেন পার্টিশন হতে দিলেন? অতএব তাঁর মরা উচিত। একজন আন্দামান ফেরত বিপ্লবীর এই উক্তি বিনুর নিজের কানে শোনা।

গান্ধীজির আগস্ট ১৯৪২ সালের 'কুইট ইন্ডিয়া' প্রস্তাব ইংরেজরা মান্য করল ১৯৪৭ সালে আগস্ট মাসে। জিন্না সাহেবের 'ডিভাইড অ্যাণ্ড কুইট' অনুপ্রস্তাবও মেনে নেওয়া হল একই কালে। দুই শতকের ব্রিটিশ শাসন তিন মাসের নোটিশে হাওয়া হয়ে গেল। বিনু তাজ্জব ও হতভম্ব। আদালতের এক কেরানি তাকে হুঁশিয়ার করে দেন, 'চোদ্দো দিনের বিল তৈরি করে এক্ষুনি জমা দিন। এ গভর্নমেন্টের দায় অন্য গভর্নমেন্ট বহন করবে কি না সন্দেহ। করলেও কবে বিল মঞ্জুর করবে কে জানে?'

পনেরোই আগস্টের সকালে হাওড়ার নেতারা বিনুকে ধরে নিয়ে যান হাওড়া ময়দানে। সে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। সেদিন সন্ধ্যায় তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার অতুল্য ঘোষের

ঘরোয়া সভায়। শ্রোতারা সবাই উঠোনে। সে একা বারান্দায়। তার ভাষণ শেষ হলে পাঁচজন মন্ত্রীকে তার সামনে হাজির করা হয়। সে অভিনন্দন জানায়। বিনু এক্ষেত্রে সাহিত্যিক বিনু।

বিনুর অপসরণ

স্বাধীনতা দিবসটি নিছক আনন্দের দিন ছিল না। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সেনাপতি মহাত্মা গান্ধী সেদিন কলকাতায় অনশনরত। তাঁর ধারণা তাঁর জীবনের মিশন ব্যর্থ হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান এক হয়নি, হিংসায় উন্মত্ত দেশ। ইংরেজরা চলে গেছে, এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তারা চলে গেছে বলেই কি দেশের হিন্দুপ্রধান অংশ থেকে মুসলমানরাও চলে যাবে, মুসলিমপ্রধান অংশ থেকে হিন্দু ও শিখরাও চলে আসবে?

এককভাবে একটা দল সারা দেশকে স্বাধীন করতে পারে। কিন্তু এককভাবে একটা দল সারা দেশকে শাসন করতে পারে না, যদি-না অন্যান্য দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাস্ত করতে সমর্থ হয়। কংগ্রেসের তেমন কোনো অভিপ্রায় ছিল না। যুদ্ধে নামলে সে দেখত ভারতীয় সেনা দ্বিধাবিভক্ত ও পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। অনশনে দেহত্যাগ করেও মহাত্মা তাদের নিবৃত্ত করতে পারতেন না। একই কালে দাঙ্গাহাঙ্গামাও লেগে থাকত।

এককভাবে রাজ্য চালানো যায় না, অপরকে ক্ষমতার ভাগ দিতে হয়। তা যদি কার্যকর না হয় তবে রাজ্যের ভাগ দিতে হয়। আর কোনো বিকল্প যদি থাকে সেটা ইংরেজকেই হাতজোড় করে বলা, তোমরাই থেকে যাও অনির্দিষ্টকাল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, ইংরেজরা ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পর নিজেরাই বিনা শর্তে একতরফা অপসরণে উন্মুখ। কারও কোনো আর্জি শুনবে না। বিনু ব্রিটিশ সরকারের ভিতরে ছিল। শাসকদের মনোভাব জানত। বাংলার লাটসাহেব তাকে বলেছিলেন, 'হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরের সঙ্গে লড়তে চায় তবে লড়ুক। আমরা কেন রিং ধরে থাকব। আমরা যাচ্ছি।' রিং মানে বক্সিং-এর রিং।

ভিতরে থেকে মুসলিম অফিসারদের মনোভাবও তার অজানা ছিল না। 'আমরা পাকিস্তান চাইনে' যিনি বলেছিলেন তিনিই বলেন, 'আমরা এখন পাকিস্তান চাই।' মাস তিনেকের মধ্যে মত পরিবর্তনের অর্থ ইংরেজরাজের শূন্যতা কংগ্রেসরাজ যদি পূরণ করে তো মুসলিম অফিসারদের শ্রেণিস্বার্থ নিরাপদ নয়। একই উক্তির রকমফের হিন্দু অফিসারদের মুখে। 'পার্টিশন না হলে বাংলার হিন্দু বাঁচবে না।'

একদা যাঁদের পূর্বপুরুষরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছিলেন, ইংরেজ বিদায়ের সময় দেখা গেল তাঁরা দেশান্তরিত হয়ে পাকিস্তানি বনেছেন। তাই তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে ইন্ডিয়া কুইট করলেন। বিনু আন্তরিক দুঃখিত। সে চেয়েছিল তাঁরা থেকে যান। তেমনি এটাও সে কামনা করেছিল যে হিন্দু অফিসাররাও পাকিস্তানে থেকে যান। বিশেষত যাঁদের শিকড় পূর্ববঙ্গে। ছিন্নমূল হয়ে কে কবে রস সংগ্রহ করতে পেরেছে? অফিসার শ্রেণি তো চলে এলেনই, তাঁদের অনুসরণে কেরানি ও পিয়োন, পুলিশ ও ডাক্তার, উকিল ও মোক্তার, জমিদার ও মহাজন, পাচক, পুরোহিত, গোয়ালা, মুচি, ধোপা, নাপিত, চাষি, মজুর। তবু ভালো যে পাঞ্জাবের মতো হিন্দু-মুসলমান পাইকারি হারে মরেনি, মারেনি, শুধুমাত্র পালিয়েছে। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি।

এরকম যে হতে পারে তা আন্দাজ করে বিনু ময়মনসিং থেকে বদলি হয়ে আসার সময় বিদায় সভায় বলেছিল, 'পশ্চিমবঙ্গ একটি ছোটো নৌকো। তাতে যাত্রীর সংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেলে নৌকাডুবি ঘটবে। যেমন ঘটে গেল সেদিন আমাদের চোখের সামনে ব্রহ্মপুত্রের জলে। পূর্ববঙ্গের সওয়া কোটি হিন্দুর জন্যে সেখানে ঠাঁই নেই। তারা সবাই গেলে পশ্চিমবঙ্গ ডুববে।'

সেই নৌকার বাড়তি যাত্রীরা মাঝিদের হুঁশিয়ারি শোনেনি। ফলে নৌকা ডোবে, মানুষও ডোবে; যারা সাঁতার জানে তেমন কয়েকজন বেঁচে যায়। মাঝিরা পালায়।

ভারতও একটি বড়ো মাপের নৌকা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেবাক হিন্দু ও শিখ তিন সপ্তাহের মধ্যে উধাও। এমনই বেবাক মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব ছেড়ে গেছে। কিন্তু দিল্লির মুসলমানরা তাদের ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, মসজিদ বেদখল দেখে সরকারের শরণাপন্ন। সরকার হিমসিম খাচ্ছেন। বিনুর বন্ধু এক হিন্দু আইসিএস অফিসার মুসলমানদের বাঁচাতে গিয়ে তাঁর অধীনস্থ হিন্দু সিপাহির দ্বারা নিহত। এখন ভরসা

গান্ধীজির নৈতিক প্রভাব। তিনি ব্যর্থ হলে সরকারের দেউলেপনা প্রমাণ হবে। সেকুলার স্টেট হবে ভাঁওতা। কাশ্মীরি মুসলমান ভবি ভুলবে না। মহাত্মাকে শেষপর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

ইতিমধ্যে মুর্শিদাবাদে গন্ডগোল বেঁধেছিল। মুসলিমপ্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা সাত দিন পাকিস্তানের শামিল থেকে
র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদে ভারতের শামিল হয়। সেই সাত দিনে সেখানকার মুসলমানরা উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে, পরে আকাশ থেকে পড়ে। বিশ্বাসই করতে চায় না যে এটাই তাদের ভাগ্য। হিন্দুরা সাত দিন মনমরা হয়ে কাটিয়েছে। এখন তারাও উৎসব করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। মারামারি থামাতে সেখানকার নেতারা চেয়ে পাঠান একজন আইসিএস অফিসার।

আঠারো বছর চাকরির পর বিনু এই প্রথম কলকাতায় বদলি হয়েছে। চারটে মাস যেতে-না-যেতেই তার উপর হুকুম, মুর্শিদাবাদ চলো। বিনু প্রতিবাদ করতে পারত। তার ছেলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে। ময়মনসিং থেকে এসে কলকাতার স্কুলে ভরতি হয়েছে। আবার স্থানান্তর। তা সত্ত্বেও বিনু সহজেই রাজি হয়ে যায়। শাসন বিভাগের প্রতি তার বরাবরই পক্ষপাত। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিচার বিভাগে পদস্থ করা হয়েছিল। প্রায় দশ বছর বাদে সে আবার জেলাশাসক হবে। সেই পদটার প্রতি তার একটা টান ছিল। সেই পদের সঙ্গে জড়িত ছিল ক্ষমতা। জজ তো ঠুঁটো জগন্নাথ। তা ছাড়া মীরার সঙ্গে তার প্রথম দেখা তো বহরমপুরেই। বিয়ের পরে মধুমাস যাপনও সেখানে।

মীরার কিন্তু একেবারেই সায় ছিল না আবার এক বদলিতে। আবার মালপত্র প্যাক করতে হবে। মালপত্রের মধ্যে পড়ে স্টাইনওয়ে বেবি গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। ভারতে দুর্লভ, বিয়ের পর আমেরিকা থেকে আনা।

মুর্শিদাবাদ যাবার আদেশ পেয়ে বিনু ঘোষ মন্ত্রীমহলের সদস্য এক পুরাতন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করে, 'পূর্ববঙ্গের হিন্দু শরণার্থীদের সম্বন্ধে আপনাদের পলিসি কী?' তিনি উত্তর দেন, 'আমরা ওদের উৎসাহ দিতে চাইনে। দিলে সবাই এসে হাজির হবে। আমরা অভিভূত হব।' কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বে যদি বিন্দুমাত্র সত্য থাকে তবে পাকিস্তানে কেবলমাত্র মুসলিমরাই সিটিজেন হতে পারে, কিন্তু এঁরা রেসিডেন্ট এলিয়েন, সমান স্বত্ববান নন। তাঁরা তো সিটিজেনশিপের জন্যে ভারতে চলে আসতে চাইবেনই। সাধ করে কেউ এলিয়েন হতে রাজি হয়?

না, হয় না। তবে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কথাবার্তার সময় জিন্না সাহেব বলেছিলেন বাংলাকে দু-ভাগ করা উচিত নয়, যেহেতু বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এক জাতীয়তার লক্ষণ বিদ্যমান। মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্ল্যানে একটি ধারা জুড়ে দেন। বাংলার হিন্দু-মুসলমান যদি একমত হয় তবে বাংলা অবিভক্ত থাকবে। তার মানে দাঁড়ায় অবিভক্ত বাংলা একাই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হবে। জওহরলাল প্রতিবাদ করেন। বাংলা যদি স্বাধীন হয় তো আরও অনেক প্রদেশ বা রাজ্য স্বাধীন হতে চাইবে। ভারত হবে বলকান। কংগ্রেস বলকানিকরণ মেনে নেবে না। মাউন্টব্যাটেন সে-ধারাটি প্রত্যাহার করেন। বাংলা দুই ভাগ হল, কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া হল না। তাহলে তো উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে রেফারেণ্ডামের আবশ্যক হত না। সিলেটে জেলাতেও না। রেফারেণ্ডামের ফল পাকিস্তানের পথে নাও যেতে পারত।

পার্টিশন হল একপ্রকার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, যেমন র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের রোয়েদাদ। সেটা প্রাদেশিক স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, এটা কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের বেলা। হিন্দু, মুসলমান, শিখ প্রভৃতিকে সম্প্রদায় হিসাবেই গণ্য করা হয়, নেশন হিসাবে নয়। জিন্না সাহেব পাকিস্তানের পতাকার এক-তৃতীয়াংশ সফেদ রাখেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ। তাৎপর্য, পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখরাও সমান অধিকারী। তাদের সংখ্যানুপাতও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তিনি একটি বিবৃতিতে বলেন, পাকিস্তানে যে যার ধর্ম অনুসরণ করতে পারবে, রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সব নাগরিকই পাকিস্তানি। সেকুলার স্টেট বলে পাকিস্তানকে চিহ্নিত না করলেও তাঁর বিবৃতির মর্ম পাকিস্তান হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তিনি ভালো করেই জানতেন যে পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখ

এলিয়েন হলে ভারতেও মুসলমানরা হবে এলিয়েন। তার মানে চার কোটি মুসলমান ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে হাজির হবে। তারা যদি ভারতে থাকে তবে সেটা হবে কংগ্রেসের সেকুলার পলিসির গুণে।

বিনু মুর্শিদাবাদের শাসনভার নেবার আগেই ঘোষ মন্ত্রীমন্ডলীর পরিবর্তে রায় মন্ত্রীমন্ডলী অধিষ্ঠিত হয়। এটাও তো কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রীমন্ডলী। বিনু ধরে নেয় এঁরাও শরণার্থীদের উৎসাহ দিতে অনিচ্ছুক। মুর্শিদাবাদে তখনও লক্ষ করার মতো শরণার্থী সমাগম হয়নি। সেখানকার গন্ডগোলটা অন্য কারণে। মুর্শিদাবাদ মুসলিমপ্রধান জেলা। তাই মাউন্টব্যাটেন তাকে পাকিস্তানের সামিল করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন মুর্শিদাবাদে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে। মুসলমানরা আনন্দ উৎসব করে। তাদের আনুগত্য পাকিস্তানের প্রতি। কিন্তু দিন সাতেক পরে দেখা গেল মুর্শিদাবাদ পড়েছে ভারতের ভাগে। তার ভিতর দিয়ে যেহেতু গঙ্গা ভাগীরথী প্রবহমান সেহেতু তাকে ভারতের ভিতরে রাখাই সমীচীন। তার বিনিময়ে পাকিস্তানকে দেওয়া হল খুলনা জেলা। সেটা হিন্দুপ্রধান। এই দুটি জেলার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক গণনাকে অগ্রাহ্য করেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ। এতে মুর্শিদাবাদের মুসলমানরা স্তম্ভিত। সাত দিন পরে পতাকা পরিবর্তন, আনুগত্য পরিবর্তন, ভাগ্য পরিবর্তন। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সংখ্যালঘিষ্ঠের অধম! এ কীরকম অন্যায়!

ওদিকে হিন্দুরাও সেই সাত দিন মুসলমান প্রতিবেশীদের চেহারা দেখে স্তম্ভিত হয়েছে। প্রজারা দলবদ্ধ হয়ে জমিদারের ভবন আক্রমণ করেছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয়। জমিদার সপরিবার কলকাতা পলাতক। বলা বাহুল্য প্রজারা মুসলমান, জমিদার হিন্দু। দৃশ্যত হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ। প্রকৃতপক্ষে জমিদার ও প্রজার বিবাদ। ইংরেজদের অভাবে জমিদাররা নির্বান্ধব। তবে পূর্ববঙ্গের লিগ মন্ত্রীমন্ডলীর শীর্ষস্থানীয়রাও জমিদার। জমিদারি প্রথার বিলোপ যদিও তাঁদের দলের পলিসি তবু অর্থনৈতিক ওলটপালট তাঁদেরও এই মুহূর্তে অভিপ্রেত নয়। মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা তটস্থ থাকে। কিন্তু ভারতের শামিল হয়ে তারাও উগ্রমূর্তি ধারণ করে।

বিনু বুঝতে পারে মুর্শিদাবাদের সমস্যাটা আসলে আইন ও শৃঙ্খলার নয়। আইন আছে, পুলিশ আছে, আদালত আছে, জেল আছে। এসবের সাহায্যে দুষ্কৃতীদের দমন করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষও নয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে। কিন্তু বিবাদের বীজ যদি থেকে যায় গন্ডগোল আবার বাঁধবে। যেটা গোড়ায় আবশ্যক সেটা মুসলমানদের আনুগত্য অর্জন। দ্বিজাতিতত্ত্বানুসারে তাদের তো পাকিস্তানে পা চালিয়ে দেবার কথা। কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্ব দুই রাষ্ট্রই বাতিল করেছে। মুসলমান মাত্রেই পাকিস্তানি নাগরিক নয়, হিন্দু মাত্রেই ভারতীয় নাগরিক নয়। গান্ধীজির পলিসি, যে যেখানে আছে সে সেইখানেই থাকবে, জোর করে কাউকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। যার ইচ্ছা সে বিনিময় করতে পারে। সেটা কিন্তু সম্পত্তি বিনিময়। লোক বিনিময় নয়। মুসলিমবর্জিত মুর্শিদাবাদ বা হিন্দুশূন্য রাজশাহি কল্পনা করা যায় না। তাতে সাম্প্রদায়িক বিবাদ চিরকালের মতো দূর হবে, কিন্তু ইতিহাসের ধারাভঙ্গ ঘটবে। সে ধারা গঙ্গা যমুনার মিশ্র ধারা। তাকে অবিমিশ্র করতে গেলে এপার-ওপার দুই পারের বাঙালি জাতীয়তা ধ্বংস হবে। দিল্লিকে মুসলিমশূন্য হতে দেবেন না বলে মহাত্মা গান্ধী প্রাণ দেন। বিনু অবশ্য প্রাণ দেবে না, কিন্তু তারও পণ সে গান্ধীনীতি অনুসরণ করবে ও তা করতে গিয়ে যথাসম্ভব ত্যাগ করবে। দেশ বিভক্ত, প্রদেশ বিভক্ত, তাই বলে লোক বিভক্ত হবে না। বিনু বিশ্বাস করে যে অবিভক্ত ভারতের জনগণ সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও এক ও অবিভাজ্য। সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণ সত্ত্বেও অহিংস।

মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহির লোকজন চিরকাল পদ্মা নদীর এপার-ওপার করে এসেছে। এখন ও-দুটো জেলা দুই আলাদা ডোমিনিয়নের প্রত্যন্ত জেলা। কোনো হিন্দু এলে সেটা খবর নয়, কিন্তু কোনো মুসলমান এলেই পুলিশ থেকে রিপোর্ট আসে অমুক ব্যক্তি অমুক গ্রামে এসেছে। গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। দুই জেলার মধ্যে মাল চলাচল চিরকাল অবাধ ছিল। এখন ওটার নাম মাল পাচার। ইতিমধ্যে বাজার থেকে কাপড় উধাও। কারণ অবাধে মাল পাচার।

বিনু একদিন তাঁবু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পদ্মার ধারে রাত কাটায়। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মাল পাচারের কলাকৌশল। ওপারে আলো জ্বলে ওঠে। যেমন রেলের সিগন্যাল। অমনি এপার থেকে নৌকা ছেড়ে দেয়।

পাচার যারা করে তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দুই সম্প্রদায়ের লোক। ওটাকে তারা অপকর্ম মনে করে না। চাহিদা আছে, জোগান দিচ্ছে। মুশকিলটা এইখানে যে মুর্শিদাবাদের চাহিদা মিটছে না, কাপড়ের অভাবে মানুষ কী পরবে? কমিশনার তা শুনে বলেন, কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে উলটো বিপত্তি। ওপারে হিন্দুর মেয়েরা শাড়ি পাবে কোথায়? বিনু বলে না, বলতে পারত, শুধু কি হিন্দুর মেয়েরা?

চালের দামের উপর থেকে সিলিং উঠে যাওয়ায় হঠাৎ দেখা দিল চালের আকাল। ভাগ্যিস কিছু চাল মজুত ছিল সরকারি আড়তে। কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করে চালের অভাব কতকটা মেটানো গেল। বিনুকে এইসব নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়। সাহিত্য শিকেয় তোলা থাকে। সামাজিকতারও সময় মেলে না।

একদিন কলকাতার সেক্রেটারিয়েটে ডাক পড়ে। বিভিন্ন জেলা থেকে সমাগত প্রশাসকদের নিয়ে দরবার করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য ওপার থেকে যেসব শরণার্থী আসছে তাদের সমষ্টিগতভাবে বসাতে হবে সীমান্তের এক-একটি গ্রামে। একই গ্রামে চাষি, তাঁতি, কামার, কুমোর, কলু, ছুতোর, ধোপা, নাপিত, মুদি ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ তাঁর স্বপ্ন।

'অবাস্তব।' বিনু বলে ওঠে, 'সীমান্তে কোথাও এক কাঠা জমি খালি নেই। সর্বত্র ঘনবসতি।'

মুখ্যমন্ত্রী তাকে ধমক দেন। সে বলে, 'আমি ছুটি নেব।' তিনি বলেন, 'আমি দিলে তো।'

রাজশাহি ও মুর্শিদাবাদের মাঝখানে গঙ্গা ও পদ্মা নদী। যেখান থেকে ভাগীরথী বেরিয়েছে সেখান পর্যন্ত গঙ্গা, তারপরে পদ্মা। নদীর মুখ্যস্রোত যেটাকে বলা হয় সেটা কখনো রাজশাহি পাড় দিয়ে বইত, কখনো মুর্শিদাবাদের পাড় দিয়ে। পার্টিশনের পূর্বে এ নিয়ে কেউ কোনো তর্ক করেনি। সম্প্রতি মুখ্যস্রোত বহমান মুর্শিদাবাদের পাড় ঘেঁষে। রাজশাহি থেকে এক লঞ্চ এসে সারাদিন টহল দিচ্ছে।

নদীর মাঝখানের তিনটে চর এখন মুখ্যস্রোতের ওপারে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানচিত্রে চিহ্নিত। লঞ্চের উর্দুভাষী বিহারি কাপ্তেন দাবি করছেন যে মুখ্যস্রোতের আধখানা পার্টিশনসূত্রে পাকিস্তানের, সুতরাং চরগুলো রাজশাহির শামিল। মুর্শিদাবাদের মুসলমান চাষিরা এতকাল ওইসব চরে ফসল ফলিয়ে এসেছে, এ বছরও ফলিয়েছে, কিন্তু কাপ্তেন তাদের চরে যেতে দিচ্ছেন না, নৌকা আটক করেছেন। মগের মুলুক আর কী! লোকগুলি বিনুর কাছে নালিশ করে।

বিনু তার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বলে, কাপ্তেন অনধিকারপ্রবেশ করেছে। গোটা মুখ্যস্রোতটাই মুর্শিদাবাদের। অন্তত আধখানা তো মুর্শিদাবাদের বটেই। সেখান দিয়ে তো লঞ্চ চলাচল বেআইনি। পুলিশকে পাঠান লঞ্চ আটক করতে।

তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে বলেন, 'ওরে বাপ রে! পাকিস্তানি লঞ্চকে আটক? ওরা গুলি করবে না? পুলিশের একটি সিপাহিও যদি মারা যায় গোটা পুলিশ ফোর্স বি—বি—বিদ্রোহ করবে।'

ব্রিটিশ আমলে জেলাশাসকদের গোপন পুস্তিকায় নির্দেশ ছিল তাঁরা যেন পারতপক্ষে মিলিটারিকে না ডাকেন। ডাকলে পরিস্থিতি মিলিটারি অফিসাররাই নিয়ন্ত্রণ করবেন। তাঁদের হুকুম অনুসারে কাজ হবে। জেলাশাসকের পক্ষে সেটা অসম্মানকর। মিলিটারিকে নিতান্তই যদি ডাকতে হয় তবে তার আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে।

বিনু অগত্যা সরকারের অনুমতি নিয়ে মিলিটারিকে ডেকে পাঠায়। এক ব্রিগেডিয়ার এসে তার অতিথি হন। মহারাষ্ট্রীয়। বলেন, 'আমি তিন-তিনটে যুদ্ধে লড়েছি। আমি এখন সারা দেশের সবচেয়ে নন-ভায়োলেন্ট ম্যান। আমার পরামর্শ শুনুন। এ ব্যাপারে মিলিটারিকে জড়াবেন না।'

এরপর আসেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল। শিখ। বলেন, 'পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে আমাদের একটিও জওয়ান যদি মারা যায় তা হলে সেটা হবে ভারতের প্রেস্টিজের ইস্যু। তা নিয়ে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। আমার পরামর্শ শুনুন। পশ্চিমবঙ্গের সশস্ত্র পুলিশকে এ ভার দিন।'

ব্যাপারটা যে কতদূর বিপজ্জনক তা উপলব্ধি করে বিনু রাজশাহির জেলাশাসকের সঙ্গে কথাবার্তা চালায়। তিনি তাকে নিমন্ত্রণ করেন। একদা তারই অধীনস্থ বাঙালি মুসলিম অফিসার। অতিশয় সজ্জন। বিনুর সঙ্গে

এমন ব্যবহার করেন যেন বিনু এখনও তাঁর উপরওয়ালা। বিনুর পুরোনো কেরানি ও পিয়োনদের সাদর আপ্যায়নের আতিশয্যে তার প্রাণ যায় আর কি! স্থির হয় দুই শাসক চরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করবেন। কিন্তু তার আগেই তাঁকে বদলি করে এক উর্দুভাষী মুসলিম অফিসারকে জেলাশাসক করা হয়। পাকিস্তানের লাইন হল আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে চরগুলো পাকিস্তানের অন্তর্গত। নদীর মুখ্যস্রোত এখন সীমানা নির্দেশ করছে। তার আধখানা পাকিস্তানে।

দুই সরকার একমত হতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনুকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠান। তাদের সঙ্গে আসে ভয়ানক সব অস্ত্রশস্ত্র। স্টেনগান, ব্রেনগান। এসব অবশ্য ব্যবহার করার জন্যে নয়, ক্ষমতা জাহির করার জন্যে। সিপাহিরা নদী পার হয়ে চরে যাবে কী করে? লঞ্চের দরকার হয়। অবিভক্ত বঙ্গের লঞ্চগুলো ছিল খুলনায়। একটি বাদে খুলনার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে চলে গেছে। তাই ভারতের নৌবহর থেকে লঞ্চ আনাতে হয়। সেসব লঞ্চ সমুদ্রের জন্যে, নদীর জন্যে নয়। লোহা দিয়ে মোড়া। কণ্টকময়। লশকররা একধার থেকে মুসলমান। অবিশ্বাসী হলে ওরা লঞ্চগুলো নিয়ে ভাগীরথী থেকে পদ্মায় পড়বে ও সরাসরি রাজশাহি চলে যাবে। ওদের দেশ নোয়াখালি, চাটগাঁয়। ওরা পাকিস্তানি নাগরিক। বিনুকে পরামর্শ দেওয়া হয় দক্ষিণী লশকর আনাতে। বিনু বলে, 'এরা বাঙালি লশকর, এদের সঙ্গে বনিবনা সহজ। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এরা পেশাদার মানুষ, রাজনীতি বোঝে না। যার নিমক খায় তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে।'

সশস্ত্র বাহিনী ও লঞ্চের লশকরদের উপরে কর্তৃত্ব করার জন্যে পাঁচজন প্রাক্তন মিলিটারি অফিসারকে বিনুর অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত করা হয়। এঁরা সবাই এখন আইএএস। একজন উইং কমাণ্ডার ছিলেন, বাঙালি খ্রিস্টান। একজন ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান। দুজন মেজর বাঙালি ব্রাহ্মণ। একজন ক্যাপটেন, অবাঙালি কায়স্থ। উইং কমাণ্ডারকে সদরে রেখে বাকি চারজনকে গঙ্গা-পদ্মার তীরে মোতায়েন করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজতে। লঞ্চেরও।

এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয় বেতার দিয়ে। পুলিশ ওয়্যারলেস। তারজন্যে নিজস্ব একটা কোড বানায় বিনু। যারা জানে তারা ছাড়া আর কেউ ডিকোড করতে পারে না। একদিন রাত দুটোর সময় সে ওয়্যারলেস মেসেজ পায়। 'দুশো রাউড গুলি চলেছে। জলদি আসুন।' অমনি বিনু রওনা হয়ে যায়। ওয়েপন ক্যারিয়ার সবসময় তৈরি থাকে। যদিও তাতে ওয়েপন থাকে না। বিনু যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছোয় তখন ভোর হয়ে এসেছে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল বলেন, কেউ মারা যায়নি, সবাই নিরাপদ। রাতের অন্ধকারে শত্রুর পায়ের শব্দ পেয়েছে মনে করে লঞ্চের সিপাহিরা গুলি চালিয়েছে চরের দিকে, দিক ভুল করে সে-গুলি ছুটেছে তীরের সিপাহিদের অভিমুখে। এরাও পালটা গুলি চালিয়েছে লঞ্চের সিপাহিদের শত্রু মনে করে। ভাগ্যি সব ক-টা সিপাহিই আনাড়ি, নইলে একটা ম্যাসাকার ঘটে যেত। ভোরের আলোয় আবিষ্কার করা গেল একটি বাছুর মরে পড়ে রয়েছে চরের উপর। কাদের বাছুর, কোথা থেকে এল, কেউ বলতে পারে না। পরে গোয়ালারা এসে হাজির, সঙ্গে একপাল গোরু। চরে তারা গোরু চরাতে এসেছিল। বাছুরটি কেমন করে দলছুট হয়। তা বলে তাদের বাছুরকে মেরে ফেলবে। এতবড়ো অন্যায়! তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করে। সামলাও ঠেলা।

চর অপারেশন উপলক্ষ্যে বিনুকে মাঝে মাঝে কলকাতা গিয়ে দেখা করতে হত কমিশনারের সঙ্গে, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। তিনি বলতেন, 'এই যে প্রিন্স অব ডেনমার্ক। এবার কী খবর!' তাঁর টেলিফোন পেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজের ঘর থেকে আসেন। বিনুর সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। তিনি একদা সাহিত্যিক ছিলেন। পার্টিশনের পূর্বাহ্ণে ময়মনসিং-এ তিনি বিনুর নিমন্ত্রণে নৈশভোজন করেন।

বিনুর সঙ্গে দুজনেই ভদ্র ব্যবহার করেন। সে যখন যা চাইবে তাঁরা তা মঞ্জুর করবেন। সীমান্তে শরণার্থী বসতির কথা আর উল্লেখ করা হয় না। শরণার্থী যাঁরা মুর্শিদাবাদে এসেছিলেন তাঁরা সীমান্ত থেকে দূরে থাকাই পছন্দ করতেন। শহরের আশেপাশেই তাঁদের বসত। স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজের কোনো প্রয়াস ছিল না। কার যে

কী জাত, কী পেশা তা প্রকাশ না করায় বিনু তা জানত না। তাঁরা সরকারি সাহায্য চান। সম্ভব হলে চাকরি কিংবা লাইসেন্স।

একদিন কলকাতা থেকে ডাক পড়ল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে বিনু একখানা পত্রিকা কিনে দেখে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুসলমানদের তাড়াতে যাচ্ছেন এটা আদৌ সত্য নয়। যত সব বাজে গুজব। বিনু সরাসরি সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে হাজিরা দেয়। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে। সেখানে ছিলেন স্বরাষ্ট্রসচিব। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তার মর্ম অমুক তারিখের মধ্যে সীমান্তের মুসলমানদের ওপারে খেদিয়ে দিতে হবে। বিনু তো অবাক। অপর জেলাশাসক সময়টা একটু বাড়িয়ে দিতে অনুরোধ করেন। কর্তা বাড়িয়ে দেন। তাঁর মুখখানা গম্ভীর। বিনুর মনে হয় তিনি যা বলছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়, অন্য কারও কথা। তাঁকে দিয়ে বলানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বিনু তাঁর পক্ষপাতী হতে সুরু করেছিল। তিনি আর যা-ই হন, কমিউনাল নন। সে মুখ বুজে শুনে যায়। বিনা বাক্যে ঘর থেকে বেরোয়। কথা দেয় না যে অমন কাজ করবে। বাইরে গিয়ে তার সহযোগীকে বলে, ‘রক্তপাত অনিবার্য। লিখিত আদেশ চাই। আপনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চান।’ তিনি ভিতরে গিয়ে লিখিত আদেশ চাইলে স্বরাষ্ট্রসচিব বলেন, ‘লিখিত আদেশ মিলবে না। মৌখিক আদেশই যথেষ্ট।’

বিনু ভারত সরকারের সার্কুলার পেয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল জেলাশাসকরা দেখবেন যাতে মুসলমানদের উপর জুলুম না হয়। জুলুম হলে জেলাশাসকদের জবাবদিহি করতে হবে। বিনু কার নির্দেশ মান্য করবে, কেন্দ্রীয় সরকারের না প্রাদেশিক সরকারের? সে একজন আইসিএস অফিসার। কেন্দ্রের প্রতি তার প্রথম অনুগত্য। সে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশ উপেক্ষা করে। তার বিশ্বাস বিধানচন্দ্র সেকুলারমনস্ক ব্যক্তি। তিনি ওরকম আদেশ দিতেই পারেন না। হয়তো ভুলেই যাবেন।

টলস্টয় ও গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত বিনু কলেজজীবনে স্টেট ভায়োলেন্সে বিশ্বাস করত না। কিন্তু কর্মজীবনে তাকে স্বীকার করতে হয়েছে যে আইনের শাসন না হলে দেশ অরাজক হবে। জেলাশাসক তথা জেলা জজের প্রথম কর্তব্যই হল আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা। রক্ষক না হয়ে তাঁরা যদি ভক্ষক হন তবে তো নিরীহ নাগরিকের ধন প্রাণ বিপন্ন। তেমন কাজ বিনুর দ্বারা হতে পারে না। তাকে মুর্শিদাবাদে পাঠানো হয়েছে গন্ডগোল থামানোর জন্যে, নতুন করে বাঁধানোর জন্যে নয়। হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানকে উৎখাত করতে গেলে স্টেট ভায়োলেন্স ব্যবহার করতে হবেই। সেটা অপব্যবহার। রক্তপাত ঘটলে রাজনীতিকরা বলবেন তাঁরা অমন আদেশ দেননি, লিখিত প্রমাণ কই? বিনুকেই দোষ দেবেন।

অবশেষে বর্ষাকালের প্লাবনের পর চরগুলো জেগে ওঠে। এক নম্বর চরটা মেজর বি অনায়াসে দখল করেন। খোশখবরটা বিনু তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করে কলকাতার কর্তাদের জানায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দন জানাতে পদ্মাতীরে আসেন, সঙ্গে কমিশনার। তাঁদের অভ্যর্থনা করে সরকারি টুরিং লঞ্চের উপরে মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়। তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের রাজনীতিক পরিকর। এঁরাও ভোজনসঙ্গী। অনাহূত অতিথি।

ভোজনের পর মন্ত্রী ও কমিশনার বিশ্রাম করতে যান। বিনু পরিকরদের সঙ্গে আলাপচারী করে। তার কানে আসে পেছনে বসে থাকা একজন আরেকজনকে বলছেন, ‘দিল্লি থেকে কলকাতায় টেলিফোন এসেছে। ও তো এখন এদেশে নেই। যা করবার এইবেলা করে নাও।’

বিনু ঠাহর করে, জওহরলাল এখন বিদেশে। তাঁর ফেরার আগে যা করবার তা করে নিতে হবে। অমুক তারিখটা তাঁর ফেরার তারিখ। মন্ত্রী এসেছেন তার আগেই বিনুকে দিয়ে যা করবার তা করাতে।

মন্ত্রীর কেবিন থেকে অনুরোধ আসে। বিনুকে তিনি নিভৃতে কিছু বলতে চান। সে কেবিনে গিয়ে দেখে কমিশনারও উপস্থিত। তিনজনের গোপন বৈঠক।

প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা। বিনুর সুখ্যাতি। দেশের এই সংকটের ক্ষণে বিনুর মতো করিৎকর্মা অফিসাররাই তো ভরসা। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গেছে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। ইন্ডিয়ান আর্মি রাজশাহি অধিকার

করলে বিনুকেই করা হবে রাজশাহির জেলাশাসক।

বিনু মনে মনে হাসে। রাজশাহির জেলাশাসক সে ছিল এগারো বছর আগে। তার চেয়ে জুনিয়ার অফিসারকে হালে সেক্রেটারি করা হয়েছে।

মন্ত্রী বলে যান—'যুদ্ধের আগে সন্দেহভাজন হলে জনগোষ্ঠীকে বহিষ্কার করা আবশ্যক। সীমান্তের মুসলমান গোষ্ঠীকে বিশ্বাস কী? ওরা তলে তলে রাজশাহির মুসলমানদের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে। ওরা প্রচ্ছন্ন পাকিস্তানি। আপনি কি অবিলম্বে ওদের সদলবলে বহিষ্কার করতে পারবেন?'

'আমি বরং ইস্তফা দেব, তবু অমন কাজ করব না।' বিনু ঘাড় নাড়ে। 'করতে গেলে রক্তপাত হবে।'

'হোক-না। হোক-না।' মন্ত্রী বলে ওঠেন।

'রক্তপাত হলে এমন হইচই পড়ে যাবে যে বাধ্য হয়ে ও পলিসি প্রত্যাহার করতে হবে। ইতিমধ্যে যে অনর্থ ঘটে যাবে তাকে অঘটিত করতে পারা যাবে না।' বিনু নিবেদন করে।

এরপর ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে আসে। মন্ত্রী বলেন, 'দেখুন, ওপার থেকে হাজার হাজার হিন্দু পালিয়ে আসছে সরকারের পোষণে। এখন ওদের আমরা কোথায় রাখি? আমাদের পলিসি কী হবে আপনিই বলুন।'

'ওদের আর যেখানেই রাখুন সীমান্তে নয়। সীমান্তে এক টুকরো খালি জমি নেই।' বিনু উত্তর দেয়।

'পলিসি স্থির করতে আপনাকে কে বলেছে? পলিসি আমরাই ঠিক করব। এই যদি আমাদের পলিসি হয় যে সীমান্তের মুসলমানদের বহিষ্কার করতে হবে তবে আপনি কি সেই পলিসি ক্যারি আউট করবেন?' মন্ত্রী জানতে চান।

বিনু ঘাড় নাড়ে। 'আমি দরকার হলে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু এমনতরো কাজ করতে পারিনে।'

কমিশনারও ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, 'হিন্দুদের ওপার থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বহিষ্কার করা হচ্ছে। ওরা কোথায় যাবে?'

মন্ত্রী যোগ করেন, 'আপনিই বলুন।'

'ওরা যেখানেই জায়গা খালি পাবে সেখানেই যাবে। পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে না হোক বিহারে, ওড়িশায়, মধ্যপ্রদেশে। ওখানকার নেতারাও তো পার্টিশনের জন্যে দায়ী।' বিনু মনে করিয়ে দেয়।

'কিন্তু ওসব জায়গায় শরণার্থীরা যদি না যায়?' মন্ত্রী তর্ক করেন।

'তা হলে আমি কী করতে পারি?' বিনু চুপ করে রইল।

'আচ্ছা, এবার আপনি আসতে পারেন।' মন্ত্রী তাকে বিদায় দেন। মুখে বিরক্তির ভাব।

সেদিন চায়ের টেবিলে তিনি এলেন না। কমিশনার এলেন। গম্ভীর ও নীরব। বিনু বুঝতে পারল তিনি তার পক্ষে নন। চায়ের পর সে লঞ্চ থেকে নেমে তাঁকে শুনিয়ে শুনিয়ে বাইরে অপেক্ষমান মুসলমানদের বলে, 'আপনারা নির্ভয়ে থাকুন। আমি থাকতে আপনাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না।' ওদের মুখে দুর্ভাবনার ছাপ।

হ্যাঁ, মধ্যাহ্নভোজনের এলাহি আয়োজন হয়েছিল ওইসব সীমান্তের মুসলমানদেরই চাঁদায়। তুলেছিলেন মহকুমা হাকিম।

রাতে কলকাতার ট্রেনে মন্ত্রী ও কমিশনারকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় বিনু। সঙ্গে মহকুমা হাকিম ও উভয়পক্ষের পরিকরগণ। কিন্তু মন্ত্রীর মুখ বেজার। তিনি ব্যঙ্গ করে বলেন, 'আশা করি আপনি আরও একটা চর জয় করবেন।'

'যদি বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয়।' বিনু আশা করে।

বিনুর কাছে মুর্শিদাবাদ ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। যেমন নেহরুর কাছে কাশ্মীর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। গান্ধীজিকে একজন ইংরেজ বন্ধু প্রশ্ন করেন, 'হিন্দুপ্রধান ভারতে মুসলিমপ্রধান কাশ্মীর থাকে কোন যুক্তিতে?' মহাত্মা উত্তর দেন, 'হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে যদি মুসলিমপ্রধান মুর্শিদাবাদ থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান ভারতে মুসলিমপ্রধান কাশ্মীরও থাকতে পারে। আমাদের এটা সেকুলার স্টেট। এ রাষ্ট্রে যে যার ধর্ম পালন করতে পারে, কিন্তু নাগরিক হিসাবে কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলিম নয়, সকলেই ভারতীয়।'

তাই যদি হয় তবে মুসলিম বাছাই করে সীমান্ত উজাড় করা কেন? আসল কারণটা কি সেখানে বেছে বেছে হিন্দু বসানো? তার মানে লোক বিনিময়। লোক বিনিময় ভারত ও পাকিস্তানব্যাপী হলে একটা হবে অবিমিশ্র হিন্দু নেশন, অন্যটা অবিমিশ্র মুসলিম নেশন। পার্টিশন যদি ইভিল হয়ে থাকে এটা গ্রেটার ইভিল। মহাত্মা সেটা হতে দেননি, তাই নিহত হয়েছেন। সেই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির পরও যাঁরা সেই খেলা খেলছেন বিনু তাঁদের নির্দেশে সেই খেলা খেলবে না। শাস্তির জন্যে সে প্রস্তুত।

দিন দুই পরে স্থানীয় বিধায়ক বিনুকে খবর দেন। তিনি শুনেছেন খোদ ঘোড়ার মুখে 'আপনার জায়গায় আরেকজন আইসিএস আসছেন।' বিনু এইরকমই প্রত্যাশা করছিল। তবে এমন তড়িঘড়ি নয়। হয়তো অমুক তারিখের মধ্যে কার্যোদ্ধার করার তাগিদ ছিল। কিন্তু সে যেদিন চার্জ দেবে তার একদিন কি দু-দিন আগে সেই গোপন আদেশটি প্রত্যাহৃত হয়। ততদিনে নেহরু দেশে ফিরে এসেছিলেন। ব্যাপারটা কি কাকতালীয়?

বহরমপুর কোর্ট স্টেশনে বিনুকে বিদায় দিতে একজনকেও দেখা গেল না। কিন্তু বেলডাঙা স্টেশনে কে একজন অজানা অচেনা প্রৌঢ় মুসলমান এসে তার কামরায় এক হাঁড়ি রসগোল্লা রেখে যান। বিনু প্রশ্ন করার আগেই ট্রেন ছেড়ে দেয়। তখন সপরিবারে মিষ্টিমুখ। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

কলকাতায় হোমরাচোমরাদের হাঁড়িমুখ। কেউ কথা বলেন না। সে যেন কী একটা গুরুতর অপরাধ করে এসেছে। যিনি ভিতরের খবর জানতেন তেমন এক বন্ধু তাকে বলেন, মন্ত্রী মহোদয়ের মুখে মুর্শিদাবাদের কাহিনি শুনে গোটা ক্যাবিনেট মিটিং একবাক্যে গর্জে ওঠে, 'এক্ষুনি তাড়ান।'

বিনুর অপসারণে দুঃখিত হন তার পুরাতন বন্ধু এক প্রাক্তন মন্ত্রী। বলেন, 'দিল্লি থেকে যিনি টেলিফোন করেছিলেন তাঁর পলিসি হচ্ছে তাঁর ভাষায় ভীত সে প্রীত হোতা হ্যায়। ভীতি থেকে প্রীতি উৎপন্ন হয়। ভীত করেই তিনি পাকিস্তানকে প্রীত করবেন। ভীতি দেখিয়েই তিনি সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়কেও প্রীত করবেন। ওপার থেকে যদি শরণার্থীরা আসে এপার থেকে মুসলিম শরণার্থীরা যাবে। টু ওয়ে ট্র্যাফিক। রক্তপাত হলে মুসলমানেরই দোষে হবে।'

বিনু ব্যথিত হয়ে বলে, 'প্রাচীন গ্রিকদের মতে দেবতারা যাদের বিনাশ করতে চান তাদের পাগল করে দেন। এসব পলিসি পাগলের মতো পলিসি। এসব কাজ পাগলের মতো কাজ। বাধা না দিলে বাঙালি জাতিটাই উচ্ছন্ন যাবে। গান্ধী নেই, এখন নেহরু ভরসা।'

অল্পদিনের অসুখে কিরণশঙ্কর রায় মারা যান। বিনু তাঁর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেয়। তাঁর পুত্রকে সমবেদনা জানায়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক তো রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক সম্পর্ক নয়। তাতে চিড় ধরে না।

চিফ সেক্রেটারি সুকুমার সেন বিনুকে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে উচ্চতর পদের জন্যে সুপারিশ করেন। জওহরলালকেও বলেন বিনুর উপর অবিচার হয়েছে। সে কিন্তু ইতিমধ্যে মনস্থির করেছিল যে আর নয়। সবরকম অভিজ্ঞতাই হয়েছে। মায় অর্ধসামরিক অপারেশন। আজেবাজে মামলার বিচার করা আয়ুর অপচয়। সাহিত্যের সাধনা অখন্ড মনোযোগ দাবি করে। সেটা বহুদিন অবহেলিত রয়েছে। সে বলে, সে আর চাকরি করবে না। জওহরলালকেও বলা নিরর্থক। সময় অর্থের চেয়ে মূল্যবান। সে চায় সাহিত্যের জন্যে সময়।

একদিন তার অসুখ করে। মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলছে। কথা বলতে গেলে জিব জড়িয়ে যাচ্ছে। একটা কথা বলতে আরেকটা কথা বেরিয়ে আসছে। মুখ বেঁকে গেছে। বিনু বুঝতে পারে এটা প্রকৃতির ওয়ার্নিং। মোমবাতি দু-দিক থেকে পোড়ানোর পরিণাম। বড়ো অফিসার ও বড়ো সাহিত্যিক একসঙ্গে দুই হতে চাইলে অকালমৃত্যু।

সে মীরাকে একটা আধুলি ধরিয়ে দেয়। রাজার মাথা উঠলে পদত্যাগ, নইলে নয়। রাজার মাথা ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগপত্র লেখা হয়। বলা হয় তার শরীরের মোমবাতি দু-দিক থেকে পুড়ছে, তাকে সাহিত্যের জন্যে চাকরি ছাড়তে হবে। মীরা বলে, 'তোমার উচ্চতা বাড়বে।'

পদত্যাগপত্র গভর্নর জেনারেল মঞ্জুর করেন। কিন্তু তার পরেও চিফ সেক্রেটারি তাকে পুনর্বিবেচনা করতে বলে পাঠান। শান্তিনিকেতনে বাসা মিলছিল না বলে সে আরও কয়েক মাস সময় চায়। মুখ্যমন্ত্রী সে-অনুরোধ

মঞ্জুর করেন। শান্তিনিকেতনে বাসা মেলে। বিনু যাবার জন্যে তৈরি, এমন সময় নতুন চিফ সেক্রেটারি সত্যেন্দ্রনাথ রায় একমাসের জন্যে জুডিশিয়াল সেক্রেটারি পদে কাজ চালাতে আহ্বান করেন। একমাসের জায়গায় আরও দু-মাস, তারপরে আরও তিনমাস এমনি করে ছ-মাস কাজ করে বিনু অবশেষে নিষ্কৃতি পায়। সেক্রেটারিয়েটের অভিজ্ঞতাটা বাকি ছিল, সেটাও হল। সেইসঙ্গে লিগাল রিমেমব্রান্সার পদে হাইকোর্টের অভিজ্ঞতাও। ততদিনে তার পুরো পেনশন পাওয়া হয়েছে। একুশ বছরের চেয়ে কয়েক মাস বেশি কার্যকাল। সাতচল্লিশ বছর বয়স। ইচ্ছা করলে আরও তেরো বছর থাকতে পারত, যদি বাঁচত। অথবা যদি সাহিত্যসেবা থেকে বিরত হত।

সেই বাড়তি ছ-মাসের সবচেয়ে বড়ো লাভ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে সদ্ভাব। বেলাশেষে তিনি বিনুকে ডেকে পাঠাতেন, দুটো-একটা সরকারি বিষয়ে কথার পর আপনার থেকে বলতেন তাঁর জীবনদর্শনের অপ্রাসঙ্গিক কথা। বোধহয় সাহিত্যিক বিনুকে। ঘরে আর কেউ থাকত না। দুজনে মুখোমুখি।

তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেন সেক্রেটারিয়েটের বিচারবিভাগীয় কর্মীরা ও স্বয়ং মন্ত্রী মহোদয়। সব ভালো যার শেষ ভালো।

বিনুর নিভৃতবাস

রুশো টলস্টয় তথা গান্ধীজির প্রভাবে বিনু তার প্রথম যৌবনে ভেবে রেখেছিল যে তাকে একদিন প্রকৃতির আরও কাছাকাছি যেতে হবে। হতে হবে সুদূর গ্রামবাসী, জনগণের জীবনের শরিক। তখনই সে লিখতে পারবে টলস্টয়ের *তেইশটি উপকথা*-র মতো বই। ইতিমধ্যে মিটিয়ে নিতে হবে *সমর ও শান্তি* আর *আনা কারেনিনা*-র মতো বৃহৎ উপন্যাস রচনার সাধ। এক্ষেত্রে তার অন্যতম পূর্বসূরি ছিলেন রম্যাঁ রল্যাঁ। লিখেছিলেন 'জাঁ ক্রিস্তফ'।

এখন অবসর তো নেওয়া গেল। আপাতত শান্তিনিকেতনই তার নিভৃতবাসের মনোমতো স্থল। এটা পূর্বপরিকল্পিত। পুত্র-কন্যার পড়াশুনার খাতিরে। তারা যেখানেই যাক স্কুল-কলেজে পড়তে চাইবে। তাদের সমবয়সি মধ্যবিত্ত সন্তানদের মতোই তাদের ধ্যানধারণা। মহাত্মা গান্ধী তাঁর পুত্রদের নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেসব পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন, গান্ধীভক্ত বিনু ও মীরা পুত্র-কন্যাদের নিয়ে তেমন কিছু করতে ভরসা পায় না। তারা বরং রবীন্দ্রভক্তদের মতো গুরুদেবের অনুসরণ করবে। সুতরাং শান্তিনিকেতনে সপরিবারে নিভৃতবাসই শ্রেয়।

বিনু শান্তিনিকেতনে যাচ্ছে শুনে তার এক শুভানুধ্যায়ী বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার বলেন, 'শান্তিনিকেতন কি সেই শান্তিনিকেতন আছে? এখন ওটা কলকাতার একটা শহরতলি। তেমনি সব বড়ো বড়ো বাড়ি।'

তার অপর এক শুভানুধ্যায়ী কাজি সাহেব বলেন, 'ওইখানেই থামবেন না। গভীরভাবে যাবেন আরও অভ্যন্তরে।'

কবিগুরু সেটা ভাবতেন। সেইজন্যেই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা। শ্রীনিকেতনের কার্যকলাপ গ্রামবাসী কৃষি ও কারুজীবীদের নিয়ে। ছাত্র অবস্থায় বিনু প্রথমবার শান্তিনিকেতনে যায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সে শ্রীনিকেতন দেখতে গিয়ে কর্মীদের সঙ্গে আলাপ করে। নজরে পড়ে একজন কর্মীকে গুরুদেবের উপদেশ —'গড়ার কাজে ষোলো আনা শক্তি নিয়োগ করো। ভাঙার কাজে সিকি পয়সা শক্তি বাজে খরচ কোরো না।' ভাষাটা ঠিক মনে নেই। কতকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজি কি অসহযোগীদের গঠনের কাজ করতে নির্দেশ দেননি? চরকা কাটতে তারা বাধ্য। সারা ভারতে অসংখ্য স্বরাজ আশ্রম ছিল। প্রত্যেকটিতে হাতেকাটা সুতো উৎপন্ন হত। খাদি বলে একটা শিল্পই নতুন করে প্রাণ পায়। দেশের লোক একটু বেশি দাম দিয়েই কেনে। বহু দরিদ্রের অন্নসংস্থান হয়।

বিনুর এক ভাই জাপানে শিক্ষার্থী হয়ে যায়। গান্ধীজি অসুস্থ শুনে জাপানিরা রোজ তাদের কাছে এসে জানতে চায় তিনি কেমন আছেন। সে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাদের এত উৎকণ্ঠা কেন?' তারা বলে, 'উৎকণ্ঠা

হবে না? গান্ধী যে গরিবের মা-বাপ।' ভাই জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, কে বড়ো? মিকাডো না গান্ধী?' তারা বলে, 'গান্ধী। মিকাডোকে জাপানিরাই মানে। গান্ধীকে সব দেশের লোক।'

চরকায় সুতোকাটা ছিল একদা ব্রিটেনের কন্যা ও বধূদের মনোপলি। সেই সূত্রেই তাঁরা কিছু উপার্জন করতে পারতেন। সুতো কাটার কল উদ্ভাবনের পর থেকেই তাঁরা তাঁদের আয়ের সূত্র থেকে বঞ্চিত। এদেশেও বামুনের মেয়েরা চরকায় পৈতের সুতো কাটতেন। কিন্তু সবাইকে চরকায় সুতো কাটতে হবে দিনে অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে, এটা গান্ধীজির নতুন এক ফরমান। পুরুষরা কোনো কালেই বা কোনো দেশেই চরকায় সুতো কাটেনি। বিনু কিছুদিন কেটে মীরার উপর ছেড়ে দেয়। মীরা যেখানেই যায় স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে চরকার ক্লাস করে। তাতে তাদের কিছু রোজগার হয়। সেটা তুচ্ছ নয়।

শান্তিনিকেতনে এগারো বছর আগে গুরুদেব মীরাকে বলেছিলেন, 'শুনেছি তুমি কর্মিষ্ঠা মেয়ে। এখানে এতরকমের বহু বিভাগ। একটা-না-একটাতে তোমার ঠাঁই হবে।' এখন সে কোনো বিভাগে যোগ দিতে চায় না। আশ্রমে মেয়েদের নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করে। একটা শিশু পাঠশালার প্রতিষ্ঠা হয়। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাশোনাও তার একটা স্বেচ্ছাবৃত কর্ম। তারা আসে যায় গানবাজনা করে প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট দিনে।

ছেলে-মেয়েরা কলকাতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিনিকেতনের আকাশে ডানা মেলে উড়ছে। পড়াশোনা গাছতলায়, খেলাধুলা খেলার মাঠে, সন্ধ্যা বেলা নৃত্যগীতের আসরে বা সভাসমিতিতে, তারপরে নীড়ে ফিরে আসে। রথীবাবুকে বলে রথীদা, ইন্দিরা দেবীকে বিবিদি, প্রতিমা দেবীকে বউঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাদা ও দিদি। বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ। এমনটি কলকাতায় ছিল না। ওদের আনন্দে ওদের বাপ-মায়ের আনন্দ।

শান্তিনিকেতনে আসার মুখে বিনুকে জানানো হয় বিশ্বভারতীর নাম হতে যাচ্ছে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটিও হবে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, চ্যান্সেলর হবেন জহরলাল নেহরু, ভাইস-চ্যান্সেলর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিনুকে অনুরোধ করা হয় রেজিস্ট্রার হতে। যাতে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টা দাঁড়িয়ে যায়। বিনু বছর দুয়েকের জন্যে রাজি হয়। কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ও পার্লামেন্টের বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট পড়ে তার মত বদলে যায়। এ পদের দায়িত্ব বহন করলে তার সাহিত্যের কাজ ব্যাহত হবে। সে সাহিত্য নিয়ে থাকবে বলে সরকারি চাকরি ছেড়েছে, এখন বিশ্বভারতী নিয়ে থাকতে হলে সাহিত্যের কাজ ছাড়তে হবে। বিনুর পরামর্শে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার নিশিকান্ত সেনকে উক্ত পদ দেওয়া হয়। তাঁর শর্ত বিনু যেন তাঁকে সাহায্য করে।

নিশিকান্তবাবু নাছোড়বান্দা। বিনুকে প্রয়োজনমতো সাহায্যও করতে হয়। কর্মসমিতির সদস্যরূপেও তার উপস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু রথীবাবুর পদত্যাগে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচন নিয়ে দলাদলি বেঁধে দেয়। বিনুও তাতে জড়িয়ে পড়ে। বিনু পরে সদস্যপদ ত্যাগ করে সাহিত্যে মন দেয়।

দ্বিতীয় যৌবনের জন্যে বিনু অস্থির হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় যৌবন না পেলে প্রথম যৌবনের উপাখ্যান লেখা স্বচ্ছন্দ হয় না। যে লিখবে সে তখনকার দিনের তরুণ। যাদের কথা লেখা হবে তারাও তাই। লিখতে হবে প্রেমের আলাপ প্রেমের ভাষায়। তারজন্যে রাজকর্ম থেকে অবসরের আবশ্যকতা ছিল। সেটাও তার অপসরণের অন্যতম কারণ।

রায় লিখতে লিখতে রিপোর্ট লিখতে লিখতে বিনুর লেখার হাত খারাপ হয়ে গেছিল; অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারে খারাপ। বেশ কিছুকাল লেগে যায় লেখার হাত ভালো করতে; অর্থাৎ সাহিত্যের বিচারে ভালো। ছোটো ছোটো উপন্যাস লেখে। ছোটোগল্প লেখে। প্রবন্ধ তো লেখেই, সাহিত্যিক তথা সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ছড়াতেই তার হাত খোলে। ছেলেদের জন্যে ছড়া। বড়োদের জন্যে ছড়া।

কিন্তু ব্যাঘাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? ভারত সরকার তাকে নবগঠিত সাহিত্য আকাদেমির সংসদের সদস্য মনোনয়ন করেন। সংসদের সদস্যরা তাকে কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচন করেন। এই সুবাদে তাকে বার বার

দিল্লি যেতে হয়। সম্মান বড়ো কম নয়। নেহরু সভাপতি, রাধাকৃষ্ণন সহ-সভাপতি, মওলানা আজাদ, সর্দার পানিক্কর প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা সদস্য। এঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসার সৌভাগ্য। কিন্তু কিছুদিন পরে বিনু উপলব্ধি করে যে আকাদেমির স্বীকৃত বারোটা সাহিত্যের বিবর্তন একভাবে হয়নি, বিকাশ এক মানের নয়, সমস্যা এক এক সাহিত্যের এক এক প্রকার। অতএব বিভিন্ন ভাষার জন্যে বিভিন্ন শাখা আকাদেমি আবশ্যক। তার কথা শুনে নেহরু চমকে ওঠেন। বলেন অমন করলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি উঠবে, ভারত টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। রাধাকৃষ্ণন নেহরুর প্রতিধ্বনি করেন। আর সবাই নীরব। কিন্তু শ্রীরামুলুর অনশনে প্রাণত্যাগের পর নেহরু চটপট অন্ধ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। একে একে অনেকগুলি ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠিত হয় নেহরু জীবিত থাকতেই। পরে ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাব তথা অসমের পুনর্বিন্যাস ঘটে।

এসব রাজ্যের অনেকগুলিতেই ভাষাভিত্তিক আকাদেমি স্থাপিত হয়। তখন দিল্লির সাহিত্য আকাদেমিরও চারটি আঞ্চলিক শাখা স্থাপন না করে উপায় থাকে না। ততদিনে বিনু পদত্যাগ করে নিজের কাজে মন দিয়েছে। আকাদেমির কাজ বিনু ছাড়া আরও অনেকে করতে পারেন। যেটা সে ছাড়া আর কারও দ্বারা হবার নয় সেই কাজটি তার করণীয় কাজ। যেমন তার পরিকল্পিত পাঁচ খন্ডের—পরে ছয় খন্ডের উপন্যাস। তেমনি তার পরিকল্পিত চার খন্ডের প্রেমের উপাখ্যান। তার এক সাহিত্যিক বন্ধুর মতে সে বিষয়টাকে বেছে নেয়নি, বিষয়টাই তাকে বেছে নিয়েছে।

বিষয় তো সেই ইটারনাল ফেমিনিন, যার উল্লেখ সে পেয়েছিল প্রমথ চৌধুরির *চার ইয়ারি কথা* উপাখ্যানের তৃতীয় উপাখ্যানে। সোমনাথের জবানিতে। ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত ভিনাস ডি মাইলো। কাব্য ও নাটকে কোথাও সে হেলেন, কোথাও দ্রৌপদী, কোথাও বিয়াত্রিস, কোথাও রাধা, কোথাও শকুন্তলা, কোথাও বসন্তসেনা, কোথাও গ্রেটচেন—যার সম্বন্ধে গ্যেটে লিখেছেন চিরন্তনী নারী আমাদের উর্ধ্বে নিয়ে যায়।

এই যে চিরন্তনী নারী একে একালেও দেখা যায়। এদেশেও, ওদেশেও। বিনুর ধারণা সে একঝলক দেখেছে। তাই সেটুকু অবলম্বন করেই উপন্যাস লিখতে মনস্থ করেছে।

বিষয়টি বিনুকে আবিষ্ট করে রাখে আযৌবন। সে যখন সময় পায় তখন সে পঞ্চাশোর্ধ্বে। ধ্যান করে দ্বিতীয় যৌবনের। কাহিনি লেখে প্রথম যৌবনের। প্রথম দুই ভাগ লিখতে বাধা পায় না। কিন্তু তৃতীয় ভাগ আরম্ভ করতে হাত ওঠে না। গোড়াতেই লিখতে হত এমন দুটি বাক্য যা না লিখলে নয়। তাতেই নিহিত ছিল কাহিনির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে দুটি বাক্য লিখলে অনিষ্ট হত একজন নারীর ও তার সন্তানের। লেখা হয়তো রূপোত্তীর্ণ, রসোত্তীর্ণ তথা কালোত্তীর্ণ হবে, লেখক হয়তো অমর হবে, কিন্তু অপরের জীবনে যে প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর সেটা কি বিবেকসম্মত না বিবেকবিরুদ্ধ? এই উভয়সংকট থেকে উদ্ধারের উপায় কি সেই দু-টি বাক্যের পরিবর্তন? না, সেটাও সততা নয়।

বিনুর মনে পড়ে আলমোড়ায় এক পর্বতারোহী ইংরেজ ভদ্রলোকের উক্তি। তিনি বলেন আরোহী যখন দেখতে পায় যে আর এক কদম এগোলেই নিশ্চিত মরণ তখন সে আর এগোয় না। সে বোঝে পর্বতের কাছে সে পরাস্ত হয়েছে। সে পরাজয় মেনে নয়। বিনু ঘোষণা করে সে আর লিখবে না। বই সেইখানেই সমাপ্ত। কিন্তু প্রকাশক তা শুনবেন কেন? পাঠকই-বা তা মেনে নেবেন কেন? বিনুর মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধী তাঁর এক অনুগামীকে বলেছিলেন, যেটা আরম্ভ করবে সেটা শেষ করবে। মহাত্মার উপদেশ শিরোধার্য করলে বিনুকে আরও লিখতে হয়। কিন্তু সেই দুটি বাক্য বাদ দেয় কী করে? লেখেই-বা কী করে? বছর দশেক লেগে যায় আভ্যন্তরিক সংগ্রামে। ছেলে পরামর্শ দেয় বইখানা লিখে পান্ডুলিপি সিন্দুকে বন্ধ করে রাখতে। মৃত্যুর পরে প্রকাশ করা হবে। মন্দ পরামর্শ নয়। কিন্তু প্রকাশক টের পেলে নিশ্চয়ই দাবি করবেন ও অর্থের টানাটানি থাকলে কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে বিনু সে-পান্ডুলিপি ছাপতে দিতে পারে। তাই বিনু সে-পরামর্শ খারিজ করে।

শেষপর্যন্ত যেটা স্থির হয় সেটা সেই দুটি বাক্যের পরিবর্তন। 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম।' সত্য বলবে, প্রিয় বলবে, অপ্রিয় সত্য বলবে না। এটা হল ঋষিবাক্য। তারপর লেখা তরতর

করে চলে। বই সারা হয়। কিন্তু চার খন্ডে নয়, বর্ধিত তৃতীয় খন্ডে। যথেষ্ট দেরি হয়েছে, আর দেরি নয়।

বিনুর পরিকল্পনা ছিল একই নায়কের তিনবার প্রেমের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব অবলম্বন করে তিন পর্যায়ের উপন্যাস রচনার। প্রথম পর্যায়ের মাঝখানে থেমে যেতে বাধ্য হওয়ার পর সে ভয় পায় যে আবার হয়তো সেইরকম সংকটে পড়বে। আদালতের সাক্ষীরা শপথ পাঠ করার সময় উচ্চারণ করে, সত্য বলিব, সম্পূর্ণ সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিব না। লেখকরূপে বিনুও উচ্চারণ করে, সত্য বলিব, সত্য ব্যতীত অন্য কিছু বলিব না, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য বলার শপথ নিতে সাহস পায় না। সম্পূর্ণ সত্য বলতে গেলে আর পাঁচজনকে জড়াতে হয়, সেটা তাদের দিক থেকে আপত্তিকর হতে পারে, তাদের আপত্তি উপেক্ষা করার স্বাধীনতা কি তার আছে?

আর্ট জীবনের থেকে নেয়। জীবনকে অনুসরণ করেই অতিক্রম করে। তখন জীবন আর্টের অনুসরণ করে। এটাই বিনুর মৌল ধারণা। কল্পনার খাদ মেশাতে হয়, তা বলে কল্পনাই সোনা নয়। সোনা হচ্ছে সত্য উপলব্ধি, যার জীবনে যতটুকু বা যত বেশি। সে প্রকাশ করার মতো কিছু পেয়ে থাকলে তবেই তো দেবে কিন্তু প্রকাশ করতে গিয়ে সবটা ব্যক্ত করা যায় কি? বিনুর ধারণা ছিল হ্যাঁ যায়। ক্রমে প্রত্যয় হল, না, যায় না। সংকট বার বার আসবে। পার হওয়া শক্ত। বিশেষত তৃতীয় পর্যায়ের বেলা। বৈষ্ণব কবিরা রাধাকৃষ্ণের লীলা বলে চালাতেন। সে-যুগ কি আর আছে!

বিনু সম্পূর্ণ সত্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়ে যতদূর সম্ভব ততদূর অগ্রসর হয়। তাতে তার মন ভরে না। উপন্যাস তার কাছে একটুখানি সোনা, বাকিটা খাদ নয়। তাই যদি হত তবে সে বিস্তর উপন্যাস লিখত। ভারতচন্দ্রের মতে, সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। বিস্তর মিছার বেসাতি তার নয়। সম্পূর্ণ সত্য বলতে পারলে সে ভারমুক্ত হত। সেকি ভারমুক্ত হয়ে অপ্রকাশিত রেখে যেতে পারত না? না, সেই পরিমাণ মনের জোর তার ছিল না।

উপন্যাস রচনায় তার আদর্শ ছিল রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নয়, টলস্টয়ের। যেমন *সমর ও শান্তি* ও *আনা কারেনিনা* কিন্তু *ক্রয়টৎসার সোনাটা* নয়। ততদিনে তিনি নীতিনিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। আর্ট বিনুর মতে মরালিটির বাহন নয়। তাকে নীতির শাসনে আনলে সে বহুবর্ণ থাকে না, একরঙা হয়ে ওঠে। তাতে সমাজের হয়তো কিছু লাভ হয়। কিন্তু মানুষ কি কেবল সামাজিক জীব? মানুষ হচ্ছে প্রকৃতির মতো ভালোয়-মন্দে, সাদায়-কালোয়, জ্ঞানে-অজ্ঞানে, সুন্দরে-কুৎসিতে মেশা; তা সত্ত্বেও পশুর চেয়ে ঊর্ধ্ব স্তরে কিন্তু অতিমানব বা দেবপ্রতিম নয়। বিনু নিজেকে একজন আর্টিস্ট মনে করে, মরালিস্ট নয়।

তবে এটাও সে মানে যে জগতে মরালিটির স্থান আছে। এ জগৎ কেবল প্রকৃতির নিয়মে নয়, নীতির নিয়মেও শাসিত। আর্টে তার প্রতিফলন পড়তে পারে, কিন্তু আর্টকে তার প্রচারমাধ্যম না করলেই হল। একই কথা রাজনীতি সম্বন্ধেও বলা যায়। জীবনে যদি রাজনীতি থাকে আর্টেও থাকবে। কিন্তু আর্টকে করবে না তার প্রচারমাধ্যম। ফরাসি বিপ্লব নিয়ে কত-না উপন্যাস লেখা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়েও হবে। তাতে রাজনীতির প্রতিফলন থাকবেই। না থাকলে তা আলুনি লাগবে।

বিনু কি কেবল জীবনশিল্পী? সেকি একজন নাগরিক নয়? নাগরিক হিসাবে কি তার কোনো বক্তব্য নেই? থাকলে তাকে সে-বক্তব্য পেশ করতে হয়। কখনো কখনো সেটা অবশ্যকর্তব্য, যেমন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কিংবা অসমের বঙ্গাল খেদা; কিংবা চীন-ভারত সংঘর্ষ; কিংবা কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে বিরোধ।

যার ভোট দেবার অধিকার আছে তার মুখ খোলারও অধিকার আছে। সে তার লেখনীর মুখ খুলতে পারে। লেখা হয়তো রসোত্তীর্ণ তথা রূপোত্তীর্ণ হবে, কিন্তু কালোত্তীর্ণ হবে কী করে? বিষয়টা যে নিতান্তই সাময়িক। তার স্থায়িত্ব কতক্ষণ?

রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বিনু তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সাহিত্যিক কি সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে লেখনী চালনা করতে পারে? রল্যাঁ বলেন, নিশ্চয়। বিনু জানতে চায়, শেক্সপিয়ারও কি করতেন? রল্যাঁ

বলেন, হ্যাঁ। সম্ভবত তাঁর নাটকের ভিতরে তা প্রচ্ছন্ন আকারে ছিল। বিনু সেটা লক্ষ করেনি। তবে রল্যাঁ যে সমসাময়িকের প্রতি কর্তব্য করেছেন ও করতেন এটা বিনুর কাছে স্পষ্ট। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লেখা তাঁর ‘যুদ্ধের ঊর্ধ্বে’ একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও তার মূল্য শেষ হয়ে যায়নি। তিনি ফরাসি জার্মান বিরোধের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনিই বোধহয় সেদিন একমাত্র ফরাসি যিনি জার্মানদের শত্রু ভাবতেন না। ফরাসি জনমত তাঁকে সেদিন ক্ষমা করেনি। যুদ্ধের পরে তাঁকে ফ্রান্সের বাইরে সুইটজারল্যাণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসিত হতে হয়েছিল। লেখক তার মানবপ্রেমের জন্যে বনবাস বরণ করবে এটি তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে তাঁর পাঠকরা তাঁকে ছাড়েননি—নানা দেশের পাঠক।

সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে লিখবে না, বিনু আর এই সংকল্পে দৃঢ় থাকতে পারেনি। ধর্মান্ধ দেশকে দৃষ্টিদান করা চক্ষুষ্মানের অবশ্যকর্তব্য। ফল যে বিশেষ কিছু হল তা নয়। ধর্মের ইসুতে দেশ ও প্রদেশ দ্বিধাবিভক্ত হল। তা বলে কি সে সব লেখা মূল্যহীন? না, তাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধর্মের ইসুতে আয়ার্ল্যাণ্ড ভাগ হয়ে গেল। অথচ তার স্বাধীনতার সংগ্রাম ভারতের চেয়েও পুরাতন। তাতে ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্ট উভয় সম্প্রদায়ের রক্ত মিশেছিল। ইয়েটস, বার্নার্ড শ, জর্জ রাসেল এঁরা সবাই প্রটেস্টান্ট। কিন্তু দেশভাগের সময় দেখা গেল এঁরা নিরুপায়। সিদ্ধান্তটা যাঁরা নিলেন তাঁরা ক্যাথলিক প্রোটেস্টান্টের গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্যই নিলেন। দশ ভাগ খারাপ কিন্তু গৃহযুদ্ধ আরও খারাপ, বিশেষত ধর্মের ইসুতে। লিঙ্কনের সামনে তেমন কোনো সাম্প্রদায়িক ইস্যু ছিল না।

বিনুর ধারণা ছিল আধুনিক যুগের মানুষ ধর্ম নিয়ে লড়তে চায় না, সেটা মধ্যযুগের মানুষের কাছে জীবন-মরণের ব্যাপার। কিন্তু তাই যদি হত তবে আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষ আধুনিক যুগের বিংশ শতাব্দীতে নিশ্বাস নিয়েও ধর্মের প্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত হত না। স্বদেশে ক্যাথলিক-প্রোটেস্টান্টের মধ্যে যতটা ব্যবধান এদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তার চেয়ে আরও বেশি। পুরাণসর্বস্ব হিন্দু ধর্মের সঙ্গে কোরানসর্বস্ব মুসলিম ধর্মের সমন্বয় যেন বৃত্তের সঙ্গে চতুষ্কোণের সমন্বয়। সেটা সমন্বয় নয়, সহনশীলতা। মিলন যেটুকু হয়েছে সেটুকু সুফি ও বৈষ্ণবদের মতো পুরাণনিরপেক্ষ তথা কোরাননিরপেক্ষ সাধকদের জীবনেই হয়েছে। আর হয়েছে তাঁদের ভক্তদের মধ্যে। পিরদের মাজারে বা উরসে যাঁরা জমায়েত হন তাঁদের সবাই যে মুসলমান তা নয়, বিপুলসংখ্যক হিন্দু। অথচ এঁরাই আবার গোহত্যা নিয়ে বা মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে রক্তারক্তি করতে পেছপাও হন না। শান্তির পথে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ আবশ্যক হয়।

তৃতীয় পক্ষ বিদায় হলে দুই পক্ষের মধ্যে হানাহানি বেঁধে যাবে এ ভয় বিনুর মধ্যে ছিল। তাই দেশভাগের সময় সে আইরিশ কবি ও নাট্যকারের মতোই নিরুপায়। তার ভরসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর উপরে। সেতুবন্ধ যদি মহাত্মা গান্ধী ও সীমান্ত গান্ধীর জীবনে সম্ভব হয়ে থাকে, সীমান্তপ্রদেশে যদি কংগ্রেস শাসন সম্ভব হয়ে থাকে তবে কী এক অলৌকিক উপায়ে সর্বত্র সম্ভব হবে। ভারত আয়ার্ল্যাণ্ড নয়। মাভৈঃ। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের বিদায়ের সময় যে দৃশ্য দেখা গেল তা তার কল্পনাতীত। পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান শিখ পরস্পরের হাতে নিহত। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রায় নব্বই লক্ষ হিন্দু শিখ শরণার্থী সমাগত। এদিক থেকেও লক্ষ মুসলমান বিতাড়িত। এর অনুরূপ ব্যাপার দুই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারত, যদি-না মহাত্মা গান্ধী অহিংস উপায়ে সফল হতেন। তা সত্ত্বেও হিন্দু ওপার থেকে এপারে চলে আসে, বহু মুসলমান এপার থেকে ওপারে চলে যায়। কতকটা নিরাপত্তার খাতিরে, কতকটা চাকরিবাকরির আশায়, কতকটা ক্ষমতার প্রলোভনে।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে বিনু সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েক জন সহকর্মী পায়। তাঁদেরই উৎসাহে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় সমমনস্ক কয়েক জন সাহিত্যিককে নিয়ে সাহিত্যমেলা অনুষ্ঠিত হয় বিনুর তত্ত্বাবধানে। তারিখটা, ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি। প্রকারান্তরে জানিয়ে দেওয়া হল যে দেশভাগ সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য এক ও অবিভাজ্য। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন তার দৃষ্টান্ত। রথীবাবু ও তাঁর সহযোগীরা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। লোকে না চাইতেই চাঁদা দিয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনকে বলা যেতে পারে সংস্কৃতির শ্রীক্ষেত্র। এখানে সব দেশের, সব ধর্মের, সব ভাষার সাহিত্য-সংগীত-ললিতকলা রসিকরা স্বাগত। এটা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারেরও ঐতিহ্য। বলা যেতে পারে শান্তিনিকেতনের এই বৈশিষ্ট্য ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেরই সম্প্রসারণ।

তবে শান্তিনিকেতনের সূচনা হয়েছিল সেই নামে একটি অতিথিশালারূপে। সেখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে সপ্তাহকাল বাস করতে আসতেন বাইরে থেকে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও সমভাবাপন্ন ব্যক্তিরা। লোকালয় থেকে দূরে খোলামেলা জায়গায় তাঁরা নিরিবিলিতে ধ্যানধারণা করতেন। সেকালের ঋষিদের আদর্শ অনুসরণই ছিল তাঁদের অন্বিষ্ট। ঋষিরা অনুসরণ করেন বলেই দেবেন্দ্রনাথকে বলা হত মহর্ষি। ডাঙা জমিতে একটি কি দুটি ছাতিম গাছ ছিল। ছাতিমতলায় বিশ্রাম করতে আসন পেতে মহর্ষি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করেন। প্রত্যেক বছর সাতই পৌষ ছাতিমতলায় সেই উপলক্ষ্যে উৎসব হয়। যোগ দেন স্থানীয় ও বহিরাগত ব্রাহ্ম-অব্রাহ্ম সর্বসাধারণ। আশ্রমের বাইরে মেলা বসে। সেখানে যাত্রা, কীর্তন, বাউল প্রভৃতি বিচিত্র অনুষ্ঠান হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় অত্যাশ্চর্য আতসবাজি।

‘শান্তিনিকেতন’ আবাস প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে ব্রাহ্মমতে উপাসনার জন্যে একটি উপাসনাগার নির্মিত হয়। বলা হয় মন্দির। যেখানে বিগ্রহ নেই সেখানে মন্দির শব্দের প্রয়োগ বিনুর কাছে নতুন ঠেকে। এই মন্দিরে রবীন্দ্রনাথ যেসব ভাষণ দিতেন সেসব বিনুর বাল্যকালে *শান্তিনিকেতন* নামে ছোটো ছোটো খন্ডে প্রকাশিত হত। সে যে-স্কুলে পড়ত সেখানকার লাইব্রেরিতে কয়েক খন্ড ছিল। বিনু নাড়াচাড়া করে দেখত।

মহর্ষির আধ্যাত্মিক আদর্শকে সাংস্কৃতিক ব্যাপ্তি দেন কবি রবীন্দ্রনাথ। আশ্রমের নাম হয় ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বালক ব্রহ্মচারীদের শিক্ষার জন্য গুরুকুল আদর্শের আবাসিক বিদ্যালয়, তাতে প্রাচীন বিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করেন আধুনিক বিদ্যা ; তা ছাড়া গানবাজনা, ছবি আঁকা, নাট্যাভিনয়, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম আখ্যাটি পরে অপ্রচলিত হয়। ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, উত্তীর্ণ হলে কলেজে পড়তে যায়। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থ সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাত্রা করেন। কবির ইংরেজ ভক্ত পিয়ার্সন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিদ্যালয়ের কাজে যোগ দেন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর গুরুদেব বিশ্বের নানা দেশে সংবর্ধনা পান। পরিবর্তে বিশ্বের বিদ্যার্থী ও বিদ্বানদের আহ্বান করেন শান্তিনিকেতনে এসে কিছুদিন থেকে শিখতে ও শেখাতে। বিদ্যালয়ের চেয়ে উন্নত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম রাখেন বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতনে আর একটি মাত্রা যুক্ত হয়।

শান্তিনিকেতনের দীর্ঘকালের জলকষ্ট পরে দূর হয়েছে। গভীর নলকূপ থেকে জল তুলে ঘরে ঘরে সরবরাহ করা হচ্ছে। এত গাছপালা, এত ফুল, এত সবুজ ঘাস এর আগে দেখা যায়নি, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদে। বলা যেতে পারে এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাকালে যদুনাথ সরকার জানিয়েছিলেন যে জল যেখানে দুর্লভ সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে যাওয়া বৃথা। কিন্তু গুরুদেব তো বিশ্বভারতীকে বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কল্পনা করেননি। তিনি উপাচার্য বলে কোনো পদ সৃষ্টি করেননি, পরীক্ষায় বিশ্বাস করতেন না, ডিগ্রির প্রয়োজন দেখতেন না। বিদ্যার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো বই পড়তেন, গবেষণা করতেন, অধ্যাপকদের কাছে পাঠ নিতেন। অধ্যাপকরা অধীত বিদ্যার অংশ দিতেন। যে যার সাধ্যমতো গ্রহণ করত।

গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য অনুসরণ করা হয়। যথাকালে পরীক্ষা দেওয়া হয়। পাস করলে অন্যত্র বিএ পড়তে যাওয়া হয়। পরে শান্তিনিকেতনেই বিএ পড়ার ব্যবস্থা হয়। কলকাতার পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হয়। যথাকালে পরীক্ষা দেওয়া হয়। এতদূর অগ্রসর হওয়ার পর বাকিটুকুতে আপত্তি কীসের? এমন সময় দেশ স্বাধীন হয়, নতুন সরকার বিশ্বভারতীকে অর্থাভাব থেকে উদ্ধার করতে রাজি হন, উভয় পক্ষের ইচ্ছায় বিশ্বভারতী হয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় হলে নিজস্ব পাঠ্যক্রম, নিজস্ব পরীক্ষা, নিজস্ব ডিগ্রি এসব একে একে প্রবর্তিত

হয়। তবে বিশ্বভারতী কোর্স বলে একটা সমান্তরাল পাঠ্যক্রম প্রচলিত ছিল। চার-পাঁচজন ছাত্র-ছাত্রী অনুসরণ করত। সেটা উঠে যায়। সেটাতে নাকি গুরুদেবের নির্বাচিত পাঠ্য ছিল।

অবসর নিয়ে বিনু যখন সপরিবারে বসবাস করতে যায় তখন সবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্ব শুরু হচ্ছে। দেশের আর দশটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডিগ্রির সমতা রক্ষা না করলে বিশ্বভারতীর ডিগ্রির মর্যাদা থাকে না, সুতরাং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো করে বিশ্বভারতীকে ঢেলে সাজাতে হয়। এটা কারও একার সিদ্ধান্ত নয়। রথীন্দ্রনাথকে দায়ী করা অন্যায়। স্থানীয় অধ্যাপকরা এসব পরিবর্তন সাগ্রহে স্বীকার করেন। তাতে তাঁদেরও আর্থিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়। লাগে টাকা দেবেন গৌরী সেন। ততদিনে বেসরকারি চাঁদা বন্ধ হয়ে গেছে। কেউ চাঁদা দেয় না। বিভাগ সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। কলাভবন, সংগীতভবন, চীনভবন ইত্যাদি গড়ে উঠেছে।

গুরুদেবের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় ঘরে প্রবেশ করেন এক চৈনিক আশ্রমিক। কবি পরিচয় করিয়ে দেন। নাম তান ইয়ুনশান। ভদ্রলোক দুটি কথা বলে বিদায় নিলে কবি বলেন, 'জাপানি বিদ্বানরাও অত্যন্ত কুশলী, কিন্তু চীনা বিদ্বানদের মধ্যে দেখি প্রাচীনতর এক প্রজ্ঞা। যেটা জাপানিদের মধ্যে পাইনে।' পরে তান সাহেবের সঙ্গে বিনুর পরিচয় প্রগাঢ় হয়। তাঁর চরিত্রে ছিল এক পরিশীলিত বৌদ্ধ স্থিতপ্রজ্ঞতা।

বছর পাঁচেক পরে শান্তিনিকেতন বেড়াতে গিয়ে বিনু চীনভবন দেখতে যায়। সেখানে এক চীনা অধ্যাপক দম্পতির সঙ্গে আলাপ। ভদ্রমহিলা নিবিষ্টমনে কী একখানা বই অনুবাদ করছিলেন। বিনু অবাক হয়ে লক্ষ করে ওখানা তার ও মীরার ইংরেজি বই। কিছুদিন পরে তাঁরা চীন দেশে ফিরে যান। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করে, যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। তান সাহেব কমিউনিস্ট নন। তিরিশ বছর পরে বিনু ও মীরা শান্তিনিকেতনে আবার সেই দম্পতির সাক্ষাৎ পায়। বইখানার কী হল জানতে চাইলে ভদ্রমহিলা বলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁদের দুজনকে ধরে পাড়াগাঁয়ে চালান করা হয়। সেখানে তাঁর স্বামীকে করতে হত মাঠে গিয়ে চাষ-আবাদ আর তাঁকে ঘরে বসে রান্নাবান্না, বাসনমাজা, কাপড়কাচা, ঝাঁট দেওয়া। বইপত্র কোথায় হারিয়ে যায়। অনুবাদটি নিখোঁজ। বিনু দুঃখিত হয়। তবে আনন্দের বিষয় মাও জে দুং-এর মৃত্যুর পরে নয়া সরকার তাঁদের রাজধানীতে ফিরিয়ে আনেন, চাকরি ফিরিয়ে দেন—বাড়িসমেত, বকেয়া মাইনেসমেত। স্বামী সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে আবার এসেছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

একান্ন সালে বসবাস করতে গিয়ে বিনুর আলাপ হয় দুজন ইন্দোনেশিয়ানের সঙ্গে, একজন অধ্যাপক—সংস্কৃত পন্ডিত। এমন একটি ছন্দ আবৃত্তি করেন যেটি ভারতে বিলুপ্ত, জাভায় রক্ষিত। তাঁর নাম বীর্যসুপার্থ শুনে বিনু বিস্মিত হয়। তিনি বলেন, বীর্য মানে বীর, সুপার্থ মানে অর্জুন। ওঁরা সংস্কৃত নামের পূর্বে একটা সু বসিয়ে দেন। যেমন সুকর্ণ। বিনু চমৎকৃত হয় যখন শোনে তিনি ধর্মে মুসলমান। শেষে ফিরে গিয়ে তিনি চিঠি লেখেন, তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। নাম রেখেছেন আর্যাবর্তপুত্র জয়বিষ্ণুবর্ধন। জন্ম নয়, সূচনা হয়েছিল আর্যাবর্তে অর্থাৎ ভারতে।

অপরজন বালিদ্বীপের হিন্দু ব্রাহ্মণ। নাম ইদা বাগুস মন্ত্র। তিনি ছাত্র। মীরার আমন্ত্রণে মন্ত্র একদিন সন্ধ্যা বেলা নর্তকের সাজ পরে বালিদ্বীপের নৃত্য প্রদর্শন করেন। বালিদ্বীপ নৃত্যের জন্যে প্রসিদ্ধ। মন্ত্র দেশে ফিরে গিয়ে ক্রমে উচ্চপদস্থ হন। পরে ভারতে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত।

বিনু রথীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করে, বিশ্বভারতী কি ইন্দোনেশিয়ান অধ্যাপক ও ছাত্রদের জন্যে একটি ভবন স্থাপন করতে পারে না? তিনি উত্তর দেন, বিস্তর ছাত্র আসতে চায়, তাদের জন্যে ব্যবস্থা করার বাসনাও ছিল, কিন্তু কোথায় এত অর্থ? বিনু জানত না যে চীনভবনের জন্যে অর্থ চিয়াং কাইশেক দান করেছিলেন। নইলে বিশ্বভারতীর সামর্থ্যে কুলোত না। সুকর্ণ কি ইন্দোনেশিয়া ভবনের জন্যে অর্থদান করতে পারতেন না? হয়তো পারতেন, কিন্তু নানা কারণে নেহরুর সঙ্গে সম্পর্ক তিতিয়ে যায়। ইন্দোনেশিয়া কোনো কালেই ভারতের অংশ বা উপনিবেশ ছিল না। 'দ্বীপময় ভারত' ধারণাটা ভ্রমাত্মক। ওয়েস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জের বিপরীত

দিকে অবস্থান, সেইজন্যেই ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জ নামকরণ করেছিলেন ইউরোপীয় আবিষ্কর্তারা, কোনো ভারতীয় নয়। নামকরণ ভ্রমাত্মক।

ইন্দোনেশিয়ানরা আর আসে না। তিব্বতিরা আসে। তাঁদের সঙ্গে বিনুদের আলাপ জমে। একদিন বিনুদের তাঁরা নিমন্ত্রণ করে চা খাওয়ান। ইয়াক নামক প্রাণীর দুধের সঙ্গে আরও কী কী মিশিয়ে যা তৈরি করা হয় তা এক অপূর্ব পানীয়। একপ্রকার পায়েস বললেও চলে, যদিও মিষ্টি নয়। বলা বাহুল্য তিব্বতিরা কমিউনিস্ট চীনের দাপটে দেশত্যাগী। তাদের সংস্কৃতি চৈনিকের চেয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির নিকটতর। তা লিপিতেই প্রমাণ।

এই শতাব্দীতে তিব্বত থেকে শরণার্থীরা ভারতে এসেছে। সকলেই বৌদ্ধ। বহু শতাব্দী পূর্বে যাঁরা তিব্বতে যান তাঁরাও সকলেই বৌদ্ধ। সেই সূত্রে বিপুলসংখ্যক বৌদ্ধ পুথি তিব্বতে স্থানান্তরিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ভারতে বৌদ্ধবিহারগুলি পরিত্যক্ত হওয়ায় অন্যত্র সে সব পুথির আশ্রয় মিলত না। তিব্বতে সে সব গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ প্রচলিত হয়। চীনে চীনা অনুবাদ। জাপানে জাপানি অনুবাদ। মূল গ্রন্থগুলি ক্রমশ লোপ পায়। কিছুকাল থেকে চেষ্টা চলেছে অনুবাদ থেকে মূল গ্রন্থ উদ্ধারের। যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশ্বভারতীর চীনভবনের অধ্যাপক বেঙ্কটরমণন অন্যতম। তিনি ইংরেজিতেও অনুবাদ করেন। বিনুকে দেখতে দেন প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রের ইংরেজি অনুবাদ। বিনুর কাছে তার মর্মভেদ সহজ হয় না। সেটাও একপ্রকার উচ্চতর গণিত। বিনু তো নিম্নতর গণিতও জানে না। বৌদ্ধদের পদে পদে যুক্তি। যুক্তির সাহায্যেই তাঁরা সত্যে উপনীত হতেন। আদিতে অবশ্য ছিল বোধি। এখানে বলে রাখি, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র মহাযান সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। তিব্বত, চীন, জাপান, কোরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় মহাযান সম্প্রদায়েরই অধিষ্ঠান। অপরপক্ষে শ্রীলঙ্কা, বর্মা, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতিতে তথাকথিত হীনযান সম্প্রদায়ের অবস্থান। হীনযানটা পরের দেওয়া নাম। তাঁদের মতে তাঁদের তত্ত্বের নাম থেরবাদ—স্থবিরবাদ।

উপাচার্য প্রবোধচন্দ্র বাগচি ছিলেন বৌদ্ধসংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ। তাঁর আহ্বানে শান্তিনিকেতনে আসেন জাপান থেকে অধ্যাপক কাসুগাই সস্ত্রীক। জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্মে বহু উপসম্প্রদায়। তাদের একটি দেশজ, আর সব ভারতগত। কাসুগাই দম্পতির সঙ্গে বিনু ও মীরা মেলামেশা করে ততটা ঘনিষ্ঠ হতে পারে না, যতটা তান দম্পতির সঙ্গে। তবে জাপান-যাত্রার সময় বিনু কাসুগাইয়ের কাছ থেকে উৎসাহভরা সাহায্য পায়। সে সাহিত্যিকরূপে জাপানে গেলেও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হিসাবে আদরলাভ করে। চীন-জাপান যুদ্ধের সময় দুই দেশের বৌদ্ধ পন্ডিতদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ছিল। সেটা শান্তিনিকেতনেও প্রতিফলিত। কাসুগাই বলেন তিনি চীনের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে চাননি, তাঁকে কনসক্রিপ্ট করা হয়েছিল। তাঁর শরীরে বুলেট বিদ্ধ হয়। সেটার জন্যে তাঁর ব্যথাবোধ বিদ্যমান। ধর্ম এক হলেও জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন, তার থেকে যুদ্ধবিগ্রহ।

ডক্টর বাগচির উদ্যোগে চীনতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ডক্টর লিবেনথল আসেন সস্ত্রীক। এঁরা জার্মান ইহুদি। স্ত্রী পুরোপুরি, স্বামী আংশিক। বর্ণবিদ্বেষের শিকার হয়ে চীন দেশে আশ্রয় নেন। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর শ্রেণিবিদ্বেষের শিকার হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। লিবেনথলের মতো একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চীনতত্ত্ববিদকে বিশ্বভারতী নামমাত্র মাসোহারায় অধ্যাপকরূপে লাভ করেন। এর আগে নাতসি জার্মানি থেকে পলাতক অধ্যাপক আরনসনকে পেয়েছিল। তিনিও ইহুদি। কী জানি কেন ইহুদিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইহুদিদের একটা টান ছিল। রোটেনস্টাইন ইহুদি, সিলভাঁ লেভি ইহুদি, ভিন্টারনিতস ইহুদি।

বিশ্বভারতী হচ্ছে সেই স্থান, বিশ্ব যেখানে একনীড় হয়। এই যে আদর্শ কবির আমলে কাগজে-কলমে নিবদ্ধ থাকেনি। নানা দেশ থেকে পন্ডিত পক্ষী ও পক্ষিণীরা উড়ে এসে শান্তিনিকেতনে একনীড় হত। রতন টাটার অর্থানুকূল্যে রতনকুঠি বা টাটা বিল্ডিং নির্মিত হয় নানা দেশের অভ্যাগতদের জন্যে। ভারতীয়রাও স্বাগত। বিনু ও মীরা এর আগে কয়েকবার সেখানে ঘর পেয়েছে। একবার তো গুরুদেব স্বয়ং তাদের জন্যে একটি পাকা পেঁপে পাঠিয়ে দেন।

শান্তিনিকেতনের এই কসমোপলিটান আদর্শ রথীন্দ্রনাথের আমলেও ছিল। ইউরোপ আমেরিকা এশিয়া আফ্রিকা থেকে বহু ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক এসেছিলেন। সেই স্রোতটা কেন যে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে গেল তার একাধিক কারণ। একটা কারণ ভারতীয়রা ওদের দেশে গেলে ওদের ভাষা শেখে। ওরা কেন এদেশে এসে এদেশের ভাষা শিখবে না? কেন এই দেশের ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করবে না? ওরা কেন ভারতীয়দের চেয়ে ভালো খাবে, ভালো পরবে, বেশি খরচ করবে, পাশ্চাত্য সংগীতের গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাবে? বিদেশি বিদেশিনিরা অনেকেই বিদেশি আচার ছেড়ে এদেশি আচার বরণ করেছিলেন। কেউ তাঁদের বারণ করেনি, অনুরোধও করেনি। কিন্তু অন্যান্যদের রুচি অন্যরূপ ছিল। তাঁরাও রবীন্দ্রভক্ত। তাঁরাও ভারতপ্রেমিক। রবীন্দ্রভক্তির বা ভারতপ্রেমের কষ্টিপাথরে ভারতীয়রা সবাই কি নিখাদ সোনা? আসলে বিশ্বভারতীকে তাঁরা ভারতভারতীতে রূপান্তরিত দেখতে চেয়েছিলেন। কেউ কেউ বঙ্গভারতীতে।

বীরভূম জেলার একটি নির্জন প্রান্তরে মহর্ষির শান্তিনিকেতন আশ্রমভবন একটি পটভূমিকাহীন উৎক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীও তাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে এদের টিকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু কেন্দ্রের যদি বড়োরকম পালাবদল হয় তবে এদের অস্তিত্ব হয়তো বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভর করবে। নয়তো এটি হবে আর একটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। তখন বিশ্ব একনীড় হবে না, শান্তিনিকেতন কসমোপলিটান চরিত্র রক্ষা করবে না। বিশ্ব একটি মুখের কথায় পরিণত হবে। জনা কয়েক বিদেশি টুরিস্ট নিয়ে তো বিশ্ব হয় না। বিশ্বভারতীর ক্রাইসিসটা আইডেনটিটির ক্রাইসিস। শান্তিনিকেতন ক্রাইসিসও তাই। আত্মশক্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

বিনুর নগরবাস

বিনুর পরিকল্পনা ছিল শান্তিনিকেতনের পর্ব শেষ হলে সে প্রকৃতির আরও কাছাকাছি, জনগণের আরও কাছাকাছি দেশের আরও অভ্যন্তরে কোনো এক অপরিচিত গ্রামে গিয়ে বসবাস করবে। গান্ধীজি যেমন সেবাশ্রমে। তবে শান্তিনিকেতনের পাট একেবারে গুটিয়ে নেবে না। সেখানে তার লাইব্রেরি থাকবে। যখন যেটা খুশি তখন সেটা পড়বে। একজন লেখকের যখন যেমন প্রয়োজন। লেখক হিসাবে সে তার সমকালের মানুষ। তাকে তার যুগের সঙ্গে তাল রাখতে হবে।

শান্তিনিকেতনে ষোলো বছর কাটানোর একটু আগে সেও মীরা একদিন কলকাতায় আসে পারিবারিক কারণে। তিন রাত্রির পর ফিরে যেত। কত বার এরকম হয়েছে, এটা আজব কিছু নয়। কিন্তু এবার ঘটে গেল অঘটন। একুশে ফেব্রুয়ারি আসন্ন। বিনুকে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হবে। সেটাও আজব কিছু নয়। কিন্তু পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হাসান ইমাম সাহেব নাকি এবার প্রধান অতিথি হতে রাজি, শুধু বিনুকে একবার তাঁর বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে হবে। বিনু মীরা সবে ঘুম থেকে উঠে চা খেতে বসেছে, এমন সময় বন্ধুপুত্র এসে বিনুকে আধঘণ্টার জন্যে পার্কসার্কাসে টেনে নিয়ে যায়। তারই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। সে দুই বাংলার মিলনপিয়াসি। একুশে ফেব্রুয়ারি মিলনের উপলক্ষ্য।

ডেপুটি হাই কমিশনার রবীন্দ্রভক্ত। শোকে দুখে সান্ত্বনা লাভ করেন রবীন্দ্রকাব্য পড়ে। ইকবালের কাব্য পড়েন না। তাঁর পাকিস্তানি সহযোগীরা এটা পছন্দ করেন না। কলকাতায় নিয়োগের পূর্বে তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন। বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র ছিল না। এখন তিনি খুশি। কিন্তু সেইসঙ্গে অখুশি। তাঁকে মিশতে দেওয়া হচ্ছে না। অনুষ্ঠানে যেতে মন চায়, কিন্তু অনুমতি মেলেনি। তিনি বিষণ্ণ মুখে জানান।

তাহলে বিনুকে ছেড়ে দিলেই পারতেন। না, বিনুর লেখা তিনি পড়েছেন। বিনুর সঙ্গে তিনি একমত যে হিন্দু-মুসলমানের মামলা তত্ত্বের মামলা নয়, স্বত্বের মামলা। মিলন হবে কী করে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে করতে একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট সারা হয়। ভদ্রলোক না খাইয়ে বিদায় দেবেন না। পড়েছে মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। কেটে গেল প্রায় দুটি ঘণ্টা।

ওদিকে মীরা অভুক্ত থেকে অপেক্ষা করছিল। কে একজন দরজায় টোকা দিচ্ছে শুনে সে বিনু মনে করে শশব্যস্ত হয়ে স্নানের ঘর থেকে ছুটে আসার সময় পা পিছলে পড়ে জখম হয়। সে-লোকটি বিনু নয়। বিনু

ফিরে আসার আগেই তার ডাক্তারবন্ধু এসেছিলেন। তিনি বলেন, কেসটা সার্জিকাল, তাই সার্জেনকে খবর দেওয়া হয়েছে।

সার্জেন এসে বলেন, হাসপাতালে গিয়ে অপারেশন করাতে হবে। তা-ই হয়। যিনি অপারেশন করেন তিনি নির্দেশ দেন দু-বছর কলকাতায় বাস করতে হবে। তারপরে তাঁকে আবার দেখাতে হবে।

দু-বছর বাদে মীরাকে দেখে সার্জেন ছাড় দিলেন। কিন্তু তিন ছেলে-মেয়ে তখন সপরিবারে কলকাতায়। তারা ছাড় দিতে নারাজ। নাতি-নাতনির টান এড়ানো যায় না। মীরা ও বিনু কলকাতায় থেকে যায় আরও দু-বছরের জন্যে। তারপরে আরও দু-বছরের জন্যে। এমনি করে পঁচিশ বছর। ইতিমধ্যে ওরা দুজনেই জড়িয়ে পড়ে নানা প্রতিষ্ঠানের কাজে। একটি তো মীরারই সৃষ্টি। সে নিজে অনুবাদ করে, আর পাঁচজনকে অনুবাদ করতে শেখায়।

বিনুর ডাক পড়ে নানা প্রয়োজনে। কোনোটা সরকারের, কোনোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের। সিলেকশন কমিটি, প্রাইজ কমিটি ইত্যাদিতে তার যোগদান একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এহো বাহ্য। এসব কাজ তাকে না হলেও অচল হত না, কিন্তু ইতিহাস বোধহয় চেয়েছিল কলকাতায় বিনুর উপস্থিতি, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ তার মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হয়। ওপার থেকে কেউ এলে বিনুর সঙ্গে দেখা করেন। এপার থেকে কেউ গেলে বিনুর সঙ্গে দেখা করে যান। ওপারে প্রকাশিত বই এপারে আসতে দেওয়া হয় না, অতি কষ্টে আনাতে হয়। ওপারের সীমান্তরক্ষীরা আটক করে, অন্যেরাও কেড়ে নেয়।

মুক্তিযুদ্ধের বছর খানেক আগে ঢাকার এক বিশিষ্ট অধ্যাপক কলকাতায় এসে বিনুকে বলেন, 'আমরা আপাতত স্বাধিকার চাইছি বটে কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য স্বাধীনতা।'

বিনু তাঁকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে পাকিস্তানি সেনা ক্ষমা করবে না। তাহলে যুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। তিনি তাতে রাজি।

সত্যি সত্যিই যুদ্ধ বেঁধে যায়। তখন দলে দলে বুদ্ধিজীবী হিন্দু-মুসলমান পালিয়ে আসেন। এঁরা চান ভারত যেন ওপারে সৈন্য পাঠায়। বিনু বলে, আমরা অর্থ দিতে পারি, অস্ত্র দিতে পারি, কিন্তু সৈন্য নয়। তা যদি করি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, তার মিতাদের সঙ্গেও। আমরা কেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ব?

তার এক বন্ধুও ওপারে সৈন্য প্রেরণের পক্ষে। তিনি বলেন, ভারতীয় সৈন্য দশ দিনের মধ্যে পশ্চিমাদের হারিয়ে দিতে পারে। তা হলে বহু লক্ষ মানুষ শরণার্থী হয় না। বহু সহস্র মানুষ প্রাণে বেঁচে যায়। বিনু তাঁকে বোঝায় যে তারপরে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে হবে। সে-যুদ্ধ দশ দিনে জেতা যাবে না। আন্তর্জাতিক আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং ভারতের উচিত নয় সৈন্য প্রেরণ।

যেটা সে মুখফুটে বলে না, কলমের মুখেও আনে না, সেটা হল ওপারে কি শুধু মুক্তিযোদ্ধারাই আছেন? না, মোল্লারাও আছে। তারা পরে বলবে, দেখলে তো, ওপার থেকে হিন্দু সৈন্যেরা এসে এপারে মুসলমানদের মেরে চলে গেল। ব্যাপারটা সাম্প্রদায়িক রূপ নেবে। রাগ পড়বে ওপারের হিন্দুদের উপরে।

বিনুর যুদ্ধবিরোধী লেখা একটি পত্রিকায় বেরোয়, সম্পাদিকা তাঁর সঙ্গে একমত হন না। তাঁর মতে ওটা কুরুক্ষেত্রের মতো ধর্মযুদ্ধ।

বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক প্যারিসের একটি সংস্থার কাছ থেকে কিছু অর্থ এনে কলকাতার একটা বেসরকারি কমিটির হাতে দেন। কমিটি ওপারের শরণার্থী বুদ্ধিজীবীদের একটা তালিকা তৈরি করে। বিনুর বাসভবনে বৈঠক বসে। এর নাম পরের ধনে পোদ্দারি। সেই সূত্রে বিনু জানতে পায় ওপারের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকজন হিন্দু, তাঁদের স্ত্রী মুসলমান। আর কয়েকজন মুসলমান, তাঁদের স্ত্রীরা হিন্দু। সমাজ তা হলে একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। কলকাতার বহু হিন্দু পরিবারে ওপারের মুসলমান শরণার্থীরা আশ্রয় পান। হিন্দুদের মেসেও মুসলমানরা অতিথি হন। এটাও একপ্রকার বিপ্লব। বিনু যখন সদ্যমুক্ত বাংলাদেশে

যায়, ঢাকায় দেখে মুসলমানদের বাড়িতে হিন্দু অতিথি। বলা যেতে পারে বাঙালির বাড়িতে বাঙালি অতিথি, দুই পারেই।

ইন্দিরা গান্ধী সৈন্য পাঠানোর পূর্বে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়ে ভারতের অবস্থাটা বুঝিয়েছিলেন। পশ্চিমাদের অত্যাচারে ওপার থেকে এপারে প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে অনন্তকাল এদেশে থাকত, যদি-না ভারত সৈন্য পাঠিয়ে পশ্চিমাদের হটাত। কোথাও সাড়া না পেয়ে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যান ও মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেন। ভারতের বিপদে সোভিয়েট সাহায্য করবে। সোভিয়েটের বিপদে ভারত। বিনু ভয় পায়। তা হলে কি ভবিষ্যতে বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে ভারত সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাহায্য করবে!

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে চব্বিশ বছর ধরে যারা অবাধ মেলামেশার সুযোগ পায়নি তারা মুক্তিযুদ্ধের আট মাসের মধ্যে আপনজনের মতো অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে। এপার থেকে এক কালচারাল ডেলিগেশনের নেতা হয়ে বিনু বার বার তিন বার স্বাধীন বাংলাদেশে যায়। আদর-আপ্যায়নের মধুর আস্বাদন পায়। কিন্তু এটাও লক্ষ করে যে বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে নয়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। ইন্ডিয়া চায় না যে দুই পারের বাঙালিরা মেলামেশা করতে করতে আবার এক হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশও কি সেটা চায়? শেখ মুজিবুর রহমানের নিধনের পর কালচারাল ডেলিগেশনের আমন্ত্রণ আসে না। বিনু যত বার উদ্যোগী হয় ওপার থেকে সাহিত্যিকদের এপারে আহ্বান করতে, তত বার ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশ চায় না যে দুই পারের বাঙালিরা অবাধে মেলামেশা করতে করতে আবার এক হয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধের সেই বছরটি ও তার পরের তিন বছর ছিল একটি সুবর্ণ যুগ। তেমনটি চব্বিশ বছর পূর্বেও ছিল না, আঠারো-উনিশ বছর পরেও ফিরে আসেনি। বেসরকারি স্তরে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান চলেছে কিন্তু সরকারি স্তরে কালচারাল ডেলিগেশন এপার থেকেও যায় না, ওপার থেকেও আসে না।

বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের কথাই বিনু বেশি করে ভাবে। নকশাল আন্দোলন তাকে বিশেষ করে ভাবায়। কয়েক বছর তো প্রতিরাত্রেই নকশালদের সঙ্গে পুলিশের গুলিবিনিময় হয়। বিনু আর মীরা কান পেতে শোনে। একদিন তাদের এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে বন্দুক লুট করতে এসে মালিককেই গুলি করে বন্দুক নিয়ে চলে যায় কয়েকটি ছেলে। সকলের চোখের সামনে নকশালরা গ্রামে গিয়ে লোকের সেবা করত, বিনুর গান্ধীপন্থী বন্ধু তাদের প্রশংসা করতেন। কিন্তু সেই তারাই খুনজখম লুটপাট বাঁধিয়ে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় এসে হামলা বাঁধায়। বিনু বুঝতে পারে না এটা কোন অর্থে মার্কসিজম লেনিনিজম। এদের দ্বারা পুলিশবধের পরিণাম পুলিশের দ্বারা নকশালবধ। বুদ্ধিজীবীরা কাউকেই নিরস্ত্র করতে পারেন না। যার অস্ত্রে জোর বেশি সেই তো জিতবে। বিনু হিংসার বিরোধী, সামাজিক পরিবর্তনের নয়।

না, এভাবে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কীভাবে করা যায় তা নিয়ে বিনুকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়। রেভোলিউশন কথাটির বিপরীত কাউন্টার রেভোলিউশন। একটি হলে আরেকটি হবেই। সেটা এড়াতে হলে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করতে হয়। বিনুর মতে সেই শব্দটি রিনিউয়াল—পুনর্নবীকরণ। দেশকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে, সংস্কৃতিকে, সভ্যতাকে পুনর্নবীকরণের কথা বিনুর মাথায় ঘোরে। রাজনীতি, অর্থনীতিই সব নয়। ন্যায়নীতির দাবি উপেক্ষা করে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। সোভিয়েট ইউনিয়ন তো কালচারের দিক থেকে বন্ধ্যা। বলশয় ব্যালে ছাড়া আর কী আছে তার দেবার? তাও তো পুরোনো আমলের। তবে হ্যাঁ, বিজ্ঞানে অগ্রগামী হয়ে ওখানকার লোকে মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। কিন্তু একজন আমেরিকানও তো চন্দ্রে অবতরণ করতে পেরেছেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্যে বিশ্বময় দুই 'বিশ্বের' মধ্যে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলেছিল তা বিনুকে বীতশ্রদ্ধ করেছিল। সে আশা করেছিল তৃতীয় বিশ্ব এর বাইরে থাকবে। কিন্তু তৃতীয় 'বিশ্বের' দেশগুলিও তো অস্ত্র প্রতিযোগিতায় বাইরের নয়। এরা বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবে না, কিন্তু ছোটোমাপের যুদ্ধ বাঁধাবে, যদি-না ইউনাইটেড

নেশনস বাধা দেয়। এই নবজাত প্রতিষ্ঠানটির উপরে বিনুর কিছুটা ভরসা ছিল। পুরোপুরি নয়, কারণ সেখানেও দলাদলি।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে আদর্শবাদীর বড়ো অভাব। কার দিকে বিনু তাকাবে। যেদিকেই তাকায় হিংসার উপরে বিশ্বাস। ধনতন্ত্রীদেরও, সমাজতন্ত্রীদেরও, মধ্যপন্থীদেরও। যাঁরা গান্ধীজির শিষ্য ছিলেন তাঁরাও অহিংসার উপর আস্থা হারিয়েছেন। ভারত পরমাণু বোমা না বানালেও পারমাণবিক শক্তির সাধনায় নিযুক্ত। অবশ্য শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য। কিন্তু কেন্দ্রে পালাবদল হলে সেই শক্তিই যুদ্ধবিগ্রহের ব্যবহারে লাগবে কি না কে বলতে পারে? যার শেষটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তার আরম্ভটা তুমি করে যাচ্ছ, এটাও কি একপ্রকার দায়িত্বহীনতা নয়? গান্ধীপন্থীদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁরা এককভাবে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন।

পৃথিবী থেকে যুদ্ধের সম্ভাবনা যদি সম্পূর্ণ নির্মূল হত তা হলে যে যত ইচ্ছা পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন করলে শঙ্কার কারণ থাকত না। কিন্তু যেখানে যুদ্ধের জন্যে প্রত্যেকটি দেশ প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে কয়েকটি দেশ পারমাণবিক শক্তি শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করলেও যুদ্ধকালে ব্যবহারের শঙ্কা থেকে যাবে, আর সকলে করলে তো মহাবিপদের বিভীষিকা মানুষের মন থেকে শান্তি কেড়ে নেবে। বিনুর মতে শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন যদি সব দেশের পলিসি হয় তবে কোথাও তার অপব্যবহার হবেই। মানবচরিত্র এত উচ্চস্তরে উপনীত হয়নি যে কোথাও কেউ তার অপব্যবহার করবে না। গণতান্ত্রিক দেশ হলেই সাধু হয় না। সমাজতান্ত্রিক দেশ হলেও না। ফ্যাসিস্ট হলে তো কথাই নেই।

তা ছাড়া ইদানীং মৌলবাদী বলে আরও এক বিপদ দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে যারা মৌলবাদী ছিল না পরে কিন্তু তাদের মধ্যে মৌলবাদ জাগছে। ভারতও এর থেকে মুক্ত নয়। কোনো ক্ষেত্রে নবীকরণই মৌলবাদীরা সহ্য করবে না অস্ত্রশস্ত্র বাদে। এদের হাতে যদি পারমাণবিক অস্ত্র পড়ে তবে সমূহ সর্বনাশ। এখনও পড়েনি বলে কখনো পড়বে না এমন কী নিশ্চয়তা আছে? সর্বত্র এটা একটা নতুন আতঙ্ক। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি সব রকমের মৌলবাদী সক্রিয়।

যে কোনো ধর্মের মৌলবাদীদের মতে ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করবে জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগ—দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, নাট্য, সংগীত, অর্থনীতি, রাজনীতি, ন্যায়নীতি, দন্ডবিধি। এক হাজার বছর আগে এটাই ছিল প্রায় সব দেশের নিয়ম। কিন্তু কালক্রমে ধর্মের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছে রাষ্ট্র আর রাষ্ট্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে পার্লামেন্ট বা কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট পার্টি। সেদিনকাল আর নেই যখন ধর্মগুরুদের নির্দেশে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, ব্যাঙ্কার প্রভৃতি ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষানিরীক্ষা, শিক্ষা, শাসন, বিচার, সওদাগরি, মহাজনি ইত্যাদি করবেন। মৌলবাদ হচ্ছে অতীতে প্রত্যাবর্তনের মতবাদ। মানুষের অতীতই হবে তার ভবিষ্যৎ।

অতীতের পূর্বেও অতীত ছিল। সুদূর অতীতে গুণকর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ হতে পারা যেত। পরে তারাই কেবল ব্রাহ্মণ হয় যাদের জন্ম ব্রাহ্মণকুলে। ব্রাহ্মণত্বের দুয়ারটা বন্ধ রয়ে গেলে আরেকটা দুয়ার খুলে যায়। সেটা সন্ন্যাসের দুয়ার। যে কোনো বর্ণের পুরুষ সন্ন্যাসী হতে পারে, যদি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ও গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। মধ্যযুগে সন্ন্যাসীদের সম্মান ব্রাহ্মণদের চেয়ে কম ছিল না—হয়তো বেশি। কারণ তাঁরা নাকি হিমালয় থেকে দুষ্প্রাপ্য ঔষধ নিয়ে আসতেন ও মরণাপন্নকে বাঁচিয়ে দিতে পারতেন। তা ছাড়া অনেকরকম অলৌকিক ঘটনাও নাকি তাঁরা ঘটাতেন। বৌদ্ধ, জৈন ও রোমান ক্যাথলিক সংঘ সন্ন্যাসীদের যে পার্থিব ক্ষমতা দেয় তা অভূতপূর্ব। রোমান ক্যাথলিক চার্চের তো আলাদা আদালত ছিল। সে-আদালত প্রাণদন্ডও দিতে পারত।

ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করত ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়কে নৈতিক সমর্থন জোগাত ব্রাহ্মণ। যেখানে সন্ন্যাসী ছিল সেখানে মঠবাড়ির পৃষ্ঠপোষক ছিল ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, তাকে নৈতিক সমর্থন জোগাত সন্ন্যাসী। শূদ্রের স্থান ছিল এঁদের সেবকের। নারীর স্থান ছিল পুরুষের সেবিকার। এটাই ছিল মোটামুটিভাবে বিভিন্ন নামে পৃথিবীর

বিভিন্ন সমাজের প্যাটার্ন। এককথায় বলা যেতে পারে ওল্ড অর্ডার বা পুরাতন শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলের সঙ্গে যার সম্পর্ক।

পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সময় থেকে শৃঙ্খলাভঙ্গ তথা শৃঙ্খলভঙ্গ শুরু। কিন্তু মানুষ তো বিশৃঙ্খলা সইতে পারে না। তাই একটা নতুন শৃঙ্খলা বা নিউ অর্ডারের কথাও ভাবা হচ্ছে গত দুই শতাব্দী ধরে। আগে এতরকম মতবাদের নাম কখনো শোনা যায়নি। কনজার্ভেটিজম, লিবারালিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম, কমিউনিজম, ন্যাশনাল সোশিয়ালিজম, রেভোলিউশনারি সোশ্যালিজম, রেভোলিউশনারি কমিউনিজম, ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিজম, সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাসি, সিন্ডিকালিজম, পপুলিজম, হিউম্যানিজম, ফেমিনিজম, এমনকী অ্যানার্কিজম ও নিহিলিজম। কোনো কোনোটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রণেতার নাম। মার্কসিজম, লেনিনিজম, স্টালিনিজম, মাওইজম, গান্ধীইজম।

এর প্রত্যেকটির ভিতরে কিছু-না-কিছু সত্য আছে, এমনকী ফ্যাসিজমের ভিতরেও। ভোটের উপর ছেড়ে দিলেই তো প্রতিপন্ন হয় কোনটা অধিকাংশের পছন্দ। ফ্যাসিস্টরা ভোটারদের সে অধিকার দেয় না, কমিউনিস্টরাও না। ভোটারদের কিনে নেওয়া তো বহু দেশের গণতন্ত্রের রীতি। যাদের টাকা নেই তারা সাম্প্রদায়িক নেশা ধরায়। ধনতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সমাহার নানা দেশেই লক্ষিত হয়। সংবাদমাধ্যমগুলো ধনিকদের হাতে। ইংল্যাণ্ডের লেবার পার্টির পত্রিকা শ্রমিকরাই কেনে না। তার চেয়ে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক একই মূল্যের ধনিকদের পত্রিকা। ওরা প্রচুর বিজ্ঞাপন পায় বলে প্রচুর খরচ করতে পারে। চটকদার বিষয় ছাপে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার চালায়।

ভারতের পক্ষে কেমনতরো সমাজব্যবস্থা যুগোচিত অথচ নীতিসম্মত এই নিয়ে বিনু নিরন্তর চিন্তিত ও ধ্যানস্থ। নেতি নেতি করে একটার পর একটা মতবাদ খারিজ করে। মৌলবাদ তো যুগোচিতও নয়, সামাজিক ন্যায়সম্মতও নয়। তাতে না আছে ব্যক্তিস্বাধীনতা, না স্ত্রী-স্বাধীনতা, না চিন্তার ও বাক্যের স্বাধীনতা। অথচ এসব যেখানে আছে সেখানে রয়েছে প্রদীপের নীচে অন্ধকার। মহানগরে দীনদরিদ্র গৃহহীন বা বস্তিবাসী লক্ষ লক্ষ মানুষ। যাদের নাম কেউ মুখে আনতে চায় না সেইসব দেহপসারিনি। দেহ কেনাবেচার বিরাট ব্যাবসা। হোয়াইট স্লেভ ট্রাফিক। আনন্দের কথা, ব্ল্যাক স্লেভ ট্রাফিক আর নেই। বহু সহস্র বর্ষ পরে।

যে-গাছের যে-ফল। আম গাছে জাম ফলে না। তেমনি ভারতের ইতিহাসে অবিকল ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা বা রাশিয়ার মতো সমাজব্যবস্থা বিবর্তিত হয় না। তাকে প্রবর্তন করতে হয়। তারজন্য চাই গণসমর্থন, গণপরিশ্রম, গণ-ত্যাগেচ্ছা। বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা। বিনা ত্যাগসে না মিলে নয়া সমাজ। আইন করে, জোরজুলুম করে যা হয় তাতে অসন্তোষ চাপা পড়ে যায়, পরে ফেটে পড়ে। অথচ আমরা সকলেই অল্প সময়ের মধ্যে চারাগাছ থেকে বনস্পতি পেতে চাই। আমাদের বিবর্তন যে বিলম্বিত হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু বিপ্লব এর প্রতিকার নয়। তাও যদি সে-বিপ্লব অহিংস বিপ্লব হত, কিন্তু হিংসার সম্মোহন থেকে সে মুক্ত নয়। বিপ্লব যদি কোনোদিন হয় তবে গৃহযুদ্ধের আকার নেবে। বুর্জোয়ারা বিনা রক্তপাতে মঞ্চ থেকে বিদায় নেবে না।

তাহলে কি বিনু চায়, রেভোলিউশন বাই কনসেন্ট না একাদিক্রমে রিফর্মস? বিনু ভেবে পায় না। দু-পক্ষেই বলবার আছে। দেশের লোককেই এর উত্তর দিতে হবে। তাদেরকেই তো পোহাতেই হবে রেভোলিউশন বা রিফর্মসের ঝক্কি।

একদিন বিশিষ্ট গান্ধীপন্থী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বিনুকে বলেন, আপনি রুশো ভলতেয়ারের মতো লিখে যান। যাতে ফরাসি বিপ্লবের মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বোঝা গেল গান্ধীপন্থীরাও স্বাধীনতার পরবর্তী লক্ষ্য নিয়ে দিগভ্রান্ত। একদিন জয়প্রকাশ নারায়ণও তাকে ডেকে পাঠান। ইন্দিরা গান্ধী দেশের লোকের সিভিল লিবার্টি হরণ করেছেন। সিভিল লিবার্টি উদ্ধার করতে হবে। পরে দেখা গেল তিনি ইন্দিরা গান্ধীকেই গদি থেকে হটাতে চান—ভোটের জোরে নয়, বিদ্রোহ করে। সৈনিকদেরও ডাক দেন। এর নাম সিভিল লিবার্টি উদ্ধার নয়, শাসক পরিবর্তন।

ইমারজেন্সি জারি করে ইন্দিরাজি বিনুর মতো লেখকদের স্বাধীনতা খর্ব করলেন। প্রত্যেকটি লেখাই সেনসরের কাছে পেশ করে প্রকাশের অনুমতি নিতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের সপরিবারে নিধন বিনুকে স্তম্ভিত ও শোকার্ত করে। তাঁকে সে চিনত। কিন্তু তার লেখা শোকনিবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পত্রিকায় প্রকাশ করতে দেন না। বলেন, 'আপনার লেখা বেরোলে ওপার থেকে এক কোটি লোক শরণার্থী হয়ে আসবে। আমরা মারা যাব।' ওটি তিনি ইন্দিরাজিকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রী সেটি ইংরেজিতে তর্জমা করিয়ে পড়েন। বিনুকে লেখেন, 'আপনি যা লিখেছেন তা ঠিক, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার কথাও চিন্তা করতে হবে। আপনার এ লেখা প্রকাশিত হলে সরকার বিব্রত হবেন।' লেখাটা পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল না। কড়া সেনসরশিপ জারি হয়েছিল। বিনু একটি সভায় এর প্রতিবাদ করে। তার বক্তৃতা কেউ প্রকাশ করে না।

মাস কয়েক পরে একদিন বিনুর ফ্ল্যাটে দুজন পুলিশকর্মীর প্রবেশ। তাঁদের হাতে একখানি নিষিদ্ধ পত্রিকা। পত্রিকাটি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পরিবারের। তাতে ছিল বিনুর সেই বক্তৃতার অনুলিখন। বিনু তো তাজ্জব! গোয়েন্দারা জানতে চান ওসব কথা বিনু কি বলেছে? বিনু বলে, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভুলচুক আছে।' সে কলম নিয়ে শুধরে দেয়। তাঁরা ফিরে যান।

এরপর বিনু একটি কমিটি গঠনে অগ্রণী হয়। তাতে ছিলেন দুজন প্রাক্তন হাই কোর্ট চিফ জাস্টিস, দুজন অ্যাডভোকেট, দুজন প্রাক্তন জেলা ও দায়রা জজ। কমিটির তরফ থেকে সে ইন্দিরাজিকে একটি প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়ে লেখে ইমারজেন্সি তুলে নিয়ে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে। তিনি জবাব দেন না। তিনি যদি কমিটির পরামর্শ অনুসারে কাজ করতেন তা হলে সেই বছর নির্বাচনে জয়ী হয়ে আরও পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকতেন।

এক বছর দেরি করার ফলে তিনি হেরে গেলেন সদলবলে। যাঁরা জিতলেন তাঁরা সকলেই ইন্দিরাবিরোধী, সেইসঙ্গে পরস্পরবিরোধী। মোরারজি দেশাই যোগ্য ব্যক্তি, বোধহয় যোগ্যতর ব্যক্তি। কিন্তু সরকার তো ব্যক্তিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে নিয়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই সরকার চৌচির। মোরারজির পরে চরণ সিংহ, তারপর আবার সেই ইন্দিরা গান্ধী। এবার তাঁর শিক্ষা হয়েছিল। ইমারজেন্সি আর নয়। কিন্তু শিখদের স্বর্ণমন্দির বিদ্রোহের ঘাঁটি হলেও সেখানে সৈন্য প্রেরণ ভুল হয়েছিল। বিনুও এর পূর্বে সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকারে বলেছিল, পাঞ্জাবের কোনো সামরিক সমাধান নেই, রাজনৈতিক সমাধান চাই।

ভিন্দ্রানওয়ালের নিধনে বিনু 'শক' পায়। মনে মনে বলে, এরজন্যে আরও দাম দিতে হবে। সেই দাম যে ইন্দিরাজির নিজের নিধন তা বিনুর কল্পনায় ছিল না। সে আবার 'শক' পায়।

ইন্দিরা নিধনে উত্তেজিত হিন্দুরা দিল্লিতে ও অন্যত্র শিখ সম্প্রদায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমাত্র দিল্লিতেই হাজার তিনেক শিখ বালবৃদ্ধবনিতা নিহত হয়। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা শিখ, অতএব ইন্দিরাহত্যার জন্যে দায়ী। এর নাম জাতিবৈর। যেন হিন্দু শিখ একজাতি নয়, দুই জাতি।

বিনুর ছেলেবেলায় তার জন্মস্থানে এক ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, তাঁর নাম পৃথ্বীচাঁদ, তিনি হিন্দু। তাঁর পুত্র বলদেও সিং কিন্তু শিখ। তার মাথায় পাগড়ির নীচে ঝুঁটি। হাতে লোহার বালা, শিখরা যাকে বলে কঙ্কণ অথবা কড়া। দাড়ি গজানোর বয়স হয়নি। তার বাবার দাড়ি ছিল না। বলদেও ছিল স্কুলের সহপাঠী ও খেলার সাথি। খলিস্তান হলে বলদেও সিং হবে তার সিটিজেন আর পৃথ্বীচাঁদ হবেন এলিয়েন, যদি বেঁচে থাকেন। এরকম পরিবার শত শত। ওরা দুই জাতি নয় কিন্তু দুই সম্প্রদায়। শিখরা বেদ, ব্রাহ্মণ, দেবদেবী, অবতার, সাকার পূজা মানে না।

এ সমস্যার সামরিক সমাধান নেই, ইন্দিরাজির পলিসি পরিত্যক্ত। যা করবার তা পুলিশই করছে। আইন ও শৃঙ্খলারক্ষা। সেটা রাজনৈতিক সমাধান নয়। রাজীব গান্ধী সন্ত লঙ্গোয়ালের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। সে-চুক্তি কার্যকর হয়নি। কার্যকর হলেও শিখ জঙ্গিরা চন্ডীগড় নিয়ে সন্তুষ্ট হত না। তারা চায় স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম ধর্মভিত্তিক শিখ রাষ্ট্র। ভাষাভিত্তিক পাঞ্জাবি রাষ্ট্র নয়। আর একটি পাকিস্তান, আর একটি বাংলাদেশ নয়। হিন্দুরা কেউ এতে রাজি হবে না, শিখদের মধ্যে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ তাঁরাও নারাজ। শিখ সম্প্রদায়েরও বেশ

কয়েকটি শাখা আছে। যেমন নির্মলি, নিরঙ্করি। গুরু গোবিন্দ সিংহের পূর্বে শিখদের সিংহ পদবি ছিল না। তাঁরা কৃপাণ ধারণ করতেন না। তেমন শিখও বিনু দেখেছে। বাবা পুরুষোত্তমলাল বেদি গুরু নানকের বংশধর। একবার তাঁর পত্নী ফ্রিডা ও পুত্র কবিরকে নিয়ে তিনি দার্জিলিং-এর ঘুম পাহাড়ে বিনু ও মীরার সঙ্গে এক বাড়িতে ছিলেন। তিনিও শিখ কিন্তু তাঁর না ছিল পাগড়ি, না ছিল ঝুঁটি, না দাড়ি, না কড়া।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে যে কমিশন গঠিত হয়েছিল তার চেয়ারম্যান জাস্টিস সরকারিয়া শিখ—পাগড়ি ইত্যাদিসমেত। কলকাতায় এসে তিনি ও তাঁর সহযোগীরা যাঁদের সাক্ষ্য নেন তাঁদের প্রথম জনই ছিল বিনু। রাজ্যগুলিকে আরও অটোনমি দিতে হবে বিনুর এই অভিমতে তিনি সায় দেন না। বলেন, কেন্দ্র দুর্বল হবে সেটা উচিত নয়। শক্তিশালী কেন্দ্র না হলে দেশ ভেঙে পড়বে। পাঞ্জাবে তা হলে রাজনৈতিক সমাধানের কতটুকু সম্ভাবনা?

কেন্দ্রকে দুর্বল করা চলবে না বিনুও এটা মেনে নেয়। কেন্দ্রকে দুর্বল না করে রাজ্যগুলিকে কী কী ছেড়ে দিতে পারা যায় তা বাছাই করতে হবে। নইলে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ডের মতো দিল্লি থেকে সুদূর রাজ্যগুলির জনসাধারণ অবহেলিত বোধ করবে; ফলে বিদ্রোহী হবে।

রিনিউয়ালের বা পুনর্নবীকরণের থিম নিয়ে একটি বৃহৎ উপন্যাস লেখার ভাবনা বিনুকে স্বস্তি দেয় না। লিখতে আরম্ভ করে সে দেখে বিষয়টা অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পরম্পরাক্রমে বিবর্তিত হওয়া চাই। নইলে সেটা হবে একপ্রকার ইউটোপিয়া।

তাকে শুরু করতে হল ব্রিটিশ আমলের পটভূমিকায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতীয় মুক্তিসংগ্রাম, হিংসা-অহিংসা, হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষ, দেশভাগ, প্রদেশভাগ, স্বাধীনতার অমৃত, লোকবিভাজনের গরল, বিষপান করে নীলকণ্ঠ গান্ধীর নিপাত, ব্রিটেনের অন্তঃপরিবর্তন, রাজন্যদের ক্ষমতালোপ, নতুন ভারতের অভ্যুদয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধে সহযোগিতা করলে তার বিনিময়ে স্বরাজ লাভ হবে। কিন্তু তা তো হল না। বিশ বছর পরে সংগ্রামের পর তাঁদের ধারণা উলটে গেল। যুদ্ধে সহযোগিতার বিনিময়ে স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার বিনিময়ে যুদ্ধে সহযোগিতা। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু কোনো কিছুর বিনিময়ে যুদ্ধে সহযোগিতা করবেন না। তিনি অহিংসার সাধক। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থে যুদ্ধে সহযোগিতা না করার স্বাধীনতা। কংগ্রেস যদি তাঁর সঙ্গে না চলে তবে তিনি একলা চলবেন। সময় যখন আসবে তখন যুদ্ধে জড়ানোর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করবেন।

ভারতের ইতিহাসে—শুধু ভারতের ইতিহাসে কেন বিশ্বের ইতিহাসে অমন একটি দশক দেখা যায়নি। চূড়ান্ত হিংসার সাধনা করছেন হিটলার। তাঁর উপরে টেক্কা দেবার জন্যে আইনস্টাইনের পরামর্শে পারমাণবিক বোমা বানাচ্ছে আমেরিকা। তা দিয়ে ইহুদি রক্ষা করার অভিপ্রায়। কিন্তু সেটা জার্মানিতে পড়ে না। পড়ে হিরোশিমায় জাপানিদের ওপর। তার আগেই ষাট লাখ ইহুদি জার্মানদের গ্যাস চেম্বারে পুড়ে মারা গেল। এমন যে যুদ্ধ এতে সহযোগিতা গান্ধী নেতৃত্বে হত না। কংগ্রেস যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ, কারাবরণ, কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন ইত্যাদি চালিয়ে গেল এটা ইতিহাসে অপূর্ব। তবে জনগণের দ্বারা অহিংসার মান রাখা হয়নি। গান্ধীজি অনশনের দ্বারা এর জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করেন।

‘দেশকে স্বাধীন যে-কেউ করতে পারে, আমি চাই জনগণকে জাগাতে।’ বলেছিলেন গান্ধীজি। বিয়াল্লিশ সালের মতো গণজাগরণ ভারতের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাতে মুসলমানদের অংশ যৎসামান্য। ব্যতিক্রম একমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খানের ব্যক্তিগত প্রভাবে মুসলমানদের যোগদান। ব্যক্তি হিসাবে মুসলমানরা কংগ্রেস পরিচালিত প্রত্যেকটি আন্দোলনেই ছিলেন। যেমন মওলানা আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ কেবল অসহযোগ আন্দোলনের সময়েই দেখা গিয়েছিল, সেটাও খেলাফতের ইসুতে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারতীয় মুসলমানদের বোঝানো হয়েছিল যে ইংরেজ গেলে কংগ্রেস রাজা হবে, তখন মুসলমান হবে হিন্দুর প্রজা। আরও একবার গণ-আন্দোলন করলে সেটাতে কি মুসলমানরা

সমষ্টিগতভাবে অংশগ্রহণ করত? আর সেটা কি সম্পূর্ণ অহিংস হত? কংগ্রেস নেতারা তা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের সামনে দুটি মাত্র বিকল্প ছিল। মুসলিম লিগকে সঙ্গে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন; মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে একক সরকার গঠন। দ্বিতীয়টি করতে গেলে মুসলিম লিগকে দেশের একভাগ দিতে হবে। সেইসূত্রে বঙ্গের একভাগ, পাঞ্জাবের একভাগ।

প্রথম বিকল্পটিকে ট্রায়াল দেওয়া হয়েছিল। সেটি ব্যর্থ হয়। সুতরাং দ্বিতীয়টি ছাড়া আর কোনো কার্যকর পন্থা ছিল না। বিনুকে স্বীকার করতেই হল যে পার্টিশনই গৃহযুদ্ধের থেকে ভালো, নইলে ইংরেজকেই বরাবরের জন্যে থেকে যেতে হয়। ইংরেজরা নিজেরাই থাকতে চায় না। জুন ১৯৪৮ পর্যন্ত ছিল তাদের রাজত্বের মেয়াদ। তার আগেই অনেকে ছুটি নিয়েছিলেন বা ইস্তফা দিয়েছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যে নেহরু ও প্যাটেল যতখানি ব্যগ্র, মাউন্টব্যাটেন তার চেয়েও বেশি। কে জানে গান্ধীবুড়ো হয়তো সব ভেস্তে দেবেন। গান্ধীজিই যে স্বাধীনতা দিবসে বিষণ্ণতম পুরুষ তা নয়, জিন্নাও ছিলেন তাঁর দোসর। ওরকম পাকিস্তান তিনি চাননি। পাকিস্তানই তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস লিগ দ্বৈরাজ্য। এক রাজ্যে দুই রাজা।

আশ্চর্যের ব্যাপার, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেখা গেল সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষ একজন ইংরেজ—লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ চক্ষের নিমেষে মিটে যায়। ভেলকি না ভোজবাজি! ইংরেজের গায়ে কেউ হাত দেয় না। হাত দেয় মুসলমানদের গায়ে, হিন্দুর গায়ে, শিখের গায়ে। পরস্পরকে মেরে তাড়ানোর ধুম পড়ে যায়। তখন সেই গান্ধীই ভরসা। তিনি যা একাই তাঁর নৈতিক শক্তিতে করেন তা একপ্রকার অসাধ্যসাধন। অহিংসা কত উচ্চে উঠতে পারে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেল পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পরে। তাঁর তিরোধানও অহিংসার উচ্চতম আদর্শ। বিনুর তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাসের এইখানেই সমাপ্তি।

এ গ্রন্থ লিখতে পারাটাও তার জীবনে এক পরম লাভ। সে-অভিজ্ঞতা তাকে সিদ্ধি না দিক শুদ্ধি দেয়। তত দিনে তার বয়স হয়েছে বিরাশি। এত দিন তো বাঁচবার কথা নয়। চার খন্ডের এক এক খন্ড লেখে আর ভাবে এই বোধহয় শেষ। না, চার খন্ডের বেশি লিখতে পারা যেত না। প্রথম যৌবনে দুই বছরের ঘটনা নিয়ে বারো বছরে ছয় খন্ডের উপন্যাস লিখেছিল। দ্বিতীয় যৌবনে তিন বছরের ঘটনা নিয়ে তিন খন্ড লিখতেই তার পনেরো বছর লেগে যায়। পঁচাত্তরের ঊর্ধ্বে সে কোনো অর্থেই যুবক নয়। ওই চার খন্ডই তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু সাড়ে আট বছরের ঘটনাকে চার খন্ডের ফ্রেমে আঁটা হচ্ছে সংক্ষেপে সারা। বিনুকে সময়ের বিরুদ্ধে দৌড় দিতে হচ্ছিল। যাকে বলে রেসিং এগেনস্ট টাইম। তাই প্রাকৃতিক বর্ণনা একদম বাদ।

এরপরে সে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন। দম যা ছিল ফুরিয়ে গেছে। উপন্যাস লেখা হচ্ছে দমের কাজ। একখানা ছোটো উপন্যাস লেখার স্বপ্ন এখনও রয়েছে, কিন্তু তার জন্যে দম নেই। আপাতত প্রবন্ধ বা নিবন্ধ, ছড়া বা কবিতা লিখেই সে ক্ষান্ত। তাতে তেমন বেদনা নেই, তেমনি আনন্দও নেই। তার প্রত্যেকটা বড়ো উপন্যাসের অন্তরে নিহিত আছে যেমন বড়ো বেদনা তেমনি বড়ো আনন্দ। সৃষ্টি মাত্রেরই বেলা একথা খাটে। বিনু একজন স্রষ্টা হতে চেয়েছে।

মীরা ও বিনু কলকাতায় বাস করলেও শান্তিনিকেতনেই তাদের হোম। তারাও আশ্রমিক সমাজের অঙ্গ। কলকাতায় থাকলেও মীরা মাসে মাসে শান্তিনিকেতনে যায়, নিজের বাড়িতে কিছুদিন কাটায়। বাগান দেখাশোনা করে। ফিরে আসে তরিতরকারি ফলমূল নিয়ে। বিনু মাঝে মাঝে যায়। না যাওয়ার একটা কারণ সে টাইপরাইটারে লেখে। পুরোনো মডেলের রেমিংটন। বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। টাইপরাইটারে লেখালেখি ছাড়া বাঁচতে পারে না। এটা ষাট বছরের অভ্যাস।

বিনু যখনই শান্তিনিকেতনে যায়, মূল আশ্রম চত্বরে ঘুরে বেড়ায়। তাতে সে একপ্রকার আধ্যাত্মিক সুরভি পায়। সেখানে তিন মহাপুরুষ সাধনা করেছেন—দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীজিও তো সেখানে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। সেই সূত্রে স্থানটির একটি মাহাত্ম্য আছে। আদি শান্তিনিকেতন ভবনে উৎকীর্ণ রয়েছে 'আনন্দরূপম অমৃতং যদ বিভাতি'। উপনিষদের মর্মবাণী। বিনুকে মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন

ভারতের ব্রহ্মবাদীদের উপলব্ধি। তাঁদের সঙ্গে তার আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি, যদিও সে আধুনিক যুগের সন্তান।

কলকাতায় তেমন কোনো আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থল নেই। তবে বিনুদের কাছে এটা সংস্কৃতির পীঠস্থান—বাংলার, ভারতের, বিশ্বের। এখানে গ্রিক চার্চ আর্মেনিয়ান চার্চও আছে। আছে ইহুদিদের সিনাগগ। নিচিরেন সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ বিহার। জৈনমন্দির তো আছেই, আছে মুসলমানদের নাখোদা মসজিদ, ভারতীয় জাদুঘর, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি মহামূল্য সংগ্রহশালা।

বিনু কলকাতা ছাড়তে পারে না, কারণ কলকাতা তাকে ছাড়তে চায় না। কমলী নেহি ছোড়তি। কিন্তু সে বহুদিন ধরে ভেবে এসেছে যে আবার মীরাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাবে ও বাকি জীবনটা কাটাবে। সম্ভব হলে আরও ভিতরে যাবে। মীরার কঠিন অসুখ, চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিলে যদি কিছুটা আরাম পায়। যে-সময় রেলযাত্রার কথা সে-সময় সে শয্যা নেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই তার মহাযাত্রা।

ওরা বাষট্টি বছর একসঙ্গে ছিল। পরম সৌভাগ্য। বিরহ বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি। এখন তো আজীবন বিচ্ছেদ। চিরবিচ্ছেদ মন মানতে চায় না। মনকে মানা না মানার স্বাধীনতা দেওয়া ভালো। কেই-বা নিশ্চিত জেনেছে যে এই শেষ, এরপরে শূন্য। বিনুর দৃঢ়বিশ্বাস পূর্ণ থেকে পূর্ণ আসে, পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিয়োগ করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। তাহলে তো পুনর্মিলনেরও সম্ভাবনা থাকে। কে জানে কোথায় ও কবে! ওসব প্রশ্ন তুলে রেখে যে কাজ করতে আসা সে-কাজ সারা করে যাওয়াই কর্তব্য। মীরা এ জগতে ছিল বিরাশি বছর। বিনুর চেয়ে ছয় বছরের ছোটো। হঠাৎ ক্যান্সার না হলে সে আরও দীর্ঘকাল বাঁচত। শক্তির সীমা ছিল না তার। কত কাজ করে গেছে ভেবে অবাক হতে হয়। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিনুর জীবনদর্শন

প্রতিযোগিতায় সাফল্যের শীর্ষে উঠে বিনুর তো আনন্দে আত্মহারা হওয়ার কথা, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল যে সে সংকটে পড়েছে। হ্যামলেটের মতো সে দোদুল্যমান, আইসিএস হবে কি হবে না? যদি হয় কেন হবে, কার জন্যে হবে? সুশীলা তো আপাতত স্বামী পুত্র নিয়ে ঘরসংসার করতে ব্যস্ত। মুক্তির জন্যে তার তাড়া নেই। বিনুর এখন মনে হচ্ছে সুশীলা মুক্তি বলতে যা বুঝত তা বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি নয়, অন্দরমহল থেকে মুক্তি। সেটার জন্যে বিনুর মতো একজনের সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে শাসনকর্ম করার দরকার কী? তবে, হ্যাঁ, সেইসূত্রে বিলেত যাওয়ার সাধ মিটিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন বিনুর নিজের দিক থেকে ছিল।

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির ক্ষমতার এক-একটি কণা এক-একজন কবিকে বা শিল্পীকে দেন। বিনুও তেমনি একজন। সে যদি তার সৃষ্টিক্ষমতার সদব্যবহার করে তবেই তার জীবন সার্থক হবে। সেটাই তার স্বধর্ম, তার জীবনের কাজ। অথচ জীবিকার জন্যেও কোনো একটা বৃত্তি বেছে নিতে হয়। সতেরো বছর বয়সে বিনুর মতে সেটা ছিল সাংবাদিক বৃত্তি। সত্যিই সে তার সেইটুকু বিদ্যা নিয়ে ইংরেজি বাংলা সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখতে পারত না। গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এক প্রুফ-রিডার তার পরম উপকার করেছিলেন। কলেজে না গেলে সে ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের এত বই আর কোথাও পেত না। তা ছাড়া লজিক, ইকনমিকস ইত্যাদি বিষয়ে লেকচার শোনা ও পরীক্ষা দেওয়ারও আবশ্যকতা ছিল। কলেজের আরও বড়ো লাভ সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গ। সবুজগোষ্ঠী গঠন। তা ছাড়া প্রখ্যাত অধ্যাপকের সান্নিধ্য। কলেজে গিয়ে বিনু বার বার প্রথম হয় ও জলপানি পায়। তার থেকে আসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। সমান্তরালভাবে চলছিল গান্ধীজির সম্পাদিত *ইয়ং ইন্ডিয়া* পড়া ও তাঁর চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে যোগ রাখা। বিনু খদ্দর পরত; কেবল কলেজে নয়, বিলেতে তথা চাকরিজীবনে। সংগ্রামে ঝাঁপ দেয়নি তবে বার বার ভেবেছে তার যোগ দেওয়া উচিত। আসলে সেদিক থেকে সে রবীন্দ্রপন্থী।

তা বলে একেবারে ব্রিটিশ শিবিরে যোগদান? দেশের লোক তো ভাববেই সে দেশদ্রোহী। কখনো যে কোনো সত্যাগ্রহীকে জেলে দিতে হবে না তা কি সম্ভব? বিনু কী করে তার গান্ধীপন্থী বন্ধুদের কাছে মুখ

দেখাবে? এই তার আদর্শবাদ! শেষপর্যন্ত বিনু তার বন্ধুদের সম্মতি পায়। এই স্থির হয় যে সে চাকরিতে বেশি দিন থাকবে না। অথচ সংগ্রামেও লিপ্ত হবে না। সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক হবে।

আর কোনো পরীক্ষার জন্যে বিনু এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করেনি। তার সেই তপস্যার মূলে ছিল এক নারীর প্রেরণা, এক নাইটের বলপরীক্ষার মূলে যেমন এক লেডি। এর থেকে তার এই প্রত্যয় জন্মায় যে নারীই পুরুষের শক্তি। যেমন কৃষ্ণের শক্তি রাধা। বৈষ্ণব পরিবারে তার কৈশোর কেটেছে। সে শুনেছে, ‘সুখ বলে, আমার *কৃষ্ণ* গিরি ধরেছিল। সারী বলে, আমার *রাধা* শক্তি সঞ্চারিল। নইলে পারবে কেন?’

বিনু মনে মনে স্বীকার করে সুশীলা শক্তি সঞ্চার না করলে সেও আইসিএস নামক বলপরীক্ষায় প্রথম হতে পারত না। যতদিন-না সে আইসিএস ত্যাগ করছে ততদিন এ নিয়ে তার মনে একটা অধর্মবোধ থাকবে। তা বলে সে সুশীলার প্রতীক্ষা করবে না। তার কামনা এক নূতনা রাধা। তার নতুন শক্তি।

দু-বছর বাদে বিনু বিলেতে তার শিক্ষানবিশি সাঙ্গ করে ভারতে ফিরে এল। বাংলা ভাষার লেখক হিসাবে তার প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশে নিযুক্তি। সেটা সে চাইতেই পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে সে এক ভ্রমণকাহিনি লিখে বাংলাদেশের পাঠকমহলে সুপরিচিত হয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরি তার পাঠক। তার প্রথম কর্মস্থল বহরমপুর। সেখানে গিয়ে সে বিভিন্ন বিভাগে হাতে-কলমে তালিম পায়। কিন্তু তার হাতের কলম তো একটা নয় দুটো। একটা রাজকর্মের আর একটা সাহিত্যসৃষ্টির। কলমের সঙ্গে কলমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

কিছুদিন পরে মহাত্মা গান্ধী তাঁর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। বিনুও জেলে যায় কিন্তু কয়েদি হিসাবে নয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাগরেদ হিসাবে। তার সহানুভূতি রাজনৈতিক বন্দিদের প্রতি। একদিন হল কিনা তার নামে এক চিঠি এসে হাজির। এসেছে দক্ষিণ ভারতের ভেলোর জেল থেকে। লিখেছেন কে না সুশীলা দেবী।

আন্দোলনে যোগ দিয়ে অসংখ্য অন্তঃপুরিকা রাজবন্দিনি হন। তাঁদের সেই বন্দিদশাই তাঁদের মুক্তি অভিজ্ঞতা, অবরোধ প্রথা থেকে মুক্তি। আজকের দিনে কেউ কল্পনা করতে পারবেন না সেটা কত বড়ো বিপ্লব। পর্দানশিন কুলবধূ সমদ্রের ধারে গিয়ে নুন তৈরি করছে আর পুলিশের দ্বারা গ্রেফতার হচ্ছে, হাকিমের দ্বারা সে দন্ডিত হচ্ছে, জেলখানায় আবদ্ধ হচ্ছে। তবু কী আনন্দ। তা বলে হাজার মাইল দূরে ভেলোরে চালান!

সুশীলার সাথি ছিলেন এক দক্ষিণী মহিলা। তিনিও বিনুকে চিঠি লিখেছিলেন। জীবনে কতরকম অঘটন ঘটে। পঁয়ত্রিশ বছর পরে বিনু যখন দিল্লিতে এক সম্মেলন উপলক্ষ্যে উপস্থিত তখন তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে অবাক হয়। তিনি এক ভারতবিখ্যাত পুরুষের পত্নী, স্বয়ং পার্লামেন্টের মেম্বার! তিনিও ভারতবিখ্যাত হৈমবতী দেবী। তিনি সেদিন ভেলোরের দুর্গতির কাহিনি বলেন। তাঁদের সেলের পাশেই ছিল ফাঁসির আসামিদের সেল। কী নিষ্ঠুরতা।

জেলখানা থেকে যে চিঠি আসে তাতে নিষ্ঠুরতার উল্লেখ থাকে না। তা সত্ত্বেও সুশীলা তার নতুন জীবন সানন্দে মেনে নিয়েছে। বিনু একদা অজস্র চিঠি লিখেছে। আর লিখতে চায় না। যে যার পথ বেছে নিয়েছে। একজন রাজবন্দিনির, অপরজন রাজপুরুষের। কারও সঙ্গে কারও সাযুজ্য নেই। এমনও হতে পারত যে সুশীলাকে একদিন আদালতে হাজির করা হত আর বিনু তাকে কারাদন্ড দিত। এ চাকরির এই হল দোষ। আদালতে দাঁড়িয়ে গান্ধীজি বলেছিলেন, হয় আপনি আমাকে দন্ড দিন, নয় পদত্যাগ করুন। সুশীলাও হয়তো সেই কথাই বলত।

বিনু একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিল। তাই নিয়ে ধ্যানস্থ ছিল। এমন সময় আরও এক চিঠি। লিখেছেন এক মার্কিন মহিলা। এসেছেন ভারত দর্শনে। লণ্ডনে বিনুর এক বন্ধুর সঙ্গে আকস্মিক আলাপ। বন্ধু পরামর্শ দিয়েছেন বিনুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি জানতে চান কী কী দেখবেন, কোথায় কোথায় যাবেন। বিনু উত্তর দেয়, এখানেই আসুন, মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি দেখাব।

তিনি সত্যি সত্যি আসেন। দেখেন। বিদায় নেন। বিনু ধরে নেয় আর কখনো দেখা হবে না। কী মনে করে দু-তিনটি বাংলা কথা শিখিয়ে দেয়। কে জানত যে একদিন তাদের বিয়ে হবে। তিনি আবার আসবেন। এবার বধূ রূপে। জীবনে কত কী অঘটন ঘটে। কে জানত বিনু একদিন সেই জেলার শাসক হয়ে আসবে, সঙ্গে মীরা। এবার ফার্স্ট লেডি।

এতদিন বিনুর জীবন ছিল তার একার জীবন। সে একজনের মতো পরিকল্পনা করেছিল। এখন করতে হল দুজনের মতো। পরে আরও একজনের মতো। কিন্তু বিনু বা মীরা কোনো জনই সংসারী বিজ্ঞজন নয়। যাকে ইংরেজিতে বলে ওয়ার্ডলি ওয়াইজ ম্যান বা ওম্যান। স্কুল থেকে বিনু একবার পুরস্কার পেয়েছিল Bunyan রচিত 'Pilgrim's Progress।'

তাতে সংসারী বিজ্ঞজনের প্রতি কটাক্ষ ছিল। বিনু স্থির করেছিল সে বড়ো হয়ে সংসারী বিজ্ঞজন হবে না। সংসারীই হবে না, যদি-না তার নিজের মতো একজন আদর্শবাদিনীকে প্রেমসূত্রে জায়ারূপে পায়। মীরাই ছিল বিনুর নূতনা রাধা। 'সমাপিবে চির বাঁশরি সাধা।' বিনু ভাবতেই পারেনি যে মীরা তার জন্যে পিতৃকুল ত্যাগ করবে, মাতৃভূমি ত্যাগ করবে, স্বমনোনীত পিয়ানো বাদনের বৃত্তি ত্যাগ করবে, ভিখিরি শিবের অন্নপূর্ণা হবে। বিয়ের আগেই বিনু জানিয়েছিল আসলে সে একজন আইসিএস নয়, একজন সাহিত্যিক; সাহিত্যের খাতিরে তাকে আইসিএস ত্যাগ করতে হবে বছর কয়েক বাদে। মীরা সায় দিয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই তাদের কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ হয়ে যায়, যাতে পদত্যাগে হঠাৎ কষ্ট না পেতে হয়। মীরা ছিল ছায়ার মতো অনুগতা। বিনু যখনই যেখানে বদলি হয়েছে বিনুর কর্মস্থলে মীরা তার সাথি হয়েছে। গরমের কালে বিনুকে ছেড়ে সে পাহাড়ে যেতে চায়নি। কোনো কোনো জায়গায় বিদ্যুৎ ছিল না। টানাপাখার হাওয়া খেতে হত। মীরা সহ্য করত। বিনুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত সফরে, রাত কাটাত তাঁবুতে। দিনের বেলা পায়ে হেঁটে বেড়াত। কোলে ছ-মাসের শিশু।

আইসিএস-দের কাজ শুধু মামলার বিচার নয়। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত একশো রকমের কাজ। এসব করতে করতে তারা চৌকস হয়, যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারে। মন্ত্রীরা না থাকলে ওরাই সরকার চালায়। সিভিল অথরিটি আর্মিও মেনে নেয়। পুলিশ তো মেনে নেয়ই। সফরে গেলে বিনুর অন্যতম কাজ হয় থানা ইনস্পেকশন। বিনু একজন ম্যান অব অ্যাকশন হয়ে ওঠে। অফিস, আদালত, ট্রেজারি, জেল, থানা, ইউনিয়ন বোর্ড, স্কুল কমিটি, ডিসপেনসারি কমিটি, কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক, কোথায় না তার স্থিতি বা গতি! মহকুমার ভার দিয়ে তাকে তৈরি করা হচ্ছে জেলার ভারের জন্যে। জেলাশাসক হলে উচ্চতর পদের জন্যে। জেলা জজ হলে হাই কোর্টের জন্যে।

এটা ঠিক চাকরি নয়, আমলাতন্ত্র—বুরোক্রেসি। বিনু এই ব্যূহের ভিতরে ঢুকে বেরোবার ফাঁক পায় না। সে ভেবেছিল তাকে ডার্টি ওয়ার্ক করতে বলা হবে। তখন সে অস্বীকার করে ইস্তফা দেবে। তাকে তার বিবেচনামতো কাজ করতে বলা হয়, যেমন সাবালক ছেলেকে। সাহিত্যের জন্যে যাচ্ছে এটা যদিও ঠিক, তবু এটার চেয়ে জুতসই দেশের জন্যে যাচ্ছে বা গুরুতর মতভেদের জন্যে যাচ্ছে। বিনু দোনোমনো করে। সবচেয়ে বড়ো কারণ মীরা ও ছেলে-মেয়ে আর্থিক সংকটে পড়বে। ওদের বোঝাতে পারা যাবে না যে বিনুর পক্ষে ওটা এক আত্মিক সংকট।

জেলাশাসক হয়ে অবধি সে আড়াই বছর সাহিত্যের কলম ধরেনি। এমন অবস্থায় একটি শিশুপুত্রের প্রয়াণ তাকে বিহ্বল করে। বিনু সরস্বতীর কাছে অপরাধী বোধ করে। চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে উদ্যত হয়। কিন্তু কোথায় বিকল্প? টাকার জন্যে লিখতে রল্যাঁ বারণ করেছেন। টাকার জন্যে অন্য কিছু। সেটা কি সংবাদপত্রের চাকরি? সেখানেও তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।

তাকে জজ করে দেওয়া হয়। তখন যথেষ্ট অবসর পায়। উপন্যাস সমাপ্ত হয়। হাত যখন খালি তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বিনু তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রশংসা করলে তিনি তাকে এক

চমক দেন। 'আমি সারাজীবন যা লিখেছি তা সাহিত্য হয়নি। তাই আমি সাহিত্যিক নই। সাহিত্যে আমার স্থান নেই। আপনার রচনা থেকে আমার নাম বাদ দিন।'

চাকরি সত্ত্বেও সাহিত্যিক মহলে বিনুর একটা স্থান আছে। সাংবাদিক হলে সেটা কি আর থাকবে? সে হবে না-ঘরকা না-ঘাটকা। চাকরি যদি অপথ হয়ে থাকে সাংবাদিকতাও অপথ। সে একটা ভুল সংশোধন করতে গিয়ে আরেকটা ভুল করবে। তার চেয়ে পেনশনের জন্যে পায়চারি করা শ্রেয়। মীরাও তার এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে। যদিও সে বিনুর পদত্যাগের জন্যে প্রস্তুত। আসবাবপত্রের বেশিরভাগ জলের দরে বিক্রি। সে আর ছেলে-মেয়ে পালঙ্ক ছেড়ে তক্তপোশে শোবে। বিনু তো ক্যাম্প খাটে। সবাই মেঝেতে বসে খাবে। টেবিলচেয়ার বাতিল।

বিনুর মনে হল জনগণের জন্যে কিছু-একটা করা উচিত। ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে তাদের সঙ্গে মিশত ও তাদের জন্যে যথাসাধ্য করত, যেমন একটা স্কুল বা মেটার্নিটি হোম। কিন্তু এখন সে-সুযোগ নেই, সে স্থাণু। তা ছাড়া জজকে লোকের সঙ্গে মিশতে মানা—পাছে সে প্রভাবিত হয়। বিনু ছড়া লিখতে শুরু করে দেয়। ছড়া হয়তো গ্রামে গঞ্জে লোকের মুখে মুখে ঘুরবে। তারজন্যে ছাপা বই পড়তে হবে না। ওটা হচ্ছে এদেশের ওরাল ট্র্যাডিশন, চর্চার অভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

যারা কায়িক পরিশ্রম করে ফসল ফলায়, কাপড় বোনে, বিনুর মতো মননশীলদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তাদের কাছে বিনু প্রাণধারণের জন্যে ঋণী। ঋণশোধের জন্যেই তার এইসব ছড়া লেখা, নিছক আনন্দের জন্যে নয়। কিন্তু এই কি যথেষ্ট? ঝড়ের দাপটে সমুদ্রের ঢেউ এসে কাঁথির উপকূলবর্তী বিশ মাইল পর্যন্ত এলাকা ছারখার করে দিয়ে গেছে। বিপন্ন মানুষকে সাহায্য পাঠানো জরুরি। কিন্তু সরকার বাধা দিচ্ছে, কারণ গ্রামবাসীরা গান্ধীজির ডাকে বিদ্রোহী। মীরা একটি মেডিক্যাল টিম পাঠাতে চায়, ছাত্ররা তৈরি। মেদিনীপুরের জেলাশাসক ঘোর কংগ্রেসবিরোধী মুসলমান। তিনিও একজন আইসিএস। বিনু তাঁকে চিঠি লিখে আশ্বাস দেয় যে মেডিক্যাল টিম যাচ্ছে নিছক মানবিক উদ্দেশ্যে। মানুষকে মানুষ না বাঁচালে কে বাঁচাবে? তাতে ফল হয়। বিনু শুনে অবাক হয় যে কংগ্রেস থেকে রিলিফ পাঠাতে কারও সাহস হয়নি। বহু কর্মী নিরাপদে কলকাতায় বসে আছেন। কুইট ইন্ডিয়া আন্দোলন তেমন সাড়া জাগায়নি মেদিনীপুর জেলার বাইরে।

বিনু রাজনীতির লোক নয়, কিন্তু মূলনীতি নিয়ে চিন্তিত। হিংসার প্রয়োজন যুদ্ধকালেই সবচেয়ে বেশি। যুদ্ধরত বিশ্বকে দৃষ্টান্ত দেখাতে পারে একমাত্র ভারতের জনগণ, গান্ধীজির নেতৃত্বে। কিন্তু তাঁর এই আন্দোলন অহিংস হয়নি।

নিদ্রিত জনগণকে জাগানোই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে তা সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু সেই জাগ্রত জনগণ অহিংসার ধার ধারেনি। তবে তাদের পক্ষে বলবার একটি প্রশংসনীয় কথা তারা একজনও ইংরেজের গায়ে হাত দেয়নি। মীরা বিনুকে একথা মনে রাখতে বলে। অর্থাৎ জাতি হিসাবে ইংরেজদের কোনো অনিষ্ট ঘটেনি। ইংরেজ সরকার আর ইংরেজ জাতি সমার্থক নয়। গান্ধীজির শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি।

বিনু ক্রমশ তার বিচারকবৃত্তিতে মনোযোগী হয়। দেশের লোক যে কেবল সুশাসন চায় তাই নয়, সুবিচারও চায়। জজের মর্যাদা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে কম তো নয়ই বরং বেশি। ইহুদিদের ওল্ড টেস্টামেন্টে রাজাদের পরেই জজদের স্থান। যিশুর অনুজ্ঞা, ন্যায়পরায়ণতার জন্যে ক্ষুধিত ও তৃষিত হও। বিচারকের আসনে বসে বিনুর মনে হয় তাকেই বিচার করা হচ্ছে, আসামিকে নয়। সে প্রার্থনা করে সে যেন কারও প্রতি অন্যায় না করে। আসামিও তো মানুষ। একজন মানুষ আরেকজন মানুষের বিচার করার কে? ভগবানই প্রকৃত বিচারক। বিনু তাঁর হাতের যন্ত্র। নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী। যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গেই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে একটি ক্ষেত্রে তার বিবেক তার হাত চেপে ধরে। না, প্রাণদন্ড নয়।

যে মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য তার প্রাণদন্ডই একমাত্র বিহিত দন্ড। সে-মামলায় প্রাণদন্ড না দেওয়াটাই সমাজের প্রতি অকর্তব্য। বিনু মানে এটাই ঠিক। তবু তার মন মানে না। প্রাণদন্ড নামক দন্ডটাই

অন্যায়; টলস্টয়ের মতে, গান্ধীজির মতেও। বিনু কী করবে? চাকরি ছেড়ে দেবে না চাকরি রাখার জন্যে প্রাণদন্ড দেবে? তার বরাত ভালো জুরিরা প্রাণদন্ডের ভয়ে দন্ডবিধি আইনের ধারাটাকে নামিয়ে আনেন। তখন জজ দ্বীপান্তর দন্ড দিয়ে অপরাধীকে বাঁচান। সেইসঙ্গে আপনাকেও।

সে নিকটবর্তী একটি জেলায় বদলি হয়েছে শুনে তার এক সাহিত্যিক বন্ধু তাকে লেখেন, 'যুবকটি বেকার। দয়া করে তাকে জুরর করবেন।' বিনুর মনে খটকা বাঁধে। তবে কি জুররা অনাহারী নন? উৎকোচ আহারী। খোঁজখবর নিয়ে যা জানতে পায় তা রোমহর্ষক। আসামি পক্ষের উকিলদের সঙ্গে জুররদের চোরা সম্পর্ক। তাই পাকা মামলাও কেঁচে যায়। জুরিপ্রথা ইংরেজদের দ্বারা এদেশে পরিবর্তিত। এক ইংরেজ জজ রবীন্দ্রনাথকে বলেন ভারতীয়রা এই প্রথার উপযুক্ত নয়। তিনি তা শুনে মর্মাহত হন। বিনুও ছিল তাঁর মতো ভারতে জুরিপ্রথার পক্ষে। কিন্তু পরিশেষে সেও সেই জজের মতের সঙ্গে মত মেলায়। হাই কোর্টকে চিঠি লিখে জানায় এ জুরিপ্রথার সঙ্গে উৎকোচ জড়িত। বছর তিনেকের জন্যে জুরিপ্রথা রহিত করা হোক।

এটা পার্টিশনের অব্যবহিত পূর্বের সুপারিশ। ব্রিটিশ বিদায়ের পর দেখা গেল জুরিপ্রথাও বিদায় হয়েছে। শুধু একটি জেলা থেকে নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে, সারা ভারত থেকে। তবে হাই কোর্টে দশ-বারো বছর বহাল ছিল। পরে সেখান থেকেও উঠে যায়। তাহলে কি জুরিপ্রথা ভারতে অনুপযোগী? অথবা ভারত কি জুরিপ্রথার অনুপযুক্ত? বিনু দুঃখিত তার সুপারিশের পরিণাম দেখে।

পার্টিশনের পূর্বেই বিনুর কাছে সরকার থেকে হিন্দু কোডের একটি খসড়া আসে। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় সরকারে কংগ্রেস ছিল না। সুতরাং হিন্দু কোডের প্রস্তাবটা কংগ্রেসের বা জওহরের নয়। বোধহয় বড়োলাটের শাসন পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্যের। তিনি হিন্দু। তবে যতদূর মনে পড়ে তাতে প্রাক্তন বিচারপতি বেনেগল নরসিংহ রাওয়ের হাত ছিল। খসড়ার একটি ধারায় ছিল স্বামী যদি হিন্দু হয় তবে স্ত্রী হিন্দু না হলেও সন্তান হিন্দু বলে গণ্য হবে। এ-ই তো বিনু চায়। তার বিয়ের সময় তার বাবা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোদের ছেলে-মেয়ের বিয়ে হবে কোন সমাজে?' বিনু উত্তর দিয়েছিল, 'ততদিনে হিন্দুসমাজ আরও উদার হয়ে থাকবে।' ভগবান কত বার তার মুখরক্ষা করেছেন, এবারেও করলেন। বেনেগল নরসিংহ রাওয়ের পত্নীও ছিলেন মীরার মতো একজন। এখন তো স্থির হয়ে গেছে বাপ হিন্দু না হলেও মা যদি হিন্দু হয় তো সন্তানও হবে হিন্দু। যেমন ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব ও সঞ্জয়।

জজের পদে থেকে বিনু আবিষ্কার করেছিল যে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি অ্যাক্ট পাস হয়েছিল। তার সূচনায় ছিল, 'The term ''Hindu'' includes an Ismalia Khoja.' যতদূর মনে পড়ে সেটা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন। তাই যদি হয় তবে জিন্না সাহেবও উত্তরাধিকার সূত্রে হিন্দু। কারণ তিনি একজন ইসমাইলিয়া খোজা। দ্বিজাতিতত্ত্ব কি তাঁর মুখে মানায়?

বিনুকে পার্টিশনের পর শ্রমিক ক্ষতিপূরণ কমিশনার করা হয়। সেইসঙ্গে কৃষি আয়কর ট্রাইবুনালের প্রেসিডেন্ট। উপরন্তু গুণ্ডা আইনের জজ। গুণ্ডার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে বেশ্যাও আসে। শ্রমিক, কৃষক, গুণ্ডা, বেশ্যা এদের সকলের সঙ্গে ঘটে প্রকাশ্য পরিচয়। কিন্তু পরে একসময় তার ও তার এক সহযোগীর উপরে ভার পড়ে গোপনে বিবেচনা করে দেখতে রাজবন্দি কমিউনিস্টদের কাকে কাকে আটক করে রাখা অনাবশ্যক। আশ্চর্যের ব্যাপার আটকদের মধ্যে ছিল কয়েকটি স্কুলের ছাত্রী। বিনু ও তার সহযোগী জানতে চান কী তাদের অপরাধ। পুলিশের ইনস্পেকটর জেনারেল স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন ওরাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। স্কুলের ছোটো ছোটো মেয়েদের মগজধোলাই করছে। তারা পরে একদিন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বনবে। ভদ্রলোক বিনুদের হাসালেন। তাঁরা ওই বালিকাদের মুক্তির সুপারিশ করেন। কিন্তু সত্যই তিনি ছিলেন ভবিষ্যদবক্তা।

বিনুর জীবনদেবতা তাকে মহাকরণে কিছুদিন সেক্রেটারি পদে রাখেন। এমনি করে তার কর্মজীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। সে ক্যাবিনেট বৈঠকে হাজির হয়ে মন্ত্রীদের মন্ত্রণা শোনে। একজন মন্ত্রী তাকে বলেন, 'আপনি

ভাবছেন চাকরি ছেড়ে দিলে আরও ভালো লিখবেন? দেখবেন এই সময়টাই ছিল আপনার সাহিত্যকর্মের দিক থেকে সবচেয়ে অনুকূল সময়।'

যামিনী রায়ও তাকে বলেন, 'সৃষ্টির কাজের জন্যে প্রতিকূলতাও চাই। বিরোধ না থাকলে সৃষ্টি এলিয়ে পড়ে। আপনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ভুল করছেন।' অবসর নেবার পর বিনু দশটা থেকে পাঁচটা বাড়িতে কাটায়। অফিস বা আদালতের অভাব বোধ করে। চারদিক জমজমাট থাকত। সকলের মধ্যমণি বিনু। শূন্য ঘরে লেখালেখি করে কি জীবনের স্বাদ মেলে? কোথায় সেই জীবনদর্শন, জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি? জীবনদর্শন বলতে জীবনকে দর্শনও বোঝায়। শান্তিনিকেতনে থেকে জীবনের কতটুকু দেখতে পাওয়া যায়? মাঝে মাঝে কলকাতা আসতে হয়, দিল্লি যেতে হয়। দর্শন যা করে তা একজন বাইরের লোকের মতো, একজন ভিতরের লোকের মতো নয়। সে একদা ছিল ইনসাইডার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ইনসাইডার। এখন সে একজন আউটসাইডার। সরকারি মহলে সে একজন আউটসাইডার, ভিতরের খবর রাখে না। রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাই। ব্যাবসার ক্ষেত্রেও তাই। তবে সে প্রচুর সময় পায় ভাববার ও লেখবার। সদর দরজা বন্ধ, অন্দরের দরজা খোলা। জগতেরও তো একটা ইনসাইড আছে। বিনু সেই অন্তর্জীবনের ইনসাইডার হতে আকাঙ্ক্ষা করে। অন্তর্জীবনও জীবন, তার দর্শনও জীবনদর্শন।

বহির্জীবনে যে রিক্ত অন্তর্জীবনে সে ধনী হতে পারে; বহির্জীবনে যে দুর্বল অন্তর্জীবনে সে বলবান হতে পারে; বহির্জীবনে যে নরম অন্তর্জীবনে সে শক্ত হতে পারে; বহির্জীবনে যে কুশ্রী অন্তর্জীবনে সে রূপবান হতে পারে; বহির্জীবনে যে শুষ্ক অন্তর্জীবনে সে সরস হতে পারে; বহির্জীবনে যে বৃদ্ধ অন্তর্জীবনে সে যুবক হতে পারে; বহির্জীবনে যে বদ্ধ অন্তর্জীবনে সে মুক্ত হতে পারে। বহির্জীবনের শূন্যতা অন্তর্জীবনের পূর্ণতা একই মানুষের বেলা সত্য হতে পারে।

মানুষকে লেবেল দিয়ে সনাক্ত করা যায় না। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, হরিজন, বাঙালি, ওড়িয়া, ভারতীয়, ইংরেজ, শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, প্রাচীন, আধুনিক, সভ্য, অসভ্য, আর্য, অনার্য ইত্যাদি লেবেল দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু তারা পুরোপুরি পৃথক নয়। অমিল যত, মিল তার চেয়ে বেশি। তাদের অন্তর্জীবন হয়তো একইরকম। এসব লেবেলের মূল্য নেই তা নয়। কিন্তু অন্তর্জীবনের এসব লেবেল নিতান্তই বাহ্য। মানুষকে ভালোবাসলে তার স্বরূপ জানতে পারা যায়।

মানুষ নিজেই একটা লেবেল। মানুষ বলতে যা বোঝায় তার চেয়েও মানুষ বড়ো। সূর্য তারার সঙ্গে তার সাযুজ্য। তার ভিতরেও জ্বলছে একই আগুন। তার বাইরেও সেই আলোর আভা, সেইজন্যে তাকে বলা হয়েছে অমৃতের সন্তান। সে এসেছে অমৃতলোক থেকে, যাবেও অমৃতলোকে। তার পরমায়ু যত হ্রস্ব হোক-না কেন তা অমৃত।

বিনু বরাবরই চিন্তা করেছে এ জীবন নিয়ে সে কী করবে। এ জীবনে সে কী হবে। এসব অবশ্য তার একার উপর নির্ভর করে না। পরিবার, সমাজ, দেশ, কাল, অবস্থা, পরিবেশ, দৈব সবকিছুই তাকে সাহায্য করে বা তার অন্তরায় হয়। মানুষ করতে চায় এক, ঘটে আরেক। হতে চায় একটা কিছু, হয়ে ওঠে আরেকটা কিছু। একে বলা যেতে পারে নিয়তি। নিয়তি কেন বাধ্যতে? কিংবা জীবনদেবতার ইচ্ছা। তাঁকেই-বা কে বাধ্য করবে?

তা সত্ত্বেও বিনু পদে পদে প্রশ্ন করে, কী কী লিখবে? কেমন করে লিখবে? কাদের জন্যে লিখবে? কেন লিখবে? তেমনি মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে বাঁচবে? কেন বাঁচবে? কাদের জন্যে বাঁচবে? কাদের বাঁচাবে?

লেখক হিসাবে সে মোটামুটি স্বাধীন। পরের ফরমাশে সে লেখে না। টাকার জন্যে লেখে না তবে লিখলে টাকা নেয়। এটা বার্নার্ড শ-এর নীতি। মোটামুটি স্বাধীন, পুরোপুরি নয়। একটা কথা আছে, Thus far and no further, এই পর্যন্ত যেতে পারো। তারপরে একটি পা-ও না। লেখকের বিবেক তাকে নিবৃত্ত করে। কিংবা রাজভয়। কিংবা লোকভয়। সব কথা লেখা যায় না। লেখক স্বাধীন হলেও নিরঙ্কুশ নয়।

মানুষ বিনু লেখক বিনুর চেয়েও সাবধান। লোকে কী মনে করবে? স্ত্রী কী মনে করবে? ছেলেমেয়ে কী মনে করবে? পারিবারিক শান্তি কার না কাম্য? তবে তাদের কাছ থেকেও সবুজসংকেত পাওয়া যায়, অন্যদের কাছ থেকে অত সহজে নয়। সকলের জীবনেই এইরূপ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে।

বিনু যেমন করে বাঁচতে চেয়েছে তেমন করে বাঁচতে পারেনি। বাঁচতে গেলে বিপাকে পড়ত। নিজের খেয়ালখুশিমতো না হলেও যেভাবে বেঁচেছে সেটা মোটের উপর ভালোই হয়েছে।

বিনুর ধারণা ছিল জীবনও একটা শিল্প হতে পারে, সে হতে পারে জীবনশিল্পী। কিন্তু জীবনের একটা বড়ো অংশ হল জীবিকা। জীবিকার অনুরোধে আইনকানুন মেনে কাজ করতে হয়, কখনো কখনো ওপরওয়ালার সঙ্গে আপোশও করতে হয়। পাবলিকের কাছেও জবাবদিহির দায় আছে। সে জীবনশিল্পী হবার সাধ ত্যাগ করে। শুধু শিল্পী হওয়ার সাধনাই বজায় থাকে। সে-সাধনার সঙ্গে প্রেমিক হওয়ার সাধনাও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। যেমন রস আর রূপ তেমনি প্রেম আর আর্ট।

এ ছাড়া ছিল সত্যের অন্বেষণ। জীবনের প্রত্যেক পর্বেই সে সত্যের অন্বেষণ করেছে। পরীক্ষা না করে কিছুই অমনি সত্য বলে মেনে নেয়নি। গুরুবাক্য হলেও তা স্বতঃসিদ্ধ নয়।

তার ভাগ্য ভালো যে তাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গুলি চালাবার হুকুম দিতে হয়নি, জজ হিসাবেও ফাঁসির হুকুম দিতে হয়নি। তেমন এক পরীক্ষায় পাস করাও খারাপ, ফেল হওয়াও খারাপ। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামাতে হলে যদি গুলি চালাবার হুকুম দেওয়া একান্ত আবশ্যক হত তাহলে সে পেছপাও হত না। সে দাঙ্গার সময় গুলি চালাত নিরীহ মানুষদের বাঁচাতে। বাঁচানোই তার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সাধনের অহিংস উপায় হয়তো অনশন, কিন্তু সেটা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বেমানান। অনশন করতে চাইলে পদত্যাগই কর্তব্য।

এখন সে নব্বইতে পড়েছে। তার জীবনসঙ্গিনী বিগত। এখন নতুন করে তার চাইবার কী আছে? পাবারই-বা আছে কী? আছে, আছে। শৈশবে ও প্রথম যৌবনে দু-বার তার দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে তার ধ্যানদৃষ্টিতে এ বিশ্বের সব কিছু পরিষ্কার দেখা দিয়েছিল। সে আরও একবার ফিরে পেতে চায় সেই দিব্যদৃষ্টি।

বিনুর নিশ্চিতি

বিনুদের বাড়িতে কেবল মানুষজন ছিল না, ছিল পোষা পশু, পোষা পাখি। আর ছিলেন এক দেবতা। ঠাকুরঘরে তাঁর অধিষ্ঠান। ঠাকুমা তাঁর নিত্য সেবা পূজা করেন। বিনুরা তাঁর প্রসাদ পায়। সেই বিগ্রহের নাম বিনুরা শুনত পূর্ণমাসী। বোধহয় পৌর্ণমাসী। শ্রীরাধার এক সখী। শাক্ত পরিবারে ইনি কেমন করে এলেন তা অজ্ঞাত।

দেবতার উপস্থিতি কেবল বিনুদের বাড়িতেই নয়। অদূরে বলরাম মন্দির, সেখানে জগন্নাথ ও সুভদ্রাও উপস্থিত। মাঝে মাঝে মা-ঠাকুমার সঙ্গে বিনুও সন্ধ্যা বেলা পায়ে হেঁটে মন্দিরে যায়। দিনের বেলা যাঁরা অসূর্যম্পশ্যা সন্ধ্যা বেলা তাঁরা মন্দিরে এসে আসর জমান। খুদে বিনুকে পুরুষ বলে গণ্য করেন না।

শহরে আরও মন্দির ও মঠবাড়ি আছে। বিনু তার বন্ধুদের সঙ্গে যায়, ঠাকুর দেখে। হনুমানজিও দেবতার মতো পুজো পান। তবে তাঁর সেটা মন্দির নয়, খোলা জায়গার উপর একটা আস্তরণ। বছরের পর বছর পাড়ায় আগুন লাগে, ঘর পুড়ে যায়। এরজন্যে পুজো করতে হয় হিঙ্গুলেই দেবীকে। যারা গুড়ের পানা দেয় তাদের ঘর পোড়ে না।

বিনু এ সমস্ত বিশ্বাস করে। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর সেও একজন ভক্ত। তবে তার প্রধান আরাধ্য মা দুর্গা ও মা সরস্বতী। বাড়িতে যখন দুর্গা পূজা হয় তখন একটা জলচৌকিতে রাখা হয় মূর্তি বা পট নয়, একটি তলোয়ার, বংশের পুরাতন উত্তরাধিকার। সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ আর কে জানে কেন শেক্সপিয়ারের ইংরেজি গ্রন্থাবলি। সরস্বতী পূজার সময় তলোয়ার থাকে না, তার বদলে থাকে কলম ও দোয়াত। আর সব একইরকম, বাদ কবিকঙ্কণ চণ্ডী। শেক্সপিয়ার যথাস্থানে সমাসীন।

ছোটোকাকা পরীক্ষা পাস করে ইংরেজি বাইবেল উপহার পান। সে-গ্রন্থও এ পরিবারে সমাদৃত। তবে পূজিত নয়। বোখারি সাহেব বলে এক ফকির মাঝে মাঝে সত্যপিরের সিন্নি দিয়ে যান। বিনুরা মুসলমানের হাতে জল খায় না, কিন্তু সিন্নি খেতে হালুয়া খেতে তাদের সংস্কারে বাধে না।

এ যে সংসার এতে এক পটপরিবর্তন ঘটে যায়, যখন বিনুর ঠাকুমা দেহত্যাগ করেন। বাবা-মা রামদাস বাবাজির কাছে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করে বাড়িতে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুমা তাঁর বিগ্রহকে নিয়ে বড়োছেলের বাড়ি ছেড়ে মেজো ছেলের বাড়ি যান। পরে শাক্তমতে পূজা-আর্চা বন্ধ হয়ে যায়। কীর্তনিয়ারা বাইরে থেকে এসে খোল করতাল বাজিয়ে গান করেন। বিনুকেও খোল বাজাতে শেখানো হয়, কিন্তু সে অপটু। প্রতিদিন মা জয়দেব থেকে একা গান করেন, বাবা বিদ্যাপতি থেকে একা আবৃত্তি করেন। সেসব বিনু বুঝতে পারে না, কিন্তু শুনতে শুনতে তার ছন্দের ও মিলের কান তৈরি হয়ে যায়। বাবা ও মা গোপাল ছাড়া আর কোনো দেব-দেবীর ভক্ত নন। সেটাও একপ্রকার একেশ্বরবাদ।

বিনু কদাচ কখনো বলরাম মন্দিরে যায়, জগন্নাথকে সে ভক্তি করে। তিনিও তো কৃষ্ণ। যাঁর কথা বাবার মুখে। বিনু তাঁকে প্রণাম করলে তিনি বলেন, 'কৃষ্ণে মতি হোক।' কিছুদিনের জন্যে বিনু পুরীতে সেজো কাকার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে যায়। প্রায়ই ঠাকুমাকে জগন্নাথ দর্শনে নিয়ে যেতে হত। গর্ভগৃহে প্রবেশ করে সে জগন্নাথের গাত্র স্পর্শ করে। কত বড়ো পুণ্য! গুরুচরণবাবু বলে এক প্রতিবেশীও যেতেন। তিনি করতেন কী, না নিজের দুই হাতে নিজের দুই গালে চড় কষাতেন আর দুই কান মলতেন। বলতেন, 'প্রতিদিন কত পাপ করছি। এইভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।'

তবে গুরুচরণের চরণ দুটি গোদের দরুন গুরুভার। বোধহয় তার ধারণা ছিল গোদের মূল কারণ হচ্ছে পাপ। পাপ থেকে যেমন কুষ্ঠ হয় তেমনি যতরকম রোগ হয়। মন্দিরে যারা যায় তারা একটা-না-একটা প্রার্থনা নিয়ে যায়। পাপমুক্তির বা রোগমুক্তির বা ধনসম্পদের বা সাংসারিক সাফল্যের বা পরকালের সদগতির বা সন্তানলাভের। বিনুর তেমন কোনো প্রার্থনা ছিল না। সে যায় শুধু দর্শন করতে, কেবল দেবতাকে নয়, সমবেত মানুষজনকে। কত দূর থেকে, কত দেশ থেকে কত স্ত্রী-পুরুষ এসে হাজির হয়েছে। এদের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে গায়ে গা ঠেকিয়ে যে সুখ পাওয়া যায় সেও তো একপ্রকার সুখ। বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের প্রতি ওর একটা টান ছিল। মেয়েদেরও বোধহয় ওর প্রতি।

বিনুর ছোটোকাকার খ্রিস্টধর্মে অনুরাগ ছিল। তিনি তাকে একদিন খ্রিস্টানদের এক গির্জায় নিয়ে যান। সেও বসে যায় সকলের সঙ্গে উপাসনায়। সবাই যখন চোখ বোজে সেও চোখ বোজে। সবাই যখন চোখ মেলে সেও তখন চোখ মেলে। সেও পবিত্র রুটি ও বারি মুখে ছোঁয়ায়। না, মদ নয়। গির্জাটা ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের।

বিনুর সতেরো বছর বয়সে তার মাতৃবিয়োগ হয়। শোকে সান্ত্বনার জন্যে সে যেসব বই পড়ে তাদের মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ। কতকটা তাঁর প্রভাবে, কতকটা ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সে ক্রমে ক্রমে দেব-দেবীতে ও সাকার আরাধনায় বিশ্বাস হারায়। রক্ত-মাংসের কোনো মানুষই ঈশ্বর হতে পারেন না, ঈশ্বরের অবতার হতে পারেন না, ঈশ্বরপুত্র হতে পারেন না, কৃষ্ণও না যিশুও না। একবার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর পর বিনু আর ঠাকুর দর্শন করতে মন্দিরে যায় না, যায় শিল্প দর্শনের জন্যে। সেদিক থেকে মন্দিরগুলো মহামূল্য।

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার সময় তাকে একটি ফর্ম পূরণ করতে দিলে সে তার ধর্মমত এই বলে ব্যক্ত করে যে তার ধর্ম একেশ্বরবাদী অন্য ধর্ম হতে সারসংগ্রহকারী হিন্দুধর্ম। ইংরেজিতে 'Monotheistic eclectic Hinduism.'

একেশ্বরবাদী হলেই যে তাকে অদ্বৈতবাদী হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মুসলমানরা একেশ্বরবাদী কিন্তু অদ্বৈতবাদী নয়। অদ্বৈতবাদীদের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। সেটা সত্য, কিন্তু মানুষ তো আপনি আপনাকে প্রার্থনা জানাতে পারে না, উপাসনা করতে পারে না। এসবের প্রয়োজন কি নেই? ছেলে বাপের কাছে প্রার্থনা করে, মাকে ভক্তি করে।

তেমনি ঈশ্বরকে পিতা রূপে, মাতা রূপে, প্রভু রূপে, প্রেমিক রূপে, সখা রূপে, পুত্র রূপে, এমনকী কান্তা রূপে কল্পনা করেছে মানুষ। যার যাতে ভক্তি বা প্রীতি বা স্নেহ। অদ্বৈতবাদী বা জ্ঞানমার্গী দ্বৈতবাদীরাও কার্যত ভক্তিমার্গী। বিনু যখন উপনিষদ পড়ে তখন সে জ্ঞানমার্গের রস পায়। যখন বৈষ্ণব পদাবলি পড়ে তখন ভক্তিমার্গের রস।

তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের বিনু একইসঙ্গে হয়ে ওঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতো লীলাবাদী আর ব্রাহ্মদের মতো একমেবাদ্বিতীয়ম বিশ্বাসী। যিনি একা তিনি লীলা করতে পারেন না, নিত্য লীলার জন্যে চান লীলাসঙ্গিনী। পরমাত্মার তেমনি জীবাত্মা, পুরুষের যেমন প্রকৃতি, কৃষ্ণের যেমন রাধা।

ভারতে শত শত মন্দির আছে যেখানে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি পূজিত। তাঁরা দুই অথচ অবিচ্ছিন্ন, দ্বৈত অথচ অদ্বৈত। উভয়ই সমান। তাঁদের একজন হচ্ছেন ভগবান, অপরজন মানুষ। ভগবান আর মানুষ উভয়েই সমান। অন্য অর্থে পুরুষ আর প্রকৃতি উভয়েই সমান। আধুনিকরা বলবেন পুরুষ ও নারী উভয়েই সমান।

ভগবান ও মানুষ কি সমান শক্তিশালী বা সমান ঐশ্বর্যশালী হতে পারে? না কখনো নয়। লক্ষ বর্ষ পরেও না। কিন্তু মানুষের প্রেম তাকে প্রেমের নিরিখে সমান করতে পারে।

খ্রিস্টানরা বলেন ভগবান প্রেম স্বরূপ। যিশু তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছেন, ভগবানকে সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালোবাসবে। আর প্রতিবেশীদের আপনার মতো ভালোবাসবে। খ্রিস্টীয় সন্তদের জীবন এই আদর্শে পরিচালিত হয়েছে। সুফি সাধকদের জীবনেও এর অনুরূপ লক্ষিত হয়। নানক, কবীর, চৈতন্যের জীবনেও। বৌদ্ধরা ভগবান সম্বন্ধে নীরব। তাঁদের মৈত্রীর ও করুণার আদর্শ কেবলমাত্র মানুষে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বজীবে প্রসারিত। জৈনদের আদর্শও অনুরূপ।

প্রেম, মৈত্রী, অহিংসা দুর্বলতার সূচক নয়। শিবি রাজা তো একটি কপোতকে আশ্রয় দিতে গিয়ে নিজের শরীরের মাংস কেটে দেন বাজপাখিকে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পরের জন্যে জীবনদানের দৃষ্টান্ত আছে। জীবনটা দিয়ে ফেলা অত সহজ নয়, কিন্তু কিছু-না-কিছু নিঃস্বার্থভাবে দান করা অসম্ভব নয়। বিনুর সাহিত্যসৃষ্টিও নিঃস্বার্থদান। তবু তা-ই যথেষ্ট নয়। পরের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে কিছু করতে পারলে সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। পর যাকে বলা হয় সেও তলিয়ে দেখলে আত্মীয়, আত্মার আত্মীয়। দেহের থেকে দেহ আলাদা, এটা স্পষ্ট। কিন্তু মনের সঙ্গে মনের ও হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের অস্পষ্ট যোগ আছে। তাই পরের কল্যাণ করলে নিজেরও কল্যাণ হয়।

বিনু ইংল্যাণ্ডে গিয়ে দেখে সেখানকার নারী ও পুরুষ কতরকম কল্যাণকর্মে সময়, শক্তি ও অর্থব্যয় করছেন। এঁদের মানবপ্রেম ও প্রাণীপ্রেমকে বলা হয় খ্রিস্টীয় প্রেম। এ প্রেম নর-নারীপ্রেম নয়। এঁদের অনেকেই চিরকুমার বা চিরকুমারী। নর-নারীপ্রেমের সাধনা এঁদের জীবনে দৃশ্যমান নয়। কিন্তু প্রেম বা করুণা বা মৈত্রী যে এঁদের নিঃস্বার্থভাবে খাটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এটা তো সত্য। কয়েকজন মহিলা অন্ধদের জন্যে একটি শিল্পশালা চালাচ্ছেন। কয়েকজন একপ্রকার খাদি তৈরি করেন ও পরেন। লণ্ডনের ইস্ট এণ্ডে কিংসলি হলের মতো কয়েকটি হল ছিল। কলেজ থেকে বেরিয়ে কল্যাণব্রতী যুবক-যুবতীরা সেসব হলে বছর কয়েক লোকের সঙ্গে মিলেমিশে নানা হিতকর কাজ করতেন। প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি তাঁদের একজন। রাসকিন লিখে গেছেন *আনটু দি লাস্ট*। গান্ধীজি তার অনুবাদ করেছেন 'সর্বোদয়'। কথাটা যিশু খ্রিস্টের। কিন্তু রাসকিন প্রবর্তিত কল্যাণকর্মের প্রেরণা ধর্মীয় প্রেরণা নয়। কর্মীরা খ্রিস্টীয় তত্ত্বে বিশ্বাস না-ও করতে পারেন। ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক-না কেন দীনহীনদের দুঃখ-দৈন্যের শরিক হয়ে দুঃখমোচন করতে হবে।

মুরিয়েল লেস্টারের ভাই কিংসলি প্রথম মহাযুদ্ধে নিহত হন। তাঁর মতো হাজার হাজার যুবক যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেন না। তাঁদের জন্যে যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন সেইসব কুমারীদের বিয়ে হয় না। হবেও না। তেমনি আরও কয়েকজনের সঙ্গেও বিনুর আলাপ হয়। এঁরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। লিগ অব নেশনসের উপর তাঁদের ভরসা। অথচ লিগের মেম্বারদের মধ্যে আমেরিকাও নেই, জার্মানিও নেই। কেই-বা আর একটা মহাযুদ্ধের জন্যে অধীর? বিনুর বিশ্বাস হয় না যে জার্মানরা আরও এক হাত লড়বে। জার্মানি

ঘুরে দ্বিতীয়বার যুদ্ধের লেশমাত্র আভাস পায় না। তার নজরে পড়ে তরুণ-তরুণীরা উড়ো পাখির মতো দলে দলে ঘরছাড়া হয়ে খোলা হাওয়ায় খোলা আকাশের তলে জমায়েত হচ্ছে। রাজনীতির নামগন্ধ নেই। অর্থোপার্জনেরও না। এইসব তরুণ যে একদিন নাতসি বনবে ও যুদ্ধে নামবে তা ভাবা যায় না। এরা সত্যি খারাপ ছিল না। দেখা গেল ভালো মানুষও খারাপ হতে পারে। খারাপ কাজ করতে পারে।

ফাউস্টকে খারাপ করেছিল মেফিস্টোফেলিস অর্থাৎ শয়তান। জার্মানদের খারাপ করল হিটলার। এটা একটা সরলীকরণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দু-কোটি জার্মান মরে ও যাদের মারে তারাও দু-কোটি রাশিয়ান। ব্যক্তিগত শত্রুতা কারও সঙ্গে কারও ছিল না। উপরন্তু মরে ষাট লক্ষ ইহুদি। কাউকেই এরা মারেনি। এক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত শত্রুতা ছিল না। যুগ যুগ ধরে জমছিল ইহুদিদের প্রতি বিরাগ। তেমনি রুশদের প্রতি।

যিশুর শিক্ষা কি তবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে? সমষ্টিগত জীবনের জন্যে নয়? তাই যদি হয় তবে গান্ধীজির শিক্ষাও ব্যক্তিগত জীবনের জন্যে। ভারতের জনসমূহ অহিংসা মেনে চলবে না। যিশুর শিক্ষার দু-হাজার বছর পরে যদি এই হয় খ্রিস্টান ইউরোপের হাল তবে গান্ধীর দু-হাজার বছর পরে সত্যাগ্রহী ভারতের হাল কি মহত্তর হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়?

তবে মানবজাতির ইতিহাসে দু-হাজার বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। মানুষ তো একদা নরখাদক ছিল। এখন কি তার কোনো চিহ্ন আছে? রাক্ষস যাদের বলা হত আজ তারা কোথায়? মানুষের জ্ঞান ছিল না, বুদ্ধি ছিল না, বিবেক ছিল না, চেতনা ছিল না, প্রেম ছিল না, কলাবিদ্যা ছিল না, কৃষিবিদ্যা ছিল না। এসব তো হয়েছে। আরও কত কী হতে পারে।

মানুষ জাতিটা যদি ডাইনোসরের মতো বিলুপ্ত না হয়ে যায় তবে হিংসার অবসান একদিন-না-একদিন হবে। মানুষ মানুষকে মেরে গর্ববোধ করবে না। সেটা বীরত্ব বলে বন্দিত করবে না। মানুষের প্রাণরক্ষার জন্যে মানুষের প্রাণত্যাগই কীর্তিত হবে। তা ছাড়া অহিংসার মতো সত্যেরও মর্যাদা সমধিক। সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে মহাভারতকার সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যান। মহাবীর ভীম ও অর্জুনকে নয়। সেই যুধিষ্ঠিরেরও একদিনের জন্যে নরকবাস হয়েছিল। কারণ তিনি একটি অর্ধসত্য উচ্চারণ করে দ্রোণের প্রাণহানি ঘটিয়েছিলেন।

বিনু স্বর্গে ও নরকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ভগবান সম্বন্ধে সে নিঃসংশয়, কিন্তু স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে অতটা নিশ্চিত নয়। আত্মা থাকলে পরমাত্মাও থাকে। বিন্দু থাকলে সিন্ধুও থাকে। অংশ থাকলে সমগ্রও থাকে। নামকরণটা ভগবান না হয়ে আর কিছু হতে পারে। নিজের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে বলেই বিনু ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তবে তাঁর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারে না। তিনি কি একজন ব্যক্তি না একটি শক্তি না একটা বিধান, যাঁর দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত? উপনিষদে ব্রহ্মকে তৎ বলা হয়েছে। তৎ ক্লীবলিঙ্গ। মানুষ তাঁরই মতো একজনকে ভক্তি করতে চায়, ভালোবাসতে চায়, তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি তিনি একজন ব্যক্তি? একালের বৈজ্ঞানিকরা তা মানবেন না। তাঁরা বলবেন একটি শক্তি বা একটি বিধান। বিনু মনঃস্থির করতে অক্ষম।

সে প্রতিদিন প্রার্থনা করে, 'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।' যিনি তাকে নিয়ে যাবেন তিনি কি একজন ব্যক্তি নন যিনি সর্বশক্তিমান, সর্ববিধাতা? বিনুর বিশ্বাস তিনি তার অন্তরেও বিদ্যমান, বাইরেও বিরাজমান। বিনুও তাঁর অন্তরে বর্তমান, কিন্তু সে তাঁর বাইরে নয়। তাঁর সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে, সেটা আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সম্পর্ক—অনাদি ও অনন্ত।

মৃত্যুর পরে অমৃত আছে এই পর্যন্ত সে নিশ্চিত। পরলোক, পরকাল ও পরজন্ম সম্বন্ধে সে নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারে না। এসব থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে। আপাতত ইহকাল ও ইহলোকই সারসত্য।

বিনুর এক অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ছিলেন নিরীশ্বরবাদী গান্ধীপন্থী রবীন্দ্রভক্ত নেতা। তাঁর সহধর্মিণীও তাঁর সঙ্গে একমত। কথাপ্রসঙ্গে বন্ধুজায়া বিনুকে বলেন, 'ঈশ্বর নেই। তা বলে কি ধর্ম নেই? ধর্ম তো আছে।'

ধর্ম মানে এক্ষেত্রে হিন্দু ধর্ম বা মুসলিম ধর্ম নয়। বিশ্বজগৎকে যা ধারণ করে আছে সেই শাশ্বত বিধান। তার এক প্রিয় বন্ধু তাকে একদিন বলেছিল, 'হ্যাঁ রে, এই অত্যাচার কি চিরকাল চলবে? ধর্ম সইবে?' সে ঈশ্বরের নাম করে না, যদিও সে ঈশ্বর মানে।

ভারতের সাধারণ মানুষ কথায় কথায় ঈশ্বরের নাম ধরে না। ধর্মের উপর ছেড়ে দেয় অন্যায়ের প্রতিকার। কোনটা ধর্ম আর কোনটা অধর্ম এ বিষয়ে তাদের একটা সহজাত প্রত্যয় আছে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই। এক ইসলাম প্রচারক মৌলানা সাহেব বিনুর সঙ্গে দেখা করতে এসে বলেন, 'এটা ধর্মের দেশ।' তার মানে হিন্দু কিংবা ইসলাম নামক ধর্মের দেশ নয়, ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণতার দেশ। তিনি যেমন হিন্দুদের ধর্মপ্রাণতাকে শ্রদ্ধা করেন তেমনি হিন্দুদের অনেকে মুসলমানদের ধর্মপ্রাণতাকে শ্রদ্ধা করেন। বিনুদের বাড়ির বেড়ার ওপারে এক মুসলমান পরিবার বাস করতেন। বৃদ্ধ গৃহকর্তাকে বিনু বিশেষ শ্রদ্ধা করত। বিনুর বাবা তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি বসে তত্ত্বালোচনা করতেন। কেউ কাউকে ভজাবার চেষ্টা করতেন না। পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করতেন।

ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের অমিল আছে এটা সত্য, কিন্তু পূর্ণসত্য নয়। মিল আছে অনেক বেশি। বিনু মসজিদে গিয়েও আনন্দ পায়। বাল্যকালে মহরমের উৎসবে যোগ দিয়ে সমান আনন্দ পেয়েছে।

একালে যেমন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ সেকালে তেমনি বৈদিক ও বৌদ্ধের বিরোধ ছিল। সে-বিরোধ এখনও মেটেনি। একবার কালিম্পং শহরে এক বৌদ্ধ সভায় বিনুকে করা হয় সভাপতি। হঠাৎ এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর বচসা বেঁধে যায়। হিন্দু স্বামীজি বুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক কটূক্তি করেন। সভার সমাপ্তির পর স্বামীজি বিনুর কাছে এসে কৈফিয়ত দেন। তাঁর আপত্তির কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পাহাড়িয়াদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করছেন। ফলে বৌদ্ধদের সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে। নয়তো ওরা হিন্দুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করত। বিনুর মনে হল ধর্মীয় বিরোধের একটা বড়ো কারণ ধর্মের সঙ্গে ধর্মের অমিল নয়, দীক্ষিতদের সংখ্যা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। হিন্দুরাও দীক্ষাদান করে। অসমের অহমরা গোড়ায় ছিল বৌদ্ধ। পরে হয় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। শাক্ত আর বৈষ্ণবের বিবাদ এখনও মেটেনি। বৈষ্ণবরা কামাখ্যা মন্দিরে যান না। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে লেখা আছে খ্রিস্টান-মুসলমান ও বৌদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ। যদিও বুদ্ধকে বলা হয় বিষ্ণুর নবম অবতার।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের কোনো লক্ষণ নেই। আপাতত সর্বধর্মের সশ্রদ্ধ সহাবস্থানই যথেষ্ট প্রগতি। প্রত্যেক ধর্মকে অপরাপর ধর্মের ভিতর থেকে সার আহরণপূর্বক শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। গান্ধীজির প্রার্থনাসভা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সেখানে গীতা, কোরান, বাইবেল ও বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে পাঠ করা হত।

বাউলরা কিন্তু ধর্মগ্রন্থ বা ধর্মস্থানের ধার ধারে না। তারা প্রার্থনাও করে না, উপাসনাও করে না, পুজোও করে না। চন্ডীদাস বলে গেছেন সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। বাউলরা বলে এই মানুষে আছে সেই মানুষ। সেই মানুষ এই মানুষের মতো জরা ব্যাধি ও মরণের অধীন নয়। তবে তাঁকে মানুষ বলা কেন? কারণ মানুষই সকলের উপর। বৌদ্ধদের বিশ্বাস বুদ্ধ মানুষ হয়েও সব দেবতার উপরে। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব বৈদিক হিন্দু ঐতিহ্য নয়, অথচ ভারতীয়।

আধুনিককালে বৈজ্ঞানিকরা অতিপ্রাকৃতকে বিশ্বাস করেন না। ভগবান তাঁদের মতে অতিপ্রাকৃত, অতএব বিশ্বাসের অযোগ্য। মানুষের উপরেই তাঁদের বিশ্বাস। এই মানুষ বিবর্তনসূত্রে আরও উন্নত হবে, জরা ব্যাধি জয় করবে, কিন্তু মরণকে নয়। সেইখানেই মানবিকবাদের সীমাবদ্ধতা।

একবার কয়েকজন সোভিয়েট বুদ্ধিজীবী কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে বিনুর দেখা হয়। তাঁদের একজন বলেন তাঁরা আধ্যাত্মিকতার অভাব অনুভব করছেন। তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেন সেটি রিলিজিয়ন নয় স্পিরিচুয়ালিটি। তার বিপরীত শব্দ মেটিরিয়ালিজম। জৈনরা নিরীশ্বরবাদী, তাহলেও তারা আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী। তারা মেটিরিয়ালিস্ট নয়, অথচ কমিউনিস্টরা নিরীশ্বরবাদী আর সেইসঙ্গে

মেটিরিয়ালিস্ট। তারা একদিন-না-একদিন আধ্যাত্মিকতার অভাব বোধ করবেই। তার মানে কিন্তু রিলিজিয়নের বা ধর্মবিশ্বাসের অভাব নয়।

যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সত্যের অন্বেষণে জীবন উৎসর্গ করেন তাঁরাও আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য গোরা ভগবানে বিশ্বাস করতেন না, সত্যে বিশ্বাস করতেন। গান্ধীজি তাঁকে বলেন, 'সত্যই ভগবান।' তেমনি প্রেমই ভগবান। সৌন্দর্যই ভগবান। যাঁরা প্রেমের সাধনা বা সৌন্দর্যের সাধনা করেন তাঁরাও ভগবানেরই আরাধনা করেন। ভগবানে বিশ্বাস অনাবশ্যক।

বিনু যদি ইদানীং বিদেশে যেত তবে সেও কি দুঃখ করে বলত না যে তার নিজের দেশেও সত্যের অভাব, প্রেমের অভাব ও সৌন্দর্যের অভাব লক্ষিত হচ্ছে? একই কারণ মেটিরিয়ালিজমের প্রভাব। আজকাল সব দেশেই সবাই কম-বেশি মেটিরিয়ালিস্ট। ধর্মবিশ্বাস এই জলতরঙ্গ রোধ করতে পারছে না। তার পালটা প্রভাব আনুষ্ঠানিকতায় নিবদ্ধ হয়ে বীর্যহীন। ধর্মের সারবস্তু ছেড়ে তার খোলসটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৌলবাদ। যেমন মুসলিম আরবে, ইরানে, পাকিস্তানে তেমনি হিন্দু ভারতে। অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ জনতা গভীর কর্দমে পতিত হচ্ছে। তবে চিরকালের জন্য নয়।

মানুষের স্বয়ংসংশোধিকা শক্তিতে বিনুর বিশ্বাস অটল। একটা প্রজন্মের ভুল আর একটা প্রজন্ম সংশোধন করবে, একটা শতকের ভুল আর একটা শতক। তবে কতক মানুষকে সদা সজাগ থাকতে হবে। তারা অতন্দ্র প্রহরী।

নির্বাচিত ছোটোগল্প

নিমন্ত্রণ

প্রিয় নির্মল,

নিমন্ত্রণের জন্যে বহু ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। একা আসতে হবে না সস্ত্রীক? ওটা কি পুরুষদের পার্টি না mixed?

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তুমি জানতে চাও সস্ত্রীক আসবে না পরস্ত্রীক। এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম। তবে এটা পুরুষদেরই পার্টি, কাপুরুষদের নয়।

ইতি। তোমার
নির্মল

প্রিয় নির্মল,

রসিকতা রাখো। কাজের কথা হোক। যদি পুরুষদের পার্টি হয় তবে আমার স্ত্রী কী করে শুনলেন যে অন্য কোনো কোনো মহিলা যাচ্ছেন।

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তোমার স্ত্রী ঠিকই শুনেছেন। মহিলাদের জন্যে স্বতন্ত্র জায়গা হচ্ছে। তোমার স্ত্রীকেও নিমন্ত্রণ করা হবে।

ইতি। তোমার
নির্মল

দুই

প্রিয় ঝরণা,

শুক্রবার

তোমার নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় বসে থাকলে দেখছি প্রস্তুত হবার সময় পাব না। এক লাইন লিখে জানিয়ো তোমার মনে কী আছে।

ইতি। তোমার
হৈমন্তী

প্রিয় হৈমন্তী,

তুমি আমার নিমন্ত্রণলিপি পাওনি শুনে অবাক। তবে কি আমি নিমন্ত্রণ করিনি? তুমি কিন্তু এসো নিশ্চয়। তুমি না-এলে এত খাবার খাবে কে!

ইতি। তোমার

ঝরণা

প্রিয় ঝরণা,
আমি বুঝি কত খাবার খাই! অমনধারা চিঠি লিখলে আমি যাব না।
ইতি। তোমার
হৈমন্তী

প্রিয় হৈমন্তী,
রাগ করলে তো? আমি জানতুম তুমি রাগী মানুষ। কিন্তু যাই হও, এতটা ছোটোলোক হবে না যে নিমন্ত্রণ পেয়ে উপেক্ষা করবে।
ইতি। তোমার
ঝরণা

প্রিয় ঝরণা,
ছোটোলোক কারা? যারা স্বামীকে ডাকলে স্ত্রীকে ডাকতে ভুলে যায়, ডাকলে বলে এত খাবে। আমরা কেয়ার করিনে। বুঝলে?
ইতি। তোমার
হৈমন্তী

প্রিয় সোমনাথ,
নিমন্ত্রণ ক্যানসেল করতে বাধ্য হচ্ছি। কিছু মনে কোরো না।
ইতি। তোমার
নির্মল

প্রিয় নির্মল,
আমার স্ত্রীর কাছে লেখা তোমার স্ত্রীর চিঠি পড়তে দিচ্ছি। পড়ে ফেরত দিয়ো। দোষটা এ পক্ষের নয়।
ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,
আমার তো দশটি নয়, পাঁচটি নয়, একটি মাত্র স্ত্রী। দোষ যদি করেই থাকে তবু My wife—right or wrong!
ইতি। তোমার
নির্মল

তিন

প্রিয় নরেশ,

শনিবার

এই চিঠিগুলি পড়ে ফেরত দিতে ভুলো না। দেখলে তো কীরকম অযাচিত অপমান। তোমরা যদি ওবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাও তবে বুঝব তোমরা আমাদের বন্ধু নও।

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,
ব্যাপারটা সত্যি শোচনীয়। কিন্তু আমরা নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে ওরা ঠাওরাবে তোমরাই আমাদের উসকে দিয়েছ। তারচেয়ে এক কাজ করলে কেমন হয়? আমরা গিয়ে নির্মল ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে মিটমাটের চেষ্টা করি।
ইতি। তোমার
নরেশ

প্রিয় নরেশ,
তোমরা গিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করলে ওরা ঠাওরাবে আমরাই তোমাদের পাঠিয়েছি। আমরা তো দোষ করিনি, আমরা কেন দূত পাঠাব? তবে কি তোমার মতে আমরাই দোষী?
ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,
আরে না না। দোষী কেউ নয়। ওটা একটা misunderstanding। অমন কত হয়। আমরা চললুম বোঝাপড়া করতে।
ইতি। তোমার
নরেশ

পুনশ্চ। দুঃখের বিষয় বোঝাপড়া হল না। ওদের ধারণা ওদের ছোটোলোক বলে অপমান করা হয়েছে। ওরা ক্ষমাপ্রার্থনা প্রত্যাশা করে। চিঠিগুলি ফেরত পাঠাচ্ছি।
নরেশ

প্রিয় ডাক্তার সেন,
এই চিঠিগুলি দয়া করে পড়ে দেখবেন। আপনি যদি আমাদের সহায় না হন তবে আমরা এখানকার সমাজে সুবিচার পাব না। অগত্যা আপনার ক্লাব থেকে ইস্তফা দিতে হবে। কেমন আছেন? নমস্কার।
ইতি। আপনার
সোমনাথ বটব্যাল

প্রিয় মি. বটব্যাল,
চিঠিগুলি পড়ে দেখলুম। আমি তো এসব মানসিক অসুখের treatment জানিনে। কলকাতা গেলে ডাক্তার গিরীন বোসের সঙ্গে কনসাল্ট করে আসব। আপনি এই ক-টা দিন সবুর করুন। নমস্কার। আশা করি শারীরিক কুশল।
ইতি। আপনার
পুরন্দর সেন

প্রিয় ডা. সেন,

আমার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করলুম। অনুগ্রহ করে ক্লাবের ওয়ার্কিং কমিটিতে পেশ করবেন। কাল নির্মলের ওখানে পার্টি। সেখানে ক্লাবের অন্য সকল সদস্য থাকবেন, থাকব না শুধু আমি, এ দৃশ্য অসহ্য। নমস্কার।

ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

প্রিয় মি. বটব্যাল,

রবিবার

কী দুর্ভাগ্য! পার্টি তো ক্লাবে নয়। একজন সদস্যের বাড়িতে। আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে আসবেন, আপনার গৃহিণী আমার গৃহিণীর সঙ্গে। আপনাদের জন্যে এক জোড়া নিমন্ত্রণপত্র ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছি। বিকেলে তৈরি থাকবেন। আমরা তুলে নিয়ে যাব।

ইতি। আপনার

পুরন্দর সেন

প্রিয় ডা. সেন,

অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা প্রস্তুত থাকব।

ইতি। আপনার

সোমনাথ বটব্যাল

চার

প্রিয় সোমনাথ,

সোমবার

কাল যখন পার্টির মাঝখানে ডাক্তার সেনের call এল তখন তিনি উঠে যেতে বাধ্য হলেন। তখন তুমি কেন উঠে গেলে? অন্দরে তোমার স্ত্রীও উঠলেন কেন? ওটা কোন দেশি ভদ্রতা?

ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

কাল আমি তোমার বন্ধু হিসেবে যাইনি, গেছলুম ডাক্তার সেনের বন্ধু হিসেবে। তিনি যখন উঠলেন আমাকেও উঠতে হল। অন্দরে আমার স্ত্রীকেও। আর কোনো কারণ না থাকলেও এটা বোঝো যে আমরা ডাক্তারের গাড়িতে গেছলুম, তাঁর গাড়ি না পেলে কার গাড়িতে ফিরতুম?

ইতি। তোমার

সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

তোমার ও যুক্তি খোঁড়া। ডাক্তারের গৃহিণী যেভাবে ফিরলেন তোমরাও সেইভাবে ফিরতে। অর্থাৎ আমার গাড়িতে। তোমাদের ব্যবহার দেখে সবাই হেসেছে। খেতে বসে খাবার ফেলে ডাক্তারের সঙ্গে চোঁচা দৌড়! যেন তোমাদেরই বাড়িতে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট।

ইতি। তোমার

নির্মল

প্রিয় নির্মল,

তুমি তো আমার বেশ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু! অ্যাক্সিডেন্ট কামনা করছ? যদি কোনো অমঙ্গল ঘটে তবে তোমারই কুচিন্তায়।

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় ডাক্তার সেন,

মঙ্গলবার

এই চিঠিগুলি পড়ে দেখবেন। আপনি যদি এর বিহিত না করেন তবে আমি কোনো উকিলের পরামর্শ নেব। অপমানের ওপর অপমান।

ইতি আপনার
নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি. কাঞ্জিলাল,

আপনি কিছুদিন সবুর করলে আমি কলকাতা গিয়ে ডাক্তার গিরীন বোসের সঙ্গে কনসাল্ট করে আসতে পারি। 'সস্ত্রীক', 'পরস্ত্রীক', 'দশটি নয় পাঁচটি নয়, একটিমাত্র স্ত্রী'—এসব যদি আদালতে যায় তবে খবরের কাগজের খোরাক জুটবে।

ইতি। আপনার
পুরন্দর সেন

প্রিয় ডা. সেন,

এসব আপনি কোথায় পেলেন? তবে কি সোমনাথ আপনাকে আমার চিঠিগুলি দেখিয়েছে? তা যদি করে থাকে তবে দেখছি সমস্ত প্রকাশ করতে হবে। বিয়ের আগে সে যেসব কেলেঙ্কারি করেছে সেসব যদি শোনেন তবে লোকটাকে ক্লাবে ঢুকতে দিয়েছেন বলে অনুতাপ করবেন।

ইতি। আপনার
নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি. কাঞ্জিলাল,

আসুন আমার বাড়িতে চা খেতে আপনারা চারজনে। আমি মিটিয়ে ফেলি এই অরুচিকর ব্যাপার।

ইতি। আপনার
পুরন্দর সেন

প্রিয় ডা. সেন,

সোমনাথের জন্যেই আমাকে দু-দুটো আলাদা পার্টি করতে হয়। ওকে মহিলাদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমার স্ত্রী তো ওর ভয়ে ক্লাবে পর্যন্ত যান না।

ইতি। আপনার
নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি. কাঞ্জিলাল,

তা হলে আমার কিছু করবার নেই, আপনি উকিলের পরামর্শ নিন। কিন্তু তার আগে দু-বার ভেবে দেখবেন।

ইতি। আপনার
পুরন্দর সেন

প্রিয় ডা. সেন,

আমার ইস্তফাপত্র প্রেরণ করছি। ক্লাবের সদস্য থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ইতি। আপনার
নির্মলচন্দ্র কাঞ্জিলাল

প্রিয় মি. কাঞ্জিলাল,

আপনারা সবাই সমান ছেলেমানুষ। ক্লাবের কী অপরাধ! আপনার ইস্তফাপত্র নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হবে তখন আমি সমস্ত খুলে বলতে বাধ্য হব। তার চেয়ে আসুন আজ বিকেলে আমার সঙ্গে চা খেতে। মি বটব্যালকেও আসতে লিখছি। মহিলাদের না আনলেও চলবে।

ইতি। আপনার
পুরন্দর সেন

পাঁচ

প্রিয় নির্মল,

বুধবার

কাল ডাক্তারের ওখানে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তুমি এলে না। শুনলুম আমার চরিত্র সম্বন্ধে এখনও তোমার মনে অবিশ্বাস আছে। কী করলে অবিশ্বাস দূর হবে বলতে পার?

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

ঠিকই শুনেছ। অবিশ্বাস দূর হবে কী করলে, বলব? যদি তুমি বিদ্যাসাগরী ধরনে মাথার চুল ছেঁটে চার্লি চ্যাপলিনের মতো তিন ভাগ গোঁফ কামাতে পার, যদি তুমি মাদ্রাজিদের মতো ধুতি কিংবা লুঙ্গি পরে টাই কলার আঁটতে পার, তাহলেই বিশ্বাস করে তোমাকে ঘরে ডাকব।

ইতি। তোমার
নির্মল

প্রিয় নির্মল,

এই চিঠির সঙ্গে আলাদা একটি মোড়কে কামানো গোঁফ ও ছাঁটা চুল পাঠালুম। বিশ্বাস না হয় সশরীরে হাজির হতে রাজি।

ইতি। তোমার
সোমনাথ

প্রিয় সোমনাথ,

অ্যাঁ, এসো, এসো, আজকেই বিকেলে।

ইতি। তোমার
নির্মল

ছয়

প্রিয় সোমনাথদা,

বৃহস্পতিবার

কাল তোমাকে দেখে এত খারাপ লাগল। কেন তুমি অমন করে সং সাজতে গেলে? এ চিঠি ছিঁড়ে ফেলো।

ইতি। তোমার নয়
ঝরণা

ঝরণা, ঝরণা, সুন্দরী ঝরণা,

কেন তা কি তুমি বুঝতে পারনি? পাঁচ বছর তোমাকে চোখে দেখিনি, এক বছর এক শহরে থেকেও না। দেখে সুখী হয়েছি। তেমনি ঝরণাই আছ। থেকো। এ চিঠি রেখো না।

ইতি শুভানুধ্যায়ী
সোমনাথদা

সোমনাথদা,

তুমি এখন বিবাহিত। হৈমর প্রতি তোমার কর্তব্য রয়েছে। তার মনে না জানি কত কষ্টই হচ্ছে তোমার ওই বিদ্ঘুটে চেহারা দেখে। তুমি আর এসো না। চিঠি ছিঁড়ে ফেলো।

ইতি। হিতৈষিণী
ঝরণা

ঝুনু,

হৈম সমস্ত জানে। আমার চেহারা দেখে তোমার খুব খারাপ লাগবে, এই আনন্দেই সে আমাকে বাঁদর সাজিয়েছিল। বলেছে, আবার যদি আমি তোমাকে দেখতে যাই তাহলে আমার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দেবে। সুতরাং আর যাব না।

ইতি। তোমার কল্যাণার্থী
সোমনাথদা

সাত

প্রিয় সোমনাথ,

শনিবার

কাল আমার এখানে আবার পার্টি। এবার mixed। এবার আমি আপনি গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসব আমার মোটরে। বিকেলে তৈরি থেকো।

ইতি। তোমার
নির্মল

দু-কান কাটা

সেইসব সুন্দর ছেলেরা আজ কোথায়, যাদের নিয়ে আমার কৈশোর সুন্দর হয়েছিল! মাঝে মাঝে ভাবি আর মন কেমন করে।

একজনকে মনে পড়ে। তার নাম সুকুমার। গৌরবর্ণ সুঠাম তনু, একটুও অনাবশ্যক মেদ নেই অথচ প্রতি অঙ্গে লালিত্য। চাঁদের পিছনে যেমন রাহু তেমনি চাঁদপানা ছেলেদের পিছনে রাহুর দল ঘুরত। তাদের কামনার ভাষা যেমন অশ্লীল তেমনি স্থূল। তাদের স্থূলহস্তাবলেপে সুকুর গায়ে আঁচড় লাগত। তা দেখে যাদের বুকে বাজত তাদের জনাকয়েক মিলে একটা দেহরক্ষা বাহিনী গড়েছিল। আমাদের কাজ ছিল তাকে বাড়ি থেকে ইস্কুল ও ইস্কুল থেকে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। আমরা নিঃস্বার্থ ছিলুম না। যে রক্ষক সেই ভক্ষক। সুকু তা জানত, তাই আমাদের প্রশ্রয় দিত না। তার দরুন আমার অভিমান ছিল। থাকবে না? রাহুদের একজন আমার ডান হাতে এমন মোচড় দিয়েছিল যে আর একটু হলে হাতটা যেত। যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।

ক্বচিৎ তাকে একা পেতুম। পেলেই আমার বুকভরা মধু তার কানে ঢালতে ব্যগ্র হতুম, কিন্তু তার আগেই সে পাশ কাটিয়ে যেত। সে যে আমার প্রকৃত পরিচয় জানল না একথা ভেবে আমার চোখে জল আসত। সময়ে অসময়ে তাই তাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতুম। ভিতরে ঢুকতে ভরসা হত না। কারণ সুকু একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুই আমাদের বাড়ি অতবার আসিসনে, খোকন।'

তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কেন এই রূঢ়তা। পরে বুঝেছি ওটা রূঢ়তা নয়। সুকুর বাবা মফস্সলে গেলে তার মা-র সঙ্গে তার ঠাকুমার বচসা বাঁধত। খোঁপা আর এলোচুলের সেই বচসা শুনে পাড়ার লোক জুটত তামাশা দেখতে। এতে সুকুর মাথা কাটা যেত। তার বাবা যখন ফিরতেন, মা-র কথায় কান দিতেন না, ঠাকুমার কাহিনি বিশ্বাস করতেন। মাকে দিতেন মার। তা দেখে সুকুর ভাইবোন বাবার পা জড়িয়ে ধরত, কিন্তু সুকু এত লাজুক যে লুকিয়ে কাঁদত। প্রতিবার মা ঘোষণা করতেন তিনি বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাক্স বিছানা নিয়ে সত্যি সত্যি বাইরের বারান্দায় দাঁড়াতেন। রাজ্যের লোক জড়ো হত তাঁকে দেখতে ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। এতে সুকুর বাবার মাথা কাটা যেত, সুকুরও। চাকর এসে বলত, 'মা, একখানাও ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া গেল না।' তা শুনে ঝি বলত, 'আর একটা দিন থেকে যাও মা। কথা রাখো।' সেদিনকার মতো মা যাওয়া মুলতুবি রাখতেন। প্রতি মাসেই এই ব্যাপার। দুজনেই সমান মুখরা, যেমন মা তেমনি ঠাকুমা। একদিন সুকুর মা এমন মার খেলেন যে গাড়ির অভাবে পেছপাও হলেন না, দুনিয়ার লোকের চোখের উপর ঘোমটা টেনে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন ও পায়ে হেঁটে রেলস্টেশনে গেলেন।

সুকুর ভাইবোন লোকলজ্জায় তাঁর সাথি হল না, কিন্তু সবচেয়ে লাজুক যে সুকু সে-ই তাঁর হাত ধরে পথ দেখানোর ভার নিল। কাজটা সুকুর মা ভালো করলেন না। সুকুর বাবার মাথা হেঁট হল। তিনি সেই হেঁট মাথায় টোপর পরে শোধ তুললেন। খবরটা যখন সুকুর মা-র কানে পড়ল তিনি কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেলেন। সবাই মিলে তাঁকে ধরে এনে ঘরে বন্ধ করে রাখল। তখন থেকে তিনি নজরবন্দি।

মামারা সুকুকে ইস্কুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেইস্কুলে যাবার নাম করে সেই যে বেরোত, ফিরত রাত করে। কেউ তাকে বকতে সাহস করত না, পাছে সে আত্মঘাতী হয়। শিবপুর হাটের তিনদিকে নদী। যেদিকে দু-চোখ যায় সেদিকে গেলে প্রায়ই নদীর ধারে পা আটকে যায়! সুকু পা ছড়িয়ে বসে, গা ঢেলে দেয়। কত নৌকো স্রোতের মুখে ভাসছে, উজান বেয়ে আসছে। কোনোটাতে চালের বস্তা, কোনোটাতে নতুন হাঁড়ি-কলসি, কোনোটাতে ঝুনো নারকেল। ছইয়ের চার কোণে মাকাল ফল দুলছে, ছইয়ের ভিতর ডাবা হুঁকো

ঝুলছে। নৌকোর গায়ে কতরকম নকশা। নকশার কতরকম রং। নৌকোও কতরকম—জেলেদের ডিঙি, বারোমেসেদের নাও, গয়নার বোট, আরও কত কী। বাংলার প্রাণ নদী, নদীর প্রাণ নৌকো, নৌকোর প্রাণ মাঝি, মাঝির প্রাণ গান। সুকু একমনে গান শোনে আর গুনগুন করে সুর সাধে। এতেই তার শান্তি, এই তার সান্ত্বনা।

একদিন মেলা লোক যাচ্ছিল মেলা দেখতে। রঘুনাথপুরে রামনবমীর মেলা। তা বলে শুধু রামায়েত বৈষ্ণবরা নয়, নিমাইত বৈষ্ণবরাও আসে। নানা দিগদেশ থেকে জমায়েত হয় আউল-বাউল দরবেশরাও। একদল কীর্তনিয়া গান করতে যাচ্ছে দেখে সুকুও তাদের নৌকোয় উঠে বসল। মেলায় গিয়ে সে দলছাড়া হল না, সে যদি-বা ছাড়তে চায় দলের লোক ছাড়ে না! তারা একটা গাছতলা দেখে আস্তানা গাড়ল। সেখানে জোল কেটে বড়ো বড়ো হাঁড়ি চাপিয়ে দিল। কুটনো কুটতে বসল দলের মেয়েছেলেরা। বলতে ভুলে গেছি, দলের কর্তা যিনি তিনি পুরুষ নন, নারী। তাঁর নাম হরিদাসী। হরিদাসী নাম শুনে সুকু ধরে নিয়েছিল হিন্দু, আপনারাও সে-ভুল করতে পারেন। তাই বলে রাখছি তিনি মুসলমান দরবেশ। তাঁর দলের পুরুষদের নাম শুনে মালুম হয় না মুসলমান না হিন্দু। ইসব শা-ও আছে, আবার মনু শা-ও আছে। সুকু ধরে নিয়েছিল ওরা সকলেই হিন্দু, তাই আহার সম্বন্ধে দু-বার ভাবেনি। কেবল পানের সময় 'পানি' কথাটা শুনে একটু খটকা বেঁধেছিল।

হরিদাসীরা মউজ করে রাঁধে বাড়ে খায় আর গান করে। সুকুও তাদের শরিক। তার গলা শুনে হরিদাসী তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোর হবে।' এতদিন জীবন বিস্বাদ লাগত, এতদিনে স্বাদ ফিরল। সুকুর চোখে পৃথিবীর রূপ গেল বদলে। যেদিকে তাকায় সেদিকে রূপের সাগর। কানে ঢেউ তোলে হরিদাসীর কণ্ঠধ্বনি—

> এমন ভাবের নদীতে সই ডুব দিলাম না।
> আমি নামি নামি মনে করি মরণ-ভয়ে নামলাম না।

মেলা ভাঙল। সুকুরও ভয় ভাঙল। মামারা যদি তাড়িয়েই দেন তবে তার আশ্রয়ের অভাব হবে না। তখনও সে জানত না যে ওরা মুসলমান, জানল শিবপুর হাটে অন্যের মুখে। তখন তার আরও একটা ভয় ভাঙল, জাতের ভয়। সে মনে মনে বলল, আমার জাত যখন গেছেই তখন দুঃখু করে কী হবে। যার জাত নেই তার সব জাতই স্বজাত। ওরা আমার আপনার লোক, আমিও ওদের।

দুই

অনুমতি না নিয়ে মেলায় যাওয়া, সেখানে মুসলমানের ভাত খাওয়া, এসব অপরাধের মার্জনা নেই। মামারা মারলেন না, বকলেন না, কিন্তু থালাবাসন আলাদা করে দিলেন। সেসব মাজতে হল সুকুকেই। তাতে তার আপত্তি ছিল না। বরং দেখা গেল তাতেই তার উৎসাহ। মামিমাদের কাছ থেকে সিধা চেয়ে নিয়ে সে নিজেই শুরু করে দিল রাঁধতে। কলাপাতা কেটে নিয়ে এসে উঠোনের এক কোণে খেতে বসে। কেউ কাছে গেলে সবিনয়ে বলে, 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, জাত যাবে।' তার দশা দেখে তার মা দু-বেলা কাঁদেন। একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না করলেই নয়, মামারা স্বীকার করলেন। তা শুনে সুকু বেঁকে বসল। বলল, 'মুসলমানের ভাত আরও কত বার খেতে হবে। ক-বার প্রায়শ্চিত্ত করব? গোবর কি এত মিষ্টি যে বার বার খেতে হবে।'

মামাবাড়ি থেকে চিঠি গেল বাবার কাছে। ইতিমধ্যে সৎমার হয়েছিল যক্ষ্মা, তাকে নিয়ে ঘরসংসার করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। সুকুর বাবা একটা ছল খুঁজছিলেন সুকুর মা-কে ফিরিয়ে আনবার। চিঠি পেয়ে আপনি হাজির হলেন। সুকুকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।' স্ত্রীকে বললেন, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। আর তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। এসো আমার সঙ্গে।'

আবার সুকুদের বাড়িতে আনন্দের হাট বসল। আমরা তার পুরোনো বন্ধুরা তাদের ওখানে দিনরাত আসর জমালুম। এবার সে আমাদের বারণ করে না, করলেও আমরা মানতুম না। এ বলে আমার সুকু, ও বলে

আমার সুকু। সুকু যেন প্রত্যেকের একান্ত আপন। ওর বাবা যদি ওকে ইস্কুলে ভরতি না করে দিতেন আমরা রোজ রোজ ইস্কুল কামাই করে বিপদে পড়তুম।

শিবপুর হাটের সেই যে অভ্যাস, সুকু সে-অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পারল না। কখন একসময় ক্লাস থেকে পালায়, আমরা চেয়ে দেখি সে নেই। আমাদের মহকুমা শহরে নদী আছে নিশ্চয়, কিন্তু নদীর ধারে ঘনবসতি, সুকুর তাতে অরুচি। সে যায় আউল দরবেশ বৈষ্ণবের সন্ধানে। ফকির দেখলেই সঙ্গ নেয়। তাদের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যার পরে বাড়ি আসে। আমরা ততক্ষণ তার জন্যে ভেবে আকুল। তার খোঁজ নিতে এক একজন এক একদিকে বেরোয়, পেলেও তাকে ডেকে সাড়া মেলে না। আমরা যেন তার আপনার লোক নই, যত রাজ্যের ফেরার আসামি ভেক নিয়েছে বলে ওরাই হয়েছে তার আপনার। সুকু যে ওদের মধ্যে কী মধু পায় আমরা তা বুঝিনে। যত সব সিঁদেল চোর আর জাঁহাবাজ চোরনি গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে বেড়ায় কার কী সম্পত্তি আছে সেই খবরটি জানতে। তারপরে একদিন নিশুতি রাতে গৃহস্থের সর্বস্ব চুরি যায়।

সুকুকে আমরা সাবধান করে দিই যেকোনো দিন চোর বলে সন্দেহ করে পুলিশ তার হাতে হাতকড়ি পরাবে। সে বলে, 'সন্দেহ মিটলে খুলেও দেবে।' আমরা বলি, 'কিন্তু কলঙ্ক তো ঘুচবে না। মুখ দেখাবি কী করে?' সে বলে, 'ওরা যেমন করে দেখায়।' ওরা মানে বাউল বোষ্টমরা।

সুকুর জন্যে আমাদের লজ্জার সীমা রইল না, দেখা গেল আমরাই ওর চেয়ে সলাজ। ওর সঙ্গে মিশতে আমাদের সংকোচ বোধ হল। প্রকাশ্যে মেলামেশা বন্ধ হয়ে এল, গোপনে মেলামেশা চলল।

হেডমাস্টারমশাই ছিলেন সুকুর বাবার বন্ধু। তিনি পরামর্শ দিলেন ওকে বোর্ডিং-এ রাখতে। ওর বাবা একদিন ওকে বোর্ডিং-এ রেখে এলেন। ওর তাতে আপত্তি নেই, বরং ছত্রিশ জাতের সঙ্গে পঙক্তিভোজনের আশা। আমরা কিন্তু হতাশ হলুম। বোর্ডিং-এর পাশেই হেডমাস্টারমশায়ের কোয়ার্টার। তাঁর চোখে ধুলো দিয়ে যে সুকুর কাছে যাওয়া-আসা করব সে-সাহস ছিল না।

কিছুদিন পরে এক মজার ব্যাপার ঘটল। হেডমাস্টারমশাই একদিন স্বকর্ণে শুনলেন দুটি বালখিল্য বালক ফুর্তিসে গান করছে—

> যৌবন জ্বালা বড়োই জ্বালা সইতে না পারি
> যৌবন জ্বালা তেজ্য করে গলায় দিব দড়ি।
> দুঃখ রে যৌবন প্রাণের বৈরী।

মশাই তো দুই হাতে দুজনের কান ধরে টেনে তুললেন। অন্তরিক্ষে দোদুল্যমান ওই দুটি প্রাণী অবিলম্বে কবুল করল যে সুকুই ওদের ও-গান শিখিয়েছে। তখন তিনি সুকুকে তলব করলেন। সুকু বলল, 'সব সত্যি। দোষ ওদের নয়, আমার।'

মশাই বললেন, 'গোল্লায় যদি যেতে হয় তবে সদলবলে কেন? তুমি একা যাও।' এই বলে একটা গাড়ি ডেকে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

সেও বাঁচল, আমরাও বাঁচলুম। তার বাবা কিন্তু তাকে নিয়ে মুশকিলে পড়লেন। ঘরে আটক করে রাখলে পড়াশোনা মাটি। ইস্কুলে যেতে দিলে সে ঠিকানা হারিয়ে ফেলে। যাদের কাছে পাঠ নেয় তারা মাস্টার নয়, বাউল ফকির। কিছুদিন তিনি নিজেই তাকে বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়ে এলেন, সেখানে তার ওপর কড়া পাহারার বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সে অঙ্কের খাতায় ইতিহাস ও ইতিহাসের খাতায় সংস্কৃত লিখে শিক্ষকদের উক্ত্যক্ত করে তুলল। এটা যে তার ইচ্ছাকৃত তা নয়। সে নিজেই বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। আসলে তার মন ছিল না পাঠে।

সুকুর মা তার বাবাকে বললেন, 'জানি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু সেকালে কর্তারা এরকম স্থলে গিন্নিদের উপদেশ নিতেন।'

'শুনি তোমার উপদেশটা কী?'

‘আমার ঠাকুরদার বিয়ে হয়েছিল ষোলো বছর বয়সে। সুকুর বয়স পনেরো হলেও ওর যেমন বাড়ন্ত গড়ন —’

সুকুর বাবা হেসে উড়িয়ে দিলেন।

তিন

ম্যাট্রিকে সুকু ফেল করল। আমি পাস। বাধ্য হয়ে আমাকে বড়ো শহরে যেতে হল। ভরতি হলুম কলেজে। চিঠি লিখে সুকুর সাড়া পেতুম না। ওর সঙ্গে দেখা হত ছুটিতে।

দিন দিন ব্যবধান বাড়তে থাকে। আমি যদি বলি ‘তুই’, সুকু বলে ‘তুমি’। আমার কষ্ট হয়। ডাকলে আসে, না ডাকলে খোঁজ করে না। গেলে দেখা দেয়, কিন্তু প্রাণ খুলে কথা কয় না। একদিন আমি কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলুম, ‘সুকু, আমি কি তোর পর?’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘তা নয়। আমি হলুম ফেল করা ছেলে। আর তুমি—’

আমি তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলুম, ‘তোর জন্যে আমার সবসময় দুঃখ হয়।’

‘কিন্তু আমি তো মনে করি আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। যেখানে যাই সেখানেই আমার ঘর, সেখানেই আমার আপনার লোক।’

বাউল ফকির দরবেশদের ও বলত আপনার লোক। ওরাও ওকে দলে টানত। রতনে রতন চেনে। আমাদের চোখে সুকু একটা ফেল করা ছেলে, ওর পরকালটি ঝরঝরে। ওদের চোখে সুকু একজন ভক্ত। গুরুর কৃপা হলে একদিন পরমার্থ পাবে। আমাদের হিতৈষীপনার চেয়ে ওদের হিতৈষিতাই ছিল ওর পছন্দ।

হাজার হলেও আমি ওর পুরোনো বন্ধু। বোধহয় তার চেয়েও বেশি। সুকু সেটা জানত, তাই আমাকে যত কথা বলত আর কাউকে তত নয়। তাকে দিয়ে কথা-বলানো একটা তপস্যা। গান করতে বললে দেরি করে না, কিন্তু মনের কথা জানাতে বললে দশ বার ঘোরায়।

সুকু নিজেকে সকলের চেয়ে সুখী বলে দাবি করলেও আমার অগোচর ছিল না যে ওর ভিতরে আগুন জ্বলছে আর সে-আগুনে ও পুড়ে খাক হচ্ছে। কাকে যে ভালোবেসেছে, কে যে সেই ভাগ্যবতী তা আমাকে জানতে দিত না। আমি অবশ্য অনুমান করতুম কিন্তু পরে বুঝেছিলুম সেসব অনুমান ভুল।

নায়িকা-সাধন বলে ওদের একটা সাধনা আছে। সুকু নিয়েছিল ওই সাধনা। প্রত্যেক নারীর মধ্যে রাধাশক্তি সুপ্ত রয়েছে। সেই শক্তি যখন জাগবে তখন প্রতি নারীই রাধা। যেকোনো নারীকে অবলম্বন করে রাধাতত্ত্বে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু সে-নারীর সম্মতি পাওয়া চাই। সুকু একজনের সম্মতি পেয়েছে এইখানেই তার গর্ব। এইজন্যেই সে বলে তার মতো সুখী আর কেউ নয়। অথচ তার মতো দুঃখী আর কেউ নয়। ভদ্রলোকের ছেলে ছোটোলোকদের সঙ্গে খায়দায়, গায়-বাজায়, শোয়া-বসা করে। ওকে নৌকো বাইতে, গোরুর গাড়ি চালাতে, ঘর ছাইতে দেখা গেছে। ওর বাবা সম্মানীয় ব্যক্তি। তাঁর মাথা হেঁট। তিনি কিছু বলতে পারেন না এই ভেবে যে ইতিমধ্যে তাঁর ছোটোবউ মরেছেন, ছেলেকে শাসন করলে যদি বড়োবউ আবার বাপের বাড়ি যান তবে আর একবার টোপর পরার মতো বল বয়স নেই। মুখে বলেন, ‘ওটাকে ত্যাজ্যপুত্র করতে হবে দেখছি।’ কিন্তু ভালো করেই জানেন যে সুকু তাঁর সম্পত্তির জন্যে লালায়িত নয়। সুকুর মা ওকে বকেন। কিন্তু বকলে সুকু বাইরে রাত কাটায়। তখন তিনিই ওকে আনতে পাঠান।

মজনু ফকির ওর গুরু। গুরুর উক্তি ও সুকুর প্রত্যুক্তি কতকটা এইরকম—

‘বাবা, কাঁদতে জনম গেল। যদি সুখের পিত্যেশ পুষে থাক তবে আমার লগে আইসো না। আমি তোমায় সুখের নাগাল দিতে নারব।’

‘আমি চোখের জলে মানুষ হয়েছি। কাঁদতে কি ডরাই?’

‘সারা জনম কাঁদতে রাজি আছ?’

‘আছি।’

‘আমায় দুষবে না?’

‘না, হুজুর।’

‘তবে তুমি সুখের সন্ধান ছেড়ে রাধার সন্ধানে যাও। সে যদি সুখ দেয় নিয়ো। যদি দুখ দেয় নিয়ো। কিছুতেই ‘না’ বোলো না। তার ছলকলার অন্ত নেই। তেঁই তোমায় বলি, কাঁদতে জনম গেল রে মোর কাঁদতে জনম গেল।’

সুকু সেই যে ফেল করল তারপরে আর পরীক্ষা দিল না। তার পড়াশুনা সেইখানেই সাঙ্গ হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে পরীক্ষা দিতে হল, সে-পরীক্ষা মাত্র একজনের কাছে। সে-একজন তার নায়িকা। তার গুরুই তাদের পরিচয় ঘটিয়ে দেন, এইটুকু আমি জানি, এর বেশি জানিনে। আর যা জানি তা লোকমুখে শোনা। লোকের কথা আমি বিশ্বাস করিনে, যদিও ল্যাটিন ভাষায় প্রবাদ আছে লোকের কথাই ভগবানের কথা।

একবার ছুটিতে বাড়ি এসে শুনি সুকু নিরুদ্দেশ। লোকে বলাবলি করছে সারী বোষ্টমি ওকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। মেয়েটি নাকি প্রথমে ছিল মোদকদের বউ। অল্প বয়সে বিধবা হয়। পরে এক বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবনে যায়, সেখানে বেশ কিছুকাল থেকে চালাকচতুর হয়। বৈষ্ণবটির কৃষ্ণপ্রাপ্তি হলে দেশে ফিরে সারী তাঁর বিষয়-বাড়ি ভোগদখল করে। তারপর থেকে সুন্দর ছেলে দেখলেই সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সর্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। গুণের মধ্যে সে গাইতে পারে অসাধারণ। গান দিয়েই প্রাণ মজায়। ছেলেদের অভিভাবকেরা অবশেষে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করেন। তখন জায়গাজমি বিক্রি করে বৈষ্ণবী একদিন নিখোঁজ হয়। তার সঙ্গে সুকুও। সুকুর বাবা থানা-পুলিশ করেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। কিছুতেই কিছু হয় না। তার মা কাতর হয়ে পড়েন।

সুকুর বাবা বললেন, ‘খোকন, তুমি তো পাস করলে, জলপানি পেলে, আমার ছেলেটি কেন অমন উচ্ছন্ন গেল! ছি ছি, একটা নষ্ট মেয়েমানুষের...’ তিনি মাথা হেঁট করলেন। রুমালে চোখ মুছলেন।

সুকুর মা বললেন, ‘যে-ছেলে মা-র সঙ্গে বনবাসী হয় সেকি তেমন ছেলে! আমার মন বলে সুকু আমার কোনো কুকাজ করেনি। ওর সবটাই সু। কিন্তু কেন আমাকে বলে গেল না? আর কি ফিরবে!’

চার

পরবর্তীকালে সুকুর মুখে প্রকৃত বিবরণ শুনেছি। সব মনে নেই, যেটুকু মনে আছে লিখছি। সুকু, এ লেখা যদি কোনোদিন তোমার চোখে পড়ে, যদি এতে কোনো ভুলচুক থাকে, তবে মাফ কোরো।

ওর নাম সারী, তাই সুকুকে ও শুক বলে ডাকত। শুক দেখতে সুন্দর, সারী তেমন নয়। কিন্তু সারী রসের ঝারি, শুক শুকনো কাঠ। বৃন্দাবনে থাকতে সারী হিন্দি বলতে শিখেছিল, যাত্রীদের সঙ্গে মিশে দু-চারটে ইংরেজি বুকনিও! হিন্দি ও বাংলা গান যখন যেটা শুনত তখন সেটা কণ্ঠসাৎ করত। এমন একটি গায়িকা নায়িকা পেয়ে সুকু ধন্য হয়েছিল। সারী ও শুকের মতো দুজন দুজনের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গানের সুধা পান করত। সুকুও জানত কত বাউল ফকিরের গান, সারীকে শোনাত।

সুকুর মতো আরও অনেকে আসত সারীর কাছে, তারাও আশা করত সারী তাদের আদর করবে! করত আদর, কিন্তু সে-আদর নিতান্তই মৌখিক। রসের কথা বলে সারী তাদের ভোলাত। যাকে বলে সর্বনাশ সেটা অতিরঞ্জিত। এমনকী সুকুর বেলাও।

সারীর নামে যারা নালিশ করেছিল তাদের লোভ ছিল জমিখানার ওপরে। কারো কারো লালসা ছিল নারীর প্রতিও। হতাশ লোলুপের দল অভিভাবকদের সামনে রেখে হাকিমের এজলাসে দাঁড়ায়। তখন সারীকে সম্পত্তির মায়া কাটিয়ে শহর ছেড়ে যেতে হয়। সুকুর মতো আর যারা আসত তারা সেই দুর্দিনে তার সহায় হল না, যে যার পথ দেখল। কিন্তু সুকু তাকে ছাড়ল না, হাতে হাতে রেখে বলল, ‘একদিন মা-র সঙ্গে গেছলুম, আজ তোর সঙ্গে যাব।’

সারী বলল, ‘আমি কি তোর মা!’

সুকু বলল, ‘মাকে যেমন ভালোবাসতুম তোকেও তেমনি ভালোবাসি।’

সারী রসিয়ে বলল, ‘তেমনি?’

সুকু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ‘দূর। তেমনি মানে কি তেমনি?’

‘তবে কেমনি?’ সারী রঙ্গ করল।

‘এমনি।’ বলে সুকু বুঝিয়ে দিল।

তখন তারা পরস্পরের কানে মুখ রেখে একসঙ্গে গান ধরল—

আশা করি বান্ধিলাম বাসা,
সে আশা হৈল নিরাশা,
মনের আশা।
ও দরদি, তোর মনে কি এই সাধ ছিল!

তারপরে রাত থাকতে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সারীর এক সই ছিল, বিনোদা গোপিনী। গ্রামে তার বাড়ি। সারী ও শুক সেইখানে নীড় বাঁধল।

বিনোদা বলে, ‘সই, তোর সঙ্গে কি ওকে মানায়! ও যে তোর ভাইয়ের বয়সি।’

সারী বলে, ‘গোপালও ছিল গোপীদের ছোটোভাইয়ের বয়সি। কারো কারো ছোটো ছেলের বয়সি।’

বিনোদা মুখ বেঁকিয়ে বলে, ‘আ মরো! কার সঙ্গে কার তুলনা।’

সারী মাথা দুলিয়ে বলে, ‘যা বলেছিস। তোর বরের সঙ্গে আমার বরের তুলনা!’

আসলে সারীর বয়স অত বেশি নয়, ওটা বিনোদার বাড়াবাড়ি। বিনির মনে কী ছিল তা কিছুদিন পরে বোঝা গেল। সে চেয়েছিল তার দেওরের সঙ্গে সারীর কণ্ঠিবদল ঘটাতে।

সারী অবশ্য ও-প্রস্তাব কানে তুলল না। ফলে বিনোদার আশ্রয় দিন দিন তিক্ত হয়ে উঠল। একদিন শুক-সারী নীড় ভেঙে উড়ে গেল।

এবার গেল ওরা সুকুর চেনা এক দরবেশের বাড়ি। আহার সম্বন্ধে সুকুর বাছবিচার ছিল না, সারীর ছিল। ওরা আলাদা রাঁধে খায়, শুধু ফটিকচাঁদের আখড়ায় থাকে।

দরবেশ অতি সজ্জন। তাঁর ওখানে যারা আসে তারাও লোক ভালো, কিন্তু কী জানি কেন সারীর সন্দেহ জাগল সুকু তাদের একটি মেয়ের প্রতি মুগ্ধ। সুকু সুপুরুষ বলে সারী তাকে সযত্নে পাহারা দিত। অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা কইতে দেখলে চোখা চোখা বাণ হানত।

তখন সুকুই অনুনয় করল, ‘চল, আমরা এখান থেকে যাই।’

সারী অভিমানের সুরে বলল, ‘কেন, আমি কি যেতে বলেছি?’

‘না, তুই বলবি কেন! আমিই বলছি। এক জায়গায় বেশিদিন থাকলে টান পড়ে যায়। সেটা কি ভালো!’

‘কীসের ওপর টান? জায়গার না মানুষের?’

এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে সুকুর মনে লাগে। সে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করে যে সে দুর্বল। তখন সারী তাকে সানন্দে ধরা দেয়।

এমনি করে তারা কত গ্রাম ঘুরল। ঘুরতে ঘুরতে তাদের পুঁজি এল ফুরিয়ে। কারও কাছে তারা কিছু চায়ও না, পায়ও না; নিলে বড়োজোর চালটা আলুটা জ্বালানির কাঠটা নেয়। সারী শৌখিন মানুষ, হাটে কিংবা মেলায় গেলেই তার কিছু খরচ হয়ে যায়। পুঁজি ভাঙতে হয়।

সারী বলে, ‘চল আমরা শহরে যাই।’

সুকু বলে, ‘শহরে!’ বলতে পারে না যে, শহরে আত্মগোপনের সুবিধা নেই, লোকে বংশপরিচয় শুধাবে, পরিচয় দিলে কেউ-না-কেউ চিনবে সে কাদের কুলতিলক।

পাঁচ

যে-শহরে তারা গেল সেটা উত্তরবঙ্গের একটা মহকুমা শহর। পশ্চিমের মতো সেখানে টমটম বা এক্কা গাড়ি চলে। টমটমওয়ালারা পশ্চিমা দোসাদ।

টমটম পাড়ার একধারে পশুডাক্তারখানা। ডাক্তারটি পশুচিকিৎসায় যত-না পারদর্শী তার চেয়ে ওস্তাদ গানবাজনায় ও থিয়েটার করায়। সুকুর চেহারা দেখে ও গান শুনে তিনি তাকে তার ছেলেদের মাস্টার রাখলেন। মাস দুয়েক পরে যখন পশুদের ড্রেসারের চাকরি খালি হল তখন তিনি সাময়িকভাবে সুকুকেই বহাল করলেন।

সুকুর সারাদিনের কাজ হল টমটমের ঘোড়া, চাষিদের গোরু ও বাবুদের কুকুরের ক্ষত পরিষ্কার করে ওষুধ লাগানো ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেচারিদের করুণ চিৎকারে তার কান ঝালাপালা হলে প্রাণ পালাই পালাই করে, কিন্তু পালাবে কোথায়! সে যা রোজগার করে তাই দিয়ে সারী সংসার চালায়। মাঝে মাঝে গৃহস্থের বাড়ি গান গেয়ে সারীও কিছু কিছু পায়। তা দিয়ে কেনা হয় শখের জিনিস।

বেশ চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন ডাক্তারবাবুর বদলির হুকুম এল। তাঁর ইচ্ছা ছিল সুকুকে সঙ্গে নিতে, কিন্তু সুকু তো একা নয়। অগত্যা সুকুর যাওয়া হল না। তাঁর জায়গায় যিনি এলেন তিনি গানবাজনার যম। সুকুর কাছে কাজ আদায় করতে গিয়ে তিনি দেখলেন সে আনাড়ি। তাঁর একটি শালা বেকার বসেছিল, সুতরাং এককথায় সুকুর চাকরি গেল।

ইতিমধ্যে টমটমওয়ালাদের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। তারা তার জন্যে দল বেঁধে দরবার করল। তাতে কোনো ফল হল না, কারণ সুকুর না ছিল যোগ্যতা, না অভিজ্ঞতা, না মুরুব্বির জোর। যা ছিল তা দুর্নাম। তখন টমটমওয়ালারা বলল, আমরাই চাঁদা করে তোমাকে খাওয়াব, তুমি আমাদের গান গেয়ে শোনাবে।

একদিন দেখা গেল সুকু টমটম পাড়ার সভাগায়ক হয়েছে। তার সভাসদ হাড়ি, ডোম, মুচি, দোসাদ, জেলে, মালী প্রভৃতি ইংরেজি শিক্ষায় বঞ্চিত জনগণ। সুকু শুধু গান গায় না, গান ধরিয়ে দেয়। ছত্রিশ জাতের ঐকতান সংগীতে পল্লি মুখর হয়। জলসা চলে রাত একটা অবধি, তারপর সুকু বাসায় ফিরে সারীর পায়ে সঁপে দেয় আধলা পয়সা ডবল পয়সা।

সুকু তার পরিচয় গোপন করেছিল। ভেবেছিল কেউ তাকে চিনবে না। কিন্তু টমটম পাড়ার সভাকবি হবার পরে সে এতদূর কুখ্যাত হল যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল দূর থেকে তার জন্যে নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। এখানে-ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে করতে একদিন সে ধরা পড়ে গেল। খবরটা ক্রমে তার বাবার কানে পৌঁছোল। বাবা এলেন না, কাকা এলেন তাকে নিতে।

কাকা এসেই শহরের গণ্যমান্যদের বাড়ি গেয়ে বেড়ালেন ভাইপোর কীর্তি। গণ্যমান্যরা শিউরে উঠলেন। ছি ছি! মেয়েমানুষ নিয়ে ভেগেছে তার জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু ছোটোলোকদের সঙ্গে ছোটোলোক হয়েছে। ছি ছি!

সুকু কাকার কথা শুনল না। ভালোছেলে হল না। তিনি অনেক করে বোঝালেন, লোভ দেখালেন, ভয় দেখালেন। যাবার সময় এমন একটা চাল চেলে গেলেন যার দরুন সুকুকে তুষের আগুনে পুড়তে হল।

সারীর বড়ো গয়নার শখ। কিন্তু কোথায় টাকা যে গয়না গড়াবে। খেতেই কুলোয় না। সারী বোঝে সব, কিন্তু থেকে থেকে অবুঝ হয়। সুকু মনে আঘাত পায়, ব্যথার ব্যথী বলে দ্বিগুণ লাগে। গানের প্রলেপ দিয়ে বুকের বেদনা ঢেকে রাখে। দিন কাটে।

একদিন টমটমওয়ালাদের সভা থেকে সুকু সকাল সকাল ছুটি পেল। সারী যে তাকে দেখে কত খুশি হবে একথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরল। বাসায় ফিরে তার মনে একটু খটকা বাঁধল। সে ঠেলা দিয়ে দেখল ভিতর থেকে দ্বার বন্ধ। ডাকল, 'সারী। ও সারী।'

মিনিট পাঁচ-সাত ডাকাডাকির পর দ্বার যদি-বা খুলল কোথায় সারী! সারীর বদলে কে একজন ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং ঘোমটায় মুখ ঢেকে হনহন করে চলে গেল। চলনটা মেয়েলি নয় মোটেই। সুকু ভেঙে পড়ল। তার মনে হল সে মরে যাবে, বাঁচবে না। মড়ার মতো কতক্ষণ পড়ে থাকল জানে না। যখন জ্ঞান হল দেখল সারী থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তার পা ছুঁতে চেষ্টা করছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। সুকু পা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল।

সে একটা রাত। দুজনের একজনেরও চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই, বুকে দুর্জয় রোদন। দুজনেই নিস্তব্ধ, নিশ্চল।

পরের দিন সারীই প্রথম কথা কইল। 'তাহলে এখন তুমি কী করবে?'

সারী তাকে এই প্রথম 'তুমি' বলল।

সুকু বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাল।

'বাড়ি ফিরে যাবে না এখানে থাকবে?'

সুকু ভেবে বলল, 'যেখানে তুমি সেইখানেই আমার বাড়ি।'

'কিন্তু দেখলে না? আমি যে বেশ্যা।'

'তুমি কে তাই যদি জানি তো সব জানলুম। তুমি কী তা তো জানতে চাইনে।'

'আমি কে?'

'তুমি রাধা।'

এ উত্তর শুনে সারী স্তম্ভিত হল। এবার ভেঙে পড়বার পালা তার। সে এমন কান্না কাঁদল যে সুকুর মনে হল তার সর্বস্ব চুরি গেছে। অথচ তখনও তার গলায় দুলছিল একছড়া সোনার হার, সদ্যনির্মিত।

ছয়

কাকার চাল ব্যর্থ হল। কিন্তু সারীর নামে যেসব কথা রটল তা কানে শোনা যায় না। সুকুর পক্ষে মুখ দেখানো দায় হল। কিন্তু নিরুপায়। টমটম পাড়ার টিটকারি সে গায়ে মাখে না, ছোটোলোকের রসিকতা মাথা পেতে নেয়।

এমন করে তাদের বেশিদিন চলত না। দৈবক্রমে সে-শহরে এলেন এক ইউরোপীয় পর্যটক, তাঁর সঙ্গে গান রেকর্ড করার যন্ত্র। তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসংগীত সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর সামনে সারী ও শুক উভয়েরই ডাক পড়ল। সারীর গলা তাঁর এত ভালো লাগল যে তিনি তার সাত-আটখানি গান রেকর্ড করলেন। তারপর সেসব রেকর্ড কলকাতার বন্ধুমহলে বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন এক রেকর্ড ব্যবসায়ী। তিনি সরাসরি সারীকে লিখলেন কলকাতা আসতে।

সারী এল, তার গান নেওয়া হল। সেসব গানের আশাতীত আদর হল। সাহেবের সার্টিফিকেট না হলে এদেশে বাংলা বইও বিক্রি হয় না। সারীর বরাতে জুটল সাহেবমহলের সুপারিশ। রেকর্ডের পর রেকর্ড করিয়ে সারী স্বনামধন্য হল। তখন তাকে বাস উঠিয়ে আনতে হল কলকাতায়। বলা বাহুল্য সুকু রইল সঙ্গে। তার গান কিন্তু কেউ রেকর্ড করতে চায় না, সাহেবের সুপারিশ নেই।

তারপরে সারী পড়ল এক ফিলম ব্যবসায়ীর সুনজরে। তার রূপের জৌলস ছিল না, কিন্তু রসের চেকনাই ছিল। ভালো করে মেক আপ করলে তাকে লোভনীয় দেখায়। যারা ফিলম দেখতে যায় তারা লোভনকে শোভন বলে ভুল করে। সে ভুলের পুরো সুযোগ পেল সারী। ডিরেক্টর তাকে পরামর্শ দিলেন ফিলমি গান শিখতে। লোকসংগীত ছেড়ে সে 'আধুনিক' সংগীত শিখল। কণ্ঠের কৃপায় সে তাতেও নাম করল। ধীরে ধীরে সারী তারা হয়ে জ্বলল। চার-পাঁচ বছর পরে যারা তার ফিল্ম দেখল তারা জানল না তার অতীত ইতিহাস।

অবশেষে একদিন শুভলগ্নে সারীর বিয়ে হয়ে গেল কলকাতার এক অভিজাত পরিবারে। কেউ আশ্চর্য হল না, কারণ সারীর আয় তখন হাজারের কোঠায়।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি চেঞ্জ থেকে ফিরছি। ট্রেনে ভয়ানক ভিড়। কোনোখানে একটিও বার্থ খালি নেই। বার কয়েক ঘোরাঘুরি করে আমি প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছি এমন সময় একটা সার্ভেন্ট কামরা থেকে কে যেন আমাকে ডাক দিল, 'খোকা? খোকা না?' আমি পিছন ফিরে দেখি সুকু।

ওর পরনে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, মুখে একরাশ গোঁফ-দাড়ি, গলায় একটা কালো কাঠের কি কালো কাচের মালা। ফিটফাট বেহারা চাপরাশির মেলায় ও নেহাত বেমানান। হাতে একটা একতারা না আনন্দলহরি ছিল, সেটা বাজিয়ে মোটা গলায় গান করছিল একটু আগে—

প্রেম করো মন প্রেমের তত্ত্ব জেনে।
প্রেম করা কি কথার কথা রে গুরু ধরো চিনে।

আমাকে পিছন ফিরতে দেখে সুকু কামরা থেকে নামল। নেমে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? জায়গা মিলছে না?'

আমি বললুম, 'এত রাত্রে কে আমার জন্যে জায়গা ছাড়বে?'

সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফার্স্ট ক্লাসে, যদিও আমার টিকিট সেকেণ্ড ক্লাসের। দরজায় ধাক্কা মেরে বলল, 'ও-সারী, একবার খুলবে?'

সারীর বদলে সারীর স্বামী দরজা খুললেন। তখন সুকু আমার পরিচয় দিয়ে বলল, 'একটু কষ্ট করতে হবে এর জন্যে। আমার বাল্যবন্ধু।'

ভদ্রলোকের মুখে পাইপ, হাতে ডিটেকটিভ নভেল ও পরনে সিল্কের স্লিপিং সুট। ভদ্রমহিলার পরনেও তাই, উপরন্তু রংচঙে ড্রেসিং গাউন। তাঁরা বোধহয় শয়নের উদ্যোগ করছিলেন।

সে-রাত্রে আর কথাবার্তা হল না। আমি উপরের বার্থে সসংকোচে নিদ্রার ভান করে পড়ে রইলুম। কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোরবেলা আসানসোল স্টেশনে সুকু এসে আমার খোঁজ করল। তার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে তার কাহিনি শুনলুম। বাকিটুকু বর্ধমানে ও ব্যাণ্ডেলে।

হাওড়ায় শেষ দেখা। বিদায়ের আগে সুকুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, 'তোর পৌরুষ বিদ্রোহী হয় না? তোর আত্মসম্মান নেই?'

সুকু উত্তর দিয়েছিল, 'ও যে রাধা!'

হাসন সখি

ক্লাসের যারা ডাকসাইটে দস্যি ছেলে, পড়া বলতে পারে না, বেঞ্চির উপর দাঁড়ায়, তারা বসে পিছনের সারিতে। একদিন তাদের রাজা সূর্যমোহন এসে আমায় বললে, 'আজ থেকে তুমি হলে আমাদের মন্ত্রী। আমাদের সঙ্গে বসবে, খাতা দেখতে দেবে, প্রম্পট করবে। কেমন, রাজি?'

আমি নবাগত, আমার ছেলেবেলার ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে পুরী জেলা স্কুলে ভরতি হয়েছি। কাউকে চিনিনে বললে হয়তো ভুল বলা হবে, কারণ আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা আমার সহপাঠী, তারই কাছে বসি ও তারই সঙ্গে বেড়াই। এমন যে আমি, সেই আমাকেই কিনা মন্ত্রী মনোনয়ন করলেন সেকেণ্ড ক্লাসের ছোটোলাট সূর্যমোহন ছোটরায়।

শুনেছিলুম তাদের অসাধ্য কাজ নেই। ফুটবল খেলার সময় ফাউল করে পা ভেঙে দেওয়া তাদের নিত্যকর্ম। সন্ধ্যার অন্ধকারে ল্যাং মারা ও গলির মধ্যে অদৃশ্য হওয়া তাদের অভ্যাস। আমার যদিও ফুটবল খেলার ব্যসন ছিল না, সমুদ্রতীর থেকে বাসায় ফিরতে প্রায়ই অন্ধকার হত। বাসা ছিল গলির ভিতরে, সুতরাং ভয়ের হেতু ছিল। আমি আর কথা কাটাকাটি না করে পিছনের সারিতে মুখ ঢাকলুম।

এই ঘটনা যে কেউ লক্ষ করবে অতটা আমি ভাবিনি। আমি অপরিচিত নগণ্য ব্যক্তি, কে-ই বা আমাকে চেনে? কিন্তু দিনকয়েক পরে আমাদের ইংরেজির মাস্টার কেশববাবু আমাকে অযাচিত অপমান করলেন আমি খারাপ ছেলেদের একজন বলে। তারপর কী মনে করে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'If you want to be a good boy follow my Nilu.' কেশববাবুর ছেলে নীলাদ্রি পড়ত আমাদেরই ক্লাসে, বসত সামনের সারিতে। সত্যিকারের ভালোছেলে, ফার্স্ট-সেকেণ্ড হত। আমি তার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা করিনি, সেও আমার সঙ্গে না। আমি লাজুক, সে অহংকারী। অন্তত লোকে তো তাই বলে। তার বাবা যখন এত মানুষের মাঝখানে আমাকে অপমান করে গেলেন তখন আমিও আমার মুখরক্ষার জন্যে তাঁর কথাগুলির অন্য অর্থ করলুম। আমার দুষ্টু ছেলের দলটিকে মন্ত্রণা দিলুম, 'ওহে, মাস্টারমশাই কী করতে বললেন শুনলে তো! নীলুকে ফলো করতে হবে। তার মানে, নীলু যখন যেদিকে যাবে তোমরাও তখন সেইদিকে যাবে। কিন্তু খবরদার, নীলু যেন টের না পায়।'

সেদিন থেকে আমাদের মন্ত্র হল, নীলুকে ফলো করো। আমরা ওটার ওপর বাঁদরামি ফলিয়ে ওর উচ্চারণ করতুম, ফললো মাই নিললো!

তখন ঠাহর হয়নি এর পরিণাম কী হতে পারে। একদিন আমাদের দলের দীনকৃষ্ণ এসে আমার কানে কানে বললে, 'জানিস ও কোথায় যায়?'

'কোথায়?'

'কাউকে বলিসনে। সমুদ্রের ধারে একটা ছোটো দোতলা বাড়ি আছে, চক্রতীর্থের দিকে। সেখানে রোজ বিকেল বেলা নীলু গিয়ে কাদের সঙ্গে আড্ডা দেয় শুনবি?'

'কাদের সঙ্গে?'

'মেয়েদের সঙ্গে!'

ডিটেকটিভ বই পড়েও আমি এমন রোমাঞ্চিত হইনি। সেদিন আমার ইচ্ছা করছিল দুনিয়ার লোককে ডেকে বলতে, আহা! নীলু কেমন ভালোছেলে দেখলেন তো আপনারা! ফললো মাই নিললো!

মেয়েদের উল্লেখ শুনে আমি আমার মুখখানাকে যথাসাধ্য সাধুসন্ন্যাসীদের মতো করে বললুম, 'আমরা দুষ্টু ছেলে বটে, কিন্তু দুশ্চরিত্র নই। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, আমরা কি কখনো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে

পারি!’

দীনু বললে, ‘মেশা দূরে থাক, ওদের কাছে যেতেই আমার বুক ধুকপুক করে। একটি মেয়ে যেই নীচে নামল আমি দিলুম ভোঁ দৌড়। নীলুর, যাই বল, সাহস আছে।’

আমি সেদিন আবিষ্কার করলুম যে আমরা দুজনেই সমান ভন্ড। যেমন আমি তেমনি দীনু। আসলে আমরা নীলুর অনুসরণ করতে পারলে বাঁচি। দুনিয়ার লোকের চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দুই ভন্ড সন্ন্যাসী নীলুর পিছু নিলুম। বুক ধুকপুক করছিল বটে দুজনেরই, কিন্তু মেয়েদের জন্যে নয়, তাদের অভিভাবকদের ভয়ে। মুখে বোলচাল দিচ্ছিলুম, ‘নীলুটাকে ধরিয়ে দিতে হবে।’ কিন্তু অন্তরাত্মা জানেন যা মনে মনে বলছিলুম। ‘যদি ধরা পড়ি তখন?’ তখন অবশ্য ভোঁ দৌড়।

বাড়িটার নাম ‘ঊর্মিমুখর’। ছোটো দোতলা বাড়ি। ফিকে নীল রং। সমুদ্রের হাওয়ায় ছিল সমুদ্রের স্বনন। বাড়িটা সার্থকনামা।

আমরা ওর পাশে ঝিনুক কুড়োতে বালু খুঁড়তে আরম্ভ করে দিলুম গুটিকয়েক চেনা শিশুর সঙ্গে ভাব করে। নজর রাখলুম নীলুর ওপরে। নীলু যখন দোতলায় পৌঁছোল তখন হাসির হররা উঠল—তাকে দেখে না তার পোশাক দেখে না কী দেখে তা বোঝা গেল না। নীলুও সে-হাসিতে যোগ দিলে। আমাদের কানে আসতে লাগল হা-হা হো-হো হি-হি।

নীলুটা যে এমন বাঁদর তা কে জানত। মেয়েদের সঙ্গে সমানে চাল দেয়। কখনো হাসে, কখনো গায়, কখনো খুনসুটি করে। আমরা শুনতে পেলুম ওরা ওকে ভুতুম বলে ডাকছে। নামের কী ছিরি! ভুতুম! নীলুর কিন্তু তাতেই আনন্দ। সে প্যাঁচার মতো আওয়াজ করছে, ‘হুঁম....হুঁম...হুঁম...’

দীনু বললে, ‘খেতে খেতে আওয়াজ করছে বলে অমন শোনাচ্ছে।’

আমি বললুম, ‘বুঝেছি, খাবার লোভেই ছোঁড়া রোজ এদিকে আসে।’

নীলু যে একজন ভাগ্যবান পুরুষ এ বিষয়ে আমাদের দ্বিমত ছিল না। না-জানি কী ভালোমন্দ খায়, আমরা তো পাইনে। এতগুলো মেয়ে মিলে রেঁধেবেড়ে খাওয়ায়। হয়তো চপ, কাটলেট, ডিমের অমলেট। কী বলে ওকে? পুডিং। হয়তো চকোলেট, টফি, লজেন্স খেতে দেয়, আইস ক্রিম লেমোনেড সিরাপ।

আমরা স্থির করলুম নীলুর বাবাকে জানাতে হবে সে কুসংসর্গে মিশছে। আমাদের দলের টাইগারের ওপর সে-ভার পড়ল। ওর মতো ঠোঁটকাটা বেহায়া খুব কম দেখা যায়। মানুষের গায়ে পড়ে ঝগড়া বাঁধায়, বিশ্রী গালাগাল দেয়। ওর মুখে কিছু আটকায় না। লঘু গুরু জ্ঞান নেই।

টাইগার একদিন মাস্টারমশায়ের পা মাড়িয়ে দিয়ে ঘটা করে পায়ের ধুলো নিলে। তারপর বললে, ‘এবার থেকে নীলুরও পায়ের ধুলো নেব, স্যার। সে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে।’

‘কেন হে?’

‘সে গাছের ডালে বিচরণ করে, নাম তার ভুতুম। একটি নয়, দুটি নয়, অনেকগুলি প্যাঁচানি তার সহচারিণী।’

মাস্টার তো হতবাক। তারপরে টাইগারের কানটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ‘ভালো করে খোঁজ নিলে জানবে যে নীলু চায় একটি রুগণ মেয়েকে একটুখানি আনন্দ দিতে। মেয়েটির যক্ষ্মা, বাঁচবে কি না সন্দেহ। সহচারিণী যাদের বলছ তাঁদেরও ওই কর্তব্য। সহচরও আছে। সব ভদ্র ঘরের ছেলে, ভদ্র ঘরের মেয়ে। তোমার মতো ইতর নয়।’

এরপরে আমি নীলুর সঙ্গে যেচে আলাপ করি। সে একটি যক্ষ্মা রোগীকে একটুখানি আনন্দ দিতে যায়, ভুতুম সাজে, লোক হাসায়। এতে আমি তার মহত্ত্বের পরিচয় পেলুম। তাকে খুলে বললুম সমস্ত, মাফ চাইলুম। নিজের দল ছেড়ে সামনের সারিতে বসতে লাগলুম তার পাশে। ইতিমধ্যে সেও পেয়েছিল আমার বিদ্যার পরিচয়। মাস্টারমশায় আমার খাতা দেখে তাকে না কি বলেছিলেন যে, ছোকরার স্টাইল আছে।

অবশেষে সেই অনিবার্য দিনটি এল যেদিন নীলু আমাকে তার অনুসরণ করতে বললে 'ঊর্মিমুখর'-এর দোতলায়। সেখানে একটি ইজিচেয়ার পাতা, তাতে ঠেস দিয়ে বসে ছিল বা শুয়ে ছিল আমাদেরই বয়সের একটি বিষণ্ণ রুগণ মেয়ে। নীলু বললে, 'এ আমার হাসন সখি।' মেয়েটি একটু হাসল। 'আর আমি এর ভুতুম!'

'তোমার নাম কি বুদ্ধু?' প্রথম আলাপেই প্রশ্ন করল মেয়েটি। আমি বলতে যাচ্ছিলুম আমার নাম, কিন্তু চোখ টিপল নীলু। তখন আমি উত্তর করলুম, 'হ্যাঁ, ভাই, আমার নাম বুদ্ধু।' সে যখন আমাকে তুমি বলেছে আমিও কেন তাকে তুমি বলব না? সুধালুম, 'তুমি বুঝি, ''ঠাকুরমার ঝুলি'' পড়তে ভালোবাস?'

'ভালোবাসি। সবচেয়ে ভালো লাগে কিরণমালার কাহিনি। আমি যেন কিরণমালা আর তোমরা যেন অরুণ বরুণ। তোমরা যেন মস্ত এক পুরী বানালে মর্মর পাথরের। আর আমি তাকে সাজালুম যত রাজ্যের মণিমাণিক্য দিয়ে। তবু কীসের যেন অভাব। তাই তোমাদের বললুম, যাও তোমরা, নিয়ে এসো সেই সোনার পাখি আর সেই মুক্তা ঝরার জল।'

মেয়েটির আসল নাম চাঁপা। এককালে ওর গায়ের রং চাঁপার মতো ছিল, এখন শুকিয়ে কালো হয়ে আসছে। মুখে একপ্রকার মাদকতা বা মদিরতা। নেশা লাগে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকলে। দেখতে যে খুব সুন্দর তা নয়, কিন্তু তন্ময় হয়ে কথা যখন বলে তখন মনের সৌন্দর্য এসে তনুর সৌন্দর্য হয়।

সেদিন ওদের ওখান থেকে যখন ফিরলুম তখন চোখে আমার জল। নীলু লক্ষ করলে। বললে, 'কাঁদছিস নাকি?'

'কাঁদব না তো কি হাসব? আমি কি তোর মতো পাষাণ?'

'আমি যে হাসি তা পাষাণ বলে নয়। হাসি ওকে হাসাতে।'

'ওকে হাসাতে চাইলেও আমি হাসতে পারব না। এ কি হাসির কথা যে একটি সুন্দর ফুল দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! হায় ভগবান, কেন আমাদের এত অক্ষম করে সৃষ্টি করলে! কেন, কেন, ওগো একটিবার বলে দাও কেন আমরা পারব না ওকে মুক্তা ঝরার জল দিয়ে বাঁচাতে!'

নীলু শুধু বললে, 'মানছি তোর স্টাইল আছে।'

এখন যেমন আমি একজন হাস্যরসিক তখন তেমন ছিলুম না। তখন ছিলুম উচ্ছ্বাসপরায়ণ ও অরসিক। সেই যে সেদিন ফিরলুম আর ওমুখো হলুম না। নীলু ডাকলে চোখের জল মুছি। বলি, 'যেদিন পারব ওকে মুক্তা ঝরার জল এনে দিতে সেদিন যাব। তার আগে নয়।'

নীলু হাসিয়ে হাসিয়ে বলে, 'বুঝেছি, প্রথম দর্শনেই প্রেম। দ্বিতীয় দর্শনের আবশ্যক হত বিয়ের আশা থাকলে।'

আমি তাকে তাড়া করে যাই। ভাবি, নীলুটা এমন নিরেট!

পুরীতে আরও কিছুকাল থাকলে হয়তো আবার যেতুম, কিন্তু যে কারণেই হোক আমাকে আবার নাম লেখাতে হল আমার ছেলেবেলার ইস্কুলে। পুরী থেকে বিদায় নিলুম অকালে।

প্রায় চার বছর পরে পাটনা কলেজের উত্তরে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছি এমনসময় নীলুর সঙ্গে মুখোমুখি। শুনলুম সে পাটনা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়ে, ওভারসিয়ার হয়ে বেরোবে। তার বাবা হঠাৎ মারা যান, তাই কলেজে পড়বার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না।

নীলু বললে, 'তোর চেহারার তো বিশেষ পরিবর্তন দেখছিনে। তোর স্বভাবটি কি তেমনি আছে—কথায় কথায় কান্না?'

'তোর শরীরটি তো বেশ খোট্টার মতো হয়েছে। স্বভাবটি কি তেমনি আছে—কথায় কথায় হাসি?'

এর থেকে হাসন সখীর প্রসঙ্গ। নীলু বললে, 'বেঁচে আছে। তার চেয়ে বড়োকথা, ভালো আছে। বিয়ের কথাবার্তা চলছে।'

‘বলিস কী! এত দূর!’ আমি আশ্চর্য হলুম। ‘আমি ভাবছি এ অসম্ভব সম্ভব হল কী করে? কে তাকে এনে দিলে মুক্তা ঝরার জল? তুই নীলু? না আর কেউ?’

নীলু আমাকে তার হোস্টেলে ধরে নিয়ে গেল। খেতে দিলে পাটনার অমৃতি আর পল্লি অঞ্চলের ঠেকুয়া। যাক, ছাতু আর লংকা খেতে দেয়নি এই ঢের। ও নাকি নিজে তাই খেয়ে খেয়ে চেহারা ফিরিয়েছে। পাশেই কোন এক মহাবীরজির আখড়ায় ডন বৈঠক ফেলে, সাঁতার কাটে গঙ্গায়।

সে কিছুতেই স্বীকার করলে না যে তার সখি সেরে উঠেছে তার আনন্দ রসায়নে। বললে, ‘দু-বছরের ওপর আমি পাটনায়, চাঁপা দেওঘরে। ছুটির সময় দেখা হয় অল্প কয়েক দিনের জন্যে। কাজেই আমার কৃতিত্ব কতটুকু! জানিনে আর কেউ আছে কি না ওখানে।’

পাটনায় নীলুর পড়া শেষ হয়ে গেল আমার আগে, যাবার আগে সে আমাকে খবর দিয়ে গেল যে, চাঁপার বিবাহ হয়েছে কলকাতার এক ডাক্তারের সঙ্গে। বললে, ‘ওঃ! কী ভাবনাই ছিল ওর জন্যে আমার। ডাক্তার শুনে ধড়ে প্রাণ এল। ও বাঁচবে বহুকাল। চিরকাল বাঁচবে ও, ডাক্তার ঠিক বাঁচাবে ওকে। তোকে বোধহয় বলিনি যে ডাক্তারটি প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ। হ্যাঁ, দোজবর।’

আমি বললুম, ‘নীলু, মুক্তা ঝরার জল ডাক্তারখানায় মেলে না। মানুষকে যে বাঁচায় সে ডাক্তার নয়। আমি নিশ্চিন্ত হতুম, যদি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে হত। হাসছিস যে! তোর না হয় অর্থ নেই, কিন্তু ভালোবাসা তো আছে। তুই কীসে অযোগ্য শুনি?’

‘শঙ্কর’, নীলু আমার দু-হাত ধরে আমার দু-চোখে চোখ রেখে বললে, ‘তুই বিদ্বান, তুই কবি। কিন্তু বিদগ্ধ নস। কখনো ভালোবেসেছিস কি না সন্দেহ। যদি কোনোদিন বাসিস তাহলে দেখবি দুরকম ভালোবাসা আছে। সখার সঙ্গে সখীর। প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার। চাঁপার সঙ্গে আমার ভালোবাসা দ্বিতীয় পর্যায়ের নয়, কোনোদিনই ছিল না, তুই ভুল বুঝেছিলি।’

‘বুঝেছি।’ আমি যেন কত বড়ো একটা আবিষ্কার করলুম। ‘তোরা ছিলি এক হিসেবে ভাইবোন। কেমন, ঠিক ধরেছি কি না?’

‘না, ঠিক নয়, বেঠিক। ভাইবোনের ভালোবাসা অন্য জিনিস। চাঁপাকে আমি বোন বলে ভাবতে পারিনে। ও আমার সখি, সই, সহেলি। এই যেমন তোর সঙ্গে আমার সখ্য তেমনি ওর সঙ্গেও। তুই কি আমার ভাই? ভাইয়ের কাছে কি সব কথা বলা যায়? তুই আমার সুহৃৎ, তাই তোর কাছে আমার লুকোবার কিছু নেই। তেমনি চাঁপার কাছে।’

‘কালিদাস তো গৃহিণীকেই সখি বলে গেছেন। তাহলে চাঁপা কেন তোর গৃহিণী হতে পারে না বল আমাকে।’ আমি চেপে ধরলুম।

‘গৃহিণী হয়তো সখি হতে পারে, কিন্তু সখি হতে পারে না গৃহিণী। কেউ যদি জোর করে আমাদের বিয়ে দেয় তাহলেও আমরা স্বামী-স্ত্রী হব না। যদি হই তাহলে আমাদের মুখের হাসি চোখে মিলিয়ে যাবে।’

বছর পাঁচ-ছয় পরে আমি বিলেত থেকে ফিরেছি, উঠেছি কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে। ওরা আমার নাম খবরের কাগজে ছাপিয়েছে। ফলে অনেকেই দয়া করে আসছেন আমাকে দেখতে। বেয়ারা একরাশ কার্ড নিয়ে এল। তাদের একখানার পিঠে ছাপা ছিল, ‘নীলাদ্রিনাথ গুপ্ত। মার্টিন অ্যাণ্ড কোম্পানি।’ পাছে চিনতে না পারি সেইজন্যে কালি দিয়ে লেখা ছিল ‘নীলু’।

নীলু! আমার বাল্যবন্ধু নীলু! সেই নীলু কলকাতায়, মার্টিন কোম্পানিতে! নীলুকেই অভ্যর্থনা করলুম সকলের আগে।

খাটো শার্ট-প্যান্ট পরা এক লৌহমানব আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল না, পাঞ্জা কষল। আমি শিউরে উঠে বললুম, ‘আঃ, ছেড়ে দে ভাই। লাগে।’

‘হুঁ! বাংলা মনে আছে। আমি পরখ করে দেখছিলুম বাংলা বেরিয়ে আসে না ইংরেজি।’

শুনলুম চাকরিতে বেশ উন্নতি করেছে, মাইনে পাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারের সমান। বললে, 'সময় একদম পাইনে। এই যে তোকে দেখতে এসেছি এ অনেক কষ্টে। চাঁপার ওখানে তোর নিমন্ত্রণ। আমি তোকে ড্রাইভ করে নিয়ে যাব সন্ধ্যার পরে। তৈরি থাকবি। না না, অন্য এনগেজমেন্ট আছে ও-কথা শুনব না। ক্যানসেল ইট। চাঁপা একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠেছে তোকে দেখতে। ওঃ, কতকাল পরে! তুই কিন্তু তেমনি আছিস। তোর স্বভাবটিও কি তেমনি আছে?'

আমি জানতে চাইলুম চাঁপা কেমন আছে, বিয়ে সুখের হয়েছে কি না, ছেলেমেয়ে ক-টি, নীলুও কি বিয়ে করেছে ইত্যাদি। উত্তর পেলুম, নীলুর স্ত্রী চাঁপার সঙ্গে অত মাখামাখি পছন্দ করেন না, তাই চাঁপার সঙ্গে নীলুর কদাচ দেখা হয়। ওদিকে আবার ডাক্তার সাহেবেরও সেই মনোভাব, তিনিও নীলুকে প্রশ্রয় দেন না। এসব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও তাদের বন্ধুতা অবিকল তেমনি রয়েছে। নীলুর একটি ছেলে, চাঁপার সন্তান হয়নি।

নীলু এক নিশ্বাসে উত্তর দিয়ে এক দৌড়ে প্রস্থান করলে। সময় নেই যে। সন্ধ্যার পর কথা রাখলে। ওর নিজের মোটরে করে আমাকে পৌঁছে দিলে থিয়েটার রোডে। ডক্টর সেন আমাকে সাদর সম্ভাষণ করে তাঁর স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রীর কাছে ছিলেন আরও কয়েকটি তরুণী। শুনলুম তাঁরা সকলেই মিস। কেউ ওবাড়ির, কেউ পাশের বাড়ির। বাড়ি মানে ফ্ল্যাট। আমার কিন্তু নজর ছিল না আর কারও প্রতি। আমার দৃষ্টির সবটা জুড়ে ছিল চাঁপা। আমাদের হাসন সখি। আমাদের কিরণমালা। আমাদের হারানো কৈশোর।

চাঁপার গায়ের রং আবার চাঁপাফুলের মতো হয়েছে, ভরন্ত দেহ, সুঠাম গড়ন। কেবল তার চোখ দুটিতে কতকালের ক্লান্তি, কতকালের নিরাশা।

'তারপর, বুদ্ধু, তোমাকে বুদ্ধু বলে ডাকলে ক্ষমা করবে তো? তুমি বলব না আপনি বলব?' সে হাসল। কী তন্ময় হাসি! সে যখন যা বলে, যা করে, তন্ময় হয়ে বলে, তন্ময় হয়ে করে।

'বুদ্ধু বলতে পারো, বরুণ বলতে পারো, যা বলতে তোমার সাধ যায়, যা বললে তুমি রূপকথার স্বাদ পাও।' আমি আশ্বাস দিলুম। 'না, আপনি কেন? আপনি কবে হলুম? সেই প্রথম থেকেই তো তুমি।'

'তুমি তো এত দেশ দেখলে, এত রাজ্য বেড়ালে, ঠিক রূপকথার রাজপুত্রের মতো। কই, তোমার রাজকন্যা কোথায়?' সে তেমনি হাসল।

'রাজকন্যা এখনও ঘুমিয়ে। সোনার কাঠি খুঁজে পাইনি।'

'কিন্তু রুপোর কাঠির খোঁজ তো পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি, কিন্তু রুপোর কাঠি ছোঁয়ালে তো সে জাগবে না। যে জাগবে না তাকে নিয়ে আমি কী করব! আমার অন্য কাজ আছে হাসন। আমি একজন কবি।'

এমনি কত কথাবার্তা। সব সাংকেতিক ভাষায়। সে বুঝল যে আমি তার ননদদের কাউকে, তার প্রতিবেশিনীদের কাউকে বিয়ে করব না। একটু ক্ষুণ্ণ হল। তার আশা ছিল ওদের একজনকে বিয়ে করে আমি তার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পাতাব, তাহলে দেখাশোনা সুগম হবে। কিন্তু আমি নীলুর দৃষ্টান্ত দিলুম। বিয়ের পরে সব মেয়েই সমান। কেউ কারও স্বামীকে স্বাধীনতা দেবে না সখির সঙ্গে মিশতে, নিজের বোন হলেও না, বউদি হলেও না।

ডিনার টেবিলে আমি ছিলুম তার ডান দিকে, খেতে খেতে কথা বলছিলুম সাংকেতিকে। ডিনারের পর অন্যান্য মেয়েদের দিকে মনোযোগ দিতে হল। হাসন তাতে খুব খুশি হল না, নীলুকে নিয়ে বসল তাস খেলতে। আমার কানে এল, 'বুদ্ধু দেখছি এক নম্বর ফ্লার্ট। বিয়ে করবে না একজনকেও, তবু সকলের সঙ্গে রঙ্গ করা চাই!'

ডাক্তার সাহেবের লক্ষ সবসময় নীলুর ওপর, আমাকে তিনি প্রতিযোগী বলে গণ্য করেননি। নীলু বেচারা সমস্তক্ষণ উশখুশ করছিল, তার লক্ষ একটা ক্লক ঘড়ির ওপরে। দেরি করলে তার বউ রাগ করবে। লৌহমানবও তার বউকে ভয় করে। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল ভাবতে! আমি তাকে রহস্য করে বললুম, 'আজ তোর কপালে ঝাঁটা আছে।'

বিদায়বেলায় চাঁপা বললে, 'আবার যখন কলকাতা আসবে দেখা করবে তো? বুদ্ধু, আবার যেন দেখা হয়।' কী জানি কেন আমার চোখ সজল হল। নীলু বললে, 'চল, তোকে রেখে আসি। ইচ্ছা ছিল একদিন আমার ওখানে ডাকতে, কিন্তু কালকেই আমাকে মফস্সলে বেরোতে হচ্ছে। আসছে বার কলকাতা এলে আমার ওখানেই উঠিস।'

তারপর নানা কারণে ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেনি। প্রায় সাত বছর পরে ছুটি নিয়ে মিহিজামে বিশ্রাম করছি, একদিন ঠিক দুপুর বেলা একখানা মোটর এসে আমার দরজায় থামল। লাফ দিয়ে নামল একটা কুকুর, তা দেখে ছুটে এল আমার দুই ছেলে। উত্তেজিত হয়ে বললে, 'বাবা, দেখবে চলো কাদের মোটর আর কুকুর।'

বেরিয়ে দেখি সাহেবি পোশাক পরা এক ভদ্রলোক ও ফারকোট গায়ে দেওয়া শাড়ি-পরা এক মহিলা। আরে, এ যে আমাদের নীলু, সঙ্গে ওর স্ত্রী রত্নাবলী। আমার স্ত্রী রান্নাঘরে ছিলেন, তাঁকে ইতিমধ্যে কুকুরের ও মোটরের খবর দেওয়া হয়েছিল, মহিলার খবর দেওয়া হয়নি। আমার ডাক শুনে তিনি বাইরে এলেন ও থাকবার নিমন্ত্রণ জানালেন। শোনা গেল নীলুরা আসানসোল থেকে এসেছে জমি কিনতে, একটু পরে আসানসোল ফিরে যাবে, থাকবে না। যদি রান্নার দেরি না থাকে খেয়ে যাবে।

আমি বললুম, 'আমরা একটার সময় টিফিন খাই, এখনও একঘণ্টা বাকি। চল, নীলু, তোকে একখানা মনের মতো জমি দেখাই।'

নীলু রাজি হল। তার স্ত্রী আমার স্ত্রীর সঙ্গে রান্নাঘরে গেলেন। শীতের দুপুর। হাওয়া দিচ্ছিল। আমরা পায়ে হেঁটে কতক দূর গেলুম। মোটর এবং কুকুর রইল ছেলেদের হেফাজতে। জিজ্ঞাসা করলুম, 'নীলু, চাঁপা কেমন আছে?'

নীলু উত্তর দিলে, 'সে অনেক কথা। আরেক দিন বলব।'

'আরেক দিন মানে তো আরও সাত-আট বছর। তার চেয়ে তুই যেটুকু পারিস বল।'

'আচ্ছা, তবে সারাংশটুকু বলি।'

বিয়ের অল্প কয়েক দিন পরেই তার স্বামী তাকে বলেন অপারেশন করতে হবে। কীসের অপারেশন চাঁপা অতশত বোঝে না। মত না দিলে যদি প্রাণসংশয় হয় সে কথা ভেবে মত দেয়। অপারেশনের পরে টের পায় চিরজীবনের মতো বন্ধ্যা হয়েছে। তার মনে দারুণ আঘাত লাগে। নীলুকে বলে, আর বেঁচে থেকে কী হবে! কী হবে প্রাণ রেখে, যদি প্রাণ দিতে না পারি! নীলু বলে, কত মেয়ে বন্ধ্যা হচ্ছে নৈসর্গিক কারণে। মনে করো, তুমিও তাদের একজন। তোমার স্বামীর চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে, তারা তোমাকে মা বলে। তুমি তাদের মানুষ করে তোলো, প্রচুর বাৎসল্যরস পাবে।

কিন্তু কিছুদিন পরে ভদ্রলোক তাঁর ছেলে-মেয়েদের অন্যত্র সরালেন। বাড়িতে রইল তাঁর ভাই-বোন, চাঁপার ননদ-দেওর। তাদের নিয়ে চাঁপার সময় কাটত মন্দ না, কিন্তু তাদের সঙ্গ পেয়ে তার হৃদয় ভরবে কেন! স্বামীর সঙ্গ পাওয়া ভার, তাঁর পসারের ক্ষতি তিনি সইতে পারেন না, আর পসারও তার অসাধারণ। সে নীলুকে চিঠি লেখে, ফোন করে, সাধে। কিন্তু নীলুরও কি উপায় আছে! তারও যে ঘরে-বাইরে হাকিম, এখানে জবাবদিহি, ওখানে কৈফিয়ত। নীলু পরামর্শ দিলে, চাঁপা, তুমি একটা কোনো কাজ বেছে নাও। কাজ করো, কাজ করে যাও। পৃথিবীতে আমরা হৃদয় ভরাতে আসিনি, এসেছি মাটি খুঁড়তে, বাড়ি গড়তে, রাস্তা বানাতে, শহর বসাতে, ভোগোপকরণ উৎপাদন করতে, শিক্ষা বিস্তার করতে, স্বাস্থ্য বর্ধন করতে, আনন্দ দিতে ও পেতে। চাঁপা, তুমি যেকোনো একটা কাজ বেছে নাও, তাহলেই বাঁচবে।

সে এক এক করে অনেকরকম কাজে হাত দিলে, কিন্তু দিতে-না-দিতে গুটিয়ে নিলে। বললে, আমার পুরী কবে নির্মাণ করবে, তাই বলো অরুণ বরুণ। কবে আনবে মুক্তা ঝরার জল, সোনার বরণ পাখি? আমি এ বাড়িতে বাঁচব না অরুণ। আমাকে আমার নিজের বাড়ি দাও। কত লোকের বাড়ি তৈরি রাখি, সখির বাড়ি তৈরি করতে পার না?

বাস্তবিক এর কোনো উত্তর নেই। ইচ্ছা করলেই নীলু পারে হাসনকে তার নিজের বাড়ি দিতে। অবশ্য মুক্তা ঝরার জল কিংবা সোনার বরণ পাখি দেওয়া তার সাধ্য নয়, শংকরেরও অসাধ্য। কিন্তু বাড়ি? মনের মতো বাড়ি দিতে পারবে না সখিকে? নীলু ভাবে কিন্তু উপায় খুঁজে পায় না। মনের মতো একখানা বাড়ি মানে কত কালের সঞ্চয়। স্ত্রীকে বঞ্চিত করে সখিকে দেবে তার সঞ্চয়! তা কি হয়? রত্না কী মনে করবে! সমাজ কী মনে করবে! নীলু পিছিয়ে যায়, কথা দিতে পারে না। চাঁপা একেবারে অবুঝ। যে-মানুষ লক্ষ লক্ষ টাকার বাড়ি তৈরি করছে সে-মানুষ পাঁচ-সাত হাজার টাকার বাড়ি তৈরি করতে পারত না! তার কি টাকার অভাব! আর দেওঘর তো সস্তা।

ডাক্তারের টাকার অভাব নেই, চাঁপা চাইলেই সাত হাজার টাকার চেক পায়, কিন্তু চাইবে কী করে! ডাক্তার কি অরুণ বরুণ, বুদ্ধুভুতুম! তিনি তাকে দয়া করে বিয়ে করেছেন, যত্ন করে বাঁচিয়ে রেখেছেন, পারতপক্ষে অবহেলা করেন না, কিন্তু তাঁর কাছে কি সখির মতো দাবি করা চলে! না, তাঁর সঙ্গে তেমন সম্পর্কই নয়। কোন সুবাদে চাইবে!

নীলু কিছু করলে না, পরিণামে চাঁপার আবার জ্বর হতে লাগল এবং সে কথা শুনে নীলুর মনে হল সে-ই দায়ী। তখন সে দেওঘর মধুপুর গিরিডি অঞ্চলে জমি খুঁজতে শুরু করে দিলে রত্নাকে না জানিয়ে। বাড়িও তৈরি হল বেনামিতে মধুপুরে। খরচ যা পড়ল তা এল বোনাস থেকে। কিন্তু প্রশ্ন উঠল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরাবে কে? ডাক্তারকে সমঝাবে কে যে মধুপুরে না গেলে চাঁপার শরীর সারবে না? কে তাঁকে বিশ্বাস করাবে যে সেখানে চাঁপার আপন বাড়ি আছে? চাঁপার আত্মীয়দের একে একে ডাক পড়ল। তাঁদের জেরা করে ডাক্তার জানতে পারলেন তাঁকে ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে। শেষকালে একটা মনোমালিন্য ঘটল। চাঁপা চলে গেল মধুপুর। বছরখানেক সবুর করে সেন আবার সাদি করলেন।

চাঁপা সে কথা শুনে দুঃখিত হল না, বরং অভিনন্দন জানালে। নীলু তো চটেমটে লাল। বোকা মেয়ে, নিজের স্বার্থ বোঝে না। আর হতভাগা ডাক্তার কেবল শরীরটি বোঝে, মানুষের যেন মন বলে কোনো পদার্থ নেই। কিন্তু নীলুর চোখ কপালে উঠল যখন চাঁপা লিখলে, আমি একা থাকলে মরে যাব। অরুণ, বরুণ, তোমরাও এখানে এসো। আবার আমরা হাসব, আমরা গল্প করব, গান করব, রাঁধব আর খাব। তোমরা আনবে মুক্তা ঝরার জল, অর্থাৎ অফুরন্ত জীবন। তোমরা আনবে সোনার বরণ পাখি, সোনালি রঙের শুক, অর্থাৎ সুখ। অরুণ বরুণ, তোমরা কবে আসবে?

এক বার নয়, দু-বার নয়, বার বার আসতে লাগল চিঠি। নীলু আর চুপ করে থাকতে পারলে না, গেল মধুপুর। দেখল সখি শুকিয়ে যাচ্ছে চাঁপা ফুলের মতো। ওকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পন্থা ওর সঙ্গে সময় কাটানো। কিন্তু সময় যে-বয়সে সুলভ ছিল সে-বয়স তো আর নেই। এখন সময় মানে টাকা, টাকা মানে প্রাণধারণের উপায়। নীলু ওকে অনেক কিছু দিতে পারে কিন্তু সময় দেবে কী করে? নিজের স্ত্রীকেই সময় দিতে পারে না, রোজ ঝাঁটা খায়। ঝাঁটা নয় খোঁটা—একই কথা। পরের স্ত্রীকে সময় দেবে? বাপ রে! সমাজ ফোঁস করে উঠবে না? সমাজের কথা দূরে থাক, ঘরের লোকটি কি রক্ষা রাখবে?

নীলু অনেক খরচপত্তর করে ওর জন্যে সঙ্গিনী নিয়োগ করলে। বই কিনে দিলে। গ্রামোফোন, রেডিয়ো, রেফ্রিজারেটর কিনে দিলে। ওর বসবার ঘর শোয়ার ঘর ডিসটেম্পার করা হল। মার্বেল পাথর আনিয়ে মেঝে বাঁধিয়ে দেওয়া গেল।

তা সত্ত্বেও সখি বলে, ওতে আমার হৃদয় ভরবে না। আমি চাই বান্ধব-বান্ধবী। বান্ধবীদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে। কেউ আমার চিঠির জবাব পর্যন্ত দেয় না। এমনকী, মিনতি, যার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে সেও আমার কাছে আসবে না। তুমি একমাত্র বান্ধব যে আমাকে বাঁচতে সাহায্য করেছ। আর সবাই স্বার্থপর। ভুতুম, তোমার কাছে আমি চিরঋণী। এ ঋণ জন্মান্তরেও শোধ হবে না। জন্মান্তরে যেন তোমার মতো বন্ধু পাই, তোমাকেই বন্ধুরূপে পাই।

'তারপর?' আমি এতক্ষণ পরে কথা কইলুম।

'তারপর?' নীলু শুকনো গলায় বললে, 'আমি তার আত্মীয়দের অনুনয়বিনয় করলুম, টাকা দিতে চাইলুম, কিন্তু কেউ কেন রাজি হবে তার কাছে থাকতে? তাদের প্রাণের দাম আছে, তারা সংসারী মানুষ, তাদের ওপর নির্ভর করছে বহু অসহায় প্রাণী। তারা বললে, 'দাও ওকে কোনো স্যানিটরিয়ামে পাঠিয়ে। ভাওয়ালিতে কি মদনপল্লিতে। অন্ততপক্ষে যাদবপুরে। আমরাও সাহায্য করব।' বোঝে না যে মধুপুরে ওর নিজের বাড়ি, ওর 'মায়াপুরী' ; ওখান থেকে ও কোথাও যায় তো স্বর্গে।'

'তারপর, ও কি এখনও সেইখানে আছে না স্বর্গে?'

'তারপর, আমি সমস্ত খুলে বললুম, আমার সহধর্মিণীকে। বললুম, ও যদি মরে যায় তো আমার ভিতরটা শুকিয়ে যাবে, ঝুনো নারকেলের মতো। তুমি কি তেমন স্বামী নিয়ে সুখি হতে পার, রত্না? যদি না হও তো আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে অনুমতি দাও মাঝে মাঝে ওর ওখানে হাজিরা দিয়ে আসবার, অবশ্য উঠব আমি ডাকবাংলোয়। তুমিও যেতে পারো আমার সঙ্গে। রত্না যখন দেখলে যে আমার ভিতরের মানুষটাই মরতে বসেছে তখন অমুমতি দিল। কিন্তু আমার সঙ্গে যেতে রাজি হল না। এইভাবে দু-বছর কাটল। সখি আবার সজীব হল, তার রং ফিরল, হাসি ফুটল। মনে হল তার সুখ না থাকলেও দুঃখ নেই। কিন্তু ওটা আমার মনের ভুল। ভিতরে ভিতরে ও শুকিয়ে যাচ্ছিল ঠিকই। সখ্যের অভাবে নয়, প্রেমের অভাবে। আমি তার কী করতে পারি!'

'থাক,' আমি সান্ত্বনা জানালুম, 'যে যাবার সে গেছে, তার কথা ভেবে মন খারাপ করিসনে। তুই তোর যথাসাধ্য করেছিস। সংসারে এই-বা ক-জন করে! তুই আদর্শ বন্ধু।'

'কিন্তু ও বেঁচে আছে। হ্যাঁ, বেঁচে আছে। ভালো আছে। সুখে আছে। ও পেয়ে গেছে মুক্তা ঝরার জল, সোনার শুকপাখি।'

'অ্যাঁ! এ অসম্ভব সম্ভব হল কী করে? করলে কে!'

'ওরই মতো এক যক্ষ্মারোগী। মধুপুরেই ওদের আলাপ। ওরা এখন একসঙ্গেই থাকে। আমি কিছু বলিনে। দেখেও দেখিনে, শুনেও শুনিনে। জীবন বড়ো না নীতি বড়ো? মানুষ বড়ো না সমাজ বড়ো? শঙ্কর, তুই তো কবি ও সাহিত্যিক। তোর কী মনে হয়?'

উচ্ছ্বাস আমার কণ্ঠরোধ করেছিল। কোনোমতে বলতে পারলুম, 'ওরা নিরাময় হোক!'

কলকাতায় নীলুর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল এই সেদিন। রবীন্দ্র জন্মদিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত এক আসরে। রত্না ছিলেন সঙ্গে। কুশল বিনিময়ের পর ওকে একান্তে টেনে নিয়ে সুধালাম, 'সখির খবর কী?'

'ভালো আছে। ওদের জীবন পরিপূর্ণ হয়েছে। ওরা এখন তিন-চারটি ছেলে-মেয়ের মা-বাপ।'

আমি চমকে উঠলুম। 'বলিস কী! হল কী করে!'

নীলু হেসে বললে, 'হয়নি। রুগণ দেখে আশ্রয় দিয়েছে। হাসন তাদের আপন সন্তানের মতো ভালোবেসে মানুষ করছে।'

'খরচ জোগায় কে?'

'যে জোগাত সেই জোগায়।'

'রত্না জানে?'

'জানে। তারও তো মায়ের প্রাণ। এতদিনে তার গ্লানি মুছে গেছে। আমাকে আর ঘরে-বাইরে সংগ্রাম করতে হয় না।'

আমি তার হাতে হাত রেখে বললুম, 'নীলু, তোকে যদি ফলো করতে জানতুম ধন্য হতুম। চাঁপার সঙ্গে দেখা হলে বলিস, যে বাঁচায় সেই বাঁচে।'

জখমি দিল

মন্বন্তরের বছর আলমোড়া গিয়ে দেখি সেখানেও মানুষের মুখে হাসি নেই। তারা বলাবলি করছে, 'ডিসেম্বর মাসে এখানেও আকাল পড়বে।' শুনে নিরাশ হলুম।

নিরাশ হয়েছি এই কথাটা ভাঙা হিন্দিতে সমঝিয়ে দিচ্ছি আমার ব্যাঙ্কারকে, খেয়াল হয়নি যে তাঁর সঙ্গে কুমায়ুনি ভাষায় আলাপ করেছেন যিনি তিনিও বাঙালি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ কুমায়ুনিদের মতো। যোধপুর ব্রিচেসের উপর গলাবন্ধ কোট, মাথায় দেশি টুপি। কপালে চন্দনের ফোঁটা। লম্বা চওড়া জমকালো চেহারা। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে, গোঁফদাড়ি কামানো।

ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'নৈরাশ্যের কথা যদি তুললেন তো অমন যে কাশ্মীর—যাকে ভূস্বর্গ বলে—সেখানেও মানুষ খেতে পায় না। ভারতের এমন অঞ্চল নেই যেখানে আমি যাইনি, কিন্তু কোথাও দেখিনি যে মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।'

শাহজি কত দূর বুঝলেন জানিনে, তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি কাশ্মীর যাবার কথা ইতিপূর্বে ভাবছিলুম, কিন্তু এরপরে সে-ভাবনা ত্যাগ করলুম। আমার বিমূঢ় দশা লক্ষ করে ব্যাঙ্কার বললেন হিন্দিতে, 'মল্লিকজির সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই? আপ পলিটিকল লিডর থে। অব জখমি দিল।'

শুনলুম ভদ্রলোক এখন এখানকার 'নন্দা দেবী রেস্টুরেন্ট'-এর মালিক। তখন আমার মনে পড়ল যে ইনিই তিনি যাঁর কথা স্থানীয় বাঙালিদের মুখে শুনেছি। আলিপুর বোমার মামলায় নাকি ছিলেন ফেরার আসামি।

'ওঃ, আপনি!' আমি নমস্কার করলুম। মল্লিক কিনা মল্লিকজি। তিনি বললেন, 'নমস্তে।' তারপরে আমরা দুজনেই কাজ সেরে একসঙ্গে গা তুললুম।

মল্লিক যখন জানালেন যে তাঁর রেস্টুরেন্ট খুব কাছেই তখন আমি জানালুম যে আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই। চললুম তাঁর সঙ্গে।

রেস্টুরেন্টের উপরতলায় তাঁর ফ্ল্যাট। বারান্দা থেকে হিমালয় দেখা যায়—হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্যে তন্ময় হলুম দুজনে। কখন একসময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠল।

'যা বলছিলুম। কাশ্মীর গেলে যে আপনি কোটি মানুষের সুখ দেখে সুখ পেতেন তা নয়। আমি তো সারা ভারতের কোনোখানেই পাইনি। যে-দেশে যা নেই তা আমি খুঁজলেও নেই, আপনি খুঁজলেও নেই। তেমন সুখ যদি দেখতে চান তো ছুটি নিয়ে ভারতের বাইরে যান। এই অভিশপ্ত দেশে...' বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

তাঁকে দেখে মনে হয় না যে কখনো ভারতের বাইরে গেছেন, আন্দামান বাদ দিলে। তাই প্রশ্ন করলুম, 'ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে গেছেন?'

'ইংল্যাণ্ডে, সুইটজারল্যাণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র।'

এসব দেশ আমারও ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ক-বছর ছিলেন?'

এর উত্তরে তিনি কী জানি কী ভাবলেন, তারপরে বললেন, 'রাম যত বছর নির্বাসনে ছিলেন।'

'চো-দ্দো বছর!' আমি আশ্চর্য হলুম। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে তার আভাস মাত্র নেই।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না লক্ষ করে তিনি বিলিতি ধরনে হা-হা করে উঠলেন। তারপর ফরাসিতে মাফ চাইলেন, 'পারদঁ!' তারপর জার্মান ভাষায় গান ধরলেন, 'Herz mein herz sei nicht becklommen...'

হৃদয়, আমার হৃদয়, ব্যথায় কাতর হোয়ো না...

তাঁর কণ্ঠের কারুণ্য আমার নয়নপল্লবে সঞ্চারিত হল। আমি চেপে ধরলুম, 'বলুন-না কী আপনার ব্যথা, যদি গোপনীয় না হয়।'

এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সবটা মনে নেই, মনে থাকলেও লেখার সময় আসেনি। একাংশ লিখছি।

আর ভাবছি তিনি এখন কোথায়!

তখন স্বদেশির যুগ। বয়স কাঁচা। দেশের মাটির দিকে চেয়ে আমার মনে ভাব জাগত, মাটি কি সত্যি মাটি না চিন্ময়ী মায়ের মৃৎপ্রতিমা? আমরা প্রতিমা পূজা করি বলে ওরা যে আমাদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি জানে না যে এই জল এই হাওয়া সবই এক-একটি প্রতিমা? যাঁর প্রতিমা তিনি ভারতমাতা।

একালের ছেলেরা শুনে হাসবে, কিন্তু সেকালে আমরা সত্যি বিশ্বাস করতুম যে ভাতরমাতা বলে বস্তুত কেউ আছেন, যেমন জগন্মাতা বলে কেউ আছেন। সেই ভারতমাতাকেই বন্দনা করে বলতুম, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী'। মনে মনে বলতুম, মা, তুমি যদি শক্তিময়ী তবে তোমার শক্তি কেন সুপ্ত রয়েছে! মা, তোমার শক্তির পরিচয় দাও। মহিষমর্দন করো। সিংহবাহিনী, সিংহটা যে বড়ো বাড়াবাড়ি করছে, মা। ওকে শায়েস্তা করো।

হাসছেন। কিন্তু তখন আমরা ভুলেও হাসতুম না। আমরা প্রত্যেকেই ছিলুম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হতুম। ভিতরের আগুন বাইরেও জলত। হাসবেন, আমরা কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস করতুম যে মা একদিন আক্ষরিক অর্থে জাগবেন। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করব জাগ্রত দেবতা দশপ্রহরণ ধারণ করে দশ হস্তে সংগ্রাম করছেন। আজ কলকাতায়, কাল পাটনায়, পরশু দিল্লিতে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করছেন। দেখব কয়েক দিন পরে একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। দেশ স্বাধীন।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হল, ওসব সত্যযুগে সম্ভব, কলি যুগে নয়। এ যুগে মা তাঁর আপন শক্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আমরাই তাঁর এক-একটি হাত, আমরাই ধরব এক-একটি প্রহরণ। জাগব আমরাই, আমরাই যুঝব।

তখন আমরা অস্ত্র সংগ্রহে মন দিলুম, অস্ত্রচালনা শিখলুম। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয়, কেমন করে বারুদ তৈরি করতে হয়, শেখা গেল এসব। ভেবেছিলুম কেউ টের পাবে না, জানতুম না যে দেয়ালেরও কান আছে। দলের লোক ধরা পড়ল, আমিও পড়তুম, কিন্তু বাবার ছিল ওষুধের দোকান, তলে তলে চোরাই মদের কারবার। জাহাজি গোরাদের কাছ থেকে তিনি মাল আমদানি করতেন। সেই সূত্রে জাহাজি গোরাদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। তারাই আমাকে লুকিয়ে চালান দিল ইংল্যাণ্ডে। তখনকার দিনে পাসপোর্টের হাঙ্গামা ছিল না। ইংল্যাণ্ড আমাকে আশ্রয় দিল। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে রক্ষা পেলুম দ্বীপান্তর হতে। ইংরেজ আমাকে উদ্ধার করল ইংরেজের রোষ থেকে।

এই ঘটনার পর আমার ব্রিটিশবিদ্বেষ আপনি অন্তর্হিত হল। বিলেতে বাস করে দেখলুম ওরা রাক্ষস নয়, পঙ্গপাল নয়, আমাদের মতো মানুষ। বিলেত দেশটাও মাটির। সে-মাটিও মাটি নয়, মৃন্ময়ী মা। ভক্তি জন্মাল। মা ব্রিটানিয়াকে মনে মনে বন্দনা করলুম। বললুম, মা, তুমি জাগ্রত দেবতা। তোমার শক্তি বদ্ধ নয়, বিকীর্ণ। তোমার অভিব্যক্তি কত উপনিবেশ, কত অধীন দেশ, কত বন্দর, কত নৌঘাঁটি, কত যুদ্ধজাহাজ, কত কামান। আবার কত বড়ো সাহিত্য, কী মহান ধর্ম, কী উন্নত বিজ্ঞান, কী উদার গণতন্ত্র। মা, তুমি তোমারই গৌরবের জন্যে ভারতকে মুক্তি দাও।

জাহাজে উঠে নাম বদলেছিলুম। সেই নামে টাকা যেত বাড়ি থেকে বিলেতে। টাকার অভাব ছিল না। লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যে পড়াশুনা করতুম আর সভাসমিতিতে হাজিরা দিতুম। আয়ার্ল্যাণ্ড কীভাবে তার স্বাধীনতা ফিরে পায় তাই লক্ষ করা ছিল আমার প্রধান কাজ। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের কর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিনের পর দিন কাটত। আইরিশদের মধ্যে তখন আরও একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নাম শিন ফেন। এই তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল।

সেই সূত্রে অনেক বার আয়ার্ল্যাণ্ডে গেছি। বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করত ডাবলিনে আইন পড়তে। কিন্তু লণ্ডনের আকর্ষণ দুর্বার। নানা দেশের আশ্রয়প্রার্থীতে লণ্ডন তখন ভরা। কেউ রাশিয়ান, কেউ চীনা, কেউ তুর্ক, কেউ পোল। তাদের আড্ডা বসত এক-একটা রেস্টুরেন্টে। আমি সেসব রেস্টুরেন্টে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম না তাদের কর্মনীতি। আর তারাও বুঝত না ভারতীয় রাজনীতি। কাজেই আইরিশদের সঙ্গেই আমার বনত ভালো। অথচ মিশতে মন যেত স্বাধীন জাতিদের সঙ্গে। হাজার হোক রুশরা চীনারা তুর্করা স্বাধীন। পোলরা অবশ্য তা নয়, সেটা ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মহলে আমার অবাধ গতিবিধি। ভারতীয়দের একাধিক দল, নরম গরম দুই দলের সঙ্গে আমার সামাজিকতা ছিল, কিন্তু গভীর সম্বন্ধ ছিল কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। ওঁর ওখানে কেউ এলেই ডাক পড়ত আমাকে। একবার দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যারিস্টার এসেছেন। গান্ধী তাঁর নাম। চমকে উঠলেন যে! হ্যাঁ, আপনাদেরই মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি মহাত্মা ছিলেন না, ছিলেন নিতান্তই মিস্টার। তখন আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই নিরীহ গোবেচারি একদিন ভারতের মহানেতা হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে ধাক্কা লেগেছিল। পরে আমরা সে-ধাক্কা কাটিয়ে উঠি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

ওঃ আপনি শুনতে চান কী কথাবার্তা? আচ্ছা বলছি। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, যদিও ১৯০৮ কি ১৯০৯ সালের কথা। সাবারকার সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হ্যাঁ, আপনাদেরই বীর সাবারকার। আশ্চর্য না? কে জানত তিনি একদিন হিন্দু মহাসভার কর্ণধার হবেন। কই, তেমন কোনো হিঁদুয়ানি তো তখনকার দিনে দেখিনি। যা হোক, যা বলছিলুম।

সাবারকার শুধালেন গান্ধীকে, 'মনে করো মস্ত একটা সাপ তোমার দিকে ফণা তুলে তেড়ে আসছে। তোমার পালাবার পথ নেই, পিছনে গভীর খাদ। তোমার হাতে একগাছা ছড়ি আছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষা করা যায়। তখন তুমি কী করবে? মারবে না মরবে?'

গান্ধী এক মুহূর্ত ভাবলেন না, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ছড়িখানা আমি ফেলে দেব, পাছে আমার লোভ জাগে তাকে মারতে।'

অবাক হচ্ছেন? অবাক হবারই কথা। এমন কথা আমি জন্মে কখনো শুনিনি, তাই পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে—'I would drop the stick lest I should feel tempted to kill it.'

সেদিন সেখানে আমরা যে কয়জন উপস্থিত ছিলুম সকলের শ্বাস উড়ে গেল। ছড়ি ফেলে দিলে সাপ কি আমাদের ছাড়বে? মনের সুখে গিলবে। সাবারকার বললেন, 'গান্ধী, তুমি আমার ধর্মগুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে অক্ষম।' সেকথা আমাদের সকলের মনের কথা।

গান্ধী কিছুদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেলেন, আমরাও ভুলে গেলুম তাঁকে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার কোনো মানে হয় না, ওটা নিছক পাগলামি। তাই আমরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করিনি। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সাধারণত এই যে, স্বরাজ কি যোগ্যতার প্রমাণ দিলে পাওয়া যাবে, না অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নিতে হবে? অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়াই যদি স্থির হয় তবে অস্ত্র কোথায় পাব? অস্ত্র পেলেও অস্ত্রশিক্ষার কী উপায়?

আমাদের মধ্যে জন কয়েক ছিলেন, তাঁরা বলতেন, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ একদিন বাঁধবেই, তখন অস্ত্র জোগাবে জার্মানি, অস্ত্রবিদ্যাও সেই শেখাবে। এত বড়ো কথা ভাবতে আমার ভয় করত। তা ছাড়া আমি ছিলুম সত্যি সত্যি ইংরেজভক্ত। না, রাজভক্ত নয়, ইংরেজভক্ত। যুদ্ধে জার্মানির চর হওয়া যদি অস্ত্র সংগ্রহের ও অস্ত্রশিক্ষার একমাত্র উপায় হয় তবে চাইনে ওসব। কিন্তু আমার ও আমার মতো অনেকের তখন ধারণা ছিল অন্য উপায় আছে। সে উপায় যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেওয়া।

যুদ্ধ যখন বাস্তবিক বাঁধল তখন আমাদের সেই ক-জনকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা ততদিনে বার্লিনে। আমরা গিয়ে কর্তাদের জানালুম, আমরা লড়তে প্রস্তুত, সৈন্যদলে আমাদের নেওয়া হোক। আমার নিজের

পক্ষপাত আর্টিলারির উপর। অনেক দিনের সাধ গোলন্দাজ হতে। তদবির করলুম। কিন্তু ভবি কেন ভুলবে! কর্তারা বললেন, তোমাদের চেহারা সুবিধের নয়, অর্থাৎ রাজনীতি সুবিধের নয়।

তখন যে যার নিজের কাজে মন দিল। আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারলুম না। এত বড়ো সুযোগ জীবনে দু-বার আসে না। এমন সুযোগও ব্যর্থ গেল। এ জীবন রেখে লাভ। মনের অসুখ শরীরে সংক্রামিত হল। ডাক্তার বলল, সুইটজারল্যাণ্ডে না গেলে সারবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় নিলুম। সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা দেশ, সেও কেমন স্বাধীন, কেমন সমৃদ্ধ। পর্বতকে মানুষ বশ করেছে, তার পিঠে শহর বসিয়েছে। সেখানে যতরকম আরাম পাবে, যতরকম খেলা, যতরকম আমোদ। সুইটজারল্যাণ্ড আমার ইংল্যাণ্ডের চেয়েও ভালো লাগল। সেখানেও নানা দেশের রাজনৈতিক শরণাগত।

সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতে খবর পেলুম রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদেশে যা ঘটেছে তার নাম নাকি বিপ্লব। উল্লাসে অধীর হলুম। ইচ্ছা করল সেদেশে উড়ে যেতে, কিন্তু উড়ব কী করে? ডানা নেই যে। দেখলুম শরণাগতরা সবাই উত্তেজিত। বিপ্লব যদি এক দেশে ঘটল তবে অন্য দেশেও ঘটবে— অস্ট্রিয়াতে, জার্মানিতে, তুরস্কে। আমি মনে মনে জুড়ে দিলুম, ভারতেও। যেই ও-কথা ভাবা অমনি শরীর সেরে যাওয়া। আমি আমার লুতসার্নের বন্ধুদের ডেকে ভোজ দিলুম। কিন্তু কে জানত সেই বছরই সেই রুশ দেশেই আর এক দফা বিপ্লব ঘটবে। কেন ঘটল কিছুই ঠাহর হল না। আমার রুশ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলুম। তাঁরা তো রেগে টং। আমার উপর নয়, বলশেভিকদের উপর। বললেন, ওরা ডাকাত, ওরা চোর, ওদের ওটা বিপ্লবই নয়, ওটা বর্গির হাঙ্গামা।

কিন্তু আমার সন্দেহ মিটল না, উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আমার এক মার্কসপন্থী আলাপী ছিলেন, তিনিই আমাকে ধীরে ধীরে বোঝালেন মানুষের ইতিহাসটা শ্রেণিসংঘাতে ভরা। ওর একটা বিশেষ অধ্যায় এক দিন আরম্ভ হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে, বুর্জোয়া আধিপত্যে। এতদিনে শেষ হল কেরেনস্কির পতনে, বুর্জোয়াদের মূর্ছায়। এখন থেকে শুরু হল ইতিহাসের শ্রমিক অধ্যায়। সব দেশেই এই হবে। একথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জারের সঙ্গে জারতন্ত্রের সঙ্গে একশো বছর ধরে যুঝল যারা তাদের প্রাণদানের, তাদের নির্বাসনের, তাদের কারাভোগের এই কি পুরস্কার। ছ-সাত মাস রাজত্ব করতে-না-করতে রাজ্যকাল গেল ফুরিয়ে। শেষ হয়ে গেল তাদের যুগ, সেই লক্ষ লক্ষ শহিদের পুরস্কারের যুগ। এর উত্তরে মার্কসপন্থী বললেন, ইতিহাস তাদের মেরে রেখেছে, লেনিন তো নিমিত্ত মাত্র।

ইতিহাস পড়িনি, এই যদি হয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা তবে ইতিহাস পড়ে সুখ নেই। ভারতমাতাকে মনে মনে ডেকে বললুম, মা, আমরা যে তোমাকে এতকাল বন্দনা করে আসছি, তোমার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছি, দ্বীপান্তরে মরছি, কারাগারে পচছি, সেকি এইজন্যে? এই কি তোমার ন্যায়বিচার যে আমরা দু-দশ মাস রাজত্ব করেই সিংহাসন থেকে নামব, আর সেই সিংহাসনে উঠবে শ্রমিক শ্রেণি? তা হলে আমরা কেন এমন করে বুকের রক্ত পাত করছি?

এরপরে কিন্তু আমার ভগবানে বিশ্বাস চলে গেল, সুতরাং ভারতমাতায়। জগতে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে ভগবানও থাকেন না, দেশজননীও না। রাশিয়া থেকে আরও শরণাগত এসে জুটল, এবার বলশেভিকদের অত্যাচার থেকে। তাদের মুখে শ্রেণিবিদ্বেষের কথা শুনতে শুনতে আমার ধারণা জন্মাল যে ইতিহাসটা শ্রেণিসংঘাতে ভরা। তাই যদি হল তবে বুর্জোয়ারা চিরদিন রাজত্ব করতে পারে না। দু-মাস পরে হোক, দু-শতাব্দী পরে হোক, একদিন না একদিন তাদের পুনর্মূষিক হতে হবেই। ত্যাগ করলেও যে-পরিণাম, ত্যাগ না করলেও সেই একই। ত্যাগ তবে করব কেন? করব ত্যাগের জন্যেই।

বুকটা দমে গেল। তার আগে আমার বুকের ব্যামো ছিল না, তখন থেকে হল। স্বৈরতন্ত্রের অবসানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের পরিবারের লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রাণ নিয়ে। এরা এখন নিঃস্ব। দেশ থেকে কেউ এদের টাকা পাঠাবে না, এরা বিদেশির দয়ানির্ভর। একদিন ভারতেও কি একইরকম হবে, এইভাবে দেশান্তরি হবে আমার আত্মীয়স্বজন? এই কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধারা?

এরপরে জার্মানিতে বিপ্লব ঘটল ও সে-বিপ্লব সফল হল। বিপ্লব তাহলে সব দেশে সফল হয় না। আমি আশ্বস্ত হলুম। হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে গেছল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্যারিসে গিয়ে হাজির হলুম ও বাসা করলুম পিস কনফারেন্স দেখতে। ভার্সাইতে যেদিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি ছিলুম সেখানে। জার্মানির লাঞ্ছনা দেখে আমার চোখে জল এল। ভাবলুম জার্মানদের বিপ্লব যদি সফল হত তা হলে কি ভার্সাইতে তাদের এ দশা হত! মনে হল মধ্যবিত্তদের মাজা দুর্বল, অতি সহজেই তারা অপমান মাথা পেতে নেয়, ইতিহাস তাই তাদের ঘাড়ে ভার্সাই চাপিয়ে দেয়।

ফল হল এই যে আমার স্বশ্রেণির প্রতি আমার অনাস্থা জন্মাল। আমার নিজের অলক্ষে মার্কসপন্থী হয়ে উঠলুম। না, কমিউনিস্ট নয়। এমনি সাধারণ অর্থে মার্কসিস্ট। ক্রিয়াকর্মে নয়, মতবাদে। হিন্দুর ছেলে ব্রাহ্মসমাজে নাম না লিখিয়ে তো নিরাকারবাদী হয়। আমিও তেমনি কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসিস্ট। আমার জীবনে এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে গেল। প্রতিমা-পূজক আমি, সর্বপ্রথমে ভাবলুম ভারতমাতার প্রতিমা। ‘বন্দে মাতরম’-এর উপবীত বর্জন করলুম। অতঃপর বহু দেশ ঘুরি, কিন্তু রাশিয়ায় যাবার ছাড়পত্র পাইনে। হয়তো আরও কিছুদিন পরে পেতুম। কিন্তু দেশে ফেরবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। মস্ত ভুল করলুম দেশে ফিরে। আমার ধারণা ছিল দেশ একেবারে বদলে গেছে এবং সে-পরিবর্তন দেখবার মতো। অনেক তদবির করে দেশে ফেরবার অনুমতি পাই। অভয় পাই যে আর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে না। আমার সহকর্মীরা মার্জনা পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরেছিলেন। অতএব আমাকে মার্জনা করা কঠিন হল না।

দেখলুম জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তার নেতা হয়েছে গান্ধী। গান্ধীর মতো অদ্ভুত লোককে যারা নেতা করতে পারে তারা সব পারে। দেশের মতিগতি আমাকে হতাশ করল। রাজনীতিক্ষেত্রে জৈন ধর্মের প্রয়োগ দেখে আমি তো ধরে নিলুম দেশ তিন হাজার বছর পেছিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। একে তো দেশটা যারপরনাই গরম, তার উপর খদ্দর পরবার ফরমায়েশ শুনে মেজাজ গেল বিলকুল বিগড়ে। তার পরে যখন কানে এল যে মদ খাওয়া পাপ তখন আমি পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলুম। ইউরোপে ফিরে যাবার পাসপোর্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভক্তেরা রটিয়েছিল যে আমি আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছি ও বাংলা দেশের ছেলেদের ও-বিদ্যা শেখাতে চাই। খবরটা সরকারি মহলে আতঙ্ক সঞ্চার করে। তার ফলে আমার পাসপোর্ট পাওয়া তো হলই না, তার বদলে হল মাদ্রাজের ভেলোর জেলে বিনা বিচারে অবরোধ। মদ খাওয়া যখন কপালে লেখেনি তখন কী আর করি! ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে শুরু করে দিলুম। মাছ-মাংস ছাড়তে হল মাদ্রাজিদের রান্নার সঙ্গে অসহযোগ করে। সকলেই স্বীকার করল যে অসহযোগী বটে। কিন্তু গরমে মারা যাচ্ছিলুম। গভর্নমেন্টকে লেখালেখি করে বদলি হলুম এই আলমোড়ায়, মানে আলমোড়া জেলে। ছাড়া পেলুম তিন বছর পরে।

ছাড়পত্রের আশা ছিল না। অথচ ইউরোপের আকর্ষণ তীব্র। চললুম বম্বে, সেখানে একটা রেস্টুরেন্ট খুলে বসলুম। বিনা খরচে মদ খাবার ফন্দি। জাহাজ ভিড়লেই আমি যাই ইউরোপীয় যাত্রীদের সঙ্গে ভাব করতে, তাদের ধরে এনে মদ খাওয়াতে, মদের গেলাসের উপর গল্প জুড়তে। ইউরোপের তাজা খবর সেইভাবে আমার কানে আসত, আর সেরা মদও আসত আমার সেলারে। বম্বে আমার বেশ সুট করেছিল, মাঝে মাঝে সেখান থেকে জলপথে সিংহলে বেড়িয়ে আসতুম, কলম্বোতে বড়ো বড়ো জাহাজ ধরতুম। ইউরোপের স্বাদ পেতুম সেসব জাহাজে। বয়স থাকলে আবার পালাতুম তার কোনো একটা জাহাজে, কিন্তু এত বয়সে আর অ্যাডভেঞ্চার সাজে না। ধরা পড়লে জেল।

বম্বে থাকতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কংগ্রেসে ঢুকে দেখলুম ওর নেতারা কেউ দিগম্বর জৈন নন, গান্ধীকে ওঁরা মান্য করেন অন্য কারণে। সে-কারণটি এই যে গান্ধীই একমাত্র লোক যিনি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কাকে বলে জানেন। যেই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দিন ঘনিয়ে এল অমনি আমিও চরকা কেটে খদ্দর পরে মদের শেষ স্বাদ নিয়ে তালগাছ খেজুরগাছ কাটবার জন্যে তৈরি হলুম। আমার মার্কসীয়

বস্তুবাদ আমাকে নিবৃত্তি করতে পারল না, আমি গলা ছেড়ে হাঁকলুম, 'বন্দে মাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!' 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়!'

থাক, আর বাড়াব না। কয়েক বছর পরে ভাঙা মন নিয়ে জেল থেকে বেরোবার আগে ভালো করে মার্কস লেনিন পড়ছিলুম, পড়ে গান্ধীজির ব্যর্থতার হেতু উপলব্ধি করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল নতুন উদ্যমে কাজে লেগে যাব, কিন্তু বুকের ব্যামোর জন্যে বাধ্য হয়ে বম্বের মায়া কাটাতে হল। আলমোড়ার সুবিধে এই যে এখানে চুপচাপ থাকা যায়। অন্যান্য হিল স্টেশনের মতো হইচই নেই। আর হিল স্টেশনে থাকার কারণ গরম আমার একবার সহ্য হয় না। ইউরোপ আমাকে মাটি করেছে। তাই দিনরাত ভাবি, কবে আবার ছাড়পত্র পাব। দরখাস্ত করেওছি কয়েকবার, কিন্তু যুদ্ধ না থামলে আশা নেই।

আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ খুব শিগগির থামবে? না, আমারও সে ভরসা নেই।

সেদিন মল্লিকজি আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না, কাজেই আমিও তাঁকে অনুরোধ জানালুম একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী যখন তাঁকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন তখন জবাব এল তাঁর ভাগনের কলম থেকে। মল্লিকজি নেই, নৈনিতাল গেছেন, কবে ফিরবেন বলে যাননি। আমরা ক্ষুণ্ণ হলুম।

একথা শুনে আমার আলমোড়ার বন্ধু লাহিড়ি বললেন, 'খেপেছেন! মল্লিকজি আসবেন আপনার হোটেলে খেতে! আপনার হোটেলের বাবুর্চি যে মুসলমান এ খবর কে না রাখে?'

আমি আহত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মল্লিক যে ইউরোপে চোদ্দো বছর ছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে-মল্লিক আর নেই। এঁর নাম মল্লিকজি, এঁর কত বড়ো চন্দনের ফোঁটা। আপনি বোধহয় লক্ষ করেননি যে বড়ো বড়ো চুলের সঙ্গে এক গোছা টিকিও আছে।'

'কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় বস্তুবাদে বিশ্বাসবান।'

'বোধহয় সেইজন্যেই বস্তু ভালো বোঝেন। টাকা চেনেন।'

কিন্তু প্রকৃতই তিনি নৈনিতাল গেছলেন। আমি অন্য সূত্রে জেনেছিলুম। লাহিড়ি তা শুনে তামাশা করলেন, 'তা হলে আপনার নিমন্ত্রণ এড়ানোর জন্যেই তিনি নৈনিতাল গেছেন। আপনি থাকতে ফিরছেন না।'

লাহিড়ি আমাকে খুলে বললেন যে মল্লিকজি ব্যাবসাদার মানুষ, জাতধর্ম মেনে চললে এই ঘোরতর নিষ্ঠাবান শহরে পসার জমে ভালো।

মাসখানেক পরে উদয়শঙ্করের স্টুডিয়ো থেকে আসছি, পথে মল্লিকজির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। লক্ষ করলুম সেদিন তাঁর পরনে ইউরোপীয় পোশাক। হালকা গ্রে রঙের সুট, ফেলট হ্যাট। কপালে চন্দনের চিহ্ন ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো কথা, আপনার বাবুর্চি কেমন রাঁধে?'

'কেমন রাঁধে, তা আসুন-না পরখ করে দেখবেন। কবে আসতে পারবেন বলুন?'

'তার কি আর সময় আছে ভাই। আমাকে যে কাল নৈনিতাল ফিরে যেতে হয়। সেখানে নতুন একটা রেস্টরেন্ট খুলছি কিনা। নাম রেখেছি রেস্তরাঁ আঁতেরনাসিওনাল (Restaurant Internationale)।'

'তাই নাকি?' আমি চমৎকৃত হলুম। 'তা হলে কি আপনি এখানকার পাট তুলে দিচ্ছেন?'

'না। এখানকার ভার নিচ্ছে আমার ভাগনে।'

'কিন্তু হঠাৎ নৈনিতাল?'

'ঠিক হঠাৎ নয়। ভাবছিলুম অনেক দিন থেকে। পাসপোর্টের জন্যে এখন থেকে তদবির না করলে নয়। আর তদবির করার মোক্ষম পদ্ধতি হল উদরের অভ্যন্তর দিয়ে।'

আমি হাসলুম। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, 'বুঝছি আমার পতন হল। কিন্তু পতন কি এই প্রথম? এতদিন যে মল্লিকজি সেজে আলমোড়ায় বসেছিলুম সেই-বা কম কী! আসল কথা আমার কিছু পুঁজি চাই। কী নিয়ে ইউরোপে যাব? আর তো বাবা নেই যে বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবেন।'

শেষের উক্তিটিতে করুণরস ছিল। আমি সমবেদনায় আপ্লুত হলুম। বললুম, 'কিন্তু দেশ যে আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, মল্লিক—'

'—জি না। শুধু মল্লিক।' তিনি আমার কোটের বাটনহোলে আঙুল ঢুকিয়ে একটু অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, 'দেশ যখন তৈরি হবে তখন আবার আসব, যদি বেঁচে থাকি।'

তারপর তিনি জানতে চাইলেন তুলনকে তালিম দিলে সেকি 'বফ রোতি' 'রাগু দ্য মুতোঁ' ইত্যাদি বানাতে পারবে? আমি পরিহাস করলুম, 'রোস্ট বিফ বানালে চেখে দেখবে কে? আপনি?'

তিনি অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন। বললেন, 'ও না খেলে আমার তাকত ফিরবে না। কিন্তু রোস্ট বিফ নয়। বফ রোতি। আমার ওখানকার মেনু ছাপা হবে ফরাসি ভাষায়। যুদ্ধের হিড়িকে আজকাল কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাই-ই চাই। আপাতত ওই আমার ইউরোপ, আমার সঞ্জীবনী। রায়, তোমাকেও আসতে হবে একদিন। বউমাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো ভাই। তিনিও যদি আসেন তো সত্যি খুশি হব।'

অজাতশত্রু

ওই মাননীয় মহোদয় যেবার আমাদের শহরে শুভাগমন করেন ওঁর গুণমুগ্ধরা একটি প্রীতিভোজ দেন। আমন্ত্রিতরা সকলেই পুরুষ, দু-চারজন আবার রাজপুরুষ।

এ ধরনের পার্টিকে বলে স্ট্যাগ পার্টি। মাঝে মাঝে স্ট্যাগ পার্টিতে যেতে বেশ লাগে। মহিলারা অনুপস্থিত থাকায় প্রাণ খুলে হাসি মশকরা করা যায়। অনেকের অনেক গুণপনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট গুপ্ত সাহেব যে মদের সঙ্গে মদ মেশাতে জানেন এ বিদ্যা এতদিন গুপ্ত ছিল। তিনি নিলেন ককটেল বিভাগের ভার।

খানা টেবিলে বসে পিনায় চুমুক দিতে দিতে সাফল্যের প্রসঙ্গ উঠল—জীবনের সাফল্য। আমাদের ডাক্তারসাহেব মেজর দাস বললেন, 'আমার বন্ধু বাগচির secret of success কী জানেন? বাগচি যে আজ এতদূর উন্নতি করেছেন তার সিক্রেট আর কিছু নয়, একটি কথা।'

সেই কথাটি কী কথা তা তিনি একটু একটু করে বললেন। বাগচির নাম আমরা শুনেছিলুম, কিন্তু জীবনী এই প্রথম শুনলুম। বাস্তবিক বাগচির মতো ভাগ্যবান পুরুষ ভাগ্যবানদের মধ্যেও বিরল। ছেলেবেলায় পড়েছিলুম, 'উদ্যোগীনং পুরুষসিংহম্ উপৈতি লক্ষ্মী'। কিন্তু কই, উদ্যোগী লোকের তো অভাব নেই, তবু কেন বাগচির মতো লোক এত কম দেখা যায়!

আমরা খাওয়া ছেড়ে শোনায় মন দিলুম। কে জানে হয়তো আমরাও এক একজন বাগচি হয়ে নরজন্ম সার্থক করব, যদি জেনে রাখি বাগচি হওয়ার সিক্রেট।

বাগচির গল্প যখন শেষ হল তখন সাফল্যের নেশা আমাদের মাথায় চড়েছে। অবশ্য নিছক সাফল্যের নেশা নয়, আর এক নেশাও। নেশার ঘোরে কে একজন গুণমুগ্ধ ফস করে বলে বসলেন, 'অতদূর যেতে হবে না। এই তো আমাদের সম্মুখেই বিরাজ করছেন সাফল্যের প্রতিমূর্তি আমাদের মহামান্য অতিথি। বাংলা দেশে বাগচি জন্মায় যখন-তখন, কিন্তু ইনি হলেন ক্ষণজন্মা। বাগচি, রেখে দিন আপনার বাগচী।'

তখন আমরা সকলে চেপে ধরলুম, 'স্যার, আপনার সাফল্যের সিক্রেট কী আজ আমাদের শোনাতেই হবে।'

ক্ষণজন্মা তা শুনে মৃদুমধুর হাসলেন। তাঁর দাড়ির উপর দিয়ে তরল হাসির ঢেউ খেলে গেল। দাড়িটি ফরাসি ধরনে ছাঁটা, যদিও তাঁর সব ক-টি চুল সাদা। মাননীয়ের বয়স ষাটের উপর। কিন্তু প্রসাধনের পারিপাট্য তা বুঝতে দেয় না।

সেদিন আমাদের পীড়াপীড়িতে তাঁর মাননীয়তার মুখোশ খসে পড়ল। তিনি আমাদের সঙ্গে সমান হয়ে বললেন, 'হা হা, আমার তো secret of success নয়, আমার হচ্ছে secret of unsuccess ; সেকি আপনাদের শুনতে ভালো লাগবে?'

আমরা বিস্মিত হলুম। বিশ্বাস করলুম না। ভাবলুম ইনি কেবল সাফল্যের প্রতিমূর্তি নন, বিনয়েরও অবতার।

গুপ্ত আমার কানে কানে বললেন, 'মিথ্যে নয়। কয়েকটা কোম্পানি ফেল মেরেছে ওঁর ম্যানেজমেন্টে।'

সারকিট হাউসের ডাইনিং রুম থেকে আমরা সকলে ড্রইং রুমে এসে জমিয়ে বসলুম। কফি খেতে খেতে মান্যবরকে খোশামোদ করতে থাকলুম তাঁর সিক্রেটটুকু জানতে। তিনি কি সহজে বলতে চান!

তখন গুপ্ত প্রস্তাব করলেন, 'স্যারকে কি এক পেয়ালা রাশিয়ান কফি দিতে পারি?'

রাশিয়ান চা কাকে বলে জানতুম, কিন্তু রাশিয়ান কফির কথা এই প্রথম শুনলুম। মাননীয় বললেন, 'রাশিয়ান কফি! সে আবার কবে আমদানি হল?'

'না, সেরকম কিছু নয়। রাশিয়ানরা কফির সঙ্গে এক ফোঁটা ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খায় কিনা। বেশি নয়, এক ফোঁটা। এই যে।'

মাননীয় আবার মুখোশ এঁটে বললেন, 'ব্যাস।'

তাতেই ফল হল। রাশিয়ান কফি গেল তাঁর উদরে, আর অমনি বেরিয়ে এল তাঁর ব্যর্থতার কাহিনি।

আমরা তাঁকে ধীরে ধীরে ঘিরে বসলুম।

আমার বড়োমেয়ের মুখে কবির এ দুটি লাইন কত বার শুনেছি—

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা...

হায়! আমার সে-মেয়ে আজ নেই; কোনো মেয়েই নেই, কোনো ছেলেই নেই, কেউ নেই। মানে, আছে সবাই কিন্তু আমার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ধন আছে মান আছে, নেই কেবল কিছু ভালোবাসা। এ বয়সে আর আশা করতে পারিনে। ক-টা দিন, আর কেন আশা।

কী করে যে কী হল, কী থেকে কী হয়ে দাঁড়াল, সে অনেক কথা। আপনাদের ভালো লাগবে না, লাগার কথা নয়। আপনারা জানতে চেয়েছেন এমন কোনো গোপনীয় কৌশল যার সাহায্যে আমি আজ ধনকুবের। আর আমি কিনা বাজে বকছি। বলছি, ধন নয় মান নয় কিছু ভালোবাসা। ক-টা দিন, আর কেন আশা!

কিন্তু দয়া করে শোনেন যদি তো আপনাদের সময় নষ্ট হবে না। যদি হয়ও তবু এমন কিছু পাবেন যা আপনাদের মনে থাকবে।

আমার জীবনের সবচেয়ে গর্বের দিন কোনটা বলব? যেদিন আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দশ লাখ অতিক্রম করল সেদিন নয়; যেদিন আমি নাইট উপাধি পেলুম সেদিন নয়; যেদিন আমি বাবার সঙ্গে সফর থেকে ফিরি, সাত বছর বয়সে। সেদিনকার দৃশ্য আমার আজও মনে আছে, প্রায় পঞ্চান্ন বছর পরে। ইতিমধ্যে কত ঘটনা ঘটল, কত দুর্ঘটনা, কত অঘটন। কিন্তু আমার সাত বছর বয়সের সেই ঘটনাটি যেমন জ্বলজ্বল করছে, তেমন আর কোনোটা নয়। আর সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

সন্ধ্যা বেলা ফিরলুম গোরুর গাড়িতে। আর অমনি পাড়ার ছেলে-মেয়ের দল আমাকে লুট করে নিয়ে গেল খেলার জায়গায়। নিয়ে গিয়ে চাঁদের আলোয় আমার চারিদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। সে-বয়সে আমার জানা ছিল না রাসলীলা কাকে বলে। ঠিক রাসলীলা না হলেও সেও ছিল সেইরকম। ওরা যে আমাকে এত ভালোবাসত তা কখনো কল্পনা করিনি। প্রত্যেকে বলে, আমার ভানু। প্রত্যেকে আমাকে কাছে টানে। আমি যে এতগুলি ছেলে-মেয়ের একান্ত ও একমাত্র, একথা সেই প্রথম শুনি সেই শেষ।

কিন্তু তখন থেকে আমার জীবনের সাধ, আমি সকলের প্রিয়পাত্র হব। আমি অজাতশত্রু, আমার কোনো শত্রু নেই। আমি নই কারও শত্রু। কিন্তু এমনই আমার কপাল, ভাবি এক হয়ে ওঠে আরেক।

ইস্কুলে ভরতি হয়ে দেখলুম সেখানে ছেলেতে ছেলেতে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা হলেই শত্রুতার সূত্রপাত হয়। আমি অজাতশত্রু, তাই প্রতিযোগিতার মধ্যে গেলুম না। যে যেদিন ডাকে সেদিন তার কাছে বসি। একদিন আমাদের ক্লাসের লাস্ট বয় মুরলী মুখুজ্যের কাছে বসেছি। এমনই আমার বরাত সেদিন মাস্টারমশাই এমন একটা প্রশ্ন করলেন যার উত্তর কেউ পারলে না দিতে। ফার্স্ট বয় থেকে লাস্ট বয় পর্যন্ত সব্বাইকে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। মাস্টারমশাই 'ইউ ইউ' করে অবশেষে আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'ইউ'! আমার উচিত ছিল চুপ করে থাকা, কিন্তু জিহ্বাগ্রে ছিলেন দুষ্টা সরস্বতী। বলে দিলুম উত্তর। মাস্টার বললেন, 'সাবাস। আজ থেকে তুমি সর্দার পোড়ো। যাও ফার্স্ট সিটে যাও, এক এক করে প্রত্যেকের কান মলতে মলতে যাও।'

এখনও মনে পড়ে সে-দৃশ্য। বেচারা মুরলী তার কান দুটি বাড়িয়ে দিয়ে চোখ বুজল। তার মুখে মুচকি হাসি। সে কিছু মনে করেনি। কিন্তু কয়েকটা ছেলে এমন কটমট করে তাকাল যে আমি তাদের কানে হাত দিতে ভয় খেলুম। যাকে বলে রোষকষায়িত লোচন। ফার্স্ট বয় বেচারার মাথা হেঁট। সে তো কেঁদেই ফেলল। কত ছেলেকে কাঁদিয়ে, কত ছেলেকে রাগিয়ে সেদিন আমি প্রথম আসনে বসলুম। ওরা যে একদিন শোধ তুলবে একথা ভেবে আমার শরীর কণ্টকিত হতে লাগল। পরের দিন সত্যি জ্বর এল।

ইস্কুলে অবশ্য যেতে হল আবার, কিন্তু বিদ্যা জাহির করা বন্ধ হল। পড়াশোনায় খারাপ ছিলুম না, অথচ বছরের শেষে পঞ্চম ষষ্ঠ কী সপ্তম হতুম। সেও আমার বিনা চেষ্টায়। পড়াশোনার চেয়ে খেলাধুলায় উৎসাহ ছিল বেশি। ফুটবল ক্রিকেট টেনিস তিনটেই ছিল আমার প্রিয়। সাঁতার আর গাছে ওঠা তো আমার নিত্যকর্ম। এর উপর ছিল চাঁদের আলোয় পাড়ার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা এবং আরও যতরকম বাঁদরামি। একথা আমি আপনাদের কাছে কবুল করছি যে, মেয়েরা কেউ আমাকে খুঁজতে এলে পাঁচ মিনিটের আগে ফিরত না। তারপরে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলত, ভানু চোর। আর আমি যখন চোর হয়ে মেয়েদের খোঁজে যেতুম তখনও পাঁচ মিনিট লাগত কোনো একজনকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু তাকে ছেড়ে দিয়ে বলতুম, এই যা, পালিয়ে গেল। আমিই চোর হতুম আবার।

কিন্তু খেলাধুলার ক্ষেত্রেও দেখলুম দারুণ প্রতিযোগিতা। বার বার মারামারি করে অবসাদ এল। আমি যে অজাতশত্রু, আমার তো শত্রুতা করা সাজে না। টেনিস খেলতে গিয়ে বাঁ-চোখে লাগল বল। যিনি বল ছুড়ে মারলেন তিনি জানতেন না যে বল আমার চোখে লাগবে। ভাবলুম তিনি আমার শত্রু। সেই থেকে টেনিস খেলায় বৈরাগ্য জন্মায়। ফুটবল খেলতে গিয়ে বহুবার ডিগবাজি খাই। ফুটবল মনে করে আমাকেই কত ছেলে কিক করে যায়। ফুটবলে বিতৃষ্ণা এল। ক্রিকেট চালিয়েছিলুম অনেক কাল। বুড়ো বয়সেও সুযোগ পেলে ব্যাট করি আর ধরতে-না-ধরতেই আউট হই।

পড়াশোনায় মন নেই, খেলাধুলার শখ নেই। আমি তবে করি কী! করি হরিনাম সংকীর্তন। পাড়ায় কীর্তনের দল ছিল। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পরম ধার্মিক বনে গেলুম। ছেলেবেলা থেকেই আমার মধ্যে ধর্মভাব ছিল কিছু বেশি। বাড়ির সকলে তা জানতেন। তাই আমার নগরকীর্তনে বাধা দেননি। অনেক রাত্রে নগরকীর্তন করে ফিরতুম, বাবা বকতেন না। কয়েক বছর এই করেই কাটল। পরীক্ষায় ফেল করতুম না, ওই অষ্টম-নবম হতুম। কাজেই মাস্টারমশাইদেরও আপত্তির কারণ ঘটত না।

আমি অজাতশত্রু। আমার একটিও শত্রু নেই। কীর্তন হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে প্রতিযোগিতা থাকলেও অপ্রীতি নেই। আর প্রতিযোগিতা হচ্ছে খোলের সঙ্গে খোলের—কে কত ভালো বাজায়। কিংবা গায়েনের সঙ্গে গায়েনের—কে কত ভালো গায়। আমি ছিলুম নাচিয়ে। বাহু তুলে নাচতুম আর আবেশে ঢলে পড়তুম। আমার প্রতিযোগীরাও তাই করত। করুক, তাতে আমার কী? প্রসাদ তো সকলের ভাগেই সমান।

বেশ চলছিল। কিন্তু বিপদে পড়লুম যেদিন বাবা বললেন, 'তোর বোধহয় কলেজে পড়া হবে না। সংসারের খরচ চালাতে পারছিনে, তোর পড়ার খরচ চালাব কী করে? যদি একটা বৃত্তিটিত্তি জোটাতে পারতিস...'

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। বৃত্তি পায় কারা! যারা প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় হয়। আমি নগণ্য ছাত্র। আমি কেন বৃত্তি পাব! তাহলে কি বাবা বলতে চান যে আমাকেও আদা নুন খেয়ে স্কলারশিপের পড়া পড়তে হবে? তাহলেই হয়েছে আমার অজাতশত্রুতা! সুধাকান্ত আমার বিশেষ বন্ধু। বেচারার মুখের গ্রাসটি কেড়ে নেব, আর সে অন্তর থেকে ক্ষমা করবে? আর মনোরঞ্জন আমার ভাইয়ের মতো। সেকি আর আমার ভাইয়ের মতো থাকবে, যদি তার জলপানি কেড়ে খাই?

উপদেশ নিতে গেলুম হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে। তিনি বললেন, কলেজে পড়ার আর কী উপায় আছে জানিনে। টিউশনি করতে গেলে দেখবে সেক্ষেত্রেও তুমুল প্রতিযোগিতা। হ্যাঁ, একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিযোগিতা নেই। ঘরজামাই হতে রাজি আছ?'

মাস্টারমশাইয়ের এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম, 'প্রাণ গেলেও না।' তারপরে ভালোছেলের মতো স্কলারশিপের জন্যে পড়ি। সামান্য একটা বৃত্তি পাই। তাতে আমার কলেজের পড়া কায়ক্লেশে চলে দু-বছর। তারপরে মোটা গোছের বৃত্তি পাই। কলেজের পড়া অক্লেশে এগোয়। কিন্তু যাদের সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা তারা আমার সঙ্গে কথা কয় না। কথা কয় তো আমার সাফল্যের সিক্রেট জেনে নিতে। এ একপ্রকার প্রচ্ছন্ন শত্রুতা। মাফ করবেন, আপনাদের কারও প্রতি কটাক্ষ করছিনে। আপনারা আমার প্রতিযোগী নন, সুতরাং শত্রু নন। আপনাদের কৌতূহল অন্য জাতের।

আইনটা পাস করেছিলুম এমনি হাতের পাঁচ হিসাবে। কিন্তু বাবা বললেন, উকিল হতে হবে। তার চেয়ে কসাই হওয়া ঢের ভালো। কসাই তো মানুষেরও গলা কাটে না, গরিব বিধবার গলা কাটে না, বিপন্ন নাবালকদের গলা কাটে না। কী করি! একটা কিছু তো করতে হবে। যা-ই করি-না কেন পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খাওয়ার কথা ওঠে। এমন কোন জীবিকা আছে যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণ নেই! যদি থাকে তো সমাজের নীচের দিকে। মিস্ত্রির বা মেথরের কাজ, চাষির বা মজুরের কাজ সেসব। আমরা ভদ্রলোক বলে পরিচিত বটে, কিন্তু আমাদের মতো পরখাদক বা নরখাদক কি আর আছে!

আর একটু রাশিয়ান কফি? ধন্যবাদ মিস্টার গুপ্ত। এক ফোঁটা। এক ফোঁটা। থাক থাক, হয়েছে হয়েছে। থ্যাঙ্ক ইউ।

ইতিমধ্যে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। একরকম জোর করেই দিয়েছিলেন। না দিলে তাঁর ধারণা আমি ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করতুম। এর কারণ আমার স্বাভাবিক ধর্মভাব আমাকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রবিবারে রবিবারে ব্রাহ্মমন্দিরে গিয়ে চোখ বোজা আমার অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখ বুজে আমি নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করতুম কি কোনো সাকার ব্রাহ্মিকার এ সম্বন্ধে আজ নীরব থাকাই সমীচীন, কারণ এখানে নিরাকারবাদীও রয়েছেন।

সে যা হোক, আমার শ্বশুরমশায়ের ছিল কয়লার খনি। বাবাকে বললুম, ব্যাবসাই যদি করতে হয় তবে আইনের ব্যাবসা কেন? তিনি রুষ্ট হলেন, কারণ তাঁর মতে আইনের ব্যাবসাতে ফেল করার সম্ভাবনা কম, কয়লার ব্যাবসাতে বেশি। এবং কপালে থাকলে রাসবিহারী ঘোষ হওয়া সোজা, রামদুলাল সরকার হওয়া শক্ত। ওদিকে শ্বশুরকন্যাও তুষ্ট হলেন না। তিনি চেয়েছিলেন আমি এক লম্ফে হাই কোর্টের জজ হয়ে অভিজাত সমাজে উন্নীত হই।

শ্বশুরমশাই বললেন, 'ব্যাবসা মানেই প্রতিযোগিতা আর প্রতিযোগিতা মানেই শত্রুতা। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের শত্রুতা কেন? এইজন্যেই। এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের যুদ্ধ বাঁধে কেন? এইজন্যেই। অতএব মনটাকে ইস্পাতের মতো কঠিন করতে হবে। ব্যাবসা হল যুদ্ধ। যুদ্ধে দয়ামায়ার স্থান নেই। দয়া করলে কী মরলে। দরকার হলে নিজের শ্বশুরের গলা কাটতে হবে, অবশ্য আক্ষরিক অর্থে নয়। কাটথ্রোট কম্পিটিশন। তাতে যদি জিতলে তো ঠাকুর, হারলে তো কুকুর। কেমন, জিতবে?'

উত্তর দিলুম, 'আপনাদের আশীর্বাদে জিতব।'

একরকম বিনা মূলধনে আরম্ভ করলুম। মুরুব্বি ও জামিন হলেন শ্বশুরমশাই। আপনাদের আশীর্বাদে গোড়া থেকেই লাভ দেখলুম। কখনো দাঁও মারার চেষ্টা করিনি। কারও সঙ্গে অসাধুতা করিনি। শ্রম করতে কুণ্ঠিত হইনি। অপমানে কাতর হইনি, অবিচারে হতাশ হইনি। বেগতিক দেখলে মিথ্যা বলেছি, খোশামোদ করেছি, ঘুস দিয়েছি। কিন্তু কাম, ক্রোধ বা লোভের বশবর্তী হইনি। ইস্পাতের মতো কঠিন হওয়াই আমার সাধনা। কিন্তু ইস্পাতের তলোয়ার থাকে ভেলভেটের খাপে। আমার ব্যবহার মখমলের মতো মোলায়েম। যে আমার কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে সে আমার কোম্পানি ছাড়েনি, যতক্ষণ-না আমি নিজে তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছি, ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। যেনতেন প্রকারেণ আশ্রিত পোষণ করা বা আত্মীয়পালন করা আমার নীতি নয়। এই আমার সাফল্যের সিক্রেট।

কিন্তু আমার ব্যর্থতার সিক্রেটও এই। মহাযুদ্ধের সময়—সে-বারকার মহাযুদ্ধে আমার মতো অনেকেরই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। হঠাৎ বড়োলোক হলে যা হয়, অনেকেই সে-টাকা দশরকম কারবারে খাটিয়ে যুদ্ধের পরে লালবাতি জ্বালেন। আমি কিন্তু হুঁশিয়ার থাকি। ফলে বাবার সঙ্গে, ভাইদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁরা চেয়েছিলেন ও-টাকা আমার কাছ থেকে হাওলাত নিয়ে কারবার ফেঁদে রাতারাতি বড়োমানুষ হতে। আমি ও-টাকা যকের ধনের মতো আগলাই। কাউকে এক পয়সা দিইনে। অবশ্য না খেতে পেয়ে মরছে দেখলে মুক্তহস্তে দিই, চিকিৎসার জন্যে পড়াশোনার জন্যে দরাজ হাতে দিই। কিন্তু বাবুয়ানার জন্যে, বিবিয়ানার জন্যে, রাতারাতি লাল হবার জন্যে এক কপর্দকও দিইনে।

পিতৃকুলের সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে সেই একই কারণে শ্বশুরকুলের সঙ্গেও বিচ্ছেদ। কেবল তাই হলে রক্ষা ছিল, মামলা বেঁধে গেল কোলিয়ারি নিয়ে। শ্বশুরমশাই সেকালের রাজপুত যোদ্ধা, জামাইকেও বাণ মারতে পরাঙ্মুখ নন। কিন্তু আমি যে আইন পড়ে ভুলে যাইনি, বরং ঘরে বসে আরও পড়েছি, এ তিনি জানতেন না। আমার মামলা আমি নিজেই তদবির করি। লোয়ার কোর্টে, হাই কোর্টে দুই কোর্টেই আমার জিত। উকিল ব্যারিস্টাররা বললেন, 'আপনি হাই কোর্টে প্র্যাকটিস করলে আমাদের ভাত মারবেন দেখছি।' আমি বললুম, 'থাক আর শত্রুবৃদ্ধি করে কী হবে!'

শ্বশুরমশাই এর পরে যে-চাল চাললেন তা সাংঘাতিক! আমার ছেলেটার মাথা খেলেন। তাকে বোঝালেন, কয়লা অতি ময়লা জিনিস। যারা কয়লার কারবার করে তারা ছোটোলোক। বাপকে বল তোর নামে মোটরকারের এজেন্সি নিতে। ছেলে আমাকে তাই ভজালে। আমি তাকে বকে দিলুম। বললুম, বেঁচে থাকলে একদিন মোটরকার ম্যানুফ্যাকচার করব। এজেন্সি নিয়ে প্রতিযোগীর সুবিধে করে দেব কেন? পরে কি ওরা আমাকে মোটরের কারখানা খুলতে দেবে? ছেলেটা অবাধ্য। আমার কাছে চেয়ে বসল এক লাখ টাকা। আমি বললুম, এক পয়সাও না। তখন সে আমার বাড়ি থেকে আপনি বেরিয়ে গেল। তার মামারা রটালে, বাপ বার করে দিয়েছে। বাজারে আমার নাম খারাপ হয়ে গেল। পরে শুনলুম ও নাকি প্রাইভেট টিউশনি করে আইন পড়ছে, পৈত্রিক সম্পত্তিতে ওর যা প্রাপ্য তা একদিন আইনের সাহায্যে আদায় করবে। আমি কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম পড়ার খরচ চালাতে। ফেরত এল।

কিছুদিন পরে দেখি মেজো ছেলেটাও বিগড়েছে। বলে, 'দাদা আমার রাম, আমি তার লক্ষ্মণ। দাদা যদি বনবাসে গেল তো আমি কেন গৃহবাসে থাকব?' চলে গেল একদিন আমাকে দাগা দিয়ে। শুনলুম দু-ভাই ছেলে পড়িয়ে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে মামাদের ওখানে। আবার কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলুম, ওয়াপস এল।

এরপর বড়োমেয়ের পালা। বড়ো ভালোবাসতুম ওটাকে। কলেজে দিয়েছিলুম যাতে সত্যিকারের সুশিক্ষিতা হয়, তারপর ভালো দেখে বিয়ে দিতুম। কিন্তু ওর মামারা ওকে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে বিয়ে দিলে। আমি দেখতে পেলুম না। ওর মাও ছিলেন এর মধ্যে। ওর মামাকে বললুম, 'আমার মেয়ে, আমি সম্প্রদান করব, এই তো নিয়ম। এ তোমরা করলে কী! এরপরে আমি যদি ওকে বঞ্চিত করি?'

ওর মা বললেন, 'মেয়ের বয়স তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। উনিশ বছরের ধাড়ি মেয়ে এক বেম্ম বাড়িতেই দেখা যায়। হিঁদুর বাড়ি কেউ কোনোদিন দেখেছে? তুমি যে ওর বিয়ে দেবে না ত্রিশের আগে একথা ও নিজেই বলছিল একদিন মনের দুখে। কী করি, মেয়ের দুঃখু দেখতে পারিনে; সোমত্থ মেয়ে, কোনদিন কী দুর্গতি হয় কে জানে! আজকাল তো প্রায়ই নারীহরণের খবর কানে আসছে। মুসলমানরা কোনদিন না ধরে নিয়ে যায়। তাই হিঁদুর মেয়ের হিঁদুর সঙ্গেই বিয়ে দিয়েছি।'

এরপরে গিন্নির সঙ্গে আড়ি।

ওদিকে আমি একটার পর একটা কয়লার খনি কাঁচা আমের মতো কুড়িয়ে নিয়ে কোঁচড়ে পুরছি। কয়লার পর মাইকা, মাইকার পর ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাঙ্গানিজের পর লোহা, যেখানে যা পাই ইজারা নিই। টাকা ঢালি, লোকসান যায়, তাও সই। কিন্তু আমার পলিসি হচ্ছে ভারতের খনিজ পদার্থ ভারতীয়দের হাতে আনা।

বিদেশিদের হাতে পড়তে না দেওয়া। এর দরুন সাহেব মহলে আমার শত্রুর সংখ্যা নেই। তারা জানে যে আমি যদি বেঁচে থাকি তো একদিন জাহাজ নির্মাণ করব।

কিন্তু এদিকে আমার স্ত্রীর সঙ্গেই শত্রুতা। বাইরে শত্রু ঘরে শত্রু। বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা! পাগলামির লক্ষণ দেখে আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে বললুম, চলো, আমরা কিছুদিন রাঁচিতে কাটিয়ে আসি। তিনি ফোঁস করে তেড়ে এলেন। বললেম, 'বটে রে! আমি পাগল না তুই পাগল?' তিনি রাগ করে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন। সেখান থেকে আদালতে গিয়ে দরখাস্ত করলেন যে তাঁর স্বামী পাগল। পাগলের সম্পত্তি পাগল নিজে দেখাশোনা করতে অপারগ। অতএব আদালত থেকে উপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ভার অর্পণ করা হোক। দরখাস্তের সঙ্গে দুজন বড়ো বড়ো ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করা হল। হা ভগবান! এঁরা আমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান। আমার শিল আমার নোড়া আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া।

কী আর করি! পাঁচজন ভদ্রলোকের পরামর্শ নিয়ে স্ত্রী-পুত্রের নামে, কন্যাদের নামে, বিষয়সম্পত্তির অধিকাংশ লিখে দিই। ওরাই এখন কোম্পানিগুলোর মালিক। আমি ম্যানেজিং এজেন্ট। প্রতি মিটিং-এ আমার ওপর চোখ রাঙায়। আমিও তেমনি ঘুঘু। পাই-পয়সার হিসাব রাখি। বাজেখরচ করতে দিইনে। তাতে ওদের খুব যে সুবিধে হয়েছে তা নয়। তবে দু-বেলা হোটেলে খাচ্ছে, অনবরত মোটর হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে, দোকানে দোকানে ঘুরে যখন যা খুশি কিনছে, মাসোহারার টাকা এইভাবে উড়িয়ে দিচ্ছে। দেখলে চোখে জল আসে কিন্তু উপায় নেই। কী আর করি!

সবচেয়ে দুঃখ হয় যখন শুনি আমি ওদের শত্রু। হায় রে! আমি শত্রু, আমি ওদের শত্রু! যে আমি একদিন অজাতশত্রু ছিলুম সেই আমি আজ আমার পুত্র-কন্যার শত্রু! ওরা আমার মুখ দেখতে চায় না। দেখে যখন টাকার দরকার হয়। অথচ এই আমাকে দেখে আমার পাড়ার ছেলে-মেয়েরা লুট করে নিয়ে গেছে চাঁদের আলোয় হাত ধরে নাচতে। রাসলীলার কৃষ্ণ আমি, বৃন্দাবনে সর্বজনপ্রিয়। আর সেই আমি আজ দ্বারকার অধিপতি হয়েও সকলের অপ্রীতিভাজন, সকলের শত্রু। মুষলপর্বের শ্রীকৃষ্ণ আমি, স্বজনের আত্মঘাতী বুদ্ধি দেখেও অসহায়। জরাব্যাধ তো তির মেরেছে আমার সারা গায়ে, মরণেরও বেশি দেরি নেই।

মাননীয়ের কাহিনি শুনে আমাদের অন্তর আলোকিত হতে থাকল। আমাদেরও তো ওই একই সমস্যা। ছেলেরা বাবু, মেয়েরা বিবি, স্ত্রীরা বেপরোয়া খরচ করতে ওস্তাদ। ওরাও সুখী হবে না, আমাদেরও সুখী হতে দেবে না। সুখের পরিবর্তে সাফল্য নিয়ে আমরা কী করব, কার সঙ্গে ভাগ করব? তার মতো ব্যর্থতা আর কী হতে পারে?

'কিন্তু,' প্রশ্ন করলেন খাঁ বাহাদুর ফারোকি, 'সব হল, আসল কথাই তো হল না। আপনার নিষ্ফলতার সিক্রেট কী? তা তো খুলে বললেন না।'

'আর কত খোলসা করব!' হাসলেন, হেসে বললেন মান্যবর। 'আমার নিষ্ফলতার সিক্রেট আমার বিয়ে।'

'উঁহু, হল না। হল না।' বলে উঠলেন প্রিন্সিপাল দত্ত। আপনার নিষ্ফলতার সিক্রেট আপনার স্কলারশিপের পড়া।'

সেদিন আমরা কেউ কারও সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তারপর থেকে ভাবছি মাননীয়ের সিক্রেটটা প্রকৃতপক্ষে কী? যাই হোক, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সফলতার সিক্রেট হচ্ছে বিফলতারও সিক্রেট।

রূপ দর্শন

সেদিন নয়নমোহনের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। এসেছিলেন এক বিয়েবাড়িতে বরযাত্রী হয়ে। আমি ছিলুম কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত। দেখা হতেই দু-হাত ধরে বললেন, 'মনে পড়ে?'

আমি তাঁর দুই হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললুম, 'না, মনে পড়বে কেন? মনে পড়ার তো কারণ নেই। মনে পড়ার তো কথা নয়।'

তিনি দুঃখ প্রকাশ করলেন। ইচ্ছা ছিল তোমার ওখানে উঠতে। কিন্তু জানই তো বরযাত্রীরা স্বাধীন নয়। এসেছি একটা দলের সঙ্গে দলচর হয়ে। সেইজন্যে—'

'সেইজন্যে একখানা চিঠি লিখেও জানাতে নেই যে আসবার কথা আছে ময়মনসিংহে। না নয়নদা, তোমাকে আমার মনে পড়ে না। মনে পড়বে যদি তুমি এখনও আমার ওখানে ওঠো।'

'না ভাই, এ যাত্রা নয়। এরপরে আবার যদি কোনোদিন আসা হয় তো নিশ্চয়। এবার আমাকে মাফ করতে হবে। বুঝলে?'

তাঁর কণ্ঠস্বরের কারুণ্য আমাকে স্পর্শ করেছিল। আমি তাঁকে পীড়াপীড়ি করলুম না, শুধু একবার চা খেতে ডাকলুম। তিনি রাজি হলেন। পরের দিন চা খেতে এসে শুধালেন, 'তুমি আমাকে একবার কী বলেছিলে মনে আছে?'

বিশ বছর পরে দেখা। কী করে আমার মনে থাকবে কী বলেছিলুম কবে? আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না, মনে নেই।

'বলেছিলে, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ।'

'তাই নাকি? কই, আমার তো মনে নেই।'

'তোমার মনে থাকার কারণ নেই, আমার মনে থাকার কারণ আছে। তাই সেদিন ভাবছিলুম, তোমার কথাই অবশেষে সত্য হল কবি।' তিনি আমাকে কবি বলে ডাকতেন।

'কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হত।' তিনি সেই নিশ্বাসে বললেন। 'এ যা হল তা আরও মর্মান্তিক।'

আনি জানতুম নয়নদার বিয়ের গল্প। জানতুম না তার পরিণতি। নয়নদার বিয়েতে আমি বরযাত্রী হয়েছিলুম, কবিতা লিখে ছাপিয়েছিলুম। বোধহয় বউদির রূপ দর্শন করে সান্ত্বনাচ্ছলে বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। তার মানে, রূপ ভগবান সবাইকে দেননি, যাকে দেননি সেও রূপবতী কবির চোখে।

আমি তো রিয়্যালিস্ট নই, হলে সাফ কথা শুনিয়ে দিতুম নিষ্ঠুরভাবে। কিন্তু যাঁর বিয়ে তিনি ছিলেন বাস্তববাদী। রূঢ় বাস্তব তাঁকে কাঁদিয়ে ছাড়ল। বিয়ের পরে তিনি আমাদের কারো কারো কাছে চোখের জল ফেলে বলেছিলেন, 'ভাই, এ যে পোড়াকাঠ।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'দাঁত বার করা, নাক চাপা, এ যে করালী।'

নয়নমোহনের নিজের মত ছিল না, তিনি শাসিয়ে রেখেছিলেন আত্মঘাতী হবেন। কিন্তু তাঁর দাদারা তাঁর মাকে বুঝিয়েছিলেন যে, ডিক্রিদারের হাত থেকে সম্পত্তি রক্ষা করতে হলে ডিক্রিদারের দুহিতাকে বধূ করতে হবে। মা বললেন, 'সম্পত্তি যদি যায় তো কে তোকে সুন্দর মেয়ে দেবে? কী দেখে? তখন তো সেই কালো মেয়েই বিয়ে করতে হবে। দেখিস আমার কথা ফলে কি না ফলে।'

এর উত্তরে নয়নদা বলেছিলেন, 'তা কেন হবে! আমি যদি বিয়ে না করি।'

‘শোনো কথা! যদি বিয়ে না করি। তা কি কখনো হয়! বিয়ে না করলে তোকে রেঁধে খাওয়াবে কে?’

নয়নদার ঠাকুমা তখনও বেঁচে। তিনিই নাতির নাম রেখেছিলেন নয়নমণি। নয়নমণি থেকে বিবর্তনসূত্রে নয়নমোহন। বুড়ি বললেন, ‘তোর বাপও বলত বিয়ে করব না, সন্ন্যেসি হব। কী বলে ওকে, কী আনন্দ? বেবাক আনন্দ। বাপ বিয়ে না করলে তুই হতিস কী করে? বল আমাকে, বল।’

বউদিরা বললেন, ‘দেখছ তো আমাদের দশা। রূপ থেকেও নেই, কেননা রুপো নেই। গয়না পর্যন্ত বন্ধক। আসল জিনিস হল টাকা। তোমার শ্বশুরের তা আছে। এমন পাত্রী হাতছাড়া করতে নেই। করলে তোমায় বলব লক্ষ্মীছাড়া।’

নয়নমোহন বাড়ির অবস্থা জানতেন না। বউদিদের কথায় হুঁশ হল। তিনি ছিলেন রিয়্যালিস্ট, তাই শেষপর্যন্ত মত দিলেন। কিন্তু অন্তর থেকে তো দেননি। অন্তর কেন তা মানবে? সেইজন্যে বিয়ের পরের দিন তাঁর কাঁদুনি। এবং সেই উপলক্ষ্যে আমার সান্ত্বনাবাণী।

আমরা যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ ছিলুম তাঁরা জানতুম এ বিবাহে তিনি সুখী হবেন না। হতে পারেন না। কারণ আর সব বিষয়ে বাস্তববাদী হলেও বিবাহ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন আদর্শবাদী। তাঁর পরম কাম্য ছিল তন্বী-শ্যামা-শিখরিদশনা-পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী। কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলেন কি না বলতে পারব না, কিন্তু যাকে তিনি ভালোবাসবেন সে কেমন হবে তা তিনি তাঁর অন্তরঙ্গদের মাঝে মাঝে শোনাতেন।

বিয়ের পরে রসিকতা করে কে একজন তাঁকে বলেছিল, ‘তুমিই জিতলে। যা চেয়েছিলে অবিকল তাই পেলে। তন্বী মানে রোগা, শ্যামা মানে কালো, শিখরিদশনা মানে পাহাড়ের মতো দাঁত, আর পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী মানে ফাটা তেলাকুচার মতো ঠোঁট দুটির মাঝখানে অনেকটা ফাঁক।’

নয়নদা বেচারার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল ও-কথা শুনে। তাঁর সবচেয়ে মনে লেগেছিল আরেকজনের বক্রোক্তি, ‘নয়ন, তুমি চোখে অন্ধকার দেখছ।’

আমরা তাঁর বন্ধুরা তাঁকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতিস্থ করি, নইলে তিনি হয়তো বিকৃতিবশত কিছু একটা করে বসতেন। আমি যে ঠিক কী কথা বলেছিলুম আমার মনে ছিল না। তাঁর মনে ছিল দেখছি।

‘তোমার কথাই অবশেষে সত্য হল, কবি,’ তিনি বললেন, ‘কিন্তু সত্য না হলেই ভালো হত। এ যা হল তা আরও মর্মান্তিক।’

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ‘কী হয়েছে নয়নদা? খারাপ কিছু নয় তো?’

‘না, খারাপ কিছু নয়। সমূহ কুশল।’

আমি নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু নিরস্ত হলুম না। জানতে চাইলুম, ‘তাহলে আরও মর্মান্তিক কেন?’

তিনি বললেন, ‘শোনো তাহলে।’

সত্যেন দত্তের একটি জাপানি কবিতা থেকে অনুবাদ মনে পড়ে।

> অতি বড় অভাগা যে আমি একটা
> আমি কিনা পেয়ে গেলুম মনিব্যাগটা।

বিয়ের পরে আমার মনোভাব ধীরে ধীরে দাঁড়াল ওই জাপানিটির মতো। আর কিছু না পাই টাকার থলি তো পেয়েছি। এই-বা কজন পায়! জীবিকার জন্যে আমাকে পরের চাকরি করতে হবে না, স্বাধীন ব্যাবসাতে মূলধনের অভাব হবে না, ব্যাবসা ফেল মারলেও সংসার অচল হবে না, লক্ষ্মী হবেন অচলা। এ কি কম কথা! এত যে দুশ্চিন্তা ছিল এমএ পাস করে তার পরে কী করব, কোথায় স্থিতি পাব, সব দুশ্চিন্তা জল হয়ে গেল। সমবয়সিদের কেউ কেউ এখনও স্থিতি পায়নি, খবর রাখো বোধহয়। বিশ বছর পরেও তাদের জীবনযাত্রা অস্থির। আর আমি সবদিক থেকে গুছিয়ে নিয়েছি। স্বাস্থ্য আমার এত ভালো যে একদিনও অনিদ্রা হয় না। আর তোমার তো শুনি কোনোদিন সুনিদ্রা হয় না। তুমি কৃপার পাত্র। কালো মেয়ে বিয়ে করলে ভালো থাকতে।

জান তো আমাদের কেমন খানদানি বংশ। আগেকার দিনে সুন্দর মেয়ে আমরা লুট করে বিয়ে করতুম। তারপরে কৌলীন্যপ্রথার সুযোগ নিয়ে সুন্দর মেয়ে ঘরে আনি। বর্ণকৌলীন্য যখন উঠে গেল তখন কাঞ্চনকৌলীন্য আমাদের ওই কাজে লাগল। আমরা পণ নিতুম না, যৌতুক নামমাত্র নিতুম, কিন্তু বউ আনতুম সুন্দরী দেখে। এর ব্যতিক্রম যে হত না তা নয়। এমন কোন নিয়ম আছে যার নিপাতন নেই? কিন্তু তা বলে আমার নিজের বেলা ব্যতিক্রম হবে এ আমি কল্পনা করিনি। আমার দাদারা সুন্দরী বিয়ে করেছেন। আমার ধারণা ছিল আমারও জন্মস্বত্ব সুন্দরী ভার্যা। বাবা যদি হঠাৎ মারা না যেতেন, সম্পত্তি যদি মর্টগেজ রেখে না যেতেন, তাহলে এ অঘটন ঘটত না। বংশের ব্যতিক্রম হয়ে নাম হাসাতুম না।

তোমাকে আমি হিংসা করি। তোমার মতো ভাগ্যবান বন্ধুদের সবাইকে হিংসা করি। যেদিন তোমার বিয়ের খবর পড়ি সেদিন যেন বুকে শেল বাজল। বিশ বছর দেখা হয়নি বলে আশ্চর্য হচ্ছ। এ জীবনে দেখা হল এইটেই আশ্চর্য। তুমি জিতেছ, আমি হেরেছি। তোমার সঙ্গে কোন মুখে দেখা করতুম! আমারই মতো যারা দুর্ভাগা তাদের সঙ্গে দেখা হয় বছরে দু-বছরে একবার। কেউ কেউ আবার এমন হতভাগা যে সেই জাপানি বেচারার মতো মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে দেখে—'ট্রামগাড়ি চাপাপড়া ব্যাং চ্যাপটা।'

গোপেনকে মনে আছে তোমার? আবগারি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হয়েছে এখন। গোপেন আমাকে রামপ্রসাদি গান গেয়ে শোনাত। বলত, কালো ভুবন আলো। তেমন তার সাজা পেতে হল নিজের। বিয়ে হল কালো মেয়ের সঙ্গে। আশা করেছিল শ্বশুর তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে যাবেন, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ বিয়ে করে দিয়ে গেলেন আরও কয়েকটি কৃষ্ণকলির অভিভাবকত্ব। গোপেন কিন্তু আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছিল। তাকে বলতুম, আচ্ছা, কালো নাহয় আলো, কিন্তু খাঁদা কী করে টিকোলো হবে? সে বলত, চীন দেশে খাঁদা নাকের ওপর তিন হাজার বছর ধরে কবিতা লেখা হয়ে আসছে, ও-দেশের রামপ্রসাদি গান কালীভক্তির নয়, খাঁদি ভক্তির। তা যেন হল, কিন্তু দাঁত বার করা কি সহ্য হয়? যেন খেতে আসছে। গোপেন বলত, এর উত্তর দিয়ে গেছেন জয়দেব কবি। বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী। খেতে আসছেন না, বলতে আসছেন যে তুমি আমার প্রিয়, আমি তোমার প্রিয়া। বচনের উল্লাসে জ্যোৎস্নার মতো ফুটে উঠছে দশন।

মানুষের বাইরেটা কিছু নয়, ভিতরটা আসল। রূপ কিছু নয়, গুণই আসল। একথা আমি কত লোকের মুখে শুনেছি, বিশ্বাস করেছি, মুখ ফুটে বলেওছি কিন্তু সান্ত্বনা পাইনি। রূপের স্বাদ কি গুণে মেটে? রূপ ক্ষণকালের, গুণ চিরকালের। তা বলে কি ক্ষণপ্রভার মূল্য কিছু কম? যখন শুনতুম বউটি বড়ো গুণের তখন খুশি হতুম খুবই, কিন্তু তার চেয়েও খুশি হতুম যদি শুনতুম চোখ দুটি তো বেশ। গুণের প্রশংসা যত শুনতুম রূপের সুখ্যাতি তার সিকির সিকিও নয়। রাগ ধরত যখন ওরা বলত বউমানুষের রূপের প্রয়োজন নেই। রূপের প্রয়োজন নাকি রূপোপজীবিনীর! তবে বউদিদিদের আনা হয়েছিল কী দেখে? তাঁদের রূপবন্দনায় পঞ্চমুখ যারা তারাই আবার রূপের অসারতা ঘোষণা করত আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে।

মাঝে মাঝে মনে পড়ত তোমার উক্তি। রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন। সবাইকে দিয়েছেন তো কৃষ্ণাকেও দিয়েছেন। তাহলে আমার চোখে পড়ে না কেন? লোকের চোখে পড়ে না কেন? এর উত্তর, দেখবার চোখ তিনি সবাইকে দেননি; আমাকে দেননি, লোকেদেরকে দেননি। কৃষ্ণার রূপ আছে, আমাদের চোখ নেই। এ কি সত্য? অনেক ভেবেছি, কিন্তু সত্য বলে মেনে নিতে পারিনি। ধরে নিয়েছি এটা একটা স্তোকবাক্য। এ বলে তুমি আমাকে সান্ত্বনা জানিয়েছ। ওটা তোমার বন্ধুকৃত্য কিন্তু বন্ধুতানিরপেক্ষ ধ্রুবসত্য নয়। তোমার বিয়ের পরে মনে হয়েছিল তুমি আমাকে পরিহাস করে ও কথা বলেছিলে, ওটা তোমার শ্লেষ। কিছুকাল তোমার ওপর বিরূপ হয়েছিলুম। তোমাকে আক্রমণ করে একটা প্রবন্ধ লিখে মাসিকপত্রে পাঠিয়েছিলুম। তারা ছাপল না। ভাগ্যিস ছাপেনি।

ক্রমে আমার প্রতীতি হল যে, রূপবোধ একটা সংস্কার। জনম অবধি আমি রূপ নিরীক্ষণ করেছি, সেইজন্যে কৃষ্ণাকে মনে হচ্ছে কুরূপ। ধরো, যদি শিশুকাল থেকে কুরূপ নিরীক্ষণ করতুম তাহলে কি কৃষ্ণাকে মনে হত কুরূপ। না, তাহলে তাকে মনে হত আর সকলের অনুরূপ। এই প্রতীতির পর আমি

একান্নবর্তী পরিবার থেকে পৃথক হতে চাইলুম। কেন, সে কথা খুলে বললুম না। বউদিদিদের মুখ দর্শন করে তারপরে কৃষ্ণার মুখ দর্শন করলে কৃষ্ণাকে কুরূপ দেখাবেই। এর একমাত্র প্রতিকার বউদিদিদের মুখ দর্শন না করা। যে-বাড়িতে কেবল কৃষ্ণাই একমাত্র নারী সে-বাড়িতে সুরূপ-কুরূপের বৈষম্য নেই। দেখলুম কৃষ্ণাকে আমার তত খারাপ লাগছে না। তার চোখ দুটি সত্যি সুন্দর। তার প্রোফাইলের ফোটো নিয়ে দেখা গেল মন্দ মানায় না। রূপ বলতে আমরা শুধু গায়ের রং আর মুখের সৌষ্ঠব বুঝি। এতে কিন্তু অনেকের প্রতি অবিচার করা হয়। কৃষ্ণা ক্ষীণমধ্যা, এখানে তার জিত। সে সুকেশী, এখানে তার জিত। তার তনুরেখা বঙ্কিম ও সুমিত, এখানে তার জিত। তার গড়ন মাংসল নয়, দিঘল, এখানে তার জিত। হাতের আঙুল, পায়ের পাতা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়, এখানে তার জিত। এভাবে বিশ্লেষণ করলে কৃষ্ণার জিত অনেক বিষয়ে। কিন্তু সৌন্দর্য তো বিশ্লেষণ করবার বস্তু নয়। আর আমিও নই সম্পূর্ণ নিরাসক্ত সমালোচক। ও যদি আমার না হয়ে পরের হত আমি ওকে রূপের পরীক্ষায় পাস মার্ক দিতুম। কিন্তু ও আমার হয়েই ফেল করেছে। এইটেই মর্মান্তিক।

একটি ছেলে একটি মেয়ে হবার পর আমি বাইরের বারান্দায় পৃথক শয্যা পাতলুম। কৃষ্ণা ভেবেছিল দু-দিনের বৈরাগ্য। একটু হেসেছিলও। কিন্তু মাসের পর মাস কাটে, আমার সংকল্পের পরিবর্তন হয় না। আমার মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না, আমি মনস্থির করে ফেলেছিলুম। ওদিকে কৃষ্ণার মনে দোটানা। সে একা শুয়ে শান্তি পায় না, অথচ আমার কাছে এসে বাইরে শুতে সাহস পায় না। একদিন শেষরাত্রে সে এল আমার কাছে। এসে লুটিয়ে পড়ল। তার কণ্ঠে দুর্জয় ক্রন্দন। ধরা গলায় বলল, 'তুমি কি আর আমার সঙ্গে শোবে না?'

তাকে অনেক বোঝালুম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। শেষে রাগ করে বললুম, 'আমি কোথাও চলে যাব, হিমাচলে কি পণ্ডিচেরিতে।' তা শুনে সে কেঁদে আকুল। পরের দিন জেদ ধরল, 'আমাকে আমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এবাড়িতে যে-ই আসে সে-ই জানতে চায় আলাদা বিছানা কেন? লজ্জায় মারা যাই।' বাপের বাড়ি থেকে কয়েক মাস পরে আপনি ফিরে এল। বাপের বাড়িতেও সকলে জানতে চায় আলাদা থাকার কারণ কী। লজ্জায় মারা যায়। ফিরে এসে আবার সেই একই সমস্যা। লজ্জায় বাঁচে না। একদিন আমাকে মিনতি করে বলল, 'অন্তত এক বিছানায় শোও। মাঝখানে ছেলে-মেয়ে। লোকলজ্জা থেকে বাঁচাও।'

তাই হল। কিন্তু ইতিমধ্যে দুজনের মধ্যে সেই যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল সে আর বুজল না। এ যেন নেহাত একটা লোক-দেখানো সেতুবন্ধ। সকলে জানল যে আমরা একটি সুখী ও সম্ভ্রান্ত দম্পতি। আমরা জানলুম যে আমাদের মাঝখানে দুস্তর ব্যবধান। অশ্রুজলের সাগর।

ভগবানকে ডেকে কত বার বলেছি, 'প্রভু, ওকে একটি দিনের জন্যে রূপবতী করো, দিনের আলোর মতো রূপ দাও। চিত্রাঙ্গদাকে দিয়েছিলে একটি বছরের জন্যে, কৃষ্ণাকে দাও একটি দিনের জন্যে।'

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়ায় নয়নমোহন চমকে উঠলেন।

'তোমার ওটা কি ঘড়ি না ঘোড়া হে?'

আমি বললুম, 'ও-ঘড়ি ফাস্ট চলেছে।'

'কিন্তু আমার আর বেশিক্ষণ থাকা চলবে না। মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। আমরা আজ রাত্রের ট্রেনে যাচ্ছি, যেটা দশটায় ছাড়ে।'

'আর একটা দিন', আমি অনুরোধ করলুম, 'এখানে থেকে গেলে পারতে। তোমার তো চাকরি নেই।'

'চাকরি নেই, কিন্তু যা আছে তা চাকরির বাড়া। মজদুররা ধর্মঘটের নোটিশ দিয়েছে, এখন গিয়ে তাদের মানভঞ্জন করতে হবে।'

এরপরে তিনি তাঁর কাহিনির খেই ধরলেন।

কৃষ্ণা জানত যে তার রূপের অভাব আমাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিচ্ছে, সেইজন্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করত রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করতে। অন্য কেউ হলে স্নো পাউডার মেখে সং সাজত, নানা রঙের শাড়ি

ব্লাউজ পরে প্রজাপতি সাজত। কিন্তু সাজপোশাকের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না বলে তারও লক্ষ ছিল না। তার লক্ষ ছিল গুণের ওপর। সে তার লক্ষ্যভেদ করেছিল। তবু আমার মন পায়নি।

এর কারণ রূপের অভাব গুণ দিয়ে পূরণ করা যায় না। রূপের অভাব রূপ দিয়েই পূরণ করতে হয়। তা যে পেরেছে সে অসাধ্যসাধন করেছে। এই অসাধ্যসাধন কৃষ্ণার সাধনা ছিল না। অন্য কোনো সাধনা এর স্থান নিতে পারে না। তাই তার গুণের সাধনা আমাকে জয় করেনি। উমার তপস্যা শিবের মতো বিরূপাক্ষের জন্যে। আমার মতো সুরূপাক্ষের জন্যে নয়। আমার নয়ন যদি সায় না দেয় তো মন সায় দেয় না। মন যদি সায় না দেয় তো দেহ সায় দিতে চায় না। গুণ দিয়ে কি বিকার দূর করা যায়?

আমি যে বিকারবোধ করি একথা তাকে মুখ ফুটে বলিনি। সে বুদ্ধিমতী, নিজেই বুঝে নিয়েছিল; তাই একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুমি আর একটি বিয়ে করো বা যেখানে ইচ্ছা যাও। এমন করে ক-দিন চালাবে।' এর উত্তরে আমি বলেছিলুম, 'পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে চাইনে। যেমন চলছে চলুক।'

বস্তুত আমার একদন্ড ফুরসত ছিল না, দিনরাত কাজ আর কাজ। হোসিয়ারির কারখানা খুলেছিলুম, দেখাশোনা করতে হত আমাকেই, স্লিপিং পার্টনার আমার তিন সম্বন্ধী, ওয়ার্কিং পার্টনার আমি। কখন খাই কখন শুই কিছুই ঠিক নেই। শুধু এই ঠিক যে বছরের শেষে লাভ দেখাতে হবে। লাভ যদি না দেখাতে পারি তো সম্বন্ধীরা টাকা তুলে নেবেন। তখন আমি মূলধন পাব কোথায়?

কৃষ্ণা যখন উপলব্ধি করল যে তার গুণেও সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, রূপের সাধনাও সুদূরপরাহত, তখন আমাকে একা রেখে ছেলে-মেয়েসমেত দার্জিলিং চলে গেল। সেখানেই তারা লেখাপড়া শিখবে ও মানুষ হবে। আমি দুঃখিত হলুম, কিন্তু বাধা দিলুম না। ওর একটা পরিবর্তন দরকার। কে জানে হয়তো শীতের দেশে বাস করে রংটা এক পোঁচ ফর্সা হতে পারে।

অকস্মাৎ স্বাধীনতা পেয়ে আমার অবস্থাটা হল বৈপ্লবিক, যেমন হতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের। কী যে করি স্বাধীনতা নিয়ে, বহুকালের সঞ্চিত ক্ষুধা নিয়ে, বঞ্চিত জ্বালা নিয়ে—কী যে করি! কী যে করি!

তুমি শুনে অবাক হবে যে কিছুই করলুম না। তার কারণ যা-ই করতে যাই তা-ই মনে হয় তুচ্ছ। মনে হয় এমন কিছু করা উচিত যা কেউ কোনোদিন করেনি, যা উচ্চাদপি উচ্চ। তেমন কিছুর নাগাল পেলে হয়। কাব্যের নায়িকারা হোসিয়ারির কল পরিদর্শন করতে এলে হয়! ট্রয়ের হেলেন, বৃন্দাবনের রাধা, ইরানের লায়লা, চিতোরের পদ্মিনী—কোথায় দেখা পাই এঁদের! কেউ কি এঁরা পথ ভুলে বক্তিয়ারপুর আসবেন না!

তোমার মনে আছে কি না জানিনে, কলেজে আমার প্রিয় কবি ছিলেন টেনিসন আর প্রিয় কবিতা ছিল 'সুন্দরী নারীদের স্বপ্ন।' অবশ্য আরও প্রিয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও কালিদাস, কিন্তু টেনিসন একটু বিশেষ অর্থে প্রিয়—ওই 'সুন্দরী নারীদের' জন্যেই। হায়! এত যে তাঁদের নাম জপ করলুম, রূপ ধ্যান করলুম, তবু তো তাঁদের কারও করুণা হল না। মেন লাইনে ট্রেন দাঁড়ালেই আমার মনে হত এই ট্রেনেই তিনি এসেছেন, এসে আমাকে খুঁজছেন। সব কাজ ফেলে স্টেশনে ছুটে যেতুম, গিয়ে নিরাশ হতুম। লোকে বলাবলি করত, 'ফি ট্রেনেই এঁর জানানা আসছেন। বাউরা হয়েছেন।' আমি কিন্তু ওসব গায়ে মাখতুম না, নিরাশ হলেও যেতুম।

একদিন স্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন থেকে নামছেন ট্রয় দেশের হেলেন নয়, বৃন্দাবনের রাধা নয়, দার্জিলিঙের কৃষ্ণা। ছেলে-মেয়েদের দার্জিলিঙের বোর্ডিং স্কুলে রেখে এসেছেন, সেখানে তারা সুখে আছে। আমার না-জানি কত অসুবিধা হচ্ছে একথা ভেবে তাঁর অস্বস্তি বোধ হল, তাই চলে এলেন। যাক, আমাকে বাঁচালেন। লোকে স্বীকার করল, না বাউরা নয়। আর আমিও স্বীকার করলুম যে স্বাধীনতার ঝক্কি পোষায় না। তার চেয়ে স্ত্রীর হাতের মোচার ঘণ্ট মিষ্টি।

কিন্তু মোচার ঘণ্ট এবার মিষ্টি লাগল না। দেখা গেল কৃষ্ণা কেবল চিঠি লিখছে বসে। ধরে নিলুম ছেলেমেয়ের জন্যে বড্ড মন কেমন করছে, চিঠি লিখে মনের ভার হালকা করছে। কিন্তু প্রতিদিন ওর নামে একই মানুষের লেখা খামে-বন্ধ চিঠি আসতে দেখে সন্দেহ জাগল কার হাতের লেখা এসব! মেয়েলি হাতের

কি না। কয়েক বার ইতস্তত করে ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলুম তাকে। সে বিনা বাক্যে উত্তর দিল চিঠিগুলো আমার সামনে রেখে।

বিস্ময়! বিস্ময়ের পর বিস্ময়! উর্দু ভাষার একজন উদীয়মান কবি দার্জিলিঙে বসে গজল লিখছেন। সাকি বলে যাকে সম্বোধন করছেন সে আমার কৃষ্ণা। সাকির কাছে নিত্যনূতন গজল আসছে স্বাক্ষরিত হয়ে। প্রেরণাও ফুরোয় না, গজলও ফুরোয় না। বলা বাহুল্য, উর্দু আমরা দুজনেই জানতুম। আমিই শিখিয়েছিলুম কৃষ্ণাকে। স্বয়ং শিখেছিলুম মুসলমান বন্ধুদের কাছে। সে-বিদ্যা যে এভাবে কাজে লাগবে কল্পনা করিনি। হতভম্ব হলুম। কবির নাম হাফিজ দিয়ে আরম্ভ। তাঁকে তাই হাফিজ বলে উল্লেখ করব।

হাফিজ নাকি পতঙ্গের মতো রওশনের রূপমুগ্ধ। রূপের বর্ণনা যা দিয়েছেন তা আমার পক্ষে আবিষ্কার। এত রূপ যে আমার অগোচর ছিল তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু বিশ্বাস না করেও পারিনে। কারণ কবি যা লিখেছেন তা পরিহাসের সুরে নয়। তবে কি একথা সত্য যে আমার চোখে যে রূপহীনা অন্যের চোখে সে রূপসি। এ কি কখনো সত্য যে কুরূপা বলে কেউ নেই, ওটা দৃষ্টিবিভ্রম! বা চোখের ধাঁধা।

তখন আমার মনে পড়ল তোমার উক্তি। ভগবান রূপ সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। যাদের দিয়েছেন তারাই শিল্পী, তারা সকলের রূপমুগ্ধ। এই উর্দু কবি একজন শিল্পী। ইনি তাই কৃষ্ণার রূপ দেখে রওশনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হায়, আমিও যদি শিল্পী হতে পারতুম...! আমার শিল্পরচনার দৌড় বক্তিয়ারপুরের গণেশ মার্কা গেঞ্জি ও হনুমান মার্কা মোজা। ওই চোখে ভগবানের দেওয়া রূপ প্রত্যক্ষ করা যায় না। চোখ দুটোকে বদলে নেওয়া চাই। ভাবলুম, কিছুদিন হনুমান ও গণেশের ধ্যান ছেড়ে গৌরীশংকর ও কাঞ্চনজঙ্ঘা অবলোকন করব। স্ত্রীকে বললুম, 'চলো আমরা দার্জিলিং যাই। দেখে আসি টুবলুকে টুটুকে।'

আঃ! কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে দু-চোখ জুড়িয়ে গেল। কী করে তার বর্ণনা দেব? আমি তো কবি নই। কিন্তু এও আমি বুঝতে পারিনে যে কাঞ্চনজঙ্ঘার মতো নারী থাকতে কৃষ্ণার মতো নারী কী করে বন্দনা পায়। কবিদের কি সত্যিকারের সৌন্দর্যবোধ আছে? আমার তো মনে হয় না।

হাফিজকে নিমন্ত্রণ করেছিলুম। জরিদার শেরওয়ানি ও চুড়িদার পায়জামা পরে তিনি এলেন, শুনলুম তিনি নবাব ঘরানা। মুর্শিদাবাদে বাড়ি। পরের মুখে নিজের স্ত্রীর রূপবর্ণনা তো শোননি, তুমি কী করে বুঝবে আমার ব্যথা। আমার যা লাগছিল আমিই জানি। শুধালুম, 'আচ্ছা, এ কি তবে সবই সত্য হে আমার স্ত্রীর ভক্ত...' মনে আছে তো রবীন্দ্রনাথের সেই কৌতুকের কবিতাটি? 'চির ভক্ত'কে 'স্ত্রীর ভক্ত' করেছি।

কবি বললেন, 'কাব্যের সত্য জীবনের সত্য এক নয়। যেমন চিত্রের সত্য ফোটোগ্রাফের সত্য এক নয়। এও সত্য, আবার সেও সত্য।'

কৃষ্ণা সেখানে ছিল না, থাকলে হয়তো আঘাত পেত। ইতিমধ্যে তার ধারণা জন্মেছিল সে যথার্থই সুন্দরী। দুই অর্থে। কাব্যে ও জীবনে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে নয়নদা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমি তাঁকে অভয় দিলুম যে ট্রেন ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব আমার। তখন তিনি পূর্বানুবৃত্তি করলেন।

দার্জিলিঙে আমার চোখ খুলে গেল। দেখলুম কৃষ্ণার গায়ের রং এক পোঁচ ফর্সা হয়নি বটে, কিন্তু রং ধরেছে ভিতরে। সে যেন এতদিন পরে আপনাকে আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কার করেছে সে সুন্দরী। সাতাশ কি আটাশ বছর বয়সে যদি কোনো মেয়ে প্রথম আবিষ্কার করে সে সুন্দরী তাহলে তার সেই আবিষ্কার তাকে বিপ্লবের আস্বাদন দেয়। এ যেন একটা আগস্ট বিপ্লব। হিংসার ক্ষমতা নেই বলে দীর্ঘকাল অহিংসা অনুশীলন করার পর অকস্মাৎ আবিষ্কার করা গেল আমরা হিংসার ক্ষমতা রাখি। দেখছ তো দেশ কেমন রক্তপিপাসায় অধীর হয়ে উঠেছে। যতক্ষণ-না একটা আণবিক বোমা কলকাতায় কী বম্বেতে পড়ছে ততক্ষণ এ পিপাসার নিবৃত্তি নেই।

কৃষ্ণাকে নিয়ে আমার দশা হল মহাত্মার মতো। কী করে তাকে বোঝাই যে তার আবিষ্কারটা কাব্যের সত্য, জীবনের সত্য নয়। যে একথা বোঝাতে পারত সে হাফিজ। হাফিজ ক্রমে দুর্লভ হল, তার চিঠিও

একসময় বন্ধ হল। কিন্তু ক্ষতি যা করে গেল তার জের চলতে থাকল। কৃষ্ণা বিশ্বাস করল হাফিজের জবানবন্দি সাচ্চা, আমার জবানবন্দি ঝুটা। আমি তাকে এগারো বছর ধরে ঠকিয়ে এসেছি। আমি প্রবঞ্চক। সে আমার মুখের দিকে ভালো করে তাকায় না, আমিও কেমন যেন অপরাধী বোধ করি নিজেকে। একে তো আমাদের দৈহিক সম্বন্ধ ছিল না, মানসিক সম্বন্ধেও ভাঙন ধরল।

দার্জিলিং থেকে একসাথেই ফিরি। আমি প্রস্তাব করেছিলুম, সে যদি দার্জিলিঙে একা থাকতে চায় তো পারে থাকতে। সে নাকচ করল, বোধহয় লোকনিন্দার ভয়ে। বক্তিয়ারপুরে ফিরে আমি আমার কাজকর্মে ডুব মারলুম। আর সে চলল উজান বেয়ে। বয়স তার দিন দিন কমতে লাগল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাটায় আয়নার সামনে। চুল বাঁধে, চুল খোলে, আবার বাঁধে। শাড়ি পরে, শাড়ি ছাড়ে, আবার পরে। সাজপোশাকের বাহার ছিল না, শুরু হল। স্নো পাউডার মেখে জুতো পালিশের মতো চেহারা হল। তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নেই, যার টাকা আছে সে যদি দু-হাতে ওড়ায় তো আমার কী? কিন্তু মাঝখানে ছেলে-মেয়ে না শোওয়ায় সে একেবারে আমার কোলে এসে শোয়। আশা করে আমি তার রূপ দেখে ভুলব। ক্ষণকালের জন্যে ভুলিনি যে তা নয়, কিন্তু সেটা আমার নিজের দুর্বলতা, তার মাদকতা নয়। সে কিন্তু ধরে নেয় যে তার মধ্যে অপূর্ব মোহিনীশক্তির সঞ্চার হয়েছে। অমনি মোহিনীশক্তির অনুশীলনে রত হয়। এদিকে আমি বিকারবোধে অস্থির। কী করে পরিহার করব ভেবে পাইনে।

আর একটি সন্তান হল, এটি ছেলে। খুব খুশি হলুম দুজনে। আমি বললুম, 'আর কেন? এখন থেকে পূর্বব্যবস্থা বহাল হোক।' সে কিছু বলে না, মুচকি হাসে। ছেলের জন্যে ছোট্ট একটা বেবি কট কেনা হল। ছেলেটি সেইখানে শোয়। আর আমি প্রতি রাত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই শোচনীয় পঙক্তিগুলি আবৃত্তি করি—

> রে মোহিনী রে নিষ্ঠুরা ওরে রক্তলোভাতুরা
> কঠোর স্বামিনী
> দিন মোর দিনু তোরে শেষে নিতে চাস হরে
> আমার যামিনী।

অগত্যা পন্ডিচেরির কথা বলাবলি করতে হল। হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করতে পারি আভাসে ইঙ্গিতে জানালুম। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে ও-কথা! আমার হোসিয়ারি ফাঁপতে ফাঁপতে টেক্সটাইলের আকার ধারণ করেছিল। কটন মিলের উদ্যোগ আয়োজনে জীবনটা মধুর হয়েছিল। রূপ নাহয় পাইনি, কিন্তু রুপো তো পেয়েছি অজস্র অঢেল। রূপের মায়া আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, কিন্তু রুপোর মায়া? দেখা গেল কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনের আকর্ষণ কম নয়। থেকে গেলুম কাঞ্চনের টানে। কৃষ্ণা কিন্তু ঠাওরাল কামিনীর টানে। তার মুখে হাসি আর ধরে না। মোহিনীশক্তির জয়।

সেই হাড়িকাঠ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই দেখে গুরু ডেকে এনে মন্ত্র নিলুম গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের। কৃষ্ণাকে সাধলুম, 'তুমিও নাও।' তার চোখ দিয়ে আগুন ছুটল। কী যে হল তার জানিনে, যখন খুশি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা, পাড়ায় পাড়ায় গল্প করে বেড়ায় আহার নিদ্রা ভুলে। রাত্রে খুঁজেপেতে ধরে নিয়ে আসি, বন্ধ করে রাখি। চিকিৎসকের পরামর্শে গুরুর অনুমতি নিয়ে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ আবার পাতাতে যাই। ফল হয় উলটো। কাতর সুরে বলে, তুমি আমার বাপের বয়সি, তুমি মাননীয় বৃদ্ধ, তোমার কি শোভা পায় এ অধর্ম! আমি নাকি তার বাপের বয়সি! হে হরি! আমি নাকি মাননীয় বৃদ্ধ! হে ঈশ্বর!....

নয়নদা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন। কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন, 'পাড়ার ঘরে ঘরে গিয়ে আমার নামে রটায় আমি নাকি তাকে সুন্দরী পেয়ে তার উপর বলপ্রয়োগ করি। বুড়ো বয়সে আমার নাকি ভীমরতি ধরেছে। ....ও হো হো। ...আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করে না ভায়া। বেলডাঙায় আমাদের দু-নম্বর মিলটা তৈরি হয়ে গেলেই আমি চোখ বুজব।...সবাই বলছে ওকে পাগলাগারদে পাঠাতে। কিন্তু সেটা হবে যথার্থ অধর্ম। না, সে আমি পারব না। কিন্তু এও আমার অসহনীয়, আমার মান গেল, আমি হেয় হয়ে গেলুম লোকচক্ষে।'

আমি তাঁর চোখ মুছিয়ে দিলুম সেকালের মতো। এক হস্টেলে একঘরে বাস করতুম আমরা। রাত কেটে যেত সুন্দরী নারীদের স্বপ্নে। নয়নদার নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল সুন্দরী নারী তাঁর ভাগ্যে অবধারিত। সেটা তাঁর জন্মস্বত্ব। জন্মস্বত্বের খন্ডন হল দেখে তিনি কেঁদে আকুল হয়েছিলেন বিশ বছর আগে। চোখ মুছিয়েছিলুম আমরা কয়েক জন বয়স্য।

সান্ত্বনাচ্ছলে সে-বার বলেছিলুম, রূপ ভগবান সবাইকে দিয়েছেন, দেখবার চোখ দেননি সবাইকে। এবার কী বলব? বলার আছে কী?

যৌবনজ্বালা

ডিনার শেষ হলে মহিলারা উঠে গেলেন বসবার ঘরে! আমার স্ত্রী চলে যাচ্ছেন দেখে অন্যমনস্কভাবে আমিও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি, এমন সময় পিছন থেকে আমার কোট ধরে টানলেন গৃহকর্তা ব্যারিস্টার মৌলিক। কানে কানে বললেন, 'কথা আছে।'

আমি থমকে দাঁড়ালুম। 'কী কথা!'

তিনি মুখ টিপে মুচকি হাসলেন। কথাটা আর কিছু নয়, এটিকেটের ভুল। বলতে হল না যে মহিলারা কিছুক্ষণ নিরালায় থাকবেন, সে-সময় পুরুষদের যাওয়া বারণ। তাঁর হাসি থেকে অনুমান করলুম কী কথা। চোরের মতো চুপি চুপি ফিরে এলুম খানা কামরায়। একটা ফাঁড়া কেটে গেল।

ইতিমধ্যে জনা চারেক অভ্যাগত মিলে জটলা শুরু করে দিয়েছিলেন। হাতে পানপাত্র, মুখে চুরুট। আমার তো ওসব চলে না, আমি এক পেয়ালা কফি হাতে ওঁদের সঙ্গে ভিড়ে গেলুম। ভিড় দেখলেই ভিড় বাড়ে। যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে ঘিরে বসল চার ইয়ারকে। কেউ কেউ টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

প্রফেসর মণিমোহন দে বলেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার প্রদোষকুমার সেনকে, 'তুমি অসম থেকে আসছ। তুমিই বলতে পারবে আসলে কী হয়েছিল। আমরা তো নানা মুনির নানা বয়ান শুনেছি। কেউ বলে শিকার করতে গিয়ে দৈব দুর্ঘটনা। কেউ বলে স্রেফ আত্মহত্যা।'

প্রদোষ মাথা নাড়লেন। 'না, অ্যাক্সিডেন্ট নয়।'

সকলে বুঝতে পারল বিকল্পে কী! তবু মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল বীরেশ্বর ঘোষাল—ব্যারিস্টার। 'তা হলে কী?'

'সুইসাইড।'

'সুইসাইড!' ঘোষাল উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি বিশ্বাস করিনে। স্বয়ং যুধিষ্ঠির এসে হলফ করে বললেও আমি বিশ্বাস করব না যে বিশ্বজিৎদা আত্মহত্যা করেছে। বিলেতে থাকতে আমাকে রক্ষা করেছিল কে? কাকে আমি বিবেকের মতো ভয় করতুম? জিতেন্দ্রিয়, চরিত্রবান, সত্যনিষ্ঠ—'

আমি বুঝতে পেরেছিলুম যাঁর কথা হচ্ছিল তিনি আমার কলেজের বিখ্যাত খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ সিংহরায়। বাংলার রাজপুত। ছ-ফুট লম্বা, সুশ্রী চেহারা, মুখচোরা প্রকৃতি। খুব কম ছেলের সঙ্গেই মেশেন, যাদের সঙ্গে মেশেন তারা বলে মনটা সাদা, যাদের সঙ্গে মেশেন না তারা বলে মাথাগরম। আমি ছিলুম বয়সে অনেক ছোটো, দূর থেকে দেখতুম আর শ্রদ্ধা করতুম।

'কিন্তু কথাটা কি সত্য?' আমি চেঁচিয়ে বললুম ঘোষালকে বাধা দিয়ে।

'চুপ। চুপ।' গৃহকর্তা আমার পিঠে টোকা মেরে সাবধান করে দিলেন যে, ও-ঘরে মহিলারা রয়েছেন।

ঘোষাল তখনও গজগজ করছিল। 'কিন্তু কেন? কোন দুঃখে আত্মহত্যা করবেন বিশ্বজিৎদার মতো লোক। একটা নষ্ট মেয়েমানুষের জন্যে?'

প্রদোষ দপ করে জ্বলে উঠলেন, 'নষ্ট মেয়েমানুষ কাকে বলছ?'

'তুমি জান কাকে বলছি। শি ইজ এ বিচ।'

'চুপ চুপ।' বলে মৌলিক তার মুখ চেপে ধরলেন।

প্রদোষ বললেন, 'যে বিচ নয় তাকে বিচ বলে ভুল করেছিল বিশ্বজিৎ। সেইজন্যে এ ট্র্যাজেডি! কিন্তু আগে দরজাগুলো ভেজিয়ে দেওয়া হোক। এসব কথা মেয়েদের জন্যে নয়।' এই বলে প্রদোষ আরেকটা সিগার ধরালেন।

আমরা যে যার চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠে দরজাগুলো ভেজিয়ে দিয়ে এলুম। কে জানে, মেয়েরা যদি শুনতে পায় তাহলেই হয়েছে। গৃহকর্তা সবাইকে দিয়ে গেলেন যার যা অভিরুচি। আমি নিলুম আর এক পেয়ালা কফি। প্রদোষ বলতে আরম্ভ করলেন।

দুই

ঘোষালকে পাপের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ছিল বিশ্বজিৎ, কিন্তু বিশ্বজিৎকে ভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে ছিল না তেমন কেউ। বিশ্বজিৎ হচ্ছে সেই জাতের মানুষ যারা রামধনুর সাতটা রং দেখতে পায় না, যাদের চোখে দুটি মাত্র রং। সাদা আর কালো। মেয়েদের সে দু-ভাগে বিভক্ত করেছিল। ভালো আর মন্দ।

জান তো মেয়েরা কত বিচিত্র প্রকৃতির। কোনো দুজন মেয়ের প্রকৃতি এক নয়। এমনকী কোনো একজন মেয়ের প্রকৃতি সবসময় একরকম নয়। সকালে বিকালে শাড়ির রং বদলায় কেন জান? মনের রং বদলায়। এই আশ্চর্য প্রাণীকে নিয়ে প্রাণে বাঁচতে হলে সাত-সাতটা রঙের জন্যে চোখ থাকা চাই। যারা রংকানা তাদের উচিত নয় বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকা। বিশ্বজিতের বাবা তার বিয়ে না দিয়ে তাকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন এই ভরসায় যে বিশ্বজিতের নীতিবোধ নির্ভরযোগ্য। তিনি জানতেন না যে ওই ধরনের পুরুষরাই মরে সকলের আগে। মেয়েদের ওরা চিনতে পারে না। ভুল করে। ভুলের মাশুল মৃত্যু।

বিশ্বজিতের ধারণা ছিল সেই মেয়েরাই ভালো যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে না। যারা পুরুষদের সঙ্গে মেশে তারা খারাপ। যারা যত বেশি মেশে তারা তত বেশি খারাপ। ওদের বাড়িতে ওরা কড়া পর্দা মানত। বাড়ির মেয়েদের সম্বন্ধে ওরা ছিল পুরোদস্তুর রক্ষণশীল। অথচ বাইজির নাচ না হলে ওদের বাড়ির কোনো উৎসব পূর্ণাঙ্গ হত না। সাদা আর কালো, ভালো আর মন্দ, এর বাইরে যে আর কোনো রং বা রীতি থাকতে পারে বিশ্বজিতের সে-শিক্ষা হয়নি দেশে থাকতে। বিদেশে গিয়ে হতে পারত, কিন্তু ওই যে বললুম তেমন কেউ ছিল না যে শেখাবে।

বিশ্বজিৎ পাপের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল তা ঠিক। তিন বছর বিলেতে কাটিয়েও সে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করেনি, নাচেনি, অন্যান্য পুরুষের অসাক্ষাতে কথা বলেনি। মেয়েরা পর্দা মানে না বলে ও নিজে একপ্রকার পর্দা মানত। মেয়েদের সামনে বড়ো-একটা বেরোত না, ট্রামে-বাসে, টিউব ট্রেনে গা ঘেঁষে বসত না দাঁড়াত না। ওর জন কয়েক ভক্ত ছিল, যেমন ঘোষাল। তাদের কারও সঙ্গে তরুণী বান্ধবী দেখলে ও তাকে বয়কট করত। শেষপর্যন্ত ওর ওই একমাত্র ভক্তই অবশিষ্ট ছিল। এবং সেটিও একটি ভন্ড। মাফ কোরো ঘোষাল। নয়তো হাটে হাঁড়ি ভাঙব।

দেশে ফিরে বিশ্বজিৎ বিয়ে করলে পারত, কিন্তু ওর এক ধনুর্ভঙ্গ পণ ছিল। যতদিন-না নিজের পয়সায় মোটর কিনেছে ততদিন ও নিজেকে ওর শ্বশুরকুলের সমকক্ষ মনে করবে না। সমকক্ষ না হয়ে পাণিগ্রহণ করবে না। ও ফরেস্ট সার্ভিসে যোগ দিয়ে অসমে চাকরি নিল। চাকরির গোড়ার দিকে যে মাইনে দেয় তাতে মোটর কেনার প্রশ্ন ওঠে না। বিয়ের প্রস্তাব এলে মোটরের অভাব বলে ও সে-প্রস্তাব বানচাল করে দেয়। অবশ্য যারা মেয়ে দিতে চায় তারা মোটর দিতেও রাজি। কিন্তু তাহলে সমকক্ষতার গৌরব থাকে না।

শিকারের শখ ওর ছেলেবেলা থেকে ছিল। ফরেস্ট অফিসার হয়ে ওটা হয়ে উঠল ওর একমাত্র শখ। বনজঙ্গল পরিদর্শন করতে গিয়ে ও শিকার করে বেড়াত মাসের মধ্যে পনেরো-বিশ দিন। যতরকম বুনো জানোয়ার ওর খপ্পরে পড়ত তাদের সহজে নিস্তার ছিল না। নিজেও বিপদে পড়ত কোনো কোনো বার। ওকে দেখলে মনে হত না যে ও ঠিক সামাজিক মানুষ। অথচ লোক অতি অমায়িক। শত্রু বলতে কেউ ছিল না ওর। কাউকে মাংস, কাউকে চামড়া, কাউকে শিং উপহার দিয়ে ও সবাইকে খুশি রেখেছিল।

এমনসময় ওখানে শিকারের খোঁজে এলেন হায়দরাবাদের এক সামন্ত রাজা ও তাঁর রানি। এঁরা কিছুদিন থেকে শিলঙে বসবাস করছিলেন। ইউরোপে এঁরা পড়াশোনা করেছেন, ইউরোপের প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁদের ভালো লাগে, সেদিক থেকে শিলং ভারতে অদ্বিতীয়। শিকার উপলক্ষ্যে এঁরা মাঝে মাঝে বনেজঙ্গলে ঘোরেন,

ফরেস্ট বাংলোয় ওঠেন। ফরেস্ট অফিসারদের সাহায্য নেন। অফিসাররাও এঁদের সঙ্গ পেয়ে কৃতার্থ বোধ করেন। হায়দরাবাদের সামন্ত রাজাদের ধনের প্রসিদ্ধি আছে। অফিসারদের কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে এঁরা গলা থেকে মণিমুক্তার হার খুলে দেন। যারা নেয় না তারাও মুগ্ধ হয়ে যায়।

বিশ্বজিৎ নিল না, মুগ্ধ হল। রাজা রানি দুজনে তাকে সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ জানালেন, সে যেন শিলঙে তাঁদের অতিথি হয়। বিশ্বজিৎ বার কয়েক 'না না, তা কি হয়' ইত্যাদি বলার পর কেমন করে এক বার 'আচ্ছা' বলে ফেলল। লোকটা সত্যনিষ্ঠ। 'আচ্ছা' যখন বলেছে তখন শিলং তাকে যেতেই হবে, ছুটি তাকে নিতেই হবে, রাজরাজড়ার অতিথি তাকে হতেই হবে, যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয়। ওঁরা তাকে ক্লাবে নিয়ে গিয়ে হোমরাচোমরাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, গভর্নমেন্ট হাউসে নিয়ে গেলেন কল করতে। ওঁরা ওর পরিচয় দিলেন এই বলে যে বাঘ ভালুকের এত বড়ো শত্রু অসম প্রদেশে আর নেই। এর ফলে লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি তাকে ধরে বসলেন তাঁর জন্যে যেন শিকারের আয়োজন করা হয়।

বিশ্বজিৎ যখন শিলং থেকে ফিরল তখন তার অন্তরে ঝড়ের মাতন। এক এক সময় তার মনে হচ্ছে কাজটা সে ভালো করল না। রাজঅতিথি হবার মতো যোগ্যতা তার কই! তারপরে মনে হচ্ছে, যা-ই বলো এমন সৌভাগ্য আর কোনো ফরেস্ট অফিসারের হয়নি। লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারিকে গোটা দুই বাঘ মারিয়ে দিতে পারলে স্বয়ং লাটসাহেব এসে হাজির হবেন। তারপরে প্রমোশন কে ঠেকায়!

প্রাইভেট সেক্রেটারি নিজে আসতে পারলেন না, এলেন তাঁর মেমসাহেব। আর কে এলেন শুনবে? রানিসাহেব। এবার রাজাসাহেব অন্য কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। দুই ভদ্রমহিলার পার্শ্বচর হল বিশ্বজিৎ। তার মাথাটা একটু ঘুরে গেল। যদিও সে তাঁদের সমকক্ষ নয় তবু সে-ই একমাত্র অফিসার যাকে তাঁরা এই সম্মানের উপযুক্ত বিবেচনা করেছেন। বিদায়কালে দুজনেই তার আকাশস্পর্শী প্রশংসা করলেন। রানি তো সোজাসুজি বলে বসলেন, 'আর কারও সঙ্গে শিকার করে আমি এমন আনন্দ পাইনি। যতদিন অসমে আছি ততদিন আর কারও সঙ্গে শিকার করব বলে মনে হয় না।'

এসব হল সামাজিকতার অঙ্গ। কিন্তু বিশ্বজিৎ লোকটা অসামাজিক তথা সত্যনিষ্ঠ। তাই অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করল। ও বোধহয় আশা করেছিল এরপর লাটসাহেব আসবেন অরণ্যবিহারে। সেরকম কোনো খবর কিন্তু এল না। কিছুদিন আনমনা থেকে সে একাই বেরিয়ে পড়ল সফরে। একমাস তাঁবু ঘাড়ে করে নানা দুর্গম স্থলে ঘুরল। তারপরে সদরে ফিরে অবাক হয়ে গেল যখন দেখল রানি তার জন্যে সারকিট হাউসে অপেক্ষা করছেন। এবারেও রাজা সময় পাননি। কোনো মহিলাও নেই তাঁর সঙ্গে, অবশ্য পরিচারিকা বাদে।

এ এক পরীক্ষা। বিশ্বজিৎ প্রশ্নপত্রের উত্তর খুঁজে পেল না। মাইনের টাকা তুলে, বিল মিটিয়ে, জমে ওঠা ফাইল পরিষ্কার করে দু-এক দিনের মধ্যেই আবার রওনা হল রানির সঙ্গী হয়ে। খুব যে তার ভালো লাগছিল তা নয়। একে ক্লান্ত, তার উপর সন্দিগ্ধ। যে মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে শিকারে যায় সে কি শুদ্ধ? সে কি নিষ্পাপ? এ কী ভীষণ পরীক্ষা তার জীবনে! এরপরে কে সহজে বিশ্বাস করবে যে সে নিজে অপাপবিদ্ধ! রানিকে 'না' বলার মতো মনের জোর তার ছিল না। বলতে পারল না যে পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকার করতে যাওয়া তার বিবেকবিরুদ্ধ। কিংবা তার শরীর ভালো নেই, কোমরে ব্যথা, ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে। অথচ সমস্তক্ষণ অশুচি বোধ করল, অপরাধী বোধ করল।

রানি বিলেতে পড়াশুনা করেছেন, পুরুষমানুষের সঙ্গে মেলামেশায় অভ্যস্ত। বিশ্বজিৎ বিলেতে ছিল শুনে তিনি ওকে নিজের সেটের একজন বলেই ধরে নিয়েছিলেন। অন্তরঙ্গতার ছলে কখনো বলেন 'ডিয়ার', কদাচিৎ 'ডারলিং'। এসব মুখের কথা, মনের কথা নয়। কিন্তু বিশ্বজিতের তো অভিজ্ঞতা নেই। সে ভাবল এসব মনের কথা। রানি কি তাহলে তার প্রেমে পড়েছেন? এ কি কখনো সম্ভব? তার মতো সামান্য লোকের সঙ্গে প্রেম! ভাবনায় পড়ল বিশ্বজিৎ। ওদিকে আবার প্রেম কথাটার ওপরে তার বিরাগ ছিল। জিনিসটা ভালো নয়। যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি তার সঙ্গে প্রেম তো রীতিমতো পাপ। বিশ্বজিৎকে এই পাপের হাত থেকে রক্ষা করবে কে?

একবার শিকার থেকে সে যখন ফিরল তখন তার অন্তরে সাগরমন্থনের মতো একটা ব্যাপার চলছিল। সেও প্রেমে পড়ল নাকি! পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম! এর চেয়ে মরণ শ্রেয়। রানি চলে গেলেন বহুসংখ্যক জন্তুজানোয়ার মেরে। জানতে পেলেন না যে আরও একটি প্রাণীকেও মেরে রেখে গেলেন। এরকম আলোড়ন সে আর কখনো অনুভব করেনি। তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে মেয়েটা খারাপ। কিন্তু সে নিজে কোন ভালো? কী করে সে তার ভাবী বধূকে বোঝাবে যে তার হৃদয়ে লেশমাত্র অনুরাগ জন্মায়নি! নিজের ওপর তার যে অবিচল বিশ্বাস ছিল তা যেন একটু নড়ল। সে কি সত্যি সচ্চরিত্র, না সেও ডুবে ডুবে জল খায়? তার কি উচিত ছিল না রানির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করা? কিন্তু সে তা পারল কই? রানি যখন জানতে চাইলেন, 'আবার কবে শিলং আসছেন বলুন,' সে উত্তর দিল, 'আপনাদের অসুবিধা হবে।' রানি সকৌতুকে বললেন, 'আমরা কি বাঘ ভালুক যে আপনার জ্বালায় অসম ছেড়ে পালাব? ওয়েল, ডিয়ার। ডু কাম জাস্ট ফর এ ডে!'

অগত্যা এক দিনের জন্যে বিশ্বজিতের শিলংযাত্রা। একদিনের জায়গায় তিন দিন হল, তবু কেউ তাকে ছেড়ে দেয় না। রাজা ডাকেন টেনিস খেলতে, রানি নিয়ে যান সমাজে পরিচয় করাতে। যে-ছেলে কোনোদিন মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি সে রানির সঙ্গে পাশাপাশি আসনে বসে রানির মোটর চালনা দেখে ও মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং ধরে। যে-মানুষ কোনোদিন বড়োকর্তাদের খোশামোদ করেনি সে একদিন দুপুরে সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে ছুটির দরবার করে আসে। দিন পনেরো ছুটি না হলে নয়। সে মোটর চালাতে শিখেছে কথাটা সত্যি। যেমন সত্যি অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ। অথচ এটা মিথ্যা। এমন মিথ্যা যে বলতে গেলে সারা মুখ লাল হয়ে ওঠে। বুক ঢিপঢিপ করে। চোখ আপনি নত হয়। ভয় হয়, ধরা পড়ে গেছে।

ওদিকে তার বিবেক তাকে এক মুহূর্ত ছুটি দেয় না। পনেরো দিনের ছুটি তো দূরের কথা। যে-মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে মোটরবিহার করে সে কি ভালোমেয়ে? কিন্তু যে-ছেলে পরস্ত্রীর সঙ্গে মোটরে করে ঘুরে বেড়ায় সেই-বা কেমন ছেলে? একদিন তো সে বিয়ে করবে। সেদিন কি তার স্ত্রী তাকে বিশ্বাস করবেন? ভবিষ্যতের জন্যে কী গভীর অশান্তির খাদ কেটে রাখছে সে! সমস্ত বিবাহিত জীবনটাই খাদে পড়ে চুরমার হবে, যদি সময়মতো ব্রেক না কষে। পনেরো দিন ছুটি নিলেও প্রত্যেক দিন সে উপায় খোঁজে পালাবার, কিন্তু পারে না পালাতে। বাইরে থেকে বাধা নেই, পাহারা নেই। কেউ তাকে ধরে রাখবে না। একবার মুখ ফুটে বললেই হল, 'আমার কাজ পড়ে আছে। আমাকে যেতে হবে রানি।' কিন্তু ওটুকু বলার মতো ইচ্ছাশক্তি লোপ পেয়েছিল। কিছুতেই সে মুখে আনতে পারে না ও-কথা। বাজে বকে। ভাবে মোটর চালানো তো শিখছে। এও কি একটা কাজ নয়!

আসল কারণটা তার অবচেতন মনে নিহিত ছিল। সেখানে তার ইচ্ছাশক্তিকে অবশ করে রেখেছিল মন্ত্রশক্তি। খারাপ মেয়ে, এই দুটি শব্দের যেন একটা মন্ত্রশক্তি ছিল। উচ্চারণ করলেই মন্ত্রশক্তির ক্রিয়া শুরু হত। মনে মনে উচ্চারণ করলেও নিস্তার নেই। খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে, খারাপ মেয়ে জপ করতে করতে বিশ্বজিৎ তার নিজের অজ্ঞাতসারে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মতো পরবশ হয়েছিল। এরজন্যে দায়ী কে? দায়ী তার ওই রংকানা চোখ। যে-চোখ রামধনুর সাতটা রং দেখে না। রং বলতে বোঝে সাদা আর কালো। সাদা দেখতে না পেলে কালো দেখে।

সে-সময় বিশ্বজিতের যদি কোনো সুহৃৎ থাকত তাহলে তাকে তার নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচাত। নিজের ভুলের হাত থেকে বাঁচলে পরে সে নিজের গুলির হাত থেকেও বাঁচত। কিন্তু তেমন কোনো সুহৃৎ ছিল না তার। আমি হলে বলতুম, যাকে তুমি খারাপ মেয়ে ভাবছ সে খারাপ নয়। ওটা তোমার আত্মপ্রতারণা। খারাপ মেয়ে ভেবে তুমি ওর কাছে যা আশা করছ, কামনা করছ, কোনোদিন তা পূর্ণ হবে না। বিশ্বজিৎ অবশ্য রাগ করত, অস্বীকার করত যে তার কোনো কামনা আছে। কিন্তু অস্বীকার করলে হবে কী? পুরুষ মাত্রেই অবচেতন মনের গুহায় যেসব অন্ধ কামনা নিহিত রয়েছে খারাপ মেয়ের গন্ধ পেলেই

তারা চরিতার্থতার জন্যে ফাঁদ পাতে। সে যদি খারাপ মেয়ে না হয়ে থাকে তবে নিজের ফাঁদে নিজেকেই পড়তে হয়। তখন মরণ অনিবার্য, যদি-না কেউ সময়মতো উদ্ধার করে।

শিলং থেকে ফিরে বিশ্বজিৎ সফরে বেরিয়ে পড়বে এমন সময় টেলিগ্রাম এল রানি আবার আসছেন। আতঙ্ক ও উল্লাস দুই পরস্পরবিরোধী ভাব তার বুক জুড়ে তান্ডব বাঁধিয়ে দিল। একবার সে পালাবার কথা ভাবে, পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে। একবার ভাবে পালিয়ে যাওয়া তো কাপুরুষের কাজ, পুরুষের কাজ বিপদের সম্মুখীন হওয়া। একবার মনে করে মিথ্যা বলাই এক্ষেত্রে সত্য বলা। পালটা টেলিগ্রাম করা উচিত আমি অসুস্থ। একবার মনে করে সাহস থাকে তো সত্য বলাই উচিত। তুমি খারাপ মেয়ে, আমি তোমার সঙ্গে শিকারে যাব না। আমার বউ রাগ করবে, যখন বিয়ের পর শুনবে।

পালটা টেলিগ্রাম করা হল না। পালিয়ে যাওয়া হল না। স্টেশনে গিয়ে রানিকে অভ্যর্থনা করল অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে বিশ্বজিৎ। এবারে সে স্থির করেছিল শিকারে যাবার সময় আরও দু-এক জন অফিসারকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। তাঁরাও রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু যাত্রাকালে দেখা গেল কারও ছেলের অসুখ, কারও মেয়ের অসুখ, কারও স্ত্রীর অসুখ। অর্থাৎ কর্ত্রীর হুকুম নেই। কোনো মহিলা তাঁর স্বামীকে বিশ্বাস করে পরস্ত্রীর সঙ্গে শিকারে ছেড়ে দেবেন না। অগত্যা বিশ্বজিতের আর দোসর পাওয়া গেল না। হাতির পিঠে বসতে হল রানির সঙ্গে তাকেই। পাশাপাশি বসে অঙ্গের সুরভি পায়। কেবল সুরভি নয়, পরশ। অমন অবস্থায় পড়লে মুনিঋষিদেরও মন টলে। বিশ্বামিত্র মুনি হলেও বিশ্বজিৎ মুনির চেয়ে জিতেন্দ্রিয় হতেন না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। বিশ্বজিৎ মুনি বহুকষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। হাতির পিঠে চড়েছ কখনো? চড়াই-উতরাই করেছ? তখন পাশের লোকটিকে পাশবালিশ বলে ভুল করা স্বাভাবিক। কখনো পড়ে যাবার ভয়ে, কখনো আচমকা ধাক্কা খেয়ে, কখনো হাতির অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে পাল্লা রেখে হেলে-দুলে কত বার যে মানুষ মানুষের গায়ে টলে পড়ে তার হিসাব নেই। এরজন্যে অবশ্য কেউ লজ্জিত হয় না। মাফ চায় না। এটা স্বাভাবিক।

তিন

হাল কামরা ও খানা কামরার মাঝখানের দরজাগুলো ভেজানো ছিল বলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে গল্প শুনছিলুম। হঠাৎ মণিমোহন বলে উঠলেন, ‘সর্বনাশ! কোনার দরজাটা ফাঁক দেখছি যে!’

ঘোষাল পা টিপে টিপে গেল দরজার কাছে। ছুটে এসে বলল, ‘মেয়েদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ।’

ষড়যন্ত্র করবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়লে যেমন চেহারা হয় আমাদের সকলের চেহারা হল সেইরকম। মুখে কথা নেই, চোখে পলক নেই, হাতের গ্লাস হাতে, কেবল চুরুটের ধোঁয়া উঠছে চিমনির ধোঁয়ার মতো অন্তরিক্ষ জুড়ে। তাহলে অন্তরাল থেকে ওঁরা সমস্ত শুনেছেন।

ভিজে বেড়াল সেজে আমরা একে একে হাল কামরায় চললুম। আরও আগে যাওয়া উচিত ছিল, দেরি হয়ে গেছে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলুম। গল্পটার খেই হারিয়ে গেল বলে মনে মনে মুন্ডুপাত করলুম। কে একজন হেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে হাসির রোল উঠল। হালকা হয়ে গেল ঘরের আবহাওয়া।

‘বাস্তবিক, মেয়েরা না শুনলে গল্প বলে আরাম নেই,’ বানিয়ে বললেন প্রদোষ। ‘এরা কি গল্প শুনতে জানে, না ভালোবাসে! যে যার পানাহার নিয়ে ব্যস্ত। শুনুন আপনারা, বাকিটুকু বলে শেষ করি। আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে।’

গল্প আবার শুরু হলে আমাদের মুখের হাসি মুখে মিলিয়ে গেল। গল্পটা তো হাসির গল্প নয়। আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলুম ট্র্যাজেডির বীজ বোনা হয়েছে, যা হবার তা হবেই। সেইজন্যে আমাদের কারও মনে সুখ ছিল না।

প্রদোষ বলতে লাগলেন—

এতক্ষণ আমি গল্প বলছিলুম বেপরোয়াভাবে। পুরুষের কাহিনি পুরুষালি ধরনে। এখন আমাকে ভদ্রতার মুখোশ পরতে হবে। নয়তো মহিলারা মনে করবেন আমি তাঁদের গায়ে পড়ে অপমান করছি। না না,

আপনারা মুখ ফুটে কিছু বলবেন না, কিন্তু গল্পের মাঝখানে উঠে চলে যাবেন। যাক, উপায় নেই। শেষ করতে তো হবে।

বেচারা বিশ্বজিৎ! আসুন আমরা সকলে মিলে তার জন্যে চোখের জল ফেলি। আমাদের চোখের জলের তর্পণ পেলে তার আত্মা তৃপ্ত হবে। বেচারা বিশ্বজিৎ! তার সব ছিল, কিন্তু এমন একজন বন্ধু ছিল না যে তাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে রক্ষা করতে পারত। আমি থাকলে বলতুম, আগুন নিয়ে খেলতে চাও খ্যালো, কিন্তু আগুনকে খারাপ বলে ভুল কোরো না। যে-মেয়ে খারাপ নয় তাকে খারাপ মেয়ে ভাবলে বিপদে পড়বে। এমনকী যে-মেয়ে সত্যি সত্যি খারাপ তাকেও খারাপ ভাবতে নেই। খারাপ ভাবলে খারাপ দিকে মন যাবে। কিছুতেই মনটাকে ফেরাতে পারবে না। এমনকী পালিয়ে গিয়েও বাঁচবে না। বাঁচতে যদি চাও তো জপ করো—ভালো মেয়ে, সহজ মেয়ে, স্বাভাবিক মেয়ে। তাহলে মন্ত্রশক্তি ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবে। সে-পথ বাঁচবার পথ।

ও যে আত্মসংবরণ করতে গিয়ে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিল রানি তা জানতেন না, জানলে শিকারের শখ সংবরণ করে বিদায় নিতেন। তাঁর ছিল শিকারের নেশা। মনের মতো শিকারি সাথি পেলে এ নেশা যেন মিটতেই চায় না। তিনি বয়সে বড়ো। তাঁর এমন কোনো অপূর্ণ কামনা ছিল না যারজন্যে বিশ্বজিৎকে তাঁর প্রয়োজন। তিনি ভাবতেই পারেননি যে তাঁর সঙ্গে মিলেমিশে একজন বিলেতফেরত সম্ভ্রান্ত যুবক এতদূর বিভ্রান্ত হতে পারে। একথা তাঁর মনে উদয় হয়নি যে তিনি খারাপ মেয়ে বলেই সঙ্গদোষে বিশ্বজিৎও খারাপ ছেলে হয়ে উঠেছে। যা সম্ভব নয় তাকেই সম্ভব মনে করে সে কষ্ট পাচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আপনি ভালো তো জগৎ ভালো। তাঁর সম্বন্ধে জগৎ কী ভাবছে সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

রানি যে রূপসি ছিলেন তা বোধহয় বলতে ভুলে গেছি। দাক্ষিণাত্যের রূপের আদর্শ উত্তরাপথের সঙ্গে মেলে না। আমরা যদি সংস্কারমুক্ত হয়ে নিরীক্ষণ করি তাহলে দাক্ষিণাত্যের রূপ আমাদের নয়নরোচক হবে। অজন্তার গুহাচিত্র কার না মনোহরণ করে! দাক্ষিণাত্যে আমি যত বার গেছি দক্ষিণী মেয়েদের রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা অমন উশখুশ করবেন না। বিয়ে যখন করব তখন বাঙালিই করব। আপাতত যে ক-দিন স্বাধীন আছি সে ক-টা দিন ত্রৈলঙ্গ ললনাদের রূপ-গান করি। যেমন কালো তাঁদের রং তেমনি কালো তাঁদের কেশ, তেমনি কালো তাঁদের চোখ, আর তেমনি কালো তাঁদের কালো চোখের কাজল। নানা রঙের ফুল তাঁদের অলকে, নানা রঙের শাড়ি তাঁদের অঙ্গে, নানা রঙের মণিমাণিক্য তাঁদের আভরণে। কালোকে পরাস্ত করার জন্যে আর সব ক-টা রং যেন চক্রান্ত করেছে। তাঁদের দেখে মনে হয় তাঁরা রঙ্গিণী। চিকনকালা বলে কৃষ্ণের যে বর্ণনা আছে তাঁদেরও সেই বর্ণনা। কৃষ্ণের মতোই আশ্চর্য তাঁদের আকর্ষণ। আমাদের রানি মহাভারতের কৃষ্ণার মতো রূপসি। কয়েকটি বিশেষণ এলোমেলোভাবে আমার মনে আসছে। উত্তপ্ত, মদির, মায়াময়, সুঠাম, বিলোল।

থাক, আর না। রানি যদি দেখতে খারাপ হতেন বিশ্বজিৎ অতটা উদ্দীপ্ত হত না। খারাপ মেয়ে যদি দেখতে সুন্দর হয়, সুন্দর মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয়, তাহলে তার যে সম্মোহন তা দুরন্ত ঘোড়ার মতো দুর্বার। বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার বিশ্বজিৎ কত দুরন্ত অশ্বের টানে উদ্দাম হয়েছে! সে সব ছিল ফার্স্ট হর্স। আর এ হল, মহিলারা মাফ করবেন, আমার বিচারে নয়, বিশ্বজিতের বিচারে ফার্স্ট উওম্যান। এর যে টান তা প্রলয়ংকর।

ফরেস্ট বাংলোয় দুজনের দুখানা ঘর। মাঝখানে খাবার ঘর দুজনের এজমালি। খাওয়াদাওয়ার পরে তারা বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে গল্প করত। তারপর যে যার ঘরে শুতে যেত। গল্প করতে করতে বেশ একটু রাত হয়ে যেত। রানি বলতেন, ‘ওয়েল, ডিয়ার, আমি আর জেগে থাকতে পারছিনে। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে, মনে থাকে যেন।’ বিশ্বজিৎ বলত, ‘বেয়ারাকে বলা আছে, রাত থাকতে ডাকবে।’ তখন রানি বলতেন, ‘সুনিদ্রা হোক, সুখস্বপ্ন দেখো।’ বিশ্বজিৎ বলত, ‘তুমিও।’ রানি হেসে বলতেন, ‘আমি? আমি স্বপ্ন দেখব আমার নূতনতম বাঘকে।’ বিশ্বজিৎ আমতা আমতা করে বলত, ‘আর আমি? আমি স্বপ্ন দেখব আমার...’ কিছুতেই তার মুখ দিয়ে বেরোত না, ‘বাঘিনিকে।’ তারপর চলে যেত নিজের ঘরে।

শিকার করতে যারা যায় তারা জানে একদিন হয়তো বাঘের হাতে জান যাবে। বিশ্বজিতেরও সে-জ্ঞান ছিল। কিন্তু সে কেয়ার করত না। এরপরে তার মনে হতে থাকল, বাঘের হাতে নয়, বাঘিনির হাতে। সে কেয়ার করল না। জীবনে তার এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছিল। ভবিষ্যতের কথা সে আর ভাবতে চায় না, ভাবতে চায় শুধু বর্তমানের কথা। বর্তমানে তার কর্তব্য কী? যে সুযোগ তার মুঠোর মধ্যে এসেছে সে-সুযোগ কি ছাড়া উচিত না ভোগ করা উচিত? ভোগ করতে গিয়ে হয়তো বিয়ে করাই হবে না। আর কাউকে বিয়ে করা অন্যায় হবে। অথচ ভোগ না করে যদি হাতছাড়া করে তবে এল কেন এ সুযোগ তার জীবনে? কেন এল? কে আসতে বলেছিল? সে তো শিলং থেকে ফেরবার সময় আমন্ত্রণ জানায়নি। পরিষ্কার ভাষায় বলেছিল, গুড বাই। তা সত্ত্বেও যদি আসে তবে কেন আসে? এ কি কেবল শিকারের জন্যে আসা?

খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, কেন তোমার আসা! সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, কেন তোমার থাকা! বেশ বুঝতে পারছি বিয়ে এ জীবনে ঘটবে না, অদৃষ্টে নেই। কেউ আমাকে বিয়ে করতে চাইবে না, যখন শুনবে আমার কীর্তিকাহিনি। আমার ভবিষ্যৎ আমি তোমার জন্যে বিসর্জন দিলুম। তুমি কি আমাকে নিরাশ করবে? নিরাশ করলেও আমি মরেছি, না করলেও মরেছি। বাঘিনির হাতেই আমার জান যাবে। তুমি যদি আমাকে শিকার কর তাহলে আমার বেঁচে থাকাও মরে থাকা!

একদিন বিশ্বজিৎ নিজের ইজিচেয়ার থেকে নেমে রানির কোলে মাথা রেখে বারান্দার উপর পা ছড়িয়ে বসল। তিনি তার মাথা টিপে দিতে দিতে বললেন, 'মাথা ধরেছে না পুওর ডারলিং?' সে তাঁর একখানি হাত নিজের হাতের ভিতর টেনে নিল। তারপর কী মনে করে ছেড়ে দিল। রানি বুঝতে পারলেন এ ব্যথা মাথাব্যথা নয়, যৌবন বেদনা। এরকম যে হবে এ তিনি কল্পনা করেননি। অথচ না হওয়াই বিচিত্র। রানি তাঁর হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না, পাছে বিশ্বজিৎ দুঃখ পায়। নিজের সর্বনাশ না করে বন্ধুকে যেটুকু সুখ দেওয়া সম্ভব সেটুকু দিতে তাঁর অনিচ্ছা ছিল না। তার বেশি তিনি কেমন করে দেবেন? বিশ্বজিৎ বিয়ে করে না কেন? তিনি কি বাধা দিচ্ছেন?

এসব কথা খোলাখুলি বলে ফেললেই ভালো করতেন রানি। কিন্তু মেয়েলি লজ্জা তাঁকে নির্বাক করেছিল। ফলে বিশ্বজিৎ এক এক করে অনেক কিছু পেল। একদিনে নয়, অনেক দিনে। সব সুখ যখন পেয়েছে তখন চরম সুখ কেন বাকি থাকে? এই হল তার অনুক্ত জিজ্ঞাসা। এর উত্তরে পেল অনুচ্চারিত উত্তর। তা হবার নয়। সে বিশ্বাস করল না যে যিনি আর-সব দিয়েছেন তিনি ওটুকু দিতে পারেন না। ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকে। ইচ্ছা নেই, তাই বলো। কী করে থাকবে, আমি তো রাজরাজড়া নই। অসমকক্ষ।

একথা শুনে রানি বললেন, 'তুমি যখন বিয়ে করবে তখন আপনি বুঝবে যে তোমার স্ত্রী এ জিনিস আর কাউকে দিতে পারে না। এ কেবল স্বামীর জন্যে।'

নির্ভুল উত্তর। বিশ্বজিতের স্ত্রী যদি এ জিনিস আর কাউকে দেন তবে সে তার নিজের হাতে তাঁকে গুলি করবে। এ জিনিস তো দূরের কথা, কোনো জিনিস না। সে স্বীকার করল যে রানি যা বলছেন তা ঠিক। অথচ তার শিরায় শিরায় যে আগুন জ্বলছিল তারও তো নির্বাণ চাই। তখন তার এমন অবস্থা যে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারে না, যদিও জানে এবং মানে তার আত্মসংবরণ করা উচিত।

বিশ্বজিতের অভ্রান্ত বিশ্বাস ও-মেয়ে খারাপ মেয়ে। সে নিজেও কিছু কম খারাপ নয়। তাহলে তাদের দুজনের সম্পর্কের ন্যায়সঙ্গত পরিণতি কী? যেটা ন্যায়শাস্ত্রে বলে সেইটেই তো হবে। না যেটা ধর্মশাস্ত্রে বলে সেইটে?

প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ হতে হতে এমন এক মুহূর্ত এল যখন না ভেবেচিন্তে বিশ্বজিৎ বলল, 'রানি, কাল আমি বাঘশিকার করতে গিয়ে নিজেকেই গুলি করব। তুমি সে-দৃশ্য সইতে পারবে না। লোকে হয়তো তোমাকেই দোষ দেবে। সময় থাকতে তুমি সদরে চলে যাও।'

রানি তা শুনে স্তম্ভিত হলেন। বললেন, 'তুমি কি পাগল হয়েছ! এত তুচ্ছ কারণে কেউ আত্মহত্যা করে? চলো, তুমিও সদরে চলো। তোমাকে আমি শিলং নিয়ে গিয়ে তোমার মনের মতো একটি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে

দেব।'

বিশ্বজিৎ ও-কথা কানে তুলল না। আলটিমেটাম দিল—'আমি যা চাই তা আজ রাত্রেই পাব, নয়তো কোনোদিন পাব না।' কাতর স্বরে বলল, 'এখন তোমার হাতে আমার জীবন-মরণ।'

রানি তার মুখের দিকে তাকাতে পারছিলেন না। পায়ের দিকে তাকিয়ে চোখের জল ঝরালেন। মৌনং সম্মতিলক্ষণং ভেবে সে তাঁকে কাছে টেনে নিল! তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বন্ধু, তুমি কি আমার সর্বনাশ করবে? এই কি তোমার মনে ছিল?'

বিচলিত হয়ে বিশ্বজিৎ বলল, 'রানি, আমি কি তোমার সর্বনাশ করতে পারি? এক বার আমার দিকে তাকাও। আমাকে দেখে কি মনে হয় যে কারও সর্বনাশ করতে পারি? তুমি কাল সদরে চলে যেয়ো। আমার কপালে যা থাকে তাই হবে।'

তিনি তার বুকে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। কিন্তু কিছুতেই তাকে দিয়ে বলাতে পারলেন না যে সেও তাঁর সঙ্গে সদরে যাবে। দুজনের একজনেরও চোখে ঘুম ছিল না। অবশেষে বিশ্বজিৎ বলল, 'যাই, আমাকে ভোরবেলা জাগতে হবে, জীবনের শেষ ঘুম ঘুমিয়ে নিই।'

রানি তার কপালে চুমো দিয়ে বললেন, 'কাল আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখব। কোথাও যেতে দেব না।'

পরের দিন ভোর হবার আগেই বিশ্বজিৎ বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলে। রাত্রে তার ঘুম আসেনি। সারা অঙ্গে যৌবনজ্বালা। শীতল জল এত কাছে, তবু এত দূরে। তবে কি এ জল নয়, মরীচিকা! খারাপ মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, আমি কি তোমাকে চিনতে পারিনি? সুন্দর মেয়ে, খারাপ মেয়ে, তুমি কি আমাকে ভুল বুঝতে দিয়েছিলে? কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। আমি যা মুখে বলি তা কাজে করি। তুমি সে-দৃশ্য সইতে পারবে না। বিদায়।

রানি তাঁর প্রসাধন শেষ করে বাইরে এসে শুনলেন বিশ্বজিৎ রওনা হয়ে গেছে। তাঁর চা খাওয়া হল না। তিনি হাতির খোঁজ করলেন। হাতি ছিল তাঁকে সদরে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি হুকুম দিলেন, সদরে নয়, সাহেব যে পথে গেছেন সেই পথে চালাও। সে-পথ কারও জানা ছিল না। সাহেব তো কাউকে বলে যাননি। ঘুরতে ঘুরতে রানির বেলা হয়ে গেল। দূর থেকে কানে এল বন্দুকের আওয়াজ। দিকনির্ণয় করে তিনি হাতি ছুটিয়ে দিলেন। পৌঁছে দেখলেন জীবনদীপ নিভে গেছে।

এমনি করে তার যৌবনজ্বালার অবসান হল। বেচারা বিশ্বজিৎ! রানিকে বাঁচাবার জন্যে সে একখানা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল তার ঘরে। ফিরে এসে রানি সেখানা আবিষ্কার করলেন। জানিনে কী ছিল সে-চিঠিতে। রানি সেখানা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আগুনে ফেলে দিলেন।

চার

প্রদোষের জবানবন্দি শেষ হল যখন, তখন মেয়েদের সকলের চোখে জল। পুরুষদের কারও মুখে কথা ছিল না। ঘোষাল তো ছোটো ছেলের মতো গালে হাত রেখে শুনছিল। বোধহয় ভাবছিল অমন মানুষের এমন পরিণাম কি সত্যি!

'সেই রানি তারপরে কী করল?' জানতে চাইলেন মিসেস মৌলিক।

'রানি তারপরে সন্ন্যাসিনী হয়ে গেলেন। তাঁর গলার গোলকোণ্ডার হিরের হার খুলে দিলেন সিভিল সার্জনের মেমসাহেবকে। তাঁর পাঁচ রকমের মণি-বসানো পাঁচ আঙুলের আংটি পরিয়ে দিলেন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টর মেমসাহেবকে। তাঁর প্ল্যাটিনামের ব্রেসলেট দিয়ে দিলেন ফরেস্ট কনজারভেটরের মেমসাহেবকে। তা বলে বিশ্বজিতের অধস্তন কর্মচারীদের স্ত্রীদের বঞ্চিত করলেন না। তাঁদের বিলিয়ে দিলেন নাকে ও কানে পরবার যতরকম অলংকার। আর শাড়িগুলো খয়রাত করলেন চাকরবাকরদের জানানাদের।'

'তারপরে?' প্রশ্ন করলেন মৌলিকের বোন মিসেস ঘোষাল।

‘তারপরে? ডেপুটি কমিশনারের তো মেমসাহেব নেই। তিনি চিরকুমার। তিনি হইচই বাধিয়ে দিলেন। তখন রানি গিয়ে মোলাকাত করলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির মেমসাহেবের সঙ্গে। খবর এল ডেপুটি কমিশনার জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছেন, অযাচিত পদবৃদ্ধি।

এরপরে মহিলাদের কৌতূহল লক্ষিত হল না। মণিমোহন বললেন, ‘সেন, তোমার ওই রানিটি মোটেই ভালোমেয়ে নয়। যা দিতে পারে না তার আশা দিয়ে ছেলেটাকে বাঁদরনাচ নাচিয়েছে। ছেলেটা যে মারা গেল তারজন্যে দায়ী তোমার রানি।’

‘আমার রানি! বেশ ভাই বেশ!’ প্রদোষ মহিলাদের দিকে তাকালেন। ‘কিন্তু রানি যদি খারাপ মেয়েই হত, যা দেবার নয় তাও দিত। তাহলে এই ট্র্যাজেডি ঘটত কি?’ তিনি আপিল করলেন।

দেখা গেল রানির বিরুদ্ধে রায় দিলেন একজন কি দুজন বাদে আর সব পুরুষ। আর বিশ্বজিতের বিরুদ্ধে মহিলারা সবাই।

পরির গল্প

ছেলেবেলায় রঙ্গন ও তার দিদি কাঞ্চন যে পথ দিয়ে পায়ে হেঁটে ইস্কুলে যেত সে পথের দুই ধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর বলাবলি করত—

এরা কারা হে?

এরা নতুন পোস্টমাস্টারবাবুর মেয়ে। কলকাতা থেকে এসেছে।

বল কী? দুই বোন? কই, দেখতে তো দুই বোনের মতো নয়!

একেবারেই না। বোধহয় দুই মা।

হতে পারে দুই মা, হতে পারে দুই।

চুপ চুপ, শুনতে পাবে।

শুনতে পেলে রঙ্গনের ও কাঞ্চনের কানের গোড়া লাল হয়ে উঠত। কিন্তু কী করবে? তখনকার দিনে ইস্কুলের বাস তো হয়নি আর ইস্কুলটাও হাই স্কুল হয়ে ওঠেনি। মেয়েদের ইস্কুলে মেয়েরা পড়াবে না বুড়োরা পড়াবে তাই নিয়ে তর্ক চলছিল তখনও। রাজপথে আট-দশ বছর বয়সের মেয়েদের চলাফেরা একটা দেখবার মতো ব্যাপার ছিল।

তারপর ইস্কুলে পা দিয়েও দুই বোন আবার তেমনি লোকজনের দৃষ্টি টেনে আনত। সহপাঠিনীরা ফিসফিস গুজগুজ করত—

দেখেছিস কেমন সুন্দরী! যেন ডানাকাটা পরি!

পরি না ফরি, না ফরফরি।

না ফুরফুরি।

ওর নাম কাঞ্চন। ওর ছোটোবোনের নাম রঙ্গন।

রঙ্গন না বেঙ্গন।

বেঙ্গন না ব্যাং।

আমি বলি ডানাকাটা বানরী।

ধুর বোকা! বানরী কখনো ডানাকাটা হয়। বানরের কি ডানা আছে?

তাহলে ও ডানাকাটা ময়না।

না না, অতটা কালো নয়।

তবে ডানাকাটা ময়ূর।

না না, অতটা কুৎসিত নয়।

তবে ও ডানাকাটা পাতিহাঁস।

আসলে হয়েছিল কী, তাদের দুই বোনের চেহারায় বেশ কিছু বৈষম্য ছিল। এতখানি বৈষম্য বড়ো-একটা দেখা যায় না। তা বলে কোথাও যে দেখা যায়নি তা নয়। রাজশাহি জেলার একটি বিশিষ্ট জমিদার বংশে দেখা গেছে। ভাই আর্য, বোন দ্রাবিড়। বোনের বিয়ে আটকায়নি। রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে রুপো।

পোস্টমাস্টারমশায়ের কিন্তু রুপোর ঘরে শূন্য। সেইজন্যে একদিন তাঁর মা বলেছিলেন তাঁর স্ত্রীকে, 'বউমা, তুমি আমার লক্ষ্মী। তুমি রত্নগর্ভা। তোমার বড়োমেয়ের বড়ো ঘরে বিয়ে হবে। ও-মেয়ে বেঁচে থাকলে হয়। কিন্তু...' তাঁর স্বর সহসা নেমে এল—'ছোটোমেয়েকে পার করতে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর লাগবে। ব্রজ অত টাকা পাবে কোথায়? শেষে কি ডাকঘরের তহবিল ভেঙে হাতে হাতকড়া পরবে?'

পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালোবাসত যাকে সেই মানুষের মুখে এই উক্তি! রঙ্গন তাহলে কার কাছে সহানুভূতি পাবে? তখন তার বয়স এগারো কি বারো। বোঝে সবই কিন্তু মেনে নিতে পারে না। কেন একযাত্রায় পৃথক ফল হবে? দিদি আর সে দুজনেই স্বর্গ থেকে এসেছে। ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন। তাহলে একজনকেই রাজ্যের সমস্ত রূপ উজাড় করে দিলেন কেন? একটুও পড়ে থাকল না আর একজনের জন্যে। বেচারি দু-বছর পরে এসেছে বলে কি রূপলাবণ্যের তলানিটুকুও পাবে না?

দিদির সঙ্গে একসঙ্গে বেরোতেও তার লজ্জা করত। কাঞ্চন ওই অঞ্চলের সেরা সুন্দরী। যেমন তার রূপ তেমনি তার রং। তেমনি তার গড়ন পাতলা ছিপছিপে দিঘল সরল, রজনিগন্ধার মতো শুভ্র, গোলাপের মতো পেলব, আঙুরের মতো স্বচ্ছ, শিরীষের মতো ফুরফুরে। খয়েরি চুল তার মতো আর কার আছে? নীল চোখের তারা তার মতো আর কোন মেয়ের? দিন দিন তার সৌন্দর্যের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ছে। কত লোক আসছে তাকে দেখতে। কত বাড়িতে তার জন্যে আদরের আসন পাতা! ধন্য মেয়ে কাঞ্চন।

আর রঙ্গন? অমন যার দিদি সে কিনা বেঁটেখাটো মোটা শ্যামল শুকনো খসখসে ভারী। এত ভারী যে ডানা থাকলেও সে উড়তে পারত না, পাতিহাঁসের মতো আস্তে হেঁটে বেড়াত। মনের দুঃখে সে খাওয়া একরকম ছেড়ে দিয়েছে। তবু তার ওজন কমতে চায় না। খেলাধুলা করলে কমত। কিন্তু তার বয়সের মেয়েদের খেলাধুলা বারণ। ছাড় কেবল ঘরে বসে দশ-পঁচিশ খেলা বা তাস খেলা। তখনকার দিনে মেয়েদের বাইরের খেলা কোথায়?

রঙ্গনদের ইস্কুলের পড়া শেষ হয়ে গেছল। ওটা মাইনর স্কুল। বাড়িতে বসে থাকতে তো কেউ দেবে না, সংসারের কাজে রাতদিন খাটাবে—যাতে হয় সে গৃহকর্মনিপুণা, সূচিশিল্পদক্ষা। বিয়ের বিজ্ঞাপনের ভাষায়।

ব্রজদুর্লভ কলকাতার লোক। ছুটি নিয়ে বড়োমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করতে গেলেন ও কলকাতাদুর্লভ জামাতা লাভ করলেন। ওরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদি মুতসুদ্দি বংশ। বনেদি বলে বনেদি! এখনও কলকাতার একটা রাস্তার দু-ধারে যতগুলো বাড়ি সব ক-টাই ওদের। ভদ্রমহিলারা ওপথ দিয়ে যান না, ভদ্রলোকেরা যান সন্ধ্যার পরে। দেহভাড়া হিসেবে যে-টাকাটা দেন তার সিংহের হিস্সা যায় বাড়িভাড়া হিসেবে।

ওরা কুবের আর ওদের ছেলেটা কার্তিক। কাঞ্চনের সঙ্গে রাজযোটক। এ বিবাহে সকলের মনে আনন্দ, কেবল রঙ্গন প্রাণ খুলে প্রফুল্ল হতে পারে না। ছেলেমানুষ হলেও সে এইটুকু বোঝে যে দুনিয়ায় সুবিচার কোথাও নেই, ন্যায়ধর্ম নেই। যারা ভালো তারা খেতে পায় না, তাদের মেয়েদের ভালো বিয়ে হয় না। যারা খারাপ তাদের অঢেল টাকা। তারা সুন্দরী মেয়েদের বিনা পণে বিয়ে করে নিয়ে যায়। তাদের ছেলেরাও তাই সুপুরুষ হয়। তাদের মেয়েরাও বিদ্যাধরী।

কিন্তু এর থেকে ওর সিদ্ধান্ত হল অদ্ভুত। যেমন করে হোক ওকে রূপসি হতেই হবে। রূপ যদি আসে তবে ধনসম্পদও আসবে। অভাবের ঘরে ওর বিয়ে হবে না, হবে ঐশ্বর্যের ঘরে। যার সঙ্গে হবে সে হয়তো কার্তিক নয়। কাজ নেই অমন কার্তিকে। কিন্তু সে যেন দিদির বরের চেয়ে দীনহীন না হয়। লোকে যেন বলতে পারে যে, হ্যাঁ, রঙ্গনেরও ভালো বিয়ে হয়েছে। হবে না কেন? ও-মেয়ে কি কম সুন্দর নাকি?

ঠাকুরের ওপর ওর বিশ্বাস টলেছিল। ও তাই একমনে ডাকতে লাগল পরিকে। যে-পরির গল্প ও ছেলেবেলায় পড়েছে। ও যেন সিণ্ডেরেলা। একদিন ওকেই ভালোবাসবে অচিন রাজপুত্র। পরি ইচ্ছা করলে কী-না পারে! পরির বরে রূপসি হওয়া এমন কী অসম্ভব!

রঙ্গন তাই পরিকে ডাকে। দিনরাত ডাকে। ডাকতে ডাকতে মাস কেটে যায়। বছর কেটে যায়। কেউ জানে না ওর এই গোপন কথাটি, সমবয়সিনি সখীরাও না। ওর স্থির বিশ্বাস ওর ডাক ব্যর্থ হবে না। পরির আসন টলবে। বলবে, যাই দেখি কে আমাকে ডাকছে। এসে দেখবে—রঙ্গন।

ওদিকে ওর বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যদি-বা কেউ কালেভদ্রে দেখতে আসছিল রঙ্গনকে, অচল টাকার মতো বাজিয়ে দেখে বলে যাচ্ছিল ফিরে গিয়ে খবর দেবে। খবর

আর আসেই না। রিপ্লাই পোস্টকার্ড লিখলেও না। বয়স গড়াতে গড়াতে আঠারোয় ঠেকল। ঠাকুমা বলেন তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। এখন যদি না ফোটে তো আর কোনোদিন বিয়ের ফুল ফুটবে না।

অগতির গতি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সং সাজিয়ে দেখানো হল। কিন্তু ভবি ভোলে না। ভায়রাভাই শিবপদবাবু বললেন, 'দাদা, তোমাকে একটা পরামর্শ দিই শোনো। তোমার মেয়ের যত ওজন ঠিক তত ওজনের তামার পয়সা জড়ো করে তাই দিয়ে ডার্বির টিকিট কেনো। একরাশ টিকিট কিনলে একটা লেগে যাবেই। তোমার ঘোড়া যদি ডার্বি জেতে তাহলে তোমার মেয়ের ভেড়া হতে দশ-বিশ জন বাঙালির ছেলে এগিয়ে আসবেই। তখন তুমি করবে স্বয়ংবর সভার আয়োজন।'

সমান ওজনের তামার পয়সা বলতে কয়েক হাজার চাঁদির টাকা বোঝায়। ব্রজদুর্লভ কোথায় পাবেন অত! তাঁর মেয়ে যদিও দুটি, ছেলে তো অনেকগুলি। তাদের মানুষ করতে হবে না? ভদ্রলোক কোনোরকম সুরাহা না দেখে অবশেষে ঠিক করলেন যে ডাকঘরের কেরানি শরদিন্দুর গলায় রঙ্গনের মালা পরিয়ে দেবেন।

ছেলেটি ভালো। অতি সচ্চরিত্র। অতীব সাধু। ব্রজদুর্লভবাবুর ওপর তার অগাধ শ্রদ্ধা। রঙ্গনকেও দেখে আসছে বহুদিন থেকে। তার কোনো দাবি নেই। তার দোষের মধ্যে সে পিতৃমাতৃহীন। গ্রামে পৈতৃক ভদ্রাসন আছে, কিন্তু জমিজমার শরিক একাধিক। চাকরিই ধরতে গেলে সম্বল। আর চাকরি তো শেষপর্যন্ত পোস্টমাস্টারি।

কোথায় কাঞ্চনের বর ঘর ধনদৌলত দাসীবাঁদি নফর মোটর আর কোথায় রঙ্গনের ভিখারি দিগম্বর। বিয়ের পরে থাকতে হবে কেরানিবাবুর আধখানা চালাঘরে, রাঁধতে হবে আধখানা ঝির সাহায্যে। ষষ্ঠীর কৃপাও তো হবে একদিন। তখন ছেলের জন্যে দুধ ঘি জুটবে না। সরু চালের ভাত জুটবে কি না কে জানে, যদি বিধবা বোনটোন এসে জোটে।

রঙ্গন প্রাণপণে পরির নাম জপে। ওই তার হরির নাম। পরি ইচ্ছা করলে কী-না সম্ভব! কেন তবে সে শরদিন্দু কেরানির বউ হয়ে দিদির দাসীবাঁদির সমান হতে যাবে! না, সে বিয়ে করবে না।

দুই

পরি একদিন সত্যি দেখা দিল। স্বপ্নে।

এই তো সেই পরি। সেই রূপকথার পরি। কেতাবের ছবির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। দেখছ না কেমন বড়ো বড়ো দুটি ডানা! এমন ডানা কি মানুষের হয়!

পরি বলল, 'বাছা রঙ্গন, তুমি কী চাও? কেন আমাকে অত করে ডাকছিলে?'

রঙ্গন হাঁটু গেড়ে বসে হাতজোড় করে বলল, 'পরি, আমার বড়ো দুঃখ।' আমার রূপ নেই বলে এরা আমাকে ঝি-এর মতো খাটায়। বিয়ে দিলে যার হাতে দেবে তার ঘরেও ঝি-এর মতো খাটতে হবে। আমার দিদির কেমন বড়োলোকের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। পায়ের উপর পা দিয়ে বসে থাকে, কিচ্ছু করতে হয় না। সব কাজ করে দেয় এক কুড়ি ঝি-চাকর। দিদির বাড়ির কুকুর-বেড়ালও আমাদের চেয়ে ভালো খায়, ভালো পরে। তাদেরও গরমজামা আছে, শীতকালে গায়ে দেয়। পরি, দিদির আমার এক-গা গয়না। সিন্দুকে আরও কত আছে তার লেখাজোখা নেই। আর আমার দেখছ তো? এই পারসি মাকড়ি আর সরু সরু চুড়ি। পরি, আমার তিনখানা মাত্র শাড়ি, বাইরে বেরোব কী পরে? একখানাও কি রেশমের! আর ওদিকে দেখো গিয়ে দিদির কত বড়ো বড়ো আলমারি আর তোরঙ্গ শুধু শাড়িতে পোশাকে ঠাসা। পরি, দিদির ছেলে-মেয়েদের দেখলে তোমার চোখ জুড়িয়ে যাবে। যখন যা চায় তখন তা পায়—ক্ষীর, সর, ননী, মাখন, সন্দেশ, রসগোল্লা। আর আমার যদি ছেলে হয় সেকি এক ফোঁটা দুধ খেতে পাবে ভেবেছ?'

পরি হেসে বলল, 'তাহলে তুমি কী চাও তাই বলো।'

রঙ্গন বলল, 'কী-না চাই! সব চাই। বর চাই ঘর চাই ধন চাই। কিন্তু সকলের আগে চাই রূপ, দিদির মতো রূপ। তোমার পায়ে পড়ি, ঠাকুর আমাকে যা দিলেন না তুমি আমাকে তা দাও। রূপ দাও। বর দাও। ঘর দাও। ধন দাও। জন দাও। সুখ দাও।'

পরি বলল, ‘তুমি যে আমাকে মহা বিপদে ফেললে রঙ্গন। আমি কি ভগবান না ভগবানের সমান! আমি তোমাকে সব কিছু দেব কী করে? দিলে দিতে পারি একটি জিনিস। সেটি কোন জিনিস তা তুমি ভেবেচিন্তে বলো। মনে রেখো, একটির বেশি নয়। ওই একটি নিয়ে তোমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। আর আমাকে ডাকতে পারবে না।’

রঙ্গন বলল, ‘বেশ, তবে আমাকে রূপ দাও। দিদির মতো রূপ।’

পরি বলল, ‘তথাস্তু।’ এই বলে আকাশে মিলিয়ে গেল।

রঙ্গন জেগে দেখল, কেউ কোথাও নেই। ওটা নেহাতই একটা স্বপ্ন। স্বপ্ন কি সত্যি হতে পারে! সে একটু একটু করে ভুলে গেল স্বপ্নের সব কথা।

মাস কয়েক পরে তার পিসি পশ্চিম থেকে এলেন ভাইয়ের অসুখ শুনে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেই বললেন, ‘ও কে! কাঞ্চন! তুই কবে এলি? তোর শাশুড়ি আসতে দিল? কিন্তু ও কী! তোর সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?’

রঙ্গন প্রণাম করে বলল, ‘আমাকে চিনতে পারছেন না পিসিমা? আমি যে রঙ্গন।’

পিসি বিশ্বাস করলেন না। রঙ্গন কখনো এত সুন্দর হতে পারে! ভিতরে গিয়ে বললেন, ‘রঙ্গনকে দেখছিনে কেন? আয় রে রঙ্গন, তোর জন্যে কী এনেছি দ্যাখ।’

এমন সময় রঙ্গনের মা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন, সত্যিই তো! কাঞ্চন! আরও কাছে গিয়ে চিবুকটি তুলে ধরলেন। না কাঞ্চন নয়, কিন্তু কাঞ্চনের দোসর। ‘ওমা, আমার কী হবে গো! ঠাকুরঝি তুমি জাদু জান? আমার রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হল? তোমরা কে কোথায় আছ গো, দেখবে এসো।’

অসুস্থ শরীরে উঠে এলেন ব্রজদুর্লভ। ঠাকুরঘর থেকে ছুটে এলেন তাঁর মা। বাড়ির ছেলেরা যে যেখানে ছিল হইচই করে এল। সবাই দেখল রঙ্গন কেমন করে কাঞ্চন হয়ে গেছে। অবশ্য বেমালুম এক নয়। বোঝা যায় এ রঙ্গন। এর বয়স কম, এ কুমারী।

তখন সে যে কী উল্লাস তা বলবার নয়। ঠাকুমা বললেন, ‘আমিই তোদের সকলের আগে লক্ষ করেছি! করেছি অনেক দিন। ও যা হয়েছে একদিনে হয়নি। তাহলেও মানতে হবে এমনটি আমার জীবনে আমি দেখিনি।’

পিসিমা বললেন, ‘এ যেন গুটিপোকা থেকে প্রজাপতি।’

মা বললেন, ‘থাক থাক, বলতে নেই। মেয়ের যা কপাল, সইলে হয়!’

বাপ বললেন, ‘ওকে আমি কলকাতা নিয়ে যেতে চাই। ওর উপযুক্ত বর এখানে বসে থেকে মিলবে না। ছুটির দরখাস্ত লিখে দিচ্ছি। ওরে, একটা টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে আয় তো রে!’

কলকাতায় রঙ্গনের জন্যে চেষ্টা চলতে লাগল। একদিন খুব মজা হল। কাঞ্চন তাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে। সে তার দিদির খোকাখুকুদের সঙ্গে খেলা করছে। এমন সময় জামাইবাবু এসে ডাকলেন, ‘কাঞ্চি, শোনো তো।’

রঙ্গন বলল, ‘বা! আমি কাঞ্চি হতে গেলুম কবে! আমি যে রঙ্গন।’

জামাইবাবু বললেন, ‘রঙ্গন! কী আশ্চয্যি! আমারই চিনতে ভুল হয়!’

তারপর কাঞ্চন এসে পড়ল। তখন জামাইবাবু ওর সামনেই ওর বোনকে আদর করে বললেন, ‘ছোটোগিন্নি।’ রসিকতা করে বললেন, ‘বড়োগিন্নি না থাকলে বড়োগিন্নির কাজ ছোটোগিন্নি চালাতে পারবে।’

এরপরে আপনার স্বার্থে কাঞ্চনের কর্তব্য হল বোনকে পাত্রস্থ করা। চেষ্টা করতে করতে মনের মতো বর পাওয়া গেল ক্ষৌণীশচন্দ্রকে। উঁচু পায়াওয়ালা সরকারি কর্মচারী। বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে প্রমোশনের সাধনায়। তবে তাঁকে দেখলে চল্লিশ বলে মনে হয় না। আর হলেই-বা কী আসে-যায়! রঙ্গনও তো ডাগর হয়েছে। বাঙালির মেয়ে কি অত লম্বা হয়! যে-ই দেখবে সে-ই বলবে পাঞ্জাবি কি কাশ্মীরি। পাতলা ছিপছিপে হালকা ফুরফুরে। রজনিগন্ধা। গোলাপ। আঙুর। খয়ের। সেইসব উপমানের সঙ্গে উপমেয়।

ক্ষৌণীশচন্দ্র মনের মতো বউ পেয়ে গেলেন। তিনি যে এতদিন অবিবাহিত ছিলেন এ যেন রঙ্গনেরই প্রতীক্ষায়। যে তাঁর মানসী বধূ। যাকে তিনি কোথাও খুঁজে পাননি। পেলেন এতদিন পরে। আকস্মিক ভাবে।

বিয়ের পর রঙ্গন তার স্বামীর সঙ্গে পুনা চলে যায়। এমনিতেই সে গৃহকর্মনিপুণা, তার ঘরসংসার সে অল্পদিনের মধ্যে বুঝে নিল। চাকরগুলো দু-হাতে লুট করছিল। বাজারখরচ নাকি দিনে দশ টাকা। দশ টাকার নোটের একটা টাকাও বাজার থেকে ফিরত না। রঙ্গন সেটাকে চোখ বুজে করে দিল পাঁচ টাকা। তার থেকেও ফিরতে লাগল বারো-তেরো আনা। নইলে নোকরি ছুটে যাবে। দেখাশোনা করত রঙ্গন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। তাই রান্নার স্বাদ বদলে গেল। ক্ষৌণীশ বললেন, 'মা বেঁচে থাকতে খেয়েছিলুম মনে পড়ে। তারপর এই খাচ্ছি। মাঝখানের পনেরো বছর অনাহারে কেটেছে।'

কিন্তু পড়াশুনো তো সে সামান্যই করেছে। অত বড়ো সরকারি আমলার ঘরে মানাবে কেন? তাই তার জন্যে গভর্নেস বহাল হল। খাস ইংরেজ মেমসাহেব। বুদ্ধিমতী মেয়ে। চটপট শিখে নেয় আর মনে রাখে। বছর দুই যেতে না যেতে দেখা গেল সে ইংরেজের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছে। কোথাও এতটুকু বাধছে না। কী চমৎকার উচ্চারণ! তবে সে বিদ্বানদের সঙ্গ পারতপক্ষে এড়ায়। তর্কবিতর্কের ধার দিয়ে যায় না। অতিথিরা গম্ভীরভাবে আলোচনা করছেন দেখলে সেলাইয়ের কাজ হাতে নিয়ে বসে। চোখ তুলে তাকায় না।

তারপর স্বামীর সঙ্গে একবার বিলেত ঘুরে আসতেই তার আদিপর্ব সাত সমুদ্রের জলে ভেসে গেল। যে সমাজে সে মিশত সে-সমাজ তাকে জাতে তুলে নিল। সে না হলে পার্টি জমবে না। তাই নিত্য নিমন্ত্রণ। সে না হলে নাচ জমবে না। তাই অবিরাম সাধ্যসাধনা। বিস্তর খোশামোদ শুনতে হয় তাকে। তাতে যে তার মাথা ঘুরে যায় না এর কারণ সে তার দীনহীন অবস্থার দিনগুলি ভোলেনি, তাই অহংকারী হয়নি।

তার একটা মস্ত গুণ সে সাধারণ গৃহস্থের পরিবারে আসা-যাওয়া করে, অসুখের সময় ফলমূল কিনে দেয়, সুখের দিনে ফুল কিনে উপহার দেয়। সকলের সঙ্গেই সহৃদয় ব্যবহার করে, হোক-না কেন গরিব কেরানি। শরদিন্দুকে সে বিয়ে করেনি বটে, কিন্তু তার মতো মানুষই-বা ক-টা দেখেছে বা দেখছে! মনুষ্যত্ব তার নতুন সমাজে বিরল।

মাঝে মাঝে তার ভীষণ মন কেমন করত মা-বাবার জন্যে। ঠাকুরমার জন্যে। ভাইগুলির জন্যে। কিন্তু ফিরে যাবার পথ খোলা ছিল না। সে গেলে তারা ওকে রাখবে কোথায়? অত বড়ো লোকের রানিকে! তারাও যে আসবে তা নয়। পুনা অনেক দূর। খেটে-খাওয়া লোকের অত সময় কোথায়? আর খরচাই-বা জামাইয়ের সংসার থেকে নেবে কেন?

একমাত্র কাঞ্চনের সঙ্গেই তার সমতা। কিন্তু কাঞ্চন কিছুতেই তাকে ডাকবে না, ছোটোগিন্নির ওপর কর্তার যা নেকনজর...! সেও কাঞ্চনকে আসতে বলবে না। ভিতরে ভিতরে বেশ একটু রেষারেষির ভাব। দিদির বোন বলেই তুলনায় রূপহীন দেখাত, নইলে কি কেউ কখনো মা-বাপ তুলে মন্তব্য করত? ডানাকাটা পরির সঙ্গে না দেখলে কেউ কখনো মিল দিয়ে বলত না যে ডানাকাটা বানরী। এখন অবশ্য সেও সমান সুন্দরী, সমান উচ্চ। তাহলেও কাজ কী দিদিকে ডেকে এনে? এ যেন খাল কেটে কুমিরকে ডেকে আনা। এদিকে কর্তারই হয়তো আফশোস হবে কী ভুলই করেছি বড়োগিন্নিকে বিয়ে না করে!

কিন্তু একদিন এক অঘটন ঘটল। স্বামী কার সঙ্গে বিলেত পালিয়ে যাচ্ছে বলে বম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করে এল কাঞ্চন। ট্রেন থেকে টেলিগ্রাম করল রঙ্গনকে ক্ষৌণীশকে। এরা দুজনে জোরসে মোটর ছুটিয়ে দিল। ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে খাড়া থাকল ক্যালকাটা মেল কখন আসে। কাঞ্চন নামল, তার কোলের ছেলেটি নামল, আয়া নামল, বেয়ারা নামল। কিন্তু পাখি দুটি উড়ে গেছে, ওদের 'কূপ' খালি। বনবন করে ফ্যান ঘুরছে। বার্থের গায়ে কার্ড আঁটা—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস আর সি রায়।

বেচারি কাঞ্চন! মণিহারা ফণী। পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর হাজার হাজার অচেনা লোকের সামনে। রঙ্গন তাড়াতাড়ি স্বামীর সঙ্গে কী পরামর্শ করল। স্বামী তৎক্ষণাৎ মোটরে করে অদৃশ্য হয়ে

গেলেন। গন্তব্য পুলিশ হেডকোয়ার্টাস। দুই বোনে সদলবলে চলল তাজমহল হোটেলে।

তিন

এতক্ষণ যা বলা হল তা গৌরচন্দ্রিকা। এরপরে আসছে আসল গল্প।

ক্ষৌণীশকে অনেক পেট্রোল পোড়াতে হল। পুলিশকেও তাঁর খাতিরে কম নয়। জুহুতে ওদের আবিষ্কার করা হল। কিন্তু গ্রেপ্তার করবে যে—কী অপরাধে?

পাসপোর্ট চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল মিসেস রায়ের চেহারা মিসেস রায়েরই মতো। অর্থাৎ রায়ের সঙ্গে যিনি ছিলেন তাঁরই ফোটো আঁটা।

'এক্সকিউজ মি। আপনি কি মিসেস কাঞ্চনমালা রায়?' পুলিশের প্রশ্ন।

'আমিই।' ভদ্রমহিলার উত্তর।

এর উপর আর কথা চলে না। পুলিশ তো ভিজে বেড়ালের মতো পাসপোর্টখানা ফেরত দিয়ে তোবা তোবা করে সরে পড়ল। ক্ষৌণীশ ধরা পড়ে গেলেন। রমেশ শাসিয়ে বলল, 'দেখে নেব। আমার স্ত্রীকে পুলিশ ডেকে এনে আমার স্ত্রী নয় বলে অপমান!'

সত্যি, কাজটা ঠিক হয়নি। ক্ষৌণীশ বোকা বনে গেলেন। রমেশ যে অত বড়ো পাষন্ড হবে তা তিনি কল্পনাও করেননি। পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে যার ফোটো দাখিল করেছে সে কোনোকালেই কাঞ্চনমালা নয়। সে কাঁকনমালা। কাঞ্চনমালার দাসী। দু-পাতা ইংরেজি পড়েছে, সাজগোজ করতে শিখেছে, চেহারায় রস আছে। এখন বিলেত গিয়ে অম্লাবদনে কাঞ্চনমালা রায় বলে পরিচয় দেবে, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সই করবে, একরাশ দলিল সৃষ্টি করবে। পরে এই নিয়ে আইন আদালত করতে হবে। কোর্টে দাঁড়াতে হবে দুই নারীকে। কে যে কাঞ্চনমালা আর কে যে কাঁকনমালা সাক্ষীপ্রমাণ নিয়ে সাব্যস্ত করতে হবে বিচারপতিকে। আর একটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা।

জাহাজ ছেড়ে দিল। কেউ আটকাতে সাহস পেল না। জাহাজঘাটে যাবে বলে জেদ ধরেছিল কাঞ্চন। সে নাকি সাহেবকে বুঝিয়ে বলবে যে সে-ই সত্যিকার কাঞ্চনমালা। ওটা মিথ্যেকার কাঁকনমালা। ওর প্রকৃত নাম বিল্বদা। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ি। সাহেব যে কোন সাহেব তা সে জানে না, কিন্তু সাহেব যখন-তখন নিশ্চয় সুবিচার করবে, সাহেব জাতটার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

ক্ষৌণীশ তাকে কোনোমতে নিরস্ত করতে না পেরে শুধু এই কথাটুকু বললেন, 'সাহেব যদি দাবি করে যে ক্যাবিন যখন রিজার্ভ হয়েছে তখন যার নাম কাঞ্চনমালা তাকেই জাহাজে করে বিলেত যেতে হবে, তো উঠবেন আপনি জাহাজে?'

'না না, আমার বাছাদের ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।' কেঁদে ফেলল কাঞ্চন। সে কী কান্না! ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ফুলে ফুলে হাত পা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কান্না।

'আপনি না গেলে আপনার জায়গায় যেতে হয় আর একজনকে। কাঞ্চন সাজতে হয় রমেশের সহযাত্রিণী হতে। ও বোধহয় একা যেতে ভয় পায়।'

রঙ্গন চোখ টিপে স্বামীকে নিরস্ত করল। ভদ্রলোকের আড্ডা দেওয়া অভ্যাস। আমুদে লোক বলে সর্বত্র জনপ্রিয়। প্রোমোশনের সেটাও একটা সংকেত।

বম্বে থেকে ওরা পুনা গেল সবাই মিলে। কাঞ্চনের বুক ভেঙে গেছে। এবং রঙ্গন লক্ষ করে অবাক হল যে রূপ উবে গেছে।

'দিদি, তোর রূপ গেল কোথায়?'

'আমার রূপ! আমার রূপ আমি সাত ভাগ করে সাত ছেলে-মেয়েকে দিয়েছি আর দিয়েছি তাদের বাপকে। ও কার্তিক ছিল। কন্দর্প ছিল না। আমার রূপ নিয়ে হয়েছে কন্দর্প। ও এখন আমার দেওয়া রূপ দেবে কাঁকনকে—আমার বাঁদিকে। দিনে দিনে সুন্দর হবে কাঁকন। আমার ছোঁয়া দিয়ে সুন্দর। যে ছিল দাসী সে হবে রানি। যে ছিল রানি সে হবে দাসী।'

রঙ্গনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করল এই উক্তি। মেয়েরা বিজ্ঞ হয় মেয়েদেরই অভিজ্ঞতা শুনে। পুরুষের পুথি পড়ে নয়।

মাত্র সাতাশ বছর বয়সে কাঞ্চনের সব সুখ ফুরিয়ে গেল। এখন তাকে বাঁচতে হবে তার বাছাদের মুখ চেয়ে। নইলে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ত, গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ত, বাজার থেকে আফিং কিনে এনে খেত, কেরোসিন মেখে আগুন ধরিয়ে দিত, বিছানার চাদর ছিঁড়ে গলায় দড়ি দিত। বাঁদি হবে রানি। রানি হবে বাঁদি। ও হো হো!

'রানি, আমার কী বুদ্ধি ছিল! রূপ থাকলে কী হবে, বুদ্ধি না থাকলে কিছুই থাকে না। না স্বামী, না সম্মান, না সম্পদ। আমি সোজা মানুষ। আমার ধারণা ছিল স্বামীকে যতগুলি সন্তান দেব তত বেশি ভালোবাসা পাব। সাতটি সন্তান দিয়ে সাত পাকে জড়াব। কই, তা তো হল না রে! গেল আমার রূপ। সেইসঙ্গে স্বামীর ভালোবাসা। ও হো হো!'

দিদিকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে রঙ্গন ভাষা খুঁজে পেল না। গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকল। আর ভাবতে লাগল নিজের ভবিষ্যৎ।

'এমন হবে যদি জানতুম তাহলে কি আমি সাধ করে মা হতে যাই। হলে হতুম এক বার কি দু-বার। আজকাল শুনি কতরকম নতুন নতুন উপায় বেরিয়েছে। দিদিমাদের মতো সাপখোপ খেতে হয় না। আমার শ্বশুরবাড়িতেই ক-টি বুড়ি পাগল। কী-সব খাওয়া হয়েছে লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাকেও সিঁদুরের মতো লাল লাল কী একটা এনে দিয়েছিল, খাইনি। এনে দিয়েছিল ওই কাঁকন। ওই বিল্বদা। খেলে বাঁচতুম না রে!'

রঙ্গন এর মধ্যে রঙিন হয়েছিল। বলল, 'আমাকে চিঠি লিখিসনি কেন? আমার গভর্নেস আমাকে প্রথম থেকেই সাবধান হতে শিখিয়েছে। আমার তো হয় না।'

তাই তো। এটা কোনোদিন কাঞ্চনের মাথায় আসেনি। তার ধারণা ছিল রঙ্গন ঠাকুরদেবতা মানে না বলেই তার হয় না। মা ষষ্ঠীর রোষ।

'তা বলে কি একেবারেই হবে না রে?'

'হবে বই কী। আগে তো জীবনটাকে উপভোগ করি। পঁচিশ বছর মাত্র বয়স। এ বয়সে মা হলে আমার ডানা কাটা পড়বে যে।'

'ও, তুই বুঝি ডানাওয়ালা পরি?'

'কেন? হতে দোষ কী? পরিদের ডানা থাকে কে না জানে? সেইটেই তো স্বাভাবিক। ডানাকাটা পরি শুনে শুনে তোর মাথা ঘুরে গেছে, তাই তুই বুঝতে পারিসনে যে ওতে পুরুষদেরই সুবিধে। ডানা দুটি কেটে রেখে তোকে ওড়বার অযোগ্য করে তোলা হয়েছে। নইলে ওর সঙ্গে এক জাহাজে বিলেত যাবার কথা তো সত্যিকার কাঞ্চনেরই। তুই উড়তে জানিসনে তো উড়োপাখির সঙ্গে উড়বি কী করে! পুরুষ তো উড়োপাখি এটাও কি জানতিসনে?'

কাঞ্চন ধিক্কার দিয়ে বলল, 'বিল্বদা উড়ল। উড়বে বলেই বুঝি তিন-তিন বার মা হতে হতে মা হল না। আমি পারতুম না রে! আমার ডানাকাটা বলে আমার দুঃখ ছিল না। তবু তো পরি ছিলুম লোকের চোখে। এখন যে বানরী! ও হো হো!'

তা নেহাত ভুল বলেনি দিদি। রঙ্গনের মনের কথাটা কেমন করে দিদির মুখে এসেছে। এতকাল পরে শোধবোধ হল ইস্কুলের সেই ডানাকাটা পরি ও ডানাকাটা বানরী বলে অন্যায় তুলনার। ওরে তোরা আয় রে ইস্কুলের ছুঁড়িরা, দেখে যা কে পরি, কে বানরী। এখন যে পরি সে ডানাওয়ালা পরি। আরও এক কাঠি সরেস।

কাঞ্চন তার আর-সব খোকা-খুকুদের কলকাতায় ফেলে এসেছিল। কোলেরটিকে নিয়ে আর কদিন ভুলে থাকা যায়! ওরা চিঠি লিখেছে, মা, তুমি জলদি এসো। তোমার জন্যে মন কেমন করছে। তা পড়ে কাঞ্চনের

চোখে কোটালের বান ডাকল। আরব্য উপন্যাসের মায়া সতরঞ্চ পেলে সে দু-দিন দু-রাত্রের পথ দু-দন্ডে পার হত। তা যখন নেই তখন রেলগাড়িতেই উঠে বসতে হল।

দিদিকে বিদায় দিয়ে এসে রঙ্গনের প্রথম কাজ হল মেডকে নোটিস দেওয়া। মেড কথাটা ইংরেজি হলেও মানুষটি কোঙ্কনি। সবরকম গৃহকর্মে সাহায্য করত। রঙ্গনের প্রসাধনের পশ্চাতে থাকত তারই অদৃশ্য হস্ত। বয়স হয়েছে, বিয়ে হয়েছিল স্বামী মারা গেছে। নিঃসন্তান। এতদিন তাকে সন্দেহ করেনি, সন্দেহের উপলক্ষ্য ঘটেনি। এই প্রথম মনে হল যে সন্দেহ না করাটাই ভালোমানুষি। একদিন সে-ই হয়তো সাজবে রঙ্গনমালা দাস।

রঙ্গন তাকে বুঝিয়ে বলল যে আর্থিক অবস্থা মেড রাখতে অনুমতি দিচ্ছে না, মেড বলে কেউ থাকবে না, পদটাই ছাঁটাই হবে। যাঁরা মেড রাখতে পারেন তাঁদের নামে চিঠি লিখে দেওয়া হচ্ছে সুপারিশ করে। লেডি কারসেটজি একবার জানতে চেয়েছিলেন কে অমন সুচারুরূপে সাজায়। তিনি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দেবেন। ভয় নেই। ধন্যবাদ।

মেড চলে যাবার পর মনটা ফাঁকা হয়ে গেল। ছিল একটি সঙ্গিনী, যার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি হত। এখন এমন একটিও মেয়েমানুষ রইল না যে অসুখেবিসুখে সেবা করবে বা কাছে বসবে। বান্ধবীরা যদি দয়া করে আসে তবে সেটা হবে দয়ার দান! তার ওপর নির্ভর করা যায় কি? দূর সম্পর্কের কোনো এক বিধবা আত্মীয়াকে আনিয়ে নিলে মন্দ হত না। কিন্তু বয়স্ক হওয়া চাই। স্বামীর চেয়েও বয়স্ক।

এই সূত্র ধরে পিসি এসে পড়লেন। থাকতেই এলেন। সঙ্গে একটি ছেলে। চাকরির খোঁজ করবে তা করুক। মেয়ে তো নয়। অরক্ষণীয়া কন্যা হয়ে থাকলে পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করা হত। অত ভালোমানুষি ভালো নয়। দু-চার হাজার টাকা খরচ করে বিয়ে দেওয়া তার চেয়ে ভালো। আর্থিক অবস্থা অনুমতি দিতে পারে।

চার

মারাঠা মেয়েদের মতো মাথায় কাপড় নেই, খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো। আর-সব বাঙালি মেয়ের মতো, ওরই নাম রঙ্গন। ওর সঙ্গে ওর স্বামী ক্ষৌণীশ। সাহেবদের মতো ডিনার পোশাক পরা। ফিরছিল দুজনে বিলিমোরিয়াদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে। আধ মাইলটাক রাস্তা, তাই মোটর ছেড়ে দিয়ে পায়ে হাঁটছিল যাতে খানা হজম হয়। চাঁদনি রাত, তেমন শীত নেই। পথ প্রায় ফাঁকা।

‘শুনলে তো কী বলছিল বিলিমোরিয়া তার মিসেসকে?’

‘কী বলছিল?’

‘বলছিল...’

‘চুপ করে গেলে যে? বলো।’

‘বলছিল তোমাকে লক্ষ করে নয়, মিসেস গুপ্তকে লক্ষ করে।’

‘কী বলছিল বলো-না?’

বলছিল, ‘দেখছ তো মিসেস গুপ্তকে। কেমন গ্রেসফুল ফিগার। কেমন ভরাট গড়ন। কেমন পরিপূর্ণ নারীত্ব।’

রঙ্গন উপহাস করে বলল, ‘পরস্ত্রীর প্রশংসা করতে পঞ্চমুখ কি শুধু বিলিমোরিয়া? না তার জবানিতে আর কোনো পুরুষ?’

‘আরে না না, এ কি আমার উক্তি? আমি কি বানিয়ে বলছি? সাক্ষাৎ ঘোড়ার মুখ থেকে শোনা। বিলিমোরিয়া তার স্ত্রীকে বলছিল, শুনে এসে আমি আমার স্ত্রীকে বলছি। কেন বলছি তার একটু রহস্য আছে।’

‘রহস্য! শুনি কী রহস্য!’

'বাকিটুকু বললে আপনি বুঝতে পারবেন। বিলিমোরিয়ার বক্তব্য হল, যে-নারী মা হয়েছে সে-ই অমন পরিপূর্ণা হতে পারে। কটাক্ষটা মাতৃত্ববিমুখ রূপসিদের বিরুদ্ধে, যেমন মিসেস বিলিমোরিয়া। এ অঞ্চলের সেরা সুন্দরী...' এই পর্যন্ত বলে ক্ষৌণীশ তৎক্ষণাৎ কথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে জুড়ে দিলেন, 'নন যদিও।'

রঙ্গন কটমট করে তাকাল। 'সরি। আমার ধারণা ছিল তুমি পরস্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখ না। মিসেস বিলিমোরিয়া নাকি সেরা সুন্দরী! মিসেস গুপ্ত নাকি পরিপূর্ণা নারী। গ্রেসফুল বলছিলে। না, আমি বলি ডিসগ্রেসফুল।'

দাম্পত্যকলহ শয়নকক্ষে নয়, রাজপথে। ক্ষৌণীশ সেই যে চুপ মেরে গেলেন, আর একটি কথাও মুখ থেকে বার করলেন না। আর রঙ্গন সেই যে বকম বকম শুরু করল তা চড়া গলায় না হলেও স্বামীর কানে হাতুড়ি পেটার মতো পটহবিদারক।

ক্ষৌণীশ বেচারার বয়স হল ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ। আর আট-নবছর বাদে রিটায়ারমেন্ট। ছেলে হলে তাকে মানুষ করবেন কবে? সেইজন্যে তিনি কখনো উচ্চবাচ্য করতেন না। মনের খেদ মনে চেপে রাখতেন। কথাটা আজকেও তুলতেন না। বিলিমোরিয়া তুলেছিল বলে তিনি ও-প্রসঙ্গ স্ত্রীর কানে পৌঁছে দিলেন সংবাদদাতার মতো।

বিছানায় গিয়ে রঙ্গন কান্নাকাটি করল। কেন কাঁদছে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিল না। মুখ ফিরিয়ে থাকল। ক্ষৌণীশ বার বার মাফ চাইলেন। নাকে কানে খত দিলেন। কিছু হল না। শেষে তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে কপট নিদ্রায় নাক ডাকাতে লাগলেন।

রঙ্গন বলল, 'ওগো শুনছ?'

উত্তরে নাক ডেকে উঠল—ঘ-র-র-র।

'শুনবে?'

ঘ-র-র-র।

'ওগো শোনো।' ভারি মোলায়েম সুর।

ক্ষৌণীশ বললেন, 'কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে। মিসেস বিলিমোরিয়া সুন্দরী নন। মিসেস গুপ্ত গ্রেসফুল নন। মিসেস দাস মিস ইন্ডিয়া। কেমন, হল তো?'

রঙ্গন অনুতপ্ত হয়ে বলল, 'সত্যি, আমি খুব দুঃখিত। তোমার মনে কী ছিল আমি কেমন করে জানতুম? কোনোদিন তো আভাস দাওনি। তুমি কি চাও যে আমাদের একটি খোকা হয়?'

'না না, আমি চাইব কেন? আমার কি আর চাইবার বয়স আছে? চাইলে তুমি চাইবে। চাও তো আর দেরি কোরো না। মানুষের সন্তানকে মানুষ করতে কমপক্ষে ষোলো বছর লাগে। আমাদের স্তরে আরও চার বছর কি ছ-বছর।'

রঙ্গন অত জানত না। জানলেও বুঝত না। কখনো ভেবে দেখেনি। তার একমাত্র ভাবনা তার রূপ তাজা থাকবে না শুকিয়ে যাবে? মা হলে কি সে এমনি তন্বী থাকবে না তার ফিগার নষ্ট হয়ে যাবে? পরি তাকে যে বর দিয়েছে সে-বরের দৌলতেই-না সে এ বর পেয়েছে। যদি রূপহীনা হয় তাহলে পতির প্রেম চলে গেলে এ জীবনে আর কী থাকে? কী নিয়ে বাঁচবে?

তা বলে কি সে কোনো দিন মা হবে না? কোনো দিন না?

হবে না এমন ধনুর্ভঙ্গ পণও সে করেনি। করার উপলক্ষ্য ঘটেনি। স্রেফ গড়িমসি করছে। মাতৃত্বকে বছরের পর বছর পেছিয়ে দিয়েছে। মাত্র পঁচিশ বছর তার বয়স। আরও দশ বছর অপেক্ষা করলে কী এমন ক্ষতি! ততদিন তো স্বামীর ভালোবাসা নিশ্চিতরূপে পাবে। তারপরে ও-ভদ্রলোকেরও অপর প্রেমের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে।

মনটাকে তৈরি করতে সময় লাগে। বিশেষ করে এত বড়ো গুরুতর একটা পদক্ষেপের পূর্বে। অন্য কেউ হলে সেই রাত্রেই মনস্থির করে ফেলত। কিন্তু রঙ্গনের অতীত জীবন রূপহীনতার জ্বালায় জর্জর। আর তার

দিদির নজির তো তার চোখের সুমুখে বর্তমান। দেখেছে তো কাঞ্চনের মতো পরিকে মাতৃত্বের পাকচক্রে পড়ে রূপরিক্তা হতে, পতিপরিত্যক্তা হতে। ডানাকাটা পরির সমস্যা যদি অত কঠিন হয়ে থাকে তবে ডানাওয়ালা পরির সমস্যা কি আরও কঠিন নয়? তার গতিবিধি বন্ধ হয়ে যাবে না? সে কি পারবে বাইরে কোথাও বেরোতে? শিশু তাকে বাড়িতে কয়েদ করে রাখবে না? শিশুর বাপ কিন্তু ওদিকে অবাধে ফুর্তি করে বেড়াবেন। আমুদে মানুষ, আমোদ করা তাঁর চাই-ই। আমোদ করতে করতে প্রমোদ। প্রমোদ করতে করতে প্রমাদ।

অবশেষে একদিন মহিলামহলে কানাঘুসো চলল যে রঙ্গন ধরা পড়েছে। কেউ বললেন, প্রকৃতির সঙ্গে জারিজুরি খাটে না। রেখে দাও তোমার পদ্ধতি প্রক্রিয়া। কেউ বললেন, এইবার ওর পায়ে বেড়ি পড়ল। উড়নচণ্ডী এখন ঘরে অন্তরিন। কেউ বললেন, আহা! বেচারির অমন রূপ পরে ছায়া হয়ে যাবে।

রঙ্গনের বান্ধবীরা তার সঙ্গে দেখা করে রসিকতা করলেন—'এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। এই যেমন মোটর অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি চেয়েছিলে প্লেজার ট্রিপ। হয়ে গেল ল্যাণ্ড স্লিপ!'

এটা সত্য নয়। রঙ্গন চেয়েছিল স্বামীকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত সন্তান দিতে। সে তাঁকে বাজিয়ে দেখেছিল যে তিনি গত ছ-বছর কাল এই দিনটির জন্যে প্রতিক্ষা করছেন। তবু মুখ ফুটে জানাবেন না, পাছে রঙ্গন তার স্বাধীন ইচ্ছায় না হয়ে অনিচ্ছায় মা হয়।

সেকালে নাকি খোকারা আকাশ থেকে নেমে আসত। একালে কেন তা হয় না? তাহলে তো মায়েদের অশেষ কষ্ট বাঁচত, রূপ নষ্ট হত না। রূপ চলে গেলে যা হয়, স্বামীর প্রেম চলে যেত না। রঙ্গন বুঝতে পারে না কেন তাকে দশ মাস অসুস্থ হতে হবে। কেন তার প্রাণ বিপন্ন হবে। বিধাতার এটা কোনদেশি বিচার? খোকা খোকা বলে ডাক দিলুম আর অমনি আকাশ থেকে খোকা নেমে এল আমার কোলে। কী মজা! তা নয়, অসহ্য দুর্ভোগ আর অসীম দুর্ভাবনা একটি শিশুর জন্যে।

যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। খোকা নয়, খুকু। ক্ষৌণীশ তো কোলে তুলে নিয়ে নাচতে চাইলেন। নার্স তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মায়ের কাছে দিল। মা তখন ভাবছে শিশুর জন্যে নয়, নিজের জন্যে। রূপ তার পাত্রান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট যা আছে তা গর্ব করবার মতো নয়। মিলিয়ে দেখলে ক্ষৌণীশ যেমনকে তেমন নয়। পরি থেকে বানরীর বিবর্তনমার্গে এক কদম এগিয়ে।

পাঁচ

পুরুষ যেমনকে তেমন। নারী যেমনকে তেমন নয়। এক যাত্রায় পৃথক ফল। কী অন্যায়! কী অবিচার! ভগবানের রাজত্বে এমন অধর্ম! তাহলে ভগবানকে ডেকে কী হবে! তিনি পুরুষের দিকেই ঢলবেন।

রঙ্গন আবার পরিকে ডাকতে আরম্ভ করল। সেই দয়াময়ী পরিকে, তার রূপদা সুখদা বরদা প্রেমদা পরিকে। পরির জন্যেই তো সব।

রঙ্গন একমনে ডাকতে থাকল পরিকে। আকুল হয়ে। ব্যাকুল হয়ে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। অবশেষে পরির আসন টলল। পরি আবার দেখা দিল স্বপ্নে।

পরি বলল, 'রঙ্গন, কী হয়েছে বাছা?'

রঙ্গন বলল, 'পরি, আমার বড়ো দুঃখ। রূপ চলে যাবে বলে আমি মা হতে চাইনি। কী করি, স্বামীর মনে আফশোস। ওঁকে সুখী করতে গিয়ে আমার সর্বস্ব যেতে বসেছে। আমার রূপই তো আমার সর্বস্ব। আমার রূপ না থাকলে আমি কী! ডানাকাটা বানরী! হায়, হায়! আমার কপালে শেষকালে এই ছিল। বরং সুন্দরী না হওয়া ভালো তবু একবার সুন্দরী হয়ে তারপরে অসুন্দর হওয়া ভালো নয়। এখন যে দুনিয়া হাসবে। পরি, তোমাকে বলতে আমার লজ্জা করে, কিন্তু না বললে কি তুমি বুঝবে? আমার তলপেট এতদিনেও সমান হল না। একটুখানি ফুলে রয়েছে। ওই একটুখানির জন্যেই আমার ফিগার মাটি হল। কী দিয়ে ঢাকা দিই, বলো তো? বিজ্ঞান এখানে নিরুপায়। তারপর আমার বুক এখন বিশাল আর ভারী আর ক্ষীর দিয়ে ভরা। শিশুর ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু জননীর দুর্ভাগ্য। আমি তো ভয়ে মাই দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছি। দিলে বেশ আরাম,

কিন্তু টেনে টেনে শেপ নষ্ট করে দেবে। যা দুরন্ত মেয়ে! পরি, আমার মেয়েকে আমি খুবই ভালোবাসি। তার জন্যে না-পারি এমন কাজ নেই। কিন্তু সে কি তা বলে আমার সর্বনাশ করবে? পিসি বলছে এটাই নিয়ম। আমি বলছি, এই যদি নিয়ম হয় তবে বাপ কেন এ নিয়মের আমলে আসে না? বাপ তো যেমনকে তেমন। এ লোকটি সত্যি বড়ো ভালো, পত্নীগত প্রাণ। কিন্তু পড়বে তো দু-বছর পরে কোনো ডাকিনীর পাল্লায়। অমন আমি ঢের দেখেছি। বউয়ের যতদিন মৌ থাকে ততদিন বউ বউ বউ। মৌ ফুরোলে দৌড়। পিসি বলছে, এর কোনো পেরতিকার নেই। আমি বলছি, প্রতিকার থাকতে বাধ্য। পরি, সেইজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।'

পরি বলল, 'প্রকৃতির নিয়ম উলটে দিতে পারি সে-ক্ষমতা কি আমার আছে? আমি প্রকৃতির আনুকূল্য করতে পারি, প্রতিকূলতা করতে পারিনে। তোমার স্বামীকে তুমি প্রেম দিয়ে জয় করো। তাহলে তোমার কোনো দুঃখ থাকবে না। রঙ্গন, তোমার কন্যাকেও তুমি স্নেহ দিয়ে জয় করবে। এই তার সুযোগ।'

রঙ্গন রাগ করে বলল, 'পরি, তুমি ইচ্ছা করলে সব পার, তবু করবে না। আমার যে কী দুঃখ তোমাকে বলা বৃথা। তুমি তো মানুষ নও। তোমার হৃদয় নেই।'

পরি হেসে বলল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। তোমার কী চাই এককথায় বলো দেখি।'

রঙ্গন বলল, 'যেমনকে তেমন। আমি চাই যেমনকে তেমন হতে। যেমনকে তেমন থাকতে। মা হয়েও যেমনকে তেমন। তেমনি সুন্দরী, তেমনি সুমধ্যমা, তেমনি সুরক্ষা।'

পরি বলল, 'কিন্তু এর একটা বিপদ আছে। তোমাকে সতর্ক করে দিই। এ জগতে জীবন্ত বলতে যা-কিছু আছে তার বিকাশ আছে, বিকাশ নেই যার সে সজীব নয়। তোমাদের বাড়িতে যে ছবি আছে সে-ছবি চিরদিন একইরকম থাকবে, কারণ সে নির্জীব। তুমিও কি তোমার স্বামীর গৃহে ছবির মতো শোভা পেতে চাও। তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা? রঙ্গন, কে তোমাকে ভালোবাসবে? কোন জীবনময় পুরুষ?'

রঙ্গন বলল, 'সে ঝুঁকি আমার। তুমি তো আমাকে যেমনকে তেমন করে দাও।'

পরি বলল, 'তথাস্তু।' এই বলে মিলিয়ে গেল।

ঘুম থেকে জেগে রঙ্গন যখন আয়নার সামনে দাঁড়াল তখন তার মুখে হাসি ধরে না। সব ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। পরির দয়া হলে কী-না সম্ভব!

তখন সে পিসির কাছে খুকুকে দিয়ে আগের মতো আবার বাইরে যেতে শুরু করল। সবাই দেখে অবাক। মা হয়েছে কিন্তু তার কোনো ছাপ নেই তার চেহারায়, তার গড়নে, তার চলনে। রঙ্গন তো রঙ্গন। যেমনকে তেমন। তাকে নিয়ে একটা লেজেণ্ড সৃষ্টি হল। একটা কিংবদন্তি। সে কিন্তু কাউকে বলল না তার কী কৌশল বা রহস্য।

মেয়েটাকে মাই দেবে না, ফিডিং বটল ধরিয়ে দেবে। কাছে রাখবে না, পিসির কোলে দেবে। রাত্রে নিজের ঘরে শোয়াবে না, পিসির ঘরে শোয়াবে। কাঁদলে জাগবে না, অঘোরে ঘুমোবে। যেন এ মেয়ে তার নয়, তার পিসির।

ক্ষৌণীশের মনে খটকা বাঁধল। এ কীরকম মা! এ কীরকম নারী! যে-রূপ তাঁকে একদা মুগ্ধ করেছিল সেই রূপই তাঁকে এখন প্রশ্নে প্রশ্নে কণ্টকিত করল। এমন রূপ কি একটা আশীর্বাদ না একটা অভিশাপ!

এ নিয়ে একদিন দিলখোলা কথাবার্তা হয়ে গেল। রঙ্গন বলল, 'আমার রূপ গেলে আমার দশা হবে আমার দিদির মতো। সেটা কি ভালো না এটা ভালো?'

ক্ষৌণীশ বললেন, 'আমি কি রমেশের মতো কুপুরুষ?'

রঙ্গন বলল, 'কুপুরুষ নও। কিন্তু পুরুষ তো। কোনদিন কাকে দেখে ভুলবে! আমি কি সেরকম ঝুঁকি নিতে পারি?'

এ তর্কের অন্ত নেই। বার বার তর্কের অবতারণায় কোনো পক্ষের উৎসাহ ছিল না। রঙ্গন বহির্মুখী হল আর ক্ষৌণীশ হলেন ঘরমুখো। এত যে বাইরে যেতে ভালোবাসতেন, না গেলে হাঁপিয়ে উঠতেন, তার চিহ্ন রইল না। আপিস থেকে সকাল সকাল বাড়ি আসেন আর মেয়েকে নিয়ে পড়ে থাকেন। একশো বার তার

কৌপীন বদলে দেন নিজের হাতে। রাত্রে মেয়েকে নিয়ে শুতে যান। তাঁর খাটের পাশে মেয়ের খুদে খাটটি। সকালেও মেয়ে আর মেয়ে আর মেয়ে। বেলা না হলে আপিসে যাবার নাম নেই।

মেয়ের কান্নায় ঘুম মাটি হয় বলে রঙ্গন অন্য ঘরে শোয়। রাত জাগলে তার চোখের কোলে কালি পড়বে, চোখের পাতা ফুলবে। পাউডার মেখে তা ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া শরীর তো একটা কল। কল বিগড়ে গেলে রূপ এলিয়ে পড়বে। রঙ্গন সেরকম ঝুঁকি নেবে না। মেয়ের জন্য সে বড়ো কম ভোগেনি। দারুণ যন্ত্রণা পেয়েছে। বাপ একটু ভুগলই-বা। দুর্ভোগের ভিতর দিয়ে সাম্য আসবে।

মেয়েকে চোখে চোখে রাখবেন বলে ক্ষৌণীশ সকাল সকাল পেনশন নিলেন। যা দুর্দান্ত মেয়ে, কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে গাড়িচাপা পড়বে। রঙ্গন তো আয়া রাখবে না। পিসির কি রাস্তায় যাওয়া ভালো দেখাবে?

পেনশন যখন হল তখন আর পুনায় বসে থাকা কেন? ক্ষৌণীশ কলকাতায় বাড়ি কিনলেন, গড়িয়াহাট অঞ্চলে। সেখানে তাঁর প্রধান কাজ হল মেয়ের ঠেলাগাড়ি ঠেলে লেকের চারধারে বেড়ানো। অনেকটা আইসক্রিমওয়ালার মতো। যে দেখে সে-ই কোলে নিতে চায়। এমন পরির মতো মেয়ে, কোনদিন কে চুরি করে সেই ভয়ে তিনি সদা সন্ত্রস্ত। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করেন না।

মেয়ের মা কিন্তু নিরুদবেগে আপিস করে। হ্যাঁ, আপিস। স্বামীর পেনশনে কুলোবে কেন? দায়ে পড়ে একটা চাকরি জোটাতে হয়েছে। সিভিল সাপ্লাই বিভাগ থাকতে চাকরির ভাবনা কী! রঙ্গন দশটা-পাঁচটা আপিস করে, তারপরে সামাজিকতা করে। তার মনে পরম শান্তি। স্বামীকে সে খাঁচায় পুরেছে, উড়োপাখি আর উড়বে না।

কিন্তু দুজনে দুজনের কাছে অচেনা অজানা প্রতিবেশীর মতো, তার বেশি নয়। শিষ্টাচার ও সদব্যবহার পদে পদে। দয়ামায়া প্রচুর। এর নাম যদি ভালোবাসা হয় তো ভালোবাসার অকুলান নেই। পরি যে সতর্ক করে দিয়েছিল সে কি তবে খামোকা? রঙ্গন কি ছবি নয়? ক্ষৌণীশ কি জীবনময়? কে জানে! কে জানে!

৩

মার্কারের সঙ্গে বিলিয়ার্ডস খেলতে খেলতে প্রিন্সিপাল সাহেব দারুণ একটা ‘ব্রেক’ করলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁকে বাহবা দেবার জন্যে সন্ধ্যা বেলা ক্লাবে মার্কার ভিন্ন আর কেউ ছিল না।

‘শাবাশ হুজুর! শাবাশ! বহুত ফাস কিলাস!’ মার্কার তাঁকে হাস্যমুখে অভিনন্দন জানাল। তাঁর কাছ থেকে তাঁর কিউ চেয়ে নিয়ে চক ঘষতে লাগল ওর ডগায়।

‘কিন্তু আজ জজসাহেবের এত দেরি হচ্ছে কেন?’ প্রিন্সিপাল সাহেব তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিতীয় কি তৃতীয় বার এই প্রশ্ন করলেন।

মার্কার বলল, ‘শায়দ মালুম হোতা কি জজসাব আজ নেহি আওয়েঙ্গে হুজুর।’ পরবর্তী প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা না করেই উত্তর দিল, ‘বড়া জবর খুনি মামলা হুজুর।’

খুনি মামলা শুনে প্রিন্সিপাল বিস্মিত হলেন না, কিন্তু জজসাহেব আসবেন না শুনে খেলা থেকে তাঁর মন উঠে গেল। মার্কারের সঙ্গে কাঁহাতক খেলা যায়। যেন সে তাঁকে জিতিয়ে দেবে বলে বদ্ধপরিকর। ওই ‘ব্রেক’-টা তা বলে মার্কারের অনুগ্রহ নয়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই—জজসাহেবের সঙ্গে খেলবার সময় এত বড়ো একটা ‘ব্রেক’ হয় না।

এবার মার্কারের পালা। সে ওস্তাদ লোক। ছেলেবেলা থেকে এই কর্ম করে আসছে। একবার আস্তে আলগোছে কিউ ছুঁইয়ে দেয়, অমনি খেলার টেবিলের সবুজ মসৃণ আস্তরণের উপর দিয়ে সাদা বল গড়িয়ে যায় ধীর মন্থর গতিতে। অব্যর্থ তার টিপ। পট করতে চায় পট হয়, ইন অফ করতে চায় ইন অফ, ক্যানন করতে চায় ক্যানন। কিন্তু ইচ্ছে করেই সে পয়েন্ট সংখ্যা বাড়তে দেয় না। প্রিন্সিপালকে হারিয়ে দেওয়া তার পলিসি নয়। সে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পিছিয়ে থাকে।

মার্কারের সঙ্গে খেলে প্রিন্সিপাল সাহেব জয়ী হন, কিন্তু জয়গৌরব পান না। সেদিন আরও কিছুক্ষণ খেলে তিনি কিউ ফেরত দিলেন। মার্কার একটু সকাল সকাল বাড়ি যাবার তালে ছিল। একগাল হেসে হাসি চেপে বলল, ‘বড়ি আফশোসকি বাত হুজুর। জজসাব আজ আনেওয়ালা নেহি হ্যায়।’

তারপর সেলাম ঠুকে পুছল, ‘হুজুরকা ওয়াস্তে’?

প্রিন্সিপাল নিজেই নিজেকে পান করাচ্ছেন। হুকুম করলেন, ‘পানি।’

‘বহুত খুব।’ বলে মার্কার সেলাম ঠুকে অদৃশ্য হল।

এমন সময় শোনা গেল বাইরে মোটরের আওয়াজ। মার্কার সেই দিকেই ছুটল।

‘হ্যালো প্রিন্সিপাল।’

‘হ্যালো জজ।’

দুজনে দুজনের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। দুজনেই উৎফুল্ল। কিন্তু সবচেয়ে উৎফুল্ল হল মার্কার। যদিও সবচেয়ে দুঃখিত। হয়েছে এখন তার বাড়ি যাওয়া। জজসাহেব আর প্রিন্সিপালসাহেব একসঙ্গে খেলতে শুরু করলে রাত ন-টার আগে ছুটি মিলবে না। একটু সরে দাঁড়িয়ে থেকে একবার এঁকে ‘শাবাশ’ ও একবার ওঁকে ‘বাহ বাহ’ দিতে হবে। মাঝে মাঝে কিউ হাতে নিয়ে চক মাখিয়ে দিতে হবে। ডাকলে খেলা দেখিয়ে দিতে হবে। ঝগড়া বাঁধলে আম্পায়ার হতে হবে। আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর পুছতে হবে ‘হুজুরকা ওয়াস্তে’? নেপথ্য থেকে নিয়ে আসতে হবে ফরমাইশি পানীয়।

জজ আর প্রিন্সিপাল দুজনে দুটো কিউ বেছে নিয়েই হাঁক ছাড়লেন, ‘মার্কার।’ তা শুনে মার্কার সেলাম ঠুকে হাজির হতেই এককণ্ঠে বললেন, ‘পুছো।’

বেচারা পড়ে গেল উভয়সংকটে। যদি জজসাহেবকে পহিলে পোছে তাহলে তার মানে দাঁড়ায় সে প্রিন্সিপালসাহেবের হুকুম পহিলে মানে। আর যদি প্রিন্সিপালসাহেবকে আগে প্রশ্ন করে তবে তার কাছে জজ সাহেবের আদেশ অগ্রগণ্য। বহুকালের মার্কার। চাকরিটা এককথায় যাবে না। তবু কাজ কী কাউকে চটিয়ে? সাহেবসুবোদের মেহেরবানিতে তার ছেলে ভাইপো ভাগনে জামাই কেউ বসে নেই। শীতের এই ক-মাস পরে হুজুরদের আপিসে 'পাংখা পুলার' দরকার হবে। তখন জ্ঞাতিদের জন্যে দরবার করতে হবে তো!

মার্কার জানত যে প্রিন্সিপালসাহেব যদিও বিদ্বানশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে, তবু জজসাহেব হলেন দন্ডমুন্ডের মালিক। চাইকী ফাঁসি দিতে সমর্থ। স্ব এলাকায় তাঁকেই পূজা করতে হয়।

'হুজুরকা ওয়াস্তে?' সে প্রিন্সিপালসাহেবকেই আগে পুছল।

তিনি হেসে ফেললেন। যা ভেবেছিলেন তাই। বললেন, 'নেম্বু পানি।'

জজ বললেন, 'জিন।'

এরপরে দুজনে খেলায় মেতে গেলেন। তাঁদের মুখে কেবল খেলার বুলি। মতভেদ হলে মার্কারকে ডাকেন। সেক্ষেত্রে তার বাক্যই আপ্তবাক্য। সে তখন কারও মুখ চেয়ে রায় দেয় না। তারও একটা কোড আছে। তার দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে তার মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন। জান গেলেও সে তার মহিমা থেকে বিচ্যুত হবে না। অন্যায় করে জজসাহেবকে জিতিয়ে দেবে না। যদিও তার মাইনে হয়তো জজের মাইনের শতাংশ। সাহেবরাও তাকে চটাতে চান না। সে যদি চাকরি ছেড়ে দেয় আর ওরকম ওস্তাদ পাওয়া যাবে না।

সেদিন খেলা কিন্তু জমল না। জজ অন্যমনস্ক ছিলেন। তাঁর কিউ বার বার বল ছুঁতে গিয়ে কুশন ছোঁয় কিংবা তাঁর বল অপর বলকে ছুঁতে না পেয়ে ভ্রষ্ট হয়। মার্কার পয়েন্টের হিসেব রাখে। বোর্ডের দিকে নজর পড়লে তিনি শিউরে ওঠেন। মাইনাস পয়েন্ট। তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন 'নো লাক।'

'ব্যাপার কী, সুর?' প্রিন্সিপাল বললেন, 'তুমি যে একেবারেই খেলছ না?'

'আর বল কেন মৈত্র?' জজ বললেন পাংশুমুখে, 'যেখানে একজনের প্রাণ নিয়ে টানাটানি সেখানে আর একজন খেলা করবে কোন সুখে? খেলতে পারো তোমরা মাস্টাররা। তোমরাই ভাগ্যবান।'

প্রিন্সিপাল প্রতিবাদ করলেন। বললেন, 'মানুষকে ফাঁসি দিতে সকলেই পারে, কিন্তু মানুষের ছেলেকে মানুষ করে দিতে পারে ক-জন! অথচ মজুরি কিনা তাদেরই সবচেয়ে কম!'

'ফাঁসি দিতে সকলেই পারে!' জজ আশ্চর্য হলেন। 'বাইশ লাখ লোকের এই দুই জেলায় মাত্র এক জনকেই সে-ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আমি হলুম ওয়ান ইন টু মিলিয়ানস।'

মাথার চুল চামরের মতো সাদা আর নরম। কিন্তু বয়স এমন কিছু হয়নি। সবে চল্লিশের কোঠায় পড়েছে। আঁটসাঁট মুখমন্ডল। ঠোঁট জবা ফুলের মতো রাঙা। সিভিলিয়ান মানুষ পান খান না। এ রং কৃত্রিম নয়। চেহারাও বাঙালির পক্ষে অসাধারণ ফর্সা। তিন-চার বছর অন্তর অন্তর বিলেত ঘুরে আসা অভ্যাস। বিয়ে করেননি। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন, 'হাতে কিছু জমলে তো বিয়ে করার কথা ভাবব।'

ওদিকে প্রিন্সিপাল হচ্ছেন গ্রাস উইডোয়ার। তাঁর স্ত্রী থাকেন কলকাতায় ছেলে-মেয়ে নিয়ে। ভদ্রলোক প্রেসিডেন্সি কলেজে দীর্ঘকাল থাকার পর এই প্রথম প্রিন্সিপাল পদ পেয়ে মফস্সলে বদলি হয়েছেন। যদি ভালো না লাগে তবে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন। নাই-বা হল প্রোমোশন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে সবাইকে নিয়ে আসবেন। একদা লণ্ডনে পড়েছেন। সে-সময় জজ ছিলেন তাঁর সমকালীন ছাত্র।

'তোমার অত মাথাব্যথা কীসের?' প্রিন্সিপাল বললেন জজের শুক্ল কেশের ওপর কটাক্ষ করে, 'সিদ্ধান্তটা তো তুমি করতে যাচ্ছ না হে! করবে জুরি। জুরি যদি বলে আসামি ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী আর তুমি যদি একমত হও তাহলে আইনে বলে দিয়েছে তুমি তাকে ফাঁসি দেবে। যদি-না তুমি তার অপরাধ লাঘব করার মতো কোনো অবস্থা দেখতে পাও। সেক্ষেত্রে তুমি দ্বীপান্তরের আদেশ দেবে। এই পর্যন্ত তোমার স্বাধীনতা। যেখানে স্বাধীনতা নেই সেখানে দায়িত্ব নেই। যেখানে যতটুকু স্বাধীনতা সেখানে ততটুকু দায়িত্ব।'

মৈত্র কিছুদিন ব্যারিস্টারি করেছিলেন। পসার জমেনি। ধাতটা পন্ডিতের। ভালো ডিগ্রি ছিল। ডিপিআই-এর সঙ্গে দেখা করতে না করতেই অমনি নিযুক্তিপত্র এল। সিদ্ধান্তটা তিনি সরকারি চাকরির বয়স পেরিয়ে যাবার আগেই নিয়েছিলেন। নইলে তাঁর মুখেও শোনা যেত 'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু, হায়' মাইকেলের মতো।

তর্ক করতে করতে তাঁরা টেবিল ছেড়ে কিন্তু কিউ হাতে করে অদূরে উঁচু বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। মার্কার ধরে নিল যে তাঁরা একটু পরে নেমে এসে খেলা চালিয়ে যাবেন। কাশতে কাশতে সে বাইরে গেল জজসাহেবের শোফারের সঙ্গে গল্প করতে।

'হায় বন্ধু!' জজ বললেন দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'যদি অত সহজ হত! কী করে আমি তোমাকে বোঝাব যে বিচারের পরিণামের জন্যে জুরির চেয়ে আমারই দায়িত্ব বেশি। তোমার কথায় মনে পড়ল আর একজনের কথা। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যাকে মারবার তাকে শ্রীভগবান স্বয়ং মেরে রেখেছেন। হে অর্জুন, তুমি শুধু তাঁর হাতের অস্ত্র। নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী।'

'ওই গীতার বচনই শেষ কথা। সমস্ত দায় ওই ব্যাটা ভগবানের। তোমার আমার কীসের দায়! অত বেশি সিরিয়াস হতে যাই কেন আমরা! প্রতিদিন এ জগতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরছে। একটা মানুষ বেশি মরলে কী আসে-যায়!' প্রিন্সিপাল উদাসীনভাবে বললেন।

'মরবে মরুক, কিন্তু আমার হাত দিয়ে কেন মরবে? কপালের দোষে মরতে পারে, কিন্তু বিচারের দোষে কেন মরবে? এক জনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায় এই আমাদের ধর্মাধিকরণের মূলনীতি। আমি সেই মূলনীতির সংরক্ষক। মাথাব্যথা আমার হবে না তো কার হবে? আমি এটাকে সিরিয়াসভাবে নিই।' জজ নাছোড়বান্দা।

'বেশ। তোমার ভাবনা তোমার। মাঝখান থেকে আমারই সন্ধ্যাটা মাটি। মার্কার! মার্কার ব্যাটা ভাগল কোথায়?' প্রিন্সিপাল হাঁক দিলেন।

মার্কার পাগড়ি খুলে রেখে আরাম করছিল। পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে ছুটে এল। তখন প্রিন্সিপাল বললেন, 'পুছো।'

'না না, এবার তোমার পালা নয়, আমার পালা। মার্কার!' জজ ইঙ্গিত করতেই মার্কার তাঁর আদেশ মান্য করল। প্রিন্সিপালের পাশে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

মৈত্র বললেন, 'নারঙ্গি!'

আর সুর চাইলেন ছোটা পেগ।

দুজনে দুজনকে 'চিয়ারিও' জানিয়ে পানীয় তুলে মুখে ছোঁয়ালেন। কিন্তু সেই উচ্চাসন থেকে নামবার নাম করলেন না। মার্কার বেচারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হঠাৎ মার্কারের মুখের উপর নজর পড়ায় অন্তর্যামী জজ অনুমানে বুঝলেন তার মনের ভাষা। ডান হাত উঠিয়ে বললেন, 'ব্যাস।'

সে তখন সাহেবদের হাত থেকে কিউ দুটি নিয়ে প্রাচীরে লগ্ন করল আর টেবিলের উপর বলগুলোকে সাজিয়ে রাখল। আর টেবিলের উপরকার কড়া আলোর বাতির সুইচ টিপে নিবিয়ে দিল। তা সত্ত্বেও সে বিদায় নিতে পারে না, যতক্ষণ সাহেবরা ক্লাবে থাকেন ও পানীয় ফরমাশ করেন। ন-টা এখনও বাজেনি, তবু মনে হয় গভীর রাত। নিঝুম শহর।

তার দশা দেখে জজ বলেন, 'মৈত্র, এখন এ বেচারাকে আটকে রেখে আমাদের কী লাভ? ক্লাবে তো আজকাল কেউ আসতেই চান না টেনিসের পরে।' ইংরেজিতে যোগ করলেন, 'কীসের টানে আসবেন? মোহিনীশক্তি কোথায়? স্টেশনে উপস্থিত মহিলারা সকলেই পর্দা। ইন্ডিয়ানাইজেশনের পরিণাম।'

'এবং ইসলামাইজেশনের।' মৈত্রও বললেন ইংরেজিতে। 'কিন্তু সেই একমাত্র কারণ নয় সুর। তুমি বিয়ে করনি। সিভিল সার্জনও চিরকুমার। তোমরাও যদি ওভাবে শত্রুতা কর তাহলে ক্লাব উঠে যেতে কতক্ষণ?

আমি তো মনে করি সমাজও উঠে যাবে।'

জজ হেসে বললেন, 'হা-হা! আমরা করছি শত্রুতা! চলো হে চলো আমার ওখানে চলো। খেতে খেতে গল্প করা যাবে। ডিনারে আজ তুমি আমার অতিথি হলে ধন্য হব।'

মার্কারকে ছুটি দিয়ে দুই বন্ধু মোটরে উঠে বসলেন।

দুই

খেতে খেতে বিস্তর আজেবাজে কথা হল। তারপর কফির পেয়ালা হাতে করে দুজনে গিয়ে বসলেন ফায়ারপ্লেসের ধারে। শীত পড়ছিল সে কথা ঠিক। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা সুর সাহেবের বৈলাতিক অভ্যাস। আগুন পোহাতে পোহাতে তিনি রেডিয়োতে বিবিসি-র সংগীত শুনতে ভালোবাসেন। তাঁর পায়ের কাছে তাঁর প্রিয় কুকুর জলি।

'আচ্ছা, মৈত্র,' সুর পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, 'তুমি নিজে ফাঁসি দিতে পার? মানে জজ হলে তুমি ফাঁসির হুকুম দিতে পারবে?'

'আলবত।' মৈত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'আমি তো দিচ্ছিনে। দিচ্ছে আইন। দেশের সরকার যদি ক্যাপিটাল সেনটেন্স রহিত করে আমিও দেব না।'

'কিন্তু সেই তিনিও, যিনি আমাকে নিমিত্ত মাত্র হতে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনিও দেখলুম আমার প্রশ্ন শুনে পিছিয়ে গেলেন। বললেন, না আমি পারিনে। তারপর আমাকে এক কাহিনি শোনালেন। তাঁর নিজের জীবনের কাহিনি।' এই বলে আবার অন্যমনস্ক হলেন। তাঁর স্মৃতি ফিরে গেল জজিয়তির প্রথম দিনগুলিতে।

'মামলাটা তো আমার কোর্টের নয়। খুঁটিনাটি আমার মনে নেই।' তিনি একটু একটু করে স্মরণ করে বলতে থাকলেন থেমে থেমে, এখানে-ওখানে শুধরে দিতে দিতে, নিজেই নিজের প্রতিবাদ করতে করতে। মোটামুটি দাঁড়াল এইরকম :

নিয়োগী সাহেব যখন রাজশাহি জেলার দায়রা জজ তখন তাঁর আদালতে এক খুনির মামলা আসে। ইংরেজ মোল্লা খুন হয়েছে। আসামি আর কেউ নয়, তার বেটা গোপাল মোল্লা। গোপালের বয়স আঠারো-উনিশ হবে। মা নেই। আদুরে গোপাল। সে যা চায় তাই পায়। কখনো বাপের মুখে 'না' উত্তর পায়নি। মহা শৌখিন ছোকরা গোপাল। গ্রামে এক আলকাপ দল গড়েছে। একরকম যাত্রার দল। রাতদিন ওই নিয়ে থাকে। তার সুন্দর রূপ আর সুন্দর কণ্ঠ কত মেয়েকে যে আকর্ষণ করে! তাদের স্বামীরা শত্রু হয়, কিন্তু গোপাল ছেলেটা সৎ। কেউ তাকে দোষ দিতে পারে না।

এমন যে গোপাল সে একদিন বায়না ধরল নিকা করবে। কাকে? না সোনাভানকে। অসমবয়সিনি রসবতী বিধবা। চারদিকে দুর্নাম। কিন্তু বহু সম্পত্তির মালিক। তাই তার প্রার্থীও অনেক। প্রস্তাবটা শুনে ইংরেজ বলল, 'না।' গোপাল বিগড়ে গেল। ইংরেজ তখনও দিব্যি জোয়ান। তারও প্রচুর সম্পত্তি। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার। গোপালকে বাঁচানোর জন্য গোপালের বাপ করে বসল সোনাভানকে নিকা। ভেবেছিল গোপাল তার কপালকে মেনে নিয়ে আর একটি লক্ষ্মী মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু গোপাল বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে ভিন্ন গাঁয়ে গিয়ে দিওয়ানা হল। আলকাপের ভার নিল তার ইয়ার কালু।

সুখেই ঘর করছিল ইংরেজ মোল্লা। আর একটি বেটাও হয়েছিল তার। একদিন অন্ধকার রাত্রে কে একজন তার ঘরে ঢুকে তাকে হেঁসো দিয়ে মেরে খুন করে। ইংরেজ চেঁচিয়ে ওঠে, 'গোপাল তুই?' চিৎকার শুনে পাড়ার লোক ছুটে আসে। দেখে ইংরেজ অজ্ঞান। একটু পরেই সে মারা যায়। গোপালকে তারা কেউ দেখেনি, কিন্তু তারাও শুনেছিল ইংরেজের চিৎকার, 'গোপাল, তুই!' সোনাভান সে-সময় ছিল না। আলকাপ শুনতে গেছল। গোপালকে গ্রেপ্তার করা হয় পরের দিন আলকাপ দলের আখড়ায়। সে বলে, আমি তো ওবাড়ি চিরদিনের মতো ছেড়েছি। আমি কেন যাব? কিন্তু অবস্থাঘটিত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে। একখানা রুমাল কুড়িয়ে পাওয়া গেল। সেখানা গোপালকে দিয়েছিল সোনাভান। তাতে রক্তের দাগ ছিল।

খুনি মামলায় জুরি সাধারণত ঝুঁকি নিতে চায় না। একেবারে খালাস দিতে কুণ্ঠাবোধ করলে ৩০২ ধারাকে দাঁড় করায় ৩০৪ ধারার ক-তে কিংবা খ-তে। এ মামলায় জুরি ইচ্ছা করলে অপরাধের গুরুত্ব কমিয়ে আনতে পারত, কিন্তু ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করল। পাবলিক প্রসিকিউটর তাদের ভালো করে ভজিয়েছিলেন যে, বউ মারা গেলে বউ হয়, ছেলে মারা গেলে ছেলে হয়, কিন্তু বাপ মারা গেলে বাপ আবার হয় না। পিতৃহত্যার মতো দুষ্কর্ম আর নেই। গোপাল যদি সৎমাকে পাবার আশায় এমন গর্হিত কাজ করে না থাকে তবে আপনারা তাকে খালাস দিন, যদি আপনাদের মনে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকে তবে সন্দেহে সুফল দিন। কিন্তু পাবলিক প্রসিকিউটর নাটকীয় ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ইংরেজ মোল্লাকে যে হত্যা করেছে সে যদি তার পুত্র গোপাল ভিন্ন আর কেউ না হয়ে থাকে তাহলে, তিনি চোখে জল এনে ফেলে জুরির সামনে চোখ মুছতে মুছতে বলেছিলেন, আপনাদের কর্তব্য অতি কঠোর। কোনোরকম কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেবেন না। গোপাল গেলেও ইংরেজের বংশলোপ হবে না। আপনারা শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান। বিজ্ঞের কাছে একটি শব্দই যথেষ্ট।

মৈত্র আর ধৈর্য ধরতে পারছিলেন না। বললেন, 'তারপর বিচারক নিশ্চয় তার বয়স বিবেচনা করে তাকে ফাঁসি দিলেন না। দ্বীপান্তর দিলেন।'

'না, বন্ধু। গোপাল আর গোপাল নয়। সে সাবালক হয়েছে। সাবালকের ছাড় নেই, মাফ নেই। নিয়োগী জুরির সঙ্গে একমত হয়ে গোপালকে চরম দন্ড দিলেন। ভালো উকিল দিলে হয়তো ছেলেটা বেঁচে যেত। কিন্তু আসামির মামা গরিব লোক। সে সরে দাঁড়ায়। সরকারি ডিফেন্স প্যানেল থেকে যথারীতি একজন উকিল দেওয়া হয়। সরকারি খরচে। সামান্য ফি। ভালো উকিলরা কেউ সে প্যানেলে নাম দেন না। যাঁকে উকিল দেওয়া হয়েছিল তিনি পাবলিক প্রসিকিউটরের সামনে দাঁড়াবার অযোগ্য। নিয়োগী কী করতে পারেন? ফাঁসিই দিলেন।' সুর বললেন করুণ সুরে।

'আহা! ফাঁসি!' মৈত্র শিউরে উঠলেন। 'হাই কোর্ট কনফার্ম করল?'

'শোনো তারপর কী হল। আসামি কাঁদল না কাটল না। নীরবে দন্ডগ্রহণ করল। শুধু একবার সামনের দিকে হাতজোড় করে তাকাল। এরপরে আরম্ভ হল বিচারকের বিচার। তিনি বাংলোয় ফিরে গিয়ে অন্য কাজে মন লাগাতে পারলেন না। তাঁর আহারে রুচি নেই। তিনি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন, আর ঘুমোতে পারেন না। তাঁর নিজের শান্তির জন্যে তিনি দিন কয়েক পরে জেলখানা পরিদর্শনের ছলে গোপালের সঙ্গে কথা বলতে যান। বলেন, গোপাল তোমার জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত। কিন্তু কী করব বলো। আমারও তো ধর্মভয় আছে। গোপাল বলে, ধর্মাবতার, কেয়ামতের দিন খোদাতালা আমার বিচার করবেন। সাক্ষীদেরও, জুরি সাহেবানেরও। ধর্মাবতারেরও। নিয়োগী ভড়কে গিয়ে বলেন, তুমি আপিল করো। গোপাল বলেন, নিজের বাপ যাকে মেরে রেখেছে, সে কি আপিলে বাঁচবে ধর্মাবতার! আর মরতেই আমি চাই। যে-মেয়ে আমার সৎমা হয়েছে তার সঙ্গে কি নিকেয় বসা যায়! খালাস হলেও আমি মুখ দেখাতে পারতুম না ধর্মাবতার। লোকে বিশ্বাস করত যে সৎমাকে নিকা করবার জন্যে আমিই আমার বাপজানকে মেরেছি।'

মৈত্র কণ্ঠক্ষেপ করলেন। 'এরই নাম ইডিপাস কমপ্লেক্স।'

সুর বলতে লাগলেন, 'ছেলেটির কথাবার্তায় এমন একটা সত্যের ঝংকার ছিল যে নিয়োগীর মনে হল আর সকলে অভিনয় করে গেছে, শুধু গোপাল তা করেনি। তিনি স্থানকাল ভুলে তাকে মিনতি করে বললেন, গোপাল, তুমি একবার শুধু বলো আসলে কী হয়েছিল। গোপাল বলল, খোদায় মালুম। আমি তো সেখানে যাইনি। রুমালটা সোনাভান আমাকে দিয়েছিল নিকার আগে, আমি সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসি নিকার পরে। তাতে রক্ত কী করে এল খোদা জানেন। এর পরে গোপাল চুপ করে। নিয়োগীও আর তাকে খোঁচান না। কিন্তু সেই যে তাঁর মাথায় পোকা ঢুকল সে-পোকা সেইখানেই থেকে গেল! তিনি সরকারকে চিঠি লিখলেন যে, তিনি ছুটি নিতে চান। ছুটির পর আর যেন তাঁকে জজ করা না হয়। করলে তাঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে।'

মৈত্র বললেন, 'তাঁর মতো লোকের জজ না হওয়াই ভালো। যে যা বলে তাই তিনি বিশ্বাস করবেন। আরে, ফাঁসির কয়েদি তো অমন কথা বলবেই।'

'ফাঁসির কয়েদি,' সুর বললেন, 'আপিল করে না কোথাও শুনেছ একথা?'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বল গোপাল আপিল করেনি?' মৈত্র পালটা শুধালেন।

'না, বন্ধু। গোপাল আপিল করেনি। এটা এমন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার যে কেবল নিয়োগী কেন, অনেকের মনেই ধোঁকা লেগেছিল। পাবলিক প্রসিকিউটরও পরে স্তম্ভিত হয়েছিলেন, কিন্তু শোনো তারপরে কী হল। নিয়োগী ছুটি পেলেন, কিন্তু ছুটির পরে তাঁকে সেই জেলারই কালেক্টর পদে অফিশিয়েট করতে বলা হল। তিনি তার সুযোগ নিয়ে টুর ফেললেন বদলগাছি থানায়। পাহাড়পুরের স্তূপ পরিদর্শন করবেন। সরেজমিনে গিয়ে হারুন অল রশিদের মতো ছদ্মবেশে অনুসন্ধান করতে লাগলেন। দফাদার চৌকিদারদের মুখেই শুনলেন যে হালিম মির্ধা এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। বাপকে আর বেটাকে। সোনাভান আর তার সম্পত্তির লোভে। কাজিয়া একটা অনেক দিন থেকে চলছিল। নিকার আগে সোনাভানের জমিজমা তারই হেফাজতে ছিল। তার বিবি না থাকলে সোনাভান তার সঙ্গেই নিকায় বসত। তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিল ইংরেজ মোল্লা। তলে তলে ফন্দি আঁটছিল। একদিন অন্ধকার রাত্রে 'বাপজান' বলে ঘরে ঢুকে ইংরেজকে নিকাশ করল। ঘুমের ঘোরে ইংরেজ চেঁচিয়ে উঠল, 'গোপাল, তুই!' সোনাভান ছিল না। সাক্ষীরা আসবার আগে হালিম অন্তর্ধান।'

মৈত্র ব্যঙ্গ করে বললেন, 'গাঁজা। গাঁজা। বদলগাছিতে তো গাঁজার চাষ হয় শুনেছি। নিয়োগীকেও গাঁজা খাইয়ে দিয়েছে। তারপর?'

'হালিম অনেক দিন নিরুদ্দেশ ছিল। গোপালের সাজা হওয়ার পর সে আবার গ্রামে ফিরে এসেছে, কিন্তু গ্রামের লোক তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে খুব সাবধানে চলাফেরা করছে। গোপালের ফাঁসি হয়ে গেলে পরে সোনাভানকে নিকা করবে। নিয়োগী সাহেব যখন সদরে ফিরলেন তখন তাঁর ১০২ ডিগ্রি জ্বর। সেই জ্বর নিয়েই তিনি নতুন জজের বাড়ি গিয়ে দেখা করলেন। বললেন, এখনও সময় আছে, ছেলেটার যাতে ফাঁসি না হয় তার জন্যে আসুন আমরা চেষ্টা করি। নতুন জজ ম্যাকগ্রেগর কি রাজি হন! বললেন, কেসটা আমি করিনি। আমার কোনো লোকাস স্ট্যাণ্ডাই নেই। আর আপনিও এখন জজ নন। আপনি ফাংটাস অফিসিও। কাগজপত্র হাই কোর্টে চলে গেছে। প্রাণদন্ড তাঁরা হয়তো কনফার্ম করবেন না। তাহলে তো ছেলেটা মরছে না। তা শুনে নিয়োগী বললেন, যদি কনফার্ম করে তখন যে খুব দেরি হয়ে গিয়ে থাকবে। ম্যাকগ্রেগর বললেন, তখন গভর্নরের কাছে করুণাভিক্ষা করলে তিনি তার বয়স বিবেচনা করে প্রাণদন্ড মকুব করবেন। এর নজির আছে। নিয়োগী বললেন, যে মানুষ আপিল করল না সে কি মার্সি পিটিশন দেবে? তাহলে তো স্বীকার করে নেওয়া হয় যে সে-ই তার বাপকে খুন করেছে। ম্যাকগ্রেগর বললেন, স্বীকার তাকে করতেই হবে যদি প্রাণে বাঁচতে চায়। চোদ্দো বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। জীবন নতুন করে আরম্ভ করার পক্ষে তেত্রিশ বছর এমন কিছু বেশি নয়। চাষির ছেলে। অন্য কোনো গ্রামে গিয়ে বাস করলে কেই-বা তাকে সমাজে ঠেলবে!'

'হ্যাঁ। ম্যাকগ্রেগরই জজ হবার যোগ্য।' মৈত্র তারিফ করে বললেন। 'তারপর?'

'তারপর যা হবার তাই হল। হাই কোর্ট দেখল গোপাল আপিল করেনি। কেউ তার হয়ে একটি কথাও বলবার জন্যে দাঁড়ায়নি। প্রাণদন্ড কনফার্ম করল। তা শুনে নিয়োগী আবার গোপালের সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে কথা বললেন। সে মার্সি পিটিশন দিতে নারাজ হল। যে দোষ করেনি সে কেন করুণাভিক্ষা করবে? তখন নিয়োগী একটা অভূতপূর্ব কাজ করলেন। জুডিশিয়াল সেক্রেটারিকে চিঠি লিখে সব কথা জানালেন। উত্তর এল, আদালতের বাইরে ভূতপূর্ব জজ যদি কিছু শুনে থাকেন তবে সেটার উপর কোনো অ্যাকশন নেওয়া যায় না। মার্সি পিটিশন না দিলে ধরে নেওয়া হবে যে দন্ডিত ব্যক্তি অননুতপ্ত। সুতরাং করুণার অযোগ্য। নিয়োগী হাল ছেড়ে দিলেন। ফাঁসির আগেই তাঁর অস্থায়ী কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। তিনি অন্যত্র বদলি হন।

তারপর তিনি মদ ধরলেন, রেস ধরলেন। উপরন্তু গীতা ধরলেন। আশা করলেন এইসব করলে তিনি বাঁচবেন।'

মৈত্র বিস্মিত হয়ে সুধালেন, 'কেন? তিনি কি বাঁচলেন না?'

'আহা! শোনোই-না সবটা!' সুর বলতে লাগলেন, 'আমার সঙ্গে যখন তাঁর প্রথম আলাপ তখন তিনি কমিশনার পদে অফিশিয়েট করছেন। না বাঁচলে কি কেউ এতদূর উন্নতি করতে পারে! আমি যখন তাঁকে বলি যে জজের কাজ আমার ভালো লাগে না, অথচ কালেক্টর পদ হচ্ছে দিল্লিকা লাড্ডু যা খেয়ে আমি পস্তাচ্ছি, তখন তিনিই আমাকে উপদেশ দেন, নিমিত্ত মাত্র ভব সব্যসাচী। কিন্তু তাঁর নিজের জবানিতে তাঁর জজিয়তির গল্প শুনে আমার মনে ভয় ঢুকল যে আমিও হয়তো তাঁরই মতো কোনো নিরপরাধীকে ফাঁসি দিয়ে আজীবন পস্তাব। তাই ফাঁসির মামলা আমার কোর্টে এলেই আমি গীতা খুলে বসি। কিন্তু তাতে কোনো শান্তি বা সান্ত্বনা পাইনে। ঈশ্বর বলে কেউ আছেন কি না তর্কের বিষয়! তাঁর হাতের অস্ত্র বলে নিজেকে ঘুম পাড়াতে পারিনে। জজকে সমস্তক্ষণ হুঁশিয়ার থাকতে হয়। পাছে কোনো নির্দোষের সাজা হয়। প্রাণদন্ড দূরের কথা, কারাদন্ডই-বা কেন হবে? বিচারটা যতদিন চলে ততদিন আমার সোয়াস্তি নেই। যেন বিচারটা আসামির নয়, আমার নিজের। বিচার শেষ হলে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু মনে একটা সংশয় থেকে যায়। কে জানে প্রকৃত সত্য কী? পাইলেট যা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যিশুর বিচারের সময়। পাইলেটের মতো আমি অজ্ঞেয়বাদী। কই, সাক্ষাৎ ভগবানের পুত্রকে দেখেও তিনি তো ভগবদ্বিশ্বাসী হননি। আসলে কী হয়েছিল তা আমার জানবার উপায় নেই, আমি অসহায়, তাই যদি না জানতে পেলুম তো কেবল দন্ডমুন্ডের নিমিত্ত হয়ে আমার কী লাভ!'

'তোমার লাভ না হোক, সমাজের লাভ'। মৈত্র সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত।

'হ্যাঁ। একদিক থেকে সেটা ঠিক। বিচারের একটা ঠাট বজায় না রাখলে লোকে আইনকে নিজেদের হাতে নেবে। প্রত্যেকেই হবে এক একজন দন্ডদাতা ও জল্লাদ। কিন্তু আমি চাই নিশ্চিতি, শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিতি। যাকে সাজা দিলুম সে যে আর একজন গোপাল নয় এই নিশ্চিতি। অবশ্য গোপালের মতো আমি আর এক জনকেও দেখিনি যে আপিল করবে না, মার্সি পিটিশন দেবে না, কেয়ামতের উপর বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্বেগে মরবে। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি যে, জেলা থেকে বিদায় নেবার আগে নিয়োগী আরও এক বার জেলখানায় গিয়ে গোপালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এবার তাকে কাতর কণ্ঠে বলেছিলেন, গোপাল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমিও সামান্য একজন ভ্রান্তিশীল মানুষ। ভুলচুক তো মানুষ মাত্রেরই হয়। গোপাল বলে, ধর্মাবতার, আপনার কী দোষ যে ক্ষমা করব? রাখে আল্লা মারে কে? মারে আল্লা রাখে কে? খোদা আপনাকে দোয়া করুন। আপনি লাটসাহেব হন।'

'ছেলেটা সত্যি বড়ো ভালো বলতে হবে।' স্বীকার করলেন মৈত্র।

'কোয়াইট রাইট।' সুর অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'কিন্তু কী ট্র্যাজিক! কেন এরকম হয়? মানুষ কী করতে এ জগতে আসে? কী করে? কেন শাস্তি পায়? সে-শাস্তি কি ইহজন্মের কর্মফল না পরজন্মের জের? না পরবর্তী জন্মের প্রস্তুতি? যারা পরজন্ম বা পরকাল মানে না তাদের তুমি বুঝ দিচ্ছ কী বলে?

তিন

মৈত্র মৌন হয়ে বসে রইলেন। তখন সুর বললেন, 'আজ খুব ভালো মিউজিক আছে হে। বিবিসি ধরব?'

মৈত্র হাত নেড়ে বললেন, 'না থাক।'

থমথমে পরিস্থিতি। কিছুক্ষণ পরে মৈত্র নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, 'সুর, তুমি এইবার একটি বিয়ে করো।'

'কেন, বলো দেখি? তোমাকে কেউ ঘটকালি করতে বলেছে?'

'না হে। তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। চুল পেকে শণ হয়েছে বটে কিন্তু শরীর শক্ত আছে। এ বয়সে কত লোক বিয়ে করছে, করে সুখী হচ্ছে।'

‘হা হা! তোমাকে বলিনি মিসেস নিয়োগী আমাকে কী বলেছিলেন।’

মৈত্র থতোমতো খেয়ে সুধালেন, ‘কী বলেছিলেন?’

‘বলেছিলেন, অভিলাষ, আমাকে দিদি বলে যখন ডেকেছ তখন সেই সুবাদে একটা কথা বলি। বিয়ে কোরো না। বউটা বাঁচবে।’

‘অ্যাঁ! তাই নাকি?’

‘শুধু এই নয়। পরে একদিন তিনি সোজা আমার বাংলোয় এসে হাজির। বললেন, অভিলাষ, তোমার কাছে লিগাল অ্যাডভাইস চাইতে এসেছি। উকিলবাড়ি যেতে লজ্জা করে। তা ছাড়া তুমি আমার ভাই, ভাইয়ের কাছে লজ্জা কীসের? তোমার আপন দিদিকে তুমি এ অবস্থায় যা করতে বলতে আমাকেও তাই করতে বলবে আশা করি।’

‘ব্যাপার!’ মৈত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

‘গুরুতর। মিসেস নিয়োগী বললেন, অভিলাষ, ওঁর পরিবর্তনের জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এতদিনে বুঝতে পেরেছি আমি ফেল। মদ আর রেস হলেও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু নিজের দেশকে উনি ইংরেজের পায়ে বিকিয়ে দিচ্ছেন। ওঁর সরকারি নথিপত্র আমি লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছি। ওঁর প্রশ্রয় পেয়ে অধীনস্থরা অবাধে দমননীতি চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বললে উনি রাগ করেন। আমি জানতে চাই ডিভোর্সের এটা একটা গ্রাউণ্ড হতে পারে কি না।’

মৈত্র চমকে উঠলেন। বললেন, ‘না না, এ হতেই পারে না! এ অসম্ভব!’

‘আমিও তাঁকে সেই কথাই বোঝাই। বরং একটু ভয় দেখিয়ে দিই। স্বামীর সরকারি নথিপত্র লুকিয়ে লুকিয়ে পড়াও একটা গ্রাউণ্ড হতে পারে।’ সুর মুচকি হাসলেন।

মৈত্রর মুখ শুকিয়ে গেল। ‘কা-কাজটা খু-খুবই খারাপ। কি-কিন্তু তা বলে ডি-ডিভোর্স হতে পারে না কি? না, তুমি আমার লেগ পুল করছ? তুমি জানো আমি ডিভোর্সের শত্রু।’

সুর বললেন, ‘আমার উদ্দেশ্য তুমি ধরতে পারনি, মৈত্র। আমি চাইনি যে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন পরামর্শদাতার জীবন আরও দুর্বহ হয়। ডিভোর্সের আমি লেশমাত্র প্রশ্রয় দিইনি। তোমার সমাজ আমার হাতে নিরাপদ।’

‘আমি হলে কী করতুম বলি।’ মৈত্র কথার সূত্র নিজের হাতে নিলেন। ‘আমি ভদ্রমহিলার মনোবিশ্লেষণ করতুম কেন তিনি তাঁর স্বামীর উপর এতদূর বিরক্ত যে পরের কাছে যান বিবাহবিচ্ছেদের পরামর্শ চাইতে। এর মূলে কী আছে? দেশঘটিত পরস্পরবিরোধী চিন্তা না অন্য কিছু ঘটিত সন্দেহ?’

‘ওই যাঃ! পন্ডিতি আরম্ভ হল!’ সুর হেসে উঠলেন, ‘একজন বিপন্ন হয়ে এসেছেন মুক্তির উপায় খুঁজতে, আমি বসে মনোবিশ্লেষণ করব পান্ডিতিক সত্যনির্ণয় করতে? আমি যদি তোমার মতো মনোবিশ্লেষণ করতে যেতুম তাহলে হয়তো কত কী জট আবিষ্কার করতুম। ওই যেমন একটু আগে বলেছিলে ইডিপাস কমপ্লেক্স, তেমনি তোমাদের ফর্দে আর কী কী কমপ্লেক্স আছে জানিনে। হয়তো জুপিটার কমপ্লেক্স।’

দুজনেই হাসতে লাগলেন। হাসি থামলে সুর বললেন, ‘তা ছাড়া সত্য বলতে আমি যা বুঝি তা অন্য জিনিস। গোপালের হয়তো ইডিপাস কমপ্লেক্স ছিল, যদি সে আদৌ খুন করে থাকে। কিন্তু আমি যদি তার বিচারক হতুম আমি তোমার মতো মনোবিশ্লেষণ করতুম না। আমার সত্যনির্ণয়ের পদ্ধতি নয় ওটা। আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সিচুয়েশনটা কী? সিচুয়েশনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিটা কী? এক-একটা সিচুয়েশন এমন যে তার পরিণতি ট্র্যাজিক না হয়ে পারে না। তার থেকে উদ্ধারের অপর কোনো পন্থা নেই। মানুষ অনেকসময় খুন করে ফাঁসি যায় উদ্ধারের আর কোনো পন্থা খুঁজে না পেয়ে। সিচুয়েশনটা কী তা তো জজকে বিশ্বাস করে কেউ বলবে না, বলতে জানেও না। তাদের চোখে আমি কালান্তক যম। আসলে আমি মানুষের বন্ধু। যাকে ফাঁসি দিই তাকে মনে মনে বুকে জড়িয়ে ধরি। ওর চেয়ে ভয়ংকর দন্ড তো নেই। তবু ওই দন্ড আমি প্রেমের

সঙ্গে উচ্চারণ করি। আমার চোখে সব খুনিই গোপাল। কেয়ামতের দিন তার প্রকৃত বিচার হবে। এ যা হল তা সমাজের প্রয়োজনে, সমাজবিহিত পদ্ধতিতে।'

মৈত্র আবেগে আপ্লুত হয়ে সুরের হাতে চাপ দিলেন। কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ। তারপর চটকা ভাঙল। মৈত্র সুধালেন, 'শেষপর্যন্ত হলটা কী? ডিভোর্স না সেপারেশন?'

'কোনোটাই না।' সুর একটু থেমে বললেন, 'আরও বছর সাতেক তাঁরা একসঙ্গেই কাটালেন। তারপরে...' সুরের সুর বিকৃত হয়ে এল।

'বলো, বলো, বলেই ফ্যাল।' মৈত্রর কৌতূহল উদগ্র।

'ভদ্রলোক একদিন মাঝরাত্রে রাস্তার ধারে নর্দমায় পড়ে মারা যান। শুনেছি মদের নেশায়।' বলতে বলতে কণ্ঠরোধ হল সুরের।

'আহা! মারা যান!' মৈত্র অভিভূত হলেন। মনে হল তন্দ্রায় অভিভূত।

বন্ধুকে এক ধাক্কা দিয়ে সুর বললেন, 'তাহলে দেখতে পাচ্ছ বিবাহ সর্বরোগহর নয়? নারীও পুরুষকে রক্ষা করতে পারে না, গীতাও না। আমি চিন্তা করে এর একটি মাত্র সমাধান পেয়েছি। এরকম বিপজ্জনক কাজ না করা। এর চেয়ে কয়লার খনিতে নামা কম বিপজ্জনক। কিন্তু আমি যদি কয়লার খাদে নামি আমার হাত ধরতে কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে রাজি হবেন না। অমন একটি হাতি পুষতে আমিই-বা কেমন করে পারব! তোমার ভদ্রারা আমাকে খনিতে নামতে দেবেন না। কিন্তু তার চেয়েও যা বিপজ্জনক সেই জজ-কালেক্টরের কাজে নামতে দিয়ে পরে মই কেড়ে নেবেন। জজ হয়ে আমি হয়তো দশটা অপরাধীর সঙ্গে একটা নিরপরাধকেও জেলে পাঠাব বা ফাঁসিতে ঝোলাব। কালেক্টর হয়ে আমি হয়তো দুরন্ত জনতার উপর গুলি চালানোর হুকুম দেব। মরবে কয়েকটা পাজি লোকের সঙ্গে এক-আধটি নিরীহ ছেলে কি মেয়ে। অমনি আমার সহধর্মিণী বাম হবেন। কী করে তাঁকে বোঝাব যে আমি মানুষটা খারাপ নই, আমার পেশাটাই খারাপ! পারলে আমি ইস্তফা দিয়ে সরে যেতুম। তারপরে যদি ফকিরের সঙ্গে ফকিরনি হয়ে গাছতলায় বাস করতে কেউ রাজি হতেন তাহলে বিয়ে করা যেত।'

চার

মৈত্র তন্ময় হয়ে শুনছিলেন। ওদিকে ফায়ার প্লেসের আগুন নিবুনিবু করছিল। সুর তার উপর আরও কয়লা চাপিয়ে তাকে তেজ করে তুললেন। ও যেন তাঁর নিজের জীবনের প্রতীক।

'এখন তোমার কথাই শোনা যাক। যদি তোমার কোনো কাজে লাগতে পারি।' বললেন মৈত্র তাঁকে আবার স্থির হয়ে বসতে দেখে।

'থ্যাঙ্ক ইউ মাই ফ্রেণ্ড। কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। গীতার সব কথা না হোক একটি বচন আমি মানি—''উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ''।'

এরপরে দুজনেই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ। কখন একসময় সুর আপন মনে বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর আত্মকাহিনি। মৈত্র শুনতে লাগলেন বিনা কণ্ঠক্ষেপে।

'লণ্ডনে যখন তোমার সঙ্গে পড়তুম তখন কি সংসারের খবর কিছু জানতুম! তখন আমার একমাত্র ধ্যান ছিল ভালো পাস করে ভালো চাকরি নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। বুড়ো বাপকে রেহাই দিতে হবে। আমার জন্যে কি শেষে ফতুর হবেন। তখন অত খতিয়ে দেখিনি কোন চাকরিতে মনের শান্তি, কোনটাতে অপ্রসাদ। আইসিএস হয়ে যেদিন বাবাকে পুত্রদায় থেকে অব্যাহতি দিই সেদিন এই ভেবে আমার আনন্দ হয়েছিল যে, এখন থেকে আমি স্বাধীন। যথাকালে দেশে ফিরে চাকরিতে যোগ দিই। ভালোই লাগে। একমাত্র কাঁটা রাজনৈতিক মনোমালিন্য। ওদের পলিসি আমি ক্যারি আউট করতে কুণ্ঠিত দেখে ওরাই আমাকে জজ করে দেয়। আমি তার ফলে আরও স্বাধীন।

'কিন্তু ক্রমেই আমার প্রতীতি হতে থাকে যে, আমি আমার মনের স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলছি। রাতদিন যাদের নিয়ে আমার কারবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা খুন কিংবা ডাকাতি কিংবা নারীধর্ষণ করেছে। সমাজের

সবচেয়ে পঙ্কিল স্তরের জীব তারা। তাদের মামলা হাতে নিয়েছে যারা তারাও হাতে-পায়ে সারা গায়ে পাঁক মেখেছে। এক এক সময়ে মুখের সঙ্গে মুখ মিলিয়ে দেখেছি। কোনটা ক্রিমিনালের আর কোনটা পুলিশের তা নিয়ে ধাঁধায় পড়েছি। জেলখানায় গিয়ে দেখেছি জেল ওয়ার্ডদের মুখও জেল কয়েদির মতো। উকিলের মুখ দেখেও ধোঁকা লেগেছে। পোশাক ভিন্ন, মুখ অভিন্ন। ক্রাইম যাকেই ছোঁয় তাকেই ক্রিমিনালের চেহারা দেয়। এই সর্বব্যাপী পাঁকের মধ্যে আমি কেমন করে পাঁকাল মাছ হব? আমার নিজের চেহারা দেখি আয়নায়। ভয় পেয়ে যাই।

'একদিন বোর্ড অফ রেভিনিউয়ের মেম্বার ও. নিল এলেন আমার স্টেশনে। এককালে আমার ওপরওয়ালা ছিলেন। আবার দেখা হল। কথায় কথায় বললেন, 'সুর, জজিং তোমার ভালো লাগে? আমার ধারণা ছিল তোমার অভিরুচি শাসনে। উত্তর দিলুম, আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু ফিরে যেতেও আমি চাইনে। ও. নিল চলে গেলেন। কিন্তু কথাটা আমার মন থেকে গেল না। শাসন বিভাগ থেকে সরে আসার পরও আমি তার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে কম চেষ্টা করিনি। ধাতটা আমার এগজিকিউটিভ। কিন্তু চার বছরে একটা ছেদ পড়ে গেছল। ফিরে গেলে আমি জোড় মেলাতে পারতুম না। রাজনৈতিক মনোমালিন্য তো চরমে উঠেছিল। কেবল ইংরেজে-বাঙালিতে নয়, হিন্দুতে-মুসলমানে।

'তবু ক্রিমিনালদের সঙ্গে ক্রিমিনাল বনে যাবার চেয়ে ওই অশান্তির মধ্যে ফিরে যাওয়াও ভালো। চিফ সেক্রেটারিকে চিঠি লিখলুম একদিন। আমাকে কি চিরকাল জজিং করতে হবে আমার রুচির বিরুদ্ধে? তিনিও আমার পুরোনো অতিথি। সহানুভূতির সঙ্গে উত্তর দিলেন, তোমার সম্বন্ধে কাগজপত্র আনিয়ে দেখলুম। আগে থেকেই ঠিক হয়ে রয়েছে যে তোমার স্থান জুডিশিয়ালে। তোমার নিজের পছন্দ হোক আর নাই হোক এই হচ্ছে তোমার বরাদ্দ। ভালো জজেরও তো দরকার। আশা করি তুমি এটা স্বীকার করবে যে ব্যক্তিগত অভিরুচির চেয়ে পাবলিক ইন্টারেস্ট বড়ো। তোমার সাফল্য কামনা করি।

'মনটাকে মানাতে আমার কত কাল যে লেগে গেল! কেমন করে যে পারলুম! একবার ভেবে দ্যাখো। মড়ার মাথার খুলি পর্যন্ত কোনো কোনো কেসে আলামত হয়। শুক্র আর শোণিতমাখা কাপড়জামা তো আকছার। আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হয় সেসব। নাড়াচাড়া করে পুলিশের লোক। ডাক্তার এসে বলে যান মৃতদেহের অঙ্গে কী কী জখম ছিল। ব্যবচ্ছেদের পর কোন কোন অর্গানে কী কী লক্ষণ দেখা গেল, কী কী বস্তু পাওয়া গেল, আমাকেই স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করতে হয়। বীভৎস সব খুঁটিনাটি। তার চেয়েও বীভৎস বলাৎকারের মামলায় স্ত্রী-অঙ্গের রিপোর্ট! ডাক্তারের মুখে তবু সহ্য হয়। নারীর মুখে পাশবিক অত্যাচারের আদ্যোপান্ত বিবরণ! উকিলেরা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে ৩৭৬ ধারার অত্যাবশ্যক উপাদান আছে কি না। অন্তর্ভেদ ঘটেছে কি না। আমার ইচ্ছা করে উকিলদের ধরে চাবকাতে। সতী মেয়েকেও তারা প্রতিপন্ন করতে চায় অসতী। যেন অসতী হলে তার অনিচ্ছা থাকতে মানা। যেন তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেকোনো পশু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এর পিছনে ক্রিয়া করছে আমাদের বৈষম্যময় সামাজিক মূল্যবোধ। একবার যে অভাগিনীর পদস্খলন হয়েছে, যেকোনো দিন যে-কেউ তার উপর আক্রমণ করলেও সেটা হবে সম্মতিসূচক। পুরুষ কিন্তু হাজার পদস্খলন সত্ত্বেও আইনের দ্বারা সুরক্ষিত।

'এখন ওইসব হতভাগিনী মেয়েদের এই বৈষম্যময় সমাজে আমি ভিন্ন আর কে রক্ষক আছে এই বাইশ লক্ষ লোকের মাঝে? শুধু ওদের নয়, যারা একবার চুরি করে দাগি হয়েছে কেউ কি তাদের বিশ্বাস করে স্বাভাবিক কাজকর্ম দেয়? অগত্যা আবার চুরি করতে হয় তাদের। দ্বিতীয় বার চুরি করলেই ডবল সাজা। অনেকসময় দেখা যায় দ্বিতীয় অপরাধটা প্রথম অপরাধের তুলনায় লঘু। তবু আমাদের হাকিমরা চোখ বুজে প্রথম দন্ডটাকে দ্বিগুণিত করে দেন। আপিলে আমি দন্ড হ্রাস করি। বলি, লোকটার পাওনা যদি হয় ছ-মাস, হাকিম তার পূর্ব অপরাধের কথা স্মরণ করে এক বছর দিতে পারেন। কিন্ত পূর্ব অপরাধের জন্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন হাকিমের হাতে সে হয়তো পেয়েছিল দশ মাস। সেটাকে কলের মতো নির্বিচারে দ্বিগুণিত করে বিশ মাস করলে বর্তমান অপরাধের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় না। হাকিমেরা করবেন কী! কোর্ট সাব

ইনস্পেকটর তাঁদের তাই বুঝিয়েছেন। আমি যখনই সুযোগ পাই সাজা কমিয়ে দিই আর পুলিশের অভিশাপ কুড়োই। একটা প্রতিষ্ঠানও খাড়া করি কয়েদিদের জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর স্বাভাবিক কাজকর্ম জোটানোর আশায়। দেখি কেউ ওদের কাজ দেবে না। দিলে পুলিশ পিছনে লাগবে। তা ছাড়া দাগি চোরকে বিশ্বাস কী! কোনদিন আবার চুরি করে পালাবে! তখন পুলিশে খবর দিলে পুলিশ বলবে, কেমন? সাবধান করেছিলুম কি না? সাহস করে আমিই মালি রাখি। কোনদিন আমাকে বোকা বানাবে! পুলিশ সাহেব বলবেন, রাইটলি সার্ভড! আরে কুকুরের ল্যাজ কখনো সিধে হয়?

'সমাজে ভালো জজেরও দরকার আছে। কিন্তু এই বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। চাই আরও একটা বিশ্বাস। সেটা না থাকলে আমার মতো লোকের পক্ষে বেঁচে থাকাই এক যন্ত্রণা। জগতে যা কিছু কুৎসিত, যা কিছু মিথ্যা, যা কিছু কু তাই নিয়ে আমার কারবার। জগৎ সম্বন্ধে আমার ধারণা কি তা বলে এই যে, জগতে সুন্দর নেই, সত্য নেই, সৎ নেই? আমার এই নরকবাস থেকে অনুমান করা শক্ত যে স্বর্গ বলে কিছু থাকতে পারে বা ঈশ্বর বলে কেউ থাকতে পারেন। মানুষ আছে তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু মানুষের চেহারা দেখে কি বিশ্বাস হয় যে, ভগবান তাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর আপনার আদলে? তাঁর উপর পিতৃত্ব আরোপ করবার মতো কী এমন প্রমাণ আছে?

'অল্পবয়স থেকেই আমি সৌন্দর্যদেবীর অন্বেষক। বিউটি আমার কাছে কথার কথা নয়। ওকে আমি প্রথম যৌবনে সর্বঘটে দেখতে চাইতুম। আভাসও পেতুম ওর আঁচলের। ওর অলকের। কিন্তু এই নরকপুরীতে কোথায় ওর হাতছানি? কোথায় ওর চাউনি? আমার জজিয়তির জীবনে প্রায়ই হা-হুতাশ করেছি। হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিতে গেছি। দশ বছর পরে এই সম্প্রতি আমার অন্তর্দৃষ্টি খুলেছে। এতদিনে আমার প্রত্যয় হয়েছে, ও আছে।

'ও আছে। ওর পথ গেছে এই ক্লেদের ভিতর দিয়ে, এই আস্তাকুঁড়ের ওপর দিয়ে; এইসব মাজাভাঙা পুরুষের, এইসব পড়ে-যাওয়া নারীর দ্বারা আচ্ছন্ন গিরিসংকট দিয়ে। ওর পথ হচ্ছে এই পথ, এই পথে আমি ওর পথেরই পথিক হয়েছি ওরই দর্শন পাব বলে। ও আমার আগে আগে চলেছে, উড়ে চলেছে মাটি না ছুঁয়ে ক্লেদ না ছুঁয়ে অন্তরিক্ষে। ও যেন সূর্যকন্যা তপতী, আর আমি ওকে ধরবার জন্যে মাটিতে পা ফেলে জলকাদায় নেমে ডাঙায় পা তুলে ছুটে চলেছি ভূতলে। আমি যেন রাজা সংবরণ। দৃষ্টি আমার ঊর্ধ্বমুখীন। ওর আর আমার উভয়েরই পথ এই ভীষণ কুৎসিত অশুভ অমাবস্যার ছায়াপথ।

'ও যেন আমার চোখে ধুলো ছুড়ে মারে যাতে আমি ওকে দেখতে না পাই, চিনতে না পারি। কিংবা ধুলো আপনি ওড়ে ওর গতিবেগের হাওয়ায়। আমি অন্ধকার দেখি। সেই অন্ধকারের নাম নিষ্ঠুর বাস্তব। যে বাস্তব আমাকে নিত্য অভিভূত করে নিত্যনূতন অপরাধে। এই তো সেদিন আমার কোর্টে এল এক তরুণী জননী। নিজের হাতে নিজের শিশুর গলা টিপে মেরেছে। তার আগে এসেছিল এক বন্ধু। বন্ধুকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় এক পোড়োবাড়িতে—সেখানে তার নিদ্রিত অবস্থায় তাকে বলি দেয়। মুণ্ডুটা পুঁতে রাখে নদীর বালিতে। এবার যে এসেছে তার কথা বলব না। কেসটা সাব-জুডিস, কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তবেরই অভিনব প্রকাশ। স্তব্ধ হয়ে ভাবি এই তমসার অপর পারে কি ও আছে? ডাকলে কি ওর সাড়া পাব? চোখ মেলে আমি ওর দেখা পাইনে তবু চোখ আমার ওর ওপরেই—এর ওপরে নয়।

'না, তোমার এই নিষ্ঠুর বাস্তব আমার দৃষ্টি হরণ করে না। দৃষ্টিকে পীড়া দেয় যদিও। আমার দৃষ্টি একে প্রতিনিয়ত অতিক্রম করে। আমার মন একে ছাড়িয়ে যায়। আমার পা একে মাড়িয়ে যায়। এর সম্বন্ধে আমার মোহ নেই। আমি একে ভালোবাসিনে। একে ভালো বলিনে। শুধু একে মেনে নিই। একদা আমার পণ ছিল বিনা পরীক্ষায় কিছুই মেনে নেব না। না ঈশ্বর, না পরকাল, না পুনর্জন্ম। এখনও গীতার মূলতত্ত্ব মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু অর্জুনের মতো আমিও সভয়ে উচ্চারণ করি, 'দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টৈব কালানলসন্নিভানি দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম'। বাকিটুকু বাদ দিই।

'নিষ্ঠুর বাস্তব, তোমাকে আমি মানি। কিন্তু তুমিই শেষ কথা নও। তোমাকে আমার চোখের ওপর ছুড়ে মেরেছে যে, আমার দৃষ্টি তারই প্রতি নিবদ্ধ। সে করালদশনা নয়। তার মুখ কালানলসন্নিভ নয়। 'সে' বললে কেমন পর পর ঠেকে। তাই 'সে' না বলে আমি বলি 'ও'। ও আমার একান্তই আপন। আমি ওর, ওর সঙ্গেও আমার নিত্য সম্পর্ক। এমন দিন যায় না যেদিন আমি ওর উড়ে চলার ধ্বনি শুনতে না পাই। আদালতের চাপা কোলাহলকে ছাপিয়ে ওঠে ওর পলায়নধ্বনি। আমি এজলাস ছেড়ে উঠে যেতে পারিনে। আমার আসনের সঙ্গে আমি গাঁথা। আমার দুই কানই সাক্ষীর বা আসামির দিকে, পাবলিক প্রসিকিউটর বা আসামির উকিলের দিকে। তবু কেমন করে কানে এসে বাজে অন্তরালবর্তিনীর নূপুর শিঞ্জন। আছে আছে আরও একজন আছে, যে এদের সকলের প্রতিবাদরূপিণী। যে এদের কারও চেয়ে কম বাস্তব নয়, কম প্রমূর্ত নয়। যাকে ধরতে জানলে ধরা যায়। ছুঁতে জানলে ছোঁয়া যায়।

'নিয়োগীর উনি তাঁকে নর্দমার থেকে বাঁচাতে পারেননি। আমার ও আমাকে কর্দম থেকে বাঁচিয়েছে। আমি যে বেঁচে আছি এটা ওরই কল্যাণে। বিয়ের বউ যা পারে না ও তা পারে। কেন তাহলে আমি বিয়ের কথা ভাবতে চাইব! তোমরা এমন কী জিতেছ! আমি এমন কী হেরেছি! আমার শুভ্র কেশ আমার শ্বেতপতাকা নয়। আমি পরাজয় স্বীকার করিনি। নিষ্ঠুর বাস্তবের সঙ্গে আমার নিত্য সংঘর্ষ। তা সত্ত্বেও আমি অপরাজিত। আপন ভুজবলে নয়, ওর রক্ষাকবচ ধারণ করে। পুরুষ চায় রণে অপরাজেয়। যে নারী তাকে অপরাজিত থাকতে সহায়তা করে সে-ই তার এষা। এ যদি পার্থিব নারী না হয় তাতে কী আসে-যায়!

'মৈত্র, তুমি হয়তো ভাবছ আমি কী হতভাগ্য! আমাকে চালতার অম্বল রেঁধে খাওয়াবার কেউ নেই। বাবুর্চিটা সুক্তো পর্যন্ত রাঁধতে জানে না। পাটনার লাটভবনে লর্ড সিনহার মতো হাজার সাহেব সাজলেও আমার রসনাটি তো বাঙালির। আমিও এককালে নিজেকে হতভাগ্য মনে করেছি, কীসে এ দশা থেকে পরিত্রাণ পাই তার উপায় অন্বেষণ করেছি। বিবাহের মধ্যে পরিত্রাণের কূলকিনারা পাইনি। মানুষ তো কেবল রুটি খেয়ে বাঁচে না। তেমনি পুরুষ তো কেবল বউ পেয়ে বাঁচে না। তাকে তার জীবনের দুই দিক মেলাতে হয়। সুন্দরের সঙ্গে কুৎসিতের। শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের। আমার জীবনে আমি কোনোমতেই দু-দিক মেলাতে পারিনি। তাই ঐশ্বর্যের মধ্যেও জ্বলেছি। অবশেষে একপ্রকার পরিত্রাণের পন্থা পেয়েছি। এখন আমার সে-জ্বালা নেই, আমি শান্ত। আমার পরিত্রাণের পন্থা পলায়নে নয়, পলায়মানার পশ্চাদ্ধাবনে।'

পাঁচ

রাত হয়েছিল। তন্দ্রায় জড়িত কণ্ঠে মৈত্র বললেন, 'সুর, তুমি আজ আমাকে কী এক আজব রূপকথা শোনালে! এমন বানাতেও পার!'

সুর একটু হাসলেন। বললেন, 'তা কাহিনিটা লাগল কেমন?'

'স্রেফ ফাঁকি দিলে।' মৈত্র বললেন হাই তুলতে তুলতে। 'আমি আশা করেছিলুম তোমার জীবনের প্রচ্ছন্ন করুণ রোমান্স শুনতে পাব। তার কথা, যাকে তুমি বিয়ে করতে চেয়েছিলে, পাওনি বলে অবিবাহিত রয়েছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে আছে। এদেশে না হোক ওদেশে। 'সে' একদিন 'ও' হবে কি না জানিনে, কিন্তু তোমার 'ও' যাকে বলেছ ও তার বিকল্প নয়। আচ্ছা আজ তবে আসি।'

'হবে না, হবে না। 'সে' তার স্থান ছেড়ে দিয়েছে। 'ও' আমার নয়ন জুড়েছে ও জুড়িয়েছে। আচ্ছা, শুনতে চাও তো শোনাব আরেক দিন।' এই বলে সুর তাঁকে মোটরে তুলে দিতে চললেন। শোফারকে হুকুম দিলেন, 'প্রিন্সিপাল সাবকা কোঠি।'

বেয়ারা এসে তাঁর সান্ধ্য পোশাক খুলে নিল। পরিয়ে দিল শোবার পায়জামা। এখন রাত জেগে মামলার নথি পড়া।

সোনার ঠাকুর মাটির পা

সভাভঙ্গের পর হল থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ আমার পিঠের উপর ছোট্ট একটি কিল। ভাবি ভিড়ের চাপে কারও হাত ঠেকে গেছে। তাই কিল খেয়ে কিল চুরি করি। ট্রামে বাসে অমন তো কত হয়। কিন্তু কিলের পর চড় পড়তেই আমার হুঁশ হয়।

পেছন ফিরে দেখি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের নবকলেবর। তেমনি শীর্ণ ঋজু দেহযষ্টি। কাঁচা-পাকা একমুখ দাড়ি-গোঁফ। চোখের দুষ্টু হাসি। হ্যাঁ, তেমনি কিল চড় আদরের পদ্ধতি। সে কি জীবনে ভোলা যায়!

'কী রে, চিনতে পারছিসনে! হা হা হা হা হা!' জড়িয়ে ধরে বলেন নব প্রফুল্ল। হাসিটা কিন্তু আচার্যদেবের নয়।

'চিনতে পারছি বই কী, কিন্তু নামটি তো মনে আসছে না।' আমি সংকোচের সঙ্গে বলি, ইদানীং আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়েছে। নামগুলোই ভুলে যাই, মুখগুলো মনে থাকে।

'হাসালি। হা হা হা হা হা! বদনদাকে এর মধ্যেই ভুলে গেলি? আউট অফ সাইট আউট অফ মাইণ্ড'। তিনি আরও গুটিকয়েক কিল চড় মারেন।

'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রিয় শিষ্য না হলে অমন সুমধুর করস্পর্শ আর কার হবে। কিন্তু বাইশ বছর বাদে হঠাৎ রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো তুমি উদয় হলে কোন বনান্ত থেকে? আমি তো জানতুম তুমি পাকিস্তানে বাস করছ।' আমি চিনতে পারি ও দুই হাত ধরে নাড়ি।

'কেন, পাকিস্তানে যাব কোন দুঃখে? আমার বাড়ি যদিও ওপারে, আশ্রম তো এপারে—বালুরঘাট মহকুমায়। তবে আশ্রম ছেড়ে কোথাও বড়ো-একটা যাওয়া হয় না। চার-পাঁচ বছর অন্তর একবার কলকাতা ঘুরে যাই, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি। তোর সঙ্গে দেখা হয় না তার কারণ তুই শান্তিনিকেতনে থাকিস।' তিনি আমার সঙ্গে চলতে চলতে বলেন।

'এখন কিছুদিন থেকে কলকাতায়। কেউ তোমাকে জানায়নি?' আমি বিস্মিত হই।

'না। এমনি খবরের কাগজে দেখলুম আজ তোর বক্তৃতা আছে। তাই তো দেখা পেলুম। যাক, তুই আমাকে ভুলে যাসনি তাহলে।' বলে তিনি আবার আদর করেন।

'কী যে বল, বদনদা! পঞ্চাশ বছরের বন্ধুতা কি ভোলা যায়? চলো, আমার সঙ্গে চলো।' এই বলে ওঁকে আমার জন্যে আনা গাড়িতে তুলি।

বদনদা খদ্দরের ঝোলাসমেত গাড়িতে উঠে বসেন।

'সত্যি, পঞ্চাশ বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। এই তো সেদিনকার কথা। তোর সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ পুরীর জগন্নাথের মন্দিরে। তোর ঠাকুমার সঙ্গে তুই, আমার জ্যাঠাইমার সঙ্গে আমি। চার জনে মিলে মহাপ্রসাদ ভাগাভাগি করে সেবা করি। মন্দিরের চত্বরে রোজ আমাদের দেখা ও সেবা হত। ধর্মে মতি ছিল না মহাপ্রসাদে রুচি ছিল বলা শক্ত। তারপর কলকাতা ফিরে এসে বিজ্ঞান কলেজে ভরতি হই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সংস্পর্শে আসি। ওসব পুজোআর্চা আর ভালো লাগে না। এবার থেকে দরিদ্রনারায়ণই আমার দেবতা। মহাপ্রসাদ হচ্ছে তাঁরই সেবার অন্ন। তার থেকে তিনি দয়া করে যা দেন সেইটুকুই আমার ভোজ্য।' গাড়িতে বসে বলে যান বদনদা।

'তারপর তোমাকে আবার দেখি চার বছর বাদে পাটনায়।' আমার মনে পড়ে যায়।

'সেই চার বছরের ভিতরেই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। গান্ধীজির ডাকে অসহযোগে ঝাঁপ দিতে গিয়ে কলেজ ছাড়ি, বিজ্ঞান ছাড়ি, আচার্যদেবকেও ছাড়ি। খদ্দরের ব্রত নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরি। সারা উত্তরভারত

পরিক্রমা করি। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে জেলেও যেতে হয়। সেটা আমার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। শুধু গঠনের কাজ তো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য স্বাধীনতা। তারজন্যে সত্যাগ্রহ। আমিও একজন সৈনিক।' বদনদা রোমন্থন করেন।

গুজরাতে গান্ধীজির সঙ্গে সবরমতী আশ্রমে মাস কয়েক কাটিয়ে সেই যে প্রব্রজ্যা নেন তার সমাপ্তি ঘটে অসমে। তারপর গান্ধীজিরই আদেশে তিনি আশ্রম স্থাপন করে সেইখানেই স্থির হয়ে বসেন। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলায়। তাঁর বাড়ির খুব কাছে। সেখানে তিনি কেবল খাদি তৈরি করেন তা নয়, সঙ্গে করেন টিনের কাজ। টিন কেটে লণ্ঠন, ল্যাম্প, কুপি। তার সঙ্গে যোগ দেয় লোহার কাজ—লাঙলের ফাল, দা, কাটারি, ছুরি, কাস্তে, কোদাল। কাঠের কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলে।

'তৈরি করা তত কঠিন নয়, বিক্রি করা যত কঠিন। হাটে হাটে পাঠাতুম, জলের দরে ছাড়তুম। ঘর থেকেই লোকসানের কড়ি জোগাতে হত। বাবা ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। স্বদেশি যুগে উনিও রকমারি পরীক্ষানিরীক্ষা করে বিস্তর টাকা জলে দিয়েছিলেন।' দাদা বলেন।

'আমার মনে আছে তোমার আশ্রমের লণ্ঠন আমি রোহনপুরের হাটে কিনেছিলুম। তোমার সঙ্গেও দেখা হয় তার কিছুদিন বাদে। তুমি তখন সত্যাগ্রহ করে বেড়াচ্ছ—বেআইনি নুন তৈরি। তোমাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছিল, করিনি। তুমিও আমাকে বিব্রত করবে না বলে অন্যত্র ধরা পড়েছিলে।' কবেকার সব কথা মনে পড়ে আমার।

'গ্রেপ্তার হলে তোর হাতে না হওয়াই ভালো। আমার তখন অর্জুনবিষাদ। তোরও তাই। ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়ের সংগ্রাম যেন তোর সঙ্গে আমার সংগ্রাম না হয়।' বদনদা আর একবার হেসে ওঠেন। হা হা হা হা হা।

'হ্যাঁ, তোমার ট্রায়াল হত আমারও ট্রায়াল। তোমার ভাগ্যে নুন অন্য জায়গায় পাওয়া গেল। আমারও ভাগ্যে বলতে পারি।' আসলে নুন নয়, নোনামাটি।

আরও কতক্ষণ স্মৃতিচারণের পর বদনদা হঠাৎ চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বলেন, 'কিন্তু এত কান্ড করে শেষটা কী লাভ হল রে? সে সব অঞ্চল তো এখন পাকিস্তানে।'

দুজনেই চুপ করে থাকি। মোটর ততক্ষণে চৌরঙ্গি দিয়ে ছুটেছে।

'হা হা হা হা হা। তুই-না আমাকে বলেছিলি স্বাধীনতার দিন যে আমাদের নতুন রাজত্ব দুশো বছর টিকবে। বাইশ বছর যেতে-না-যেতে এ কী দেখছি! চতুর্দিকে ফাটল, চতুর্দিকে ভাঙন, যেন মোগল রাজত্বের শেষ দশা। যে রেটে জল ঢুকছে জাহাজ ডুবতে কতক্ষণ! জোর দশ বছর।' বদনদার গলা কাঁপে।

'ও কী বলছ বদনদা!' আমি ওঁর নৈরাশ্য সহ্য করতে পারিনে।

'না না, হাসির কথা নয়। আমি বড়ো দুঃখেই হাসছি রে। গান্ধীকে খুন করে তাঁর গুণ গাওয়া হচ্ছে ইনিয়েবিনিয়ে। একজনও মানুষ বিশ্বাস করে না যে এ স্বাধীনতা মিলিটারি ভিন্ন আর কেউ রক্ষা করতে পারে। অথচ বাপু বেঁচে থাকলে সবাই বিশ্বাস করত যে মিলিটারি নয়, তিনিই পারতেন রক্ষা করতে।' বদনদা আদ্রকণ্ঠে বলেন।

আমরা ফিরছিলুম গান্ধী শতবার্ষিকী সভায় যোগ দিয়ে। বদনদার কলকাতা আসার উদ্দেশ্যও তাই। প্রবীণ গান্ধীবাদীরা দেশের নানা স্থান থেকে এসে জড়ো হন। দেখেন দেশের লোক চলে যাচ্ছে তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। তাঁরা মুষলপর্বের অর্জুনের মতো অসহায় দর্শক। দস্যুদের বিরুদ্ধে গাণ্ডীব তুলবেন যে, গাণ্ডীবই তাঁদের চেয়ে ভারী।

'মস্ত ভুল করেছি বিয়ে করে।' বদনদা হারানো খেই হাতে নিয়ে বলেন। 'বাপুর বারণ ছিল, স্বরাজ না হওয়া তক বিয়ে কোরো না। তার মানে কি এই যে, স্বরাজ হতে না হতেই বিয়ে করতে পার? তোর সঙ্গে শেষ দেখার পর চটপট বিয়ে করে ফেলি। মেয়েটি আমার জন্যে পার্বতীর মতো তপস্যা করছিল। আমারও দরকার ছিল আশ্রমের জন্যে একজন লেডি ডাক্তার। বিয়ের পরেও অসিধার করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু বিনতাকে তার মাতৃত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত হত না, অধর্ম হত। তেমনি সুনুকেও জন্মলাভের

অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় হত। সুনু—সুবিনয়, আমাদের একমাত্র সন্তান। কলকাতায় ওর এমএ পড়ার একটা কিনারা করে দিতে পারিস?'

ভাগ্যিস গাড়ির ড্রাইভার ছিল হিন্দুস্থানি, নইলে শুনে কী মনে করত!

'বিয়ে করে তুমি ভুল করেছ কেন ভাবছ? ব্রহ্মচর্যের পর গার্হস্থ্য, এইরকমই তো শাস্ত্রে লেখে। বয়সটা অবশ্য বানপ্রস্থের। ''ভুল'' বলছ সেইজন্যেই কি?' আমি শুধাই।

'সেটাও একটা কথা বই কী। কিন্তু সেইজন্যে নয়। বিয়ে যতদিন করিনি ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কারও ভবিষ্যৎ ভাবিনি। বিয়ের পরে বাপ হয়ে অবধি ছেলের ভবিষ্যৎই ভেবেছি, দেশের ভবিষ্যৎ নয়। তোর কাছে গোপন করে কী হবে, ছেলেকেই আমি আশ্রমের ট্রাস্টি করে যেতে চেয়েছিলুম। আশ্রমটা যে আমারই ব্যক্তিগত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত তা বোধহয় জানিস।' বদনদা খুলে বলেন।

'ভালোই তো। সুনুরও একটা জীবিকা জোটে।' আমি মন্তব্য করি।

'সুনু কী বলে শুনবি? বলে, আমার ওতে বিশ্বাস নেই। অহিংসাতেও না। ওর মতে মহাত্মা তাঁর কাজ যা, তা চুকিয়ে দিয়ে গেছেন, আর কারও জন্যে বাকি রেখে যাননি।' বদনদা কাঁদো কাঁদো ভাবে বলেন।

'তাই নাকি? তা হলে সুনুর ভবিষ্যৎ কোন পথে?' আমি জিজ্ঞাসু হই।

'পাস, চাকরি, বিয়ে—গতানুগতিক পথে। নয়তো ছাত্র রাজনীতি, তার থেকে কমিউনিজম, তার থেকে নকশালপন্থা। তোরা পাঁচজনে ওকে সৎপরামর্শ না-দিলে ও যে একদিন বোমা ছুড়বে না তাই-বা কী করে জানব? হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী। সুনু কি দুনিয়ার বার!' বদনদা আমার হাতে হাত রেখে থরথর করে কাঁপেন।

দুই

আমার কুকুর বিন্দি আমাকে অভ্যর্থনা করতে ছুটে আসে। বদনদাকে দেখে তাঁকেও চার পা তুলে সংবর্ধনা জানায়। তিনি ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। বলেন, 'আমারও এরকম একটি পাহাড়ি কুকুর আছে। একটুও হিংস্র নয়।'

'কই, আমার বোনটিকে দেখছিনে কেন?' দাদা আসন নিয়ে বলেন।

'তিনি অনেক দিন বাদে বাপের বাড়ি গেছেন। থাকলে কত খুশি হতেন তোমাকে দেখে।' এরপর আমি তাঁকে চা অফার করি।

'দিলে ''না'' বলব না। আশ্রম থেকে ও-পাপ বিদায় করতে পারিনি। আমার বউ তো দিনে সাত-আট কাপ খায়। লেডি ডাক্তার কিনা, চাঙ্গা হওয়া চাই। তবে সুনুকেও সমান চাতাল করে তুলেছে। এখন ও কলকাতায় এসে চায়ের দোকানে বা কফি হাউসে আড্ডা দেবে তো। চা-বাগানের কুলির রক্ত চুষবে।' দাদা বিমর্ষ হন।

'চা থেকে কত বিদেশি মুদ্রা আসে খবর রাখ, বদনদা? অত বড়ো একটা ইণ্ডাস্ট্রি উঠে যায় এই কি তোমার মনের ইচ্ছা?' আমি তর্ক করি।

'ওই বিদেশি মুদ্রাই তোরা বুঝিস। শুনতে পাই বাঁদর চালান দিয়েও বিদেশি মুদ্রা লুটছিস। এর একটা নৈতিক দিক আছে সেটা কেউ দেখবে না। দেখবে শুধু ভৌতিক দিকটাই। অমনি করেই নাকি দেশ ধনবান হবে, বলবান হবে।' দাদা ফুৎকার করেন।

আমি চা ঢেলে দিই। বিস্কুট এগিয়ে দিই।

'আবার বিস্কুট, কেন মুড়ি ঘরে নেই? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র মুড়ি খেতেন ও খাওয়াতেন। খেয়েছিস ওঁর সঙ্গে আত্রাইতে। মনে নেই।' দাদা মনে করিয়ে দেন।

'কিন্তু বিস্কুট তো এখন আমরাই তৈরি করছি।' আমি আবার তর্ক করি।

'মদও তো আজকাল আমরাই চোলাই করছি। মৈশুরে আঙুর ফলছে। কিন্তু গরিব দেশবাসীকে বিস্কুট ধরিয়ে ওদের মাথা খাওয়া কি পাপ নয়? এরপরে মদও ধরাব তো। একবার যদি ও-রসের স্বাদ পায় তবে বঙ্গোপসাগর হবে মদ্যোপসাগর। সাগর শুষে ফেলবে অগস্ত্য ঋষির বংশধর আমাদের তৃষ্ণার্ত দেশবাসী।' দাদা শিউরে ওঠেন।

মুড়িও ছিল বাড়িতে। দাদা বিস্কুট ঠেলে দিয়ে মুড়ি নিয়ে বসেন। বলেন, 'আমার সবচেয়ে ভালো লাগে মোটা চালের ভাত, তার পরেই মুড়ি। পেটও ভরে, মনও ভরে।'

আমরা দুজনে ছাদে যাই। আরামকেদারা নিয়ে বসি। দিকে দিকে তেতলা চার-তলা বাড়ি। সাত-তলা আট-তলাও দেখা যায়। দাদা চোখ বুজে বলেন, 'এ তোরা করছিস কী? এ যে সোনার ঠাকুর মাটির পা।'

কথাটা এককালে আইরিশ কবি জর্জ রাসেলের বইয়ে পড়েছিলুম। যাঁর ছদ্মনাম এ ই। দাদা মনে পড়িয়ে দিলেন।

'তোদের সভ্যতা, তোদের সংস্কৃতি, তোদের রাষ্ট্র, তোদের সমাজ এই বাইশ বছরে সোনার ঠাকুরের আকৃতি নিয়েছে। কিন্তু পা দুটি তো মাটির। সেই শ্রমিক আর সেই কৃষক। তাদের না আছে পুঁজি, না আছে জমি। গ্রামে গেলে দেখবি চড়া সুদে কর্জ করছে, যেটুকু আছে সেটুকুও বিকিয়ে যাচ্ছে। ধনী আরও ধনী হচ্ছে, গরিব আরও গরিব হচ্ছে। সোনার ঠাকুর একদিন দেখবেন যে তাঁর মাটির পা আর বইতে পারছে না। এমন মাথাভারী ব্যবস্থা কেউ কি পারে বইতে? তখন কী হবে জানিস? না কি আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে?' দাদা আমাকে হাতের কাছে পেয়ে ভয় দেখান।

'সেইজন্যেই তো সোশ্যালিজমের কথা উঠেছে।' আমি কাটান দিই।

'ওর মানে কী, রজত? আমার অল্পবিদ্যায় এই বুঝি যে, রাষ্ট্রই হবে সমস্ত অর্থের মালিক, যেমন সমস্ত অস্ত্রের মালিক। এক হাতে অস্ত্রের মনোপলি আর অন্য হাতে অর্থের মনোপলি নিয়ে রাষ্ট্রই হবে হিরের ঠাকুর। কিন্তু মাটির পা তো যেমনকে তেমন রয়ে যাবে। না কি পাথরের পা হয়ে যাবে?' বদনদা সংশয়ের স্বরে বলেন।

'কে জানে। আমরা তো হাতে-কলমে পরখ করে দেখিনি।' আমি পাশ কাটাই।

'আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলে যে অস্ত্র ও অর্থ কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তার চেয়ে সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ শ্রেয়। কিন্তু সে যে কতদিনে হবে, তা আমার জ্ঞানগম্য নয়। মহাত্মা বেঁচে থাকলে তিনিই আলো দিতেন। তাঁর অভাব প্রত্যেক দিনই অনুভব করছি। বরং আরও বেশি করে।' দাদা বিলাপ করেন।

'কেন, তিনিই কি বলে যাননি আত্মদীপো ভব?' আমি সান্ত্বনা দিতে যাই।

'আত্মদীপ হতে চাইলেও পারছি কোথায়?' দাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'এই দ্যাখ-না, কালের হাওয়া আমার আশ্রমেও বইছে। কর্মীরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে। ভাগচাষিরাও রায়তি সত্ব দাবি করছে, না দিলে জমি জবরদখল করবে। আমার কি সহানুভূতি নেই? কিন্তু আমি হলুম প্র্যাকটিকাল মানুষ। মজুরি বা মাইনে বাড়ালে বাড়তি দাম খদ্দের দেবে না, অগত্যা সরকারের কাছেই হাত পাততে হবে। তা কি পারি কখনো? আর জমিতে ভাগচাষির রায়তি সত্ব স্বীকার করার পর ও-জমি আর আশ্রমের থাকে না। তাহলে আশ্রমের চলে কী করে?'

'তাহলে তুমি এক কাজ করো, বদনদা। ওদের সবাইকে পার্টনার করে নাও। ওরা জানুক যে আশ্রমটা ওদেরই।' আমি পরামর্শ দিই।

'ও-কথা যে কখনো মাথায় আসেনি তা নয় রজত। কিন্তু দক্ষ কর্মীরা যে যেখানে দু-পয়সা বেশি পাবে সেখানেই চলে যাবে। এই ওদের রীতি। অদক্ষ কর্মীদের স্থিতিও কি সুনিশ্চিত? স্বাধীনতার পূর্বে যাদের পেয়েছি তারা আমাকে ছাড়েনি। সুখে-দুঃখে আমার সঙ্গেই থেকেছে। তাদের অনেকেই মৃত। অনেকে আবার পাকিস্তানে চলে গেছে। নতুন লোক নিয়ে ভাঙা হাট চালিয়ে যাচ্ছি রে। এরা কি অংশীদার হতে চায়, না অংশীদারি পেলে টিকবে?' বদনদা দাড়ি ছেড়ে মাথায় হাত দেন।

ভাবনার কথা বই কী। আমি চুপ করে থাকি। কিছুদিন আগে আর এক বন্ধুর আশ্রম দেখতে গিয়ে দুঃখিত হয়েছিলুম। হাতিশালে হাতি আছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া। লোক আছে লশকর আছে। তবু রাজপুরী খাঁ খাঁ করছে—ঘুমন্ত পুরী। কারণ বন্ধুটি নেই।

এ কাহিনি শুনে বদনদা বলেন, 'একে একে নিবিছে দেউটি। আমিই-বা আর কদ্দিন! আমার পরে আমারটিও ঘুমন্তপুরী হবে। তাতে প্রাণসঞ্চার করবে কে? বিনতা আমার সহধর্মিণী। তারই তো এ ভার বহন করার কথা। কিন্তু ও কী বলে শুনবি?'

আমি কান পেতে রই। বিন্দি আমার পায়ের কাছে শুয়ে।

'বিনতা বলে, তোমরা এটার নাম রেখেছ সত্যাগ্রহাশ্রম। এটা তো সেবাশ্রম নয় যে আমিও চালাতে পারব। সত্যাগ্রহাশ্রম করেছ সাবরমতীর অনুসরণে। সেখানকার নিয়ম ছিল শান্তির সময় সংগঠন, সংগ্রামের সময় সত্যাগ্রহ। এখানকার নিয়মও যদি তাই হয় তবে একদিন সত্যাগ্রহের ডাক আসতে পারে। তুমি থাকলে সত্যাগ্রহে নামবে, দ্বিধা করবে না। কিন্তু আমি কি তা পারি? আমার হাতে সবসময়ই একরাশ প্রসূতি ও শিশু। শুনলি তো? আমার নামকরণেই আমি জব্দ। তখন কি ছাই জানতুম যে সত্যাগ্রহের পাট উঠে যাবে?' বদনদা আক্ষেপ করেন।

'সত্যি উঠে গেছে না কি?' আমি প্রশ্ন করি।

'মেকি সত্যাগ্রহ এখানে-ওখানে হচ্ছে। যারা করছে তারা কেউ গান্ধীবাদী নয়। খাঁটি সত্যাগ্রহ এখন খাঁটি গব্য ঘৃতের চেয়েও দুর্লভ।' বদনদা হাসেন। কিন্তু হা হা করেন না। করলে হয়তো হাহাকারের মতো শোনাত।

আরও কিছুক্ষণ গল্পসল্প করে আমরা দুজনে ছাদ থেকে নেমে আসি। নৈশভোজনের সময় হয়েছিল। আমি বদনদার জন্যেও রাঁধতে বলে দিয়েছিলুম কিন্তু তার অনুমতি নিইনি। এবার অনুমতি চাই।

'সে কী! আমি যে আমার শালিপতির অতিথি। ওঁরা যে আমার জন্যে অভুক্ত বসে থাকবেন। অ্যাঁ, করেছ কী রজত!' তিনি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন।

'সেই যে মহাপ্রসাদ সেবা, এটা তারই একটা অক্ষম অনুকরণ বদনদা। তোমার যেটুকু ইচ্ছা খেয়ো। ওঁদের ওখানকার জন্যে পেটে জায়গা রেখে দিয়ো।' আমি প্রস্তাব করি।

'না না, তা কি হয়? তোর সঙ্গে বাইশ বছর বাদে খাচ্ছি। পেট ভরেই খাব। ওঁরা কিছু মনে করবেন না।' তিনি ঠাণ্ডা হন।

তিন

আহার করতে বসে বদনদা কিছুক্ষণ প্রার্থনা করেন। আশ্চর্য প্রার্থনা। কখনো কারও মুখে ওরকম প্রার্থনা শুনিনি। ঠিক যেন খ্রিস্টানদের গ্রেস বিফোর মিট। আমিও মনে মনে উচ্চারণ করি। মুখ ফুটে বলতে চক্ষুলজ্জা।

'এই যে দুটি খেতে পাচ্ছি এরজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। এই-বা কজন পাচ্ছে? এই বা ক-দিন পাব? আমার অন্নদাতাদের যেন আমি না ভুলি। যেন ওদের শ্রমের মূল্য দিই ওদেরই মতো শ্রমে আর স্বেদে। আর ওদের যেন সেবা করি অহেতুক প্রেমে।'

বদনদার এই প্রার্থনা কার উদ্দেশ্যে নিবেদিত তা জানিনে। হয়তো ঈশ্বরের, হয়তো মানবের। হয়তো ওটা প্রার্থনাই নয়, একটা সংকল্পবাক্য। অভিভূত হয়ে শুনি। তারপর আহার শুরু হলে জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কি খ্রিস্টানদের মতো গ্রেস বিফোর মিট?'

'যা বলেছিস। আমাদের হিন্দুদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে অর্পণ করে প্রসাদ সেবা করা। ওদের প্রথা হচ্ছে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাওয়া। আমিও ধন্যবাদ জানিয়ে খাই। কিন্তু কাকে? ঈশ্বরকে? না ভাই, তাঁকে নয়। তিনি তো ঐশ্বর্যময়। আমার ঐশ্বর্যে কাজ কী। আমি চিনি দরিদ্রনারায়ণকে। ভুখা নারায়ণকে। নাঙ্গা নারায়ণকে। যিনি লাঙল ধরে মাঠে মাঠে ফসল ফলান। যিনি তাঁত ধরে ঘরে ঘরে লজ্জা নিবারণ করেন।' বদনদা যেন তাঁকে প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন।

আমি এটা প্রত্যাশা করিনি। বলি, 'বেশ তো, কিন্তু এর মানে কী? ''এই-বা ক-দিন পাব?''।'

'দ্যাখ রজত, আমার এ প্রার্থনা আজকের নয়। এটা আমি অন্তর থেকে পাই পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়। তখন আমি জেলে নয়, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। চোখের সামনে দেখি হাজার হাজার মহাপ্রাণী না খেতে পেয়ে মারা

যাচ্ছে। আমিই-বা কে যে দু-বেলা দু-মুঠো অবধারিতরূপে দিনের পর দিন পাব। মন্বন্তরটা কীভাবে হল তোর মনে আছে নিশ্চয়। কলকাতার ব্যবসায়ী আর সরকারের ঠিকাদার গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠিয়ে যেকোনো দামে চাল কিনে আনে। চাল তো নয়, মুখের গ্রাস। কেনা তো নয়, কাগজের নোট ধরিয়ে দিয়ে লুট। দেখে আমার গা জ্বলে যায়। জীবনে অমন কনফিডেন্স ট্রিক দেখিনি। সেদিন থেকেই আমার মন উঠে গেছে তোদের এই সভ্যতার ওপর থেকে। শুধু ইংরেজ রাজত্বের ওপর থেকেই নয়। এটা একটা কনফিডেন্স ট্রিক। এই যে টাকা দিয়ে চাল কেনা, যা তোরা প্রতিদিন করছিস। কেন, শ্রম দিয়ে কিনিসনে কেন? স্বেদ দিয়ে কিনিসনে কেন? প্রেম দিয়ে প্রতিদান হিসেবে নিসনে কেন?' বলতে বলতে দাদা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

আমি কেমন করে তাঁকে বোঝাব যে টাকা-পয়সার উদ্ভব হয়েছে বিনিময়ের সুবিধার জন্যে। তাতে সকলেরই সুবিধা। চাষিদের কি কিছু কম! ওই একটি বার ওরা ঠকেছিল। পরে ওরাও চালাক হয়ে গেছে।

বদনদা খেতে খেতে বলেন, 'দুনিয়া জুড়ে যে ইনফ্লেশন চলেছে তার থেকে চাষিরও কিছু ফায়দা হচ্ছে, তা ঠিক। কিন্তু ওই কনফিডেন্স ট্রিক আবার মন্বন্তর ডেকে আনবে। আর সে-বারকার মতো গ্রামের লোকরাই লাখে লাখে মরবে, এ আমি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি রজত। আমি কেন পাপের ভাগী হতে যাই। আমি চাই সময় থাকতে এর প্রতিবিধান। কিন্তু কার কাছে গেলে প্রতিবিধান হবে? সকলেই তো পাপের ভাগী। এই কনফিডেন্স ট্রিক থেকে সকলেই তো লাভবান হচ্ছে। কেউ কম, কেউ বেশি। তা সত্ত্বেও আমি জানি এ খেলা চিরকাল চলতে পারে না। এর কুফল ফলবেই।' দাদা ওয়ার্নিং দেন।

আদি খ্রিস্টানদের মতো তিনি ব্যাকুলভাবে বলেন, 'যাও, খেটে খাও। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাও। মাটির সঙ্গে আত্মীয়তা ফিরে পাও।'

এরপরে দাদা আবার হা হা হা হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, 'নিজের ছেলেকেই বোঝাতে পারলুম না। যে আমার নিজের হাতে-গড়া। আমার সহকর্মীদের এক জনও যদি শুনত আমার কথা। সকলেই বোঝে টাকা, আরও টাকা। মজুরি আরও বাড়াও। মাইনে আরও বাড়াও। আমার কি ছাই নাসিকের মতো একটা ছাপাখানা আছে যে যত খুশি ছেপে বিলিয়ে দেব? আর মেকি দৌলতের নহর বয়ে যাবে। অসত্যমেব জয়তে হা হা হা হা হা!'

'তবে এবার তোদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি রজত। লোকে এবার পড়ে পড়ে মরবে না। মারবে ও মরবে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ যা হবার তা হবে।' দাদার দু-চোখ জ্বলতে থাকে। তারপর আবার স্নিগ্ধ হয়।

'দেশকে তুমি অহিংস রাখতে পারবে না?' আমি অশান্ত বোধ করি।

'আমি কেন, স্বয়ং মহাদেবও পারবেন না।' তারপর কী ভেবে বলেন, 'কে জানে পারতুম হয়তো। যদি ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ না করতুম। বেশিদিনের জন্যে নয় যদিও।'

'ব্রহ্মচর্য! ব্রহ্মচর্য দিয়ে কখনো বিপ্লব রুখতে পারা যায়!' আমি তো অবাক। বদনদার কি ভীমরতি হয়েছে? বাহাত্তরের আর কত দেরি!

'অহিংসা দিয়ে পারা যায়, যদি অহিংসার সঙ্গে থাকে ব্রহ্মচর্য। তেমন দু-চার জন সাধক এখনও রয়েছেন। সেইজন্যেই তো আশা হয় যে আমরা সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠতে পারব। কিন্তু তাঁরাই-বা আর কদ্দিন? আমাদের জেনারেশনটাই মরে ঝরে যাচ্ছে। একে একে নিবিছে দেউটি।' বদনদা করুণ স্বরে বলেন। বিলাপের মতো শোনায়।

নীরবে আহারপর্ব সারা হয়। একজনের বিশ্বাসের সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?

আমি অন্য প্রসঙ্গ পাড়তে গেলে বদনদা আমার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলেন, 'রুশ বিপ্লবের সময় অভিজাত ঘরের অঙ্গনাদের দেখা গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে। এক টুকরো হিরের বিনিময়ে এক টুকরো রুটির সন্ধানে। তাহলেই বুঝতে পারছিস কোনটার চেয়ে কোনটার মূল্য বেশি। তোদের মূল্যবোধ যদি এখন থেকেই শোধরাত তাহলে বিপ্লব কোনোদিন ঘটতই না। বিপ্লবকে অহিংসা দিয়ে রোধ করার প্রশ্নও উঠত না।'

তর্ক করব না বলে মুখ বুজে থাকি। দাদা বলে যান, 'তা ছাড়া সবাই তো একরকম সুনিশ্চিত যে অহিংসার যুগ ফুরিয়েছে। তার আর কোনো ভূমিকা নেই ইতিহাসে। তাই যদি হয় তবে বিপ্লবের দিন অহিংসার কাছে অত বড়ো একটা দাবি পূরণ করবেই-বা কে, যদি বহুকালের ও বহুজনের প্রস্তুতি না থাকে।'

দাদা একটা লবঙ্গ মুখে দিয়ে বলেন, 'মাটির পা দুটি গলে গেলে সোনার ঠাকুরটি টলে পড়বেন, এর মধ্যে এমন এক ভবিতব্যতা আছে যে আমরা কজন অহিংসক এর খন্ডন করতে পারিনে। তা বলে কি আমাদের কর্তব্য নেই? আমরা সাক্ষীগোপাল?'

আমারও তো সেই একই জিজ্ঞাসা। 'আমরাও কি সাক্ষীগোপাল?'

দাদা বাল্যকালে ফিরে যান। বলেন, 'কাসাবিয়াঙ্কার কাহিনি মনে পড়ে?' 'The boy stood on the burning deck.' আমি আবৃত্তি করতে শুরু করি।

'আমিও সেইরকম একটা জ্বলন্ত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে। জাহাজের গায়ে গোলা পড়ছে। জাহাজের প্রতি অঙ্গে আগুন। অবধারিত মরণ। সকলেই পালাচ্ছে। আমাকেও বলছে পালাতে। আমি কিন্তু আমার পদতলভূমি থেকে ভ্রষ্ট হব না। একচুলও নড়ব না। বাপুজির আদেশ, আমাকে স্বস্থানে স্থির থাকতে হবে। কাসাবিয়াঙ্কাকে যখন বলা হয় তোমার পিতা নিহত, বেঁচে থাকলে আদেশ ফিরিয়ে নিতেন, সে তা বিশ্বাস করে না। বলে, পিতার আদেশ আমাকে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। হ্যাঁ, আমাকেও এইখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। বাপুজির আজ্ঞা।' দাদা দুই চোখ মোছেন।

'তার মানে কি ভূগোলের বিশেষ একটি স্থানে?' আমি প্রশ্ন করি।

'তার মানে, জীবনের বিশেষ একটি পোজিশনে। আমরা বরাবরই গঠনের ও সংঘাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। শান্তির সময় পাটাতন পরিষ্কার করি, সংগ্রামের সময় আগুনের সঙ্গে মোকাবিলা করি। দগ্ধ হবার ভাগ্য থেকে তো কেউ আমাদের বঞ্চিত করতে পারে না। ওই দগ্ধ হওয়াটাই আমাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা।'

বদনদার বদনে অপূর্ব আভা।

নীলনয়নীর উপাখ্যান

অভূতপূর্ব, অভাবনীয় কান্ড। বেকসুর খালাসের হুকুম পেয়ে খুনের আসামি কোথায় আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচবে তা নয়, সে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকায়। তারপরে হাউহাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, 'আপনারা আমার সর্বনাশ করলেন। আমি মুক্তি চাইনি, শাস্তি চেয়েছি। আমি বাঁচতে চাইনি, মরতে চেয়েছি। এই পোড়ামুখ আমি কাকে দেখাব? এই পোড়াজীবন আমি কেমন করে কাটাব? কে আমাকে বিশ্বাস করে চাকরিবাকরি দেবে? আপনারা আমার সর্বনাশ করলেন। এ হুকুম ফিরিয়ে নিন, ফিরিয়ে নিন।'

জজসাহেব অবাক। জুরিরা বিমূঢ়। পাবলিক প্রসিকিউটর স্তম্ভিত। এঁরা সকলে আদালত থেকে উঠে চলে গেলেন।

জজসাহেব তাঁর চেম্বারে গিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরকে স্মরণ করলেন। তিনি প্রবেশ করতেই সাহেব বলেন, 'স্যানিয়েল, এ যে হিতে বিপরীত। আমি তো ওকে একেবারে ছেড়ে দিতে চাইনি। চেয়েছিলাম যাতে ফাঁসি না হয়ে দ্বীপান্তর হয়। শুনানির আগে তোমাকে ডেকে বলেছিলুম, কাস্ট আয়রন কেস। সারদা হলে একে নির্ঘাত ঝুলিয়ে দিত। কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, নিরুপম আর নীলনয়নী এদেশের ওথেলো আর ডেসডিমোনা। আই বেগ ইয়োর পার্ডন, ডেসডিমোনা।

এখানে বলে রাখি, জজসাহেব ইংরেজি উচ্চারণ সম্বন্ধে খাঁটি ইংরেজ ছিলেন। তাঁর নাম চারুচন্দ্র রক্ষিত। কেউ তাঁকে সে-নামে উল্লেখ করলে তিনি চটপট শুধরে দিতেন, 'ইউ মিন, চারু চাণ্ডার র‍্যাকসিট।' তিনি একজন সিভিলিয়ান জজ। হাই কোর্টের সিভিলিয়ান জজেরাই তখনও সেশনস কেস শুনতেন। জুরিপ্রথা তখনও হাই কোর্টে বহাল ছিল, যদিও মফস্সল থেকে উঠে গেছে। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে।

সেবারে পাবলিক প্রসিকিউটর মাথা চুলকে বলেছিলেন, 'ইয়োর লর্ডশিপ আমায় কী করতে পরামর্শ দেন?'

সেবারে জজসাহেব পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'স্যানিয়েল, তুমিও যদি মনে কর এ লোকটি এদেশের ওথেলো, তাহলে মামলাটি এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে ওথেলোর প্রতি জুরির সহানুভূতি উদ্রেক হয়। যাতে জুরি মার্ডারের বদলে কালপেবল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টিং টু মার্ডার এই ভার্ডিক্ট দেয়।'

আইনত পাবলিক প্রসিকিউটরকে প্রভাবিত করা জজের কর্তব্য নয়। জজ হবেন নিরপেক্ষ। ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন। তবে তিনি জুরিকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, নরহত্যা সবসময় দন্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারার মধ্যে আসে না। কখনো কখনো ৩০৪ নম্বর ধারার প্রথমাংশ প্রযোজ্য। জুরিই মনস্থির করেন। জজ সাধারণত হস্তক্ষেপ করেন না।

পাবলিক প্রসিকিউটর আইনত জজের নির্দেশে কাজ করতে বাধ্য নন। তাঁকে যাঁরা নিযুক্ত করেছেন তাঁদের নির্দেশই তিনি পালন করবেন। এক্ষেত্রে প্রাণদন্ডেরই নির্দেশ। কেননা অপরাধটা একান্ত গুরুতর।

এইরকম ছিল মামলার শুনানির পূর্বের কথোপকথন।

পরিচালনকালে পাবলিক প্রসিকিউটর বোধহয় যথেষ্ট কঠোর হননি। কিছুটা কোমল হয়েছিলেন। তাহলেও এতটা কোমল নন যে জুরি আসামিকে একেবারেই অব্যাহতি দেবে। তিনি জজসাহেবকে বলেন, 'আমি সরকারকে এখন পরামর্শ দিতে পারি খালাসের বিরুদ্ধে আপিল করতে। তখন রিট্রায়াল হবে।'

জজসাহেব হাঁ হাঁ করে ওঠেন। 'তাহলে সারদা যে লোকটাকে নিশ্চিত ঝুলিয়ে দেবে।'

সে-সময় সারদাকান্ত সেনগুপ্ত ছিলেন অন্যতম সিভিলিয়ান জজ। আরও সিনিয়র। এর আগে তিনিই দায়রার মামলাগুলোর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। 'হাঙ্গিং জাজ' বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিল।

মিস্টার জাস্টিস র‍্যাকসিট সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়ে দু-গ্লাস শেরি দিয়ে তাঁর মনের দুঃখ ডুবিয়ে দিলেন।

ওদিকে আসামি তো আদালত থেকে বেরোতেই চায় না, বলে, 'কোথায় যাব? আমার বলতে কে আছে? একটি ছ-বছরের ছেলে।'

তখন নিরুপমের ভগ্নীপতি সত্যব্রত এগিয়ে এসে বলেন, 'তোমার দিদি আছেন। তোমার ছেলেকে তাঁর ওখানেই পাবে। চলো আমার সঙ্গে।'

নিরুপম তাঁর সঙ্গেই দিদির বাড়ি যায়। সেখানে তার ছেলেকে জড়িয়ে ধরে আর একদফা কান্নাকাটি করে। কিন্তু একটিও কথা বলে না।

দিদির পায়ে মাথা রেখে কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করে। কিন্তু এক বারও মুখ খোলে না।

জামাইবাবুকে তার যা বলার ছিল তা সে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে লিখে জানায়। 'আমার ভগ্নীপতি সত্যব্রত ভট্টাচার্যকে আমি আমার নাবালক পুত্র নিরঙ্কুশ ভট্টাচার্যের গার্জেন নিযুক্ত করিলাম। লাইফ ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির কাছ থেকে আমার যা পাওনা তা তিনি আদায় করিয়া আমার পুত্রের কল্যাণে ব্যয় করিবেন।' তারপর তার সেই কাগজের সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করার জন্য দুজন প্রতিবেশীকে ডেকে আনা হল।

সে-রাত্রে নিরুপম সেই বাড়িতেই ছিল। কিন্তু সকালে তার শোবার ঘরের দরজা খুলে দেখা গেল, সে উধাও।

অনেক খোঁজ করেও তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

তার ছেলের পরবর্তী জন্মদিনে সে আপনিই এসে হাজির হল। তার পরনে গৈরিক। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি কি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছ?'

সে বলে, 'না। এই দ্যাখো আমার উপবীত। আমি গৈরিক ধারণ করেছি এইজন্য যে কেউ আমার পূর্বাশ্রমের কথা জানতে চাইবে না। আমিও জানাব না।'

দুই

এখন পূর্বাশ্রমের কথা বলি, যতদূর জানি।

চাঁপাতলার নীলকণ্ঠ ঘোষ ছিলেন ডিরোজিয়োর সাক্ষাৎ শিষ্য। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একজন। ঘোষ বংশের ধারা ধরে তাঁর পুত্র নীলাম্বরও হিন্দু কলেজে পড়ে। হিন্দু কলেজ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হয় তখন ধারাবাহিকতা রক্ষা করেন নীলকমল, নীলরতন ও নীলবরণ ঘোষ।

নীলবরণের কন্যা নীলনয়নী। ওঁরা ডিরোজিয়ন বলে পরিচয় দিতেন। সেটা শুধু বাড়ির সদরমহলে। অন্দরমহলে চিরাচরিত পূজাপার্বণ, বারব্রত, চিকের আড়ালে বসে জলসা দেখা, বাইরে বেরোলে একহাত ঘোমটা। মেয়েদের সাধারণত ষোলো বছর বয়সের আগে বিয়ে হয়ে যেত। এঁরা পুরুষানুক্রমে সলিসিটর ও নীলরক্তের দাবিদার। বাড়িটাও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলের কলোনিয়াল স্টাইলে।

নীলনয়নী ষোলো বছর বয়সে বিয়ে করবে না। কলেজে পড়বে। এবং বেথুনে নয়, প্রেসিডেন্সি কলেজে। ততদিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের দরজা ছাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছিল। সেটা প্রথম বার নয়। প্রথম বার হয়েছিল পি কে রায়ের আমলে। গত শতাব্দীর শেষভাগে। তখন তিন জন ব্রাহ্ম ছাত্রীকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি করা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে তখনও কো-এডুকেশন চালু হয়নি। বাঙালি এ ব্যাপারে অগ্রণী।

এবার নীলনয়নী প্রেসিডেন্সি কলেজে গিয়ে দেখে, আরও অনেক ছাত্রী যোগ দিয়েছে। তারা বেশিরভাগই হিন্দু ঘরের। তারা এখন নিজেদের মধ্যে দল পাকায়। ছেলেদের সঙ্গে মেশে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাক্যালাপ শুরু হয়। নিরুপম ভট্টাচার্য বলে একটি ছাত্রের সঙ্গে নীলনয়নীর বন্ধুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় না, যেটা হয় সেটাও একপ্রকার প্রেম। সেটা সাধারণত বিবাহে পরিণত হয় না। থেকে যায় জীবনভরা হতাশায়।

আমাদের নিরুপম ও নীলনয়নী সে কথা জানত না।

শুধুমাত্র নীলনয়নীর সঙ্গে একসঙ্গে বসে ইংরেজি পড়ার জন্য নিরুপম আইএসসি-র পরে বিএ পড়ে। ফলে সে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না। ইকনমিক্স অনার্স পড়ে। ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পায়।

এদিকে নীলনয়নী অল্পের জন্য ফার্স্ট ক্লাস পায় না, ইংরেজিতে হাই সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পায়। সেইখানে তার পড়াশুনোয় ছেদ পড়ে। বাবা চরম পত্র দেন, 'বিএ পাসের পরে বিয়ে পাস।'

মা-ও বলেন, 'মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়। তোর বিয়ের বয়েস পার হয়ে যাচ্ছে। তোর জন্য আমরা সবাই উদ্বিগ্ন।'

এরপরে শুরু হয়ে যায় পাত্রপক্ষের কনে দেখা।

নীলনয়নী একে একে প্রত্যেকটি পাত্রেরই খুঁত ধরে। বলে, 'ছেলেটি দেখতে ভালো, কিন্তু কেমন যেন হাবাগোবা, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না।' আর একজনের বেলায় বলে, 'ইনি একজন বক্তিয়ার খিলজি, মুখ দিয়ে তুবড়ি ছোটে।' আর একজনের বেলায় বলে, 'রংটা কয়লার মতো ময়লা নয় বটে, কিন্তু খোট্টা গয়লাদের মতো।' আর একজনের বেলায় বলে, 'ইনি একটি কার্তিক, সাজপোশাক পরে ফুলবাবু।' এমনি করে এক এক করে সবাইকে খারিজ করে।

তখন মা-বাবা বলেন, 'তুই নিজেই স্থির কর কাকে বিয়ে করবি। কিন্তু যাকেই কর, অবিলম্বে করতে হবে।'

মেয়ে বলে, 'আমার সহপাঠী নিরুপম ভট্টাচার্য আমাকে ভালোবাসে। আমিও তাকে ভালোবাসি। ভালোবাসাটাই সবচেয়ে বড়োকথা। দ্বিতীয় একজনকে যদি ভালোবাসতুম তাহলে দুজনের থেকে একজনকে বেছে নেওয়ার প্রশ্ন উঠত। তবে আমি বিলম্বের পক্ষপাতী। কারণ নিরুপম এখনও সেটল হয়নি। তার জন্য আরও সময় চাই।' তারপরে সে বিশদভাবে নিরুপম ও তার পরিবারের পরিচয় দেয়।

মেয়ের মা চমকে উঠে বলেন, 'সে কী করে? পাত্রটি যে বামুনের ছেলে? জামাইকে আমি আশীর্বাদ করব না জামাই আমাকে আশীর্বাদ করবে? জামাইকে আমি পাদ্য অর্ঘ্য দেব না জামাই আমার চরণবন্দনা করবে? পাপ, পাপ, মহাপাপ। তোর জন্য আমি কি নরকে যাব? না না, এ বিয়ে হতে পারে না।'

বাবা বলেন, 'আমার কাছে কাস্ট জিনিসটা বড়ো কনসিডারেন্স নয়, ক্লাসটাই বড়ো। নিরুপম ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে বটে, কিন্তু ওর পরিবারটা লোয়ার মিডল ক্লাস। ও যদি ধাপে ধাপে উন্নতি করে তাহলে একদিন লোয়ার মিডল ক্লাস থেকে মিডল ক্লাসে, তারপর আপার মিডল ক্লাসে প্রোমোশন পেতে পারে। কিন্তু তারজন্য কে জানে হয়তো তিরিশ বছর দেরি হবে। আমরা তিরিশ বছর কেন, তিরিশ মাসও অপেক্ষা করতে রাজি নই। ওকে যা হয় একটা-কিছু কাজ নিয়ে আরম্ভ করতে হবে, এই যেমন লাইফ ইনসিয়োরেন্সের এজেন্সি। আমি একটা ইনসিয়োরেন্স কোম্পানির সলিসিটর। আমি ওকে সাহায্য করতে পারি। আমার একটা ফ্ল্যাট খালি পড়ে আছে। সেটা সাহেবপাড়ায়। সেটা আমি ওকে ছেড়ে দিতে পারি। ঠিকানা ছকু খানসামা লেন না হয়ে রাসেল স্ট্রিট হলে বিজনেস আরও জমবে। ওকে একটা বেবি অস্টিন কারও ব্যবহার করতে দিতে পারি। তাহলে ওকে ট্রামে-বাসে চড়ে বড়োলোকের বাড়ি হাজির হতে হবে না, অস্টিন হাঁকিয়ে সারা শহর ঘুরতে পারবে। ও যদি উদ্যোগী পুরুষ হয়ে থাকে তো এক বছরের মধ্যেই আশাতীত সাফল্য অর্জন করতে পারবে। আমি ওকে এক বছর সময় দিতে রাজি।'

নিরুপমকে চায়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। তার সঙ্গে কথা বলে নীলবরণ সন্তুষ্ট হন। বলেন, 'তোমার ইংরেজি চোস্ত ইংরেজি। যে কোনো বিলেতফেরতা ব্যারিস্টারের মতো। তোমাকে আমি ব্যারিস্টার মহলে সুপারিশ করব। অনেকেই তোমার পলিসি কিনবে। কিন্তু আমার একটি মাত্র শর্ত। আমার মেয়ে যে স্টাইলে মানুষ হয়েছে তাকে তুমি সেই স্টাইলেই বরাবর রাখবে।

নিরুপম বলে, 'নিশ্চয়ই।' সে এক বছরের মধ্যে বিয়ে করতে রাজি হয়। তার ধারণা ছিল, তার রাজি হওয়া মানে তার মা-বাবারও রাজি হওয়া।

নীলনয়নীর মা সুধান, 'তুমি কি ঠিক জান, তোমার মা-বাবাও রাজি হবেন? তাঁরা যদি রাজি থাকেন, এবাড়ির কর্তা গিয়ে ওবাড়ির কর্তার কাছে প্রস্তাবটা পাড়বেন। তার পরে পাকাদেখা। আর বছর খানেকের মধ্যে শুভকর্ম!'

নিরুপম যখন কথাটা বাবা হরনাথের কাছে ভাঙে তখন তিনি আগুন হয়ে বলেন, 'বামন হয়ে চাঁদে হাত? শূদ্র হয়ে ব্রাহ্মণের ঘরে বিবাহ? আমরা পাশ্চাত্য বৈদিক। রাঢ়ি বারেন্দ্রর সঙ্গেও আমাদের চলে না। চলবে কিনা কায়স্থের সঙ্গে? আমি সামান্য স্কুলমাস্টার বলে কি আমার এমনই দুরবস্থা? অর্থের জন্য জাতিবর্ণ বিক্রয় করব? তুমি কি জান যে কায়স্থদের বিবাহের সময় কী মন্ত্র পাঠ করা হয়? নীলবরণ ঘোষ দাসস্য কন্যা নীলনয়নী দাসী। ওই দাসীটিকে তুমি যখন নিয়ে আসবে তখন ও তোমার গর্ভধারিণীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেলে শুনবে—আমি এইমাত্র চান করে উঠেছি, শুদ্দুরটা আমার গা ছুঁয়ে দিল। তিনি চানের ঘরে গিয়ে বালতি বালতি জল ঢেলে শুচি হবেন। বধূবরণ করবেন না, পাকস্পর্শ করতে দেবেন না, শূদ্রাণীকে রান্নাঘরে ঢুকতেই দেবেন না। কাজেই বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার বউ অপমানিতা বোধ করে বাপের বাড়ি ফিরে যাবেন। তখন তোমাকেই ঘরজামাই হতে হবে। এটাও তোমার জেনে রাখা ভালো, তোমার ছেলের পইতে হবে না। ব্রাহ্মণসমাজ তাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণই করবে না। অগত্যা তাকে কায়স্থসমাজেই মিশে যেতে হবে। তার চেয়ে ভয়ংকর কথা, আমার আত্মা পরলোকে গিয়ে শান্তি পাবে না। তোমার ছেলে যদি পিন্ড দেয়, আমার আত্মা সে-পিন্ড গ্রহণ করতে পারবে না। পিন্ডর জন্য হাহাকার করবে। সে যে কী দুরবস্থা তা তুমি কল্পনা করতেও পারবে না।'

এবার নিরুপম তার মা নারায়ণীর কাছে যায়। মা বলেন, 'দাসী বলে যাকে ঘরে আনবে আসলে সে-ই হবে রানি, আমি হব দাসী। সে এক সিন্দুক শাড়ি নিয়ে আসবে, দিনে তিন বার বদলাবে। আমার তো দুখানি মাত্র শাড়ি। ও একবাক্স গয়না নিয়ে আসবে, আমার তো দুখানি মাত্র চুড়ি। আমি রান্না করে ওকে চার বেলা খাওয়াব। আমি তো নিজে দু-বেলার বেশি খেতে পাইনে। তারপর ভেবে দ্যাখো তোমার নিজের ছোটোবোনের কথা। তার বয়স এখন বারো, এখন থেকে পাত্রের খোঁজ করতে হবে। কিন্তু কোনো ব্রাহ্মণ পরিবার কি ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবে?'

নিরুপম ভাবনায় পড়ে যায়। ওর বাবা ওকে ডেকে বলেন, 'চাণক্য পন্ডিতের কথামতো তোমার ষোলো বছর বয়স থেকে তোমার সঙ্গে আমি মিত্রবৎ আচরণ করেছি। তুমি শুধু আমার পুত্র নও, আমার মিত্র। তাই তোমাকে আরও একটা কথা বলি, এটা খুব কম লোকই জানে। এই মেয়েটির নাম নীলনয়নী হয়েছে এইজন্যে—এর চোখের তারা নীল?'

নিরুপম বলল, 'হ্যাঁ, চোখের তারা নীল।'

'এটা কেমন করে হল তা বোঝ? ব্রিটিশ আমলের আগে পোতুর্গিজ হার্মাদরা শুধু যে জমিদারদের ধনসম্পদ লুঠ করে নিয়ে যেত তা-ই নয়, সুন্দরী মেয়ে দেখলে তাকেও হরণ করে নিয়ে যেত। পরে চড়া মুক্তিপণ দিয়ে তাদের উদ্ধার করে আনা হত। তাদের বিয়ের পরে দেখা যেত তাদের সন্তানদের কারো কারো চোখের তারা নীল বা মাথার চুল কটা। এর মানে বোঝ? টাকার জোরে এটা ধামাচাপা দেওয়া হয়। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ পরিবারে তাদের বিয়েও দেওয়া হয়। কিন্তু তিন-চার পুরুষ অন্তর অন্তর দেখা যায় তাদের মেয়ের চোখের তারা নীল বা ছেলের মাথার চুল কটা। হুগলি জেলায় এমন কয়েকটি পরিবারকে আমি চিনি। চাঁপাতলার ঘোষেদেরও আদিনিবাস শ্রীরামপুরে। সেখানকার সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমি এমন মেয়ে দেখেছি। নীল রক্তের কল্যাণে নীলনয়নী কন্যাদের সুপাত্রে বিবাহ হয়ে যায়। এবার ওরা সুপাত্র পেয়েছে তোমাকে। এর ফলে এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশে শুধু শূদ্রের সংমিশ্রণ নয়, যবনেরও সংমিশ্রণ ঘটবে। তোমাকে বন্ধুর মতো পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সময় থাকতে নিবৃত্ত হও, প্রবৃত্তি দমন করো।'

নিরুপম বলে, 'এসব বাজে গুজব। এর অন্য বায়োলজিক্যাল ব্যাখ্যা আছে। আপনি যদি বিয়ে করতে বারণ করেন, আমি করব না। কিন্তু এ জীবনে বিয়েই করব না। আপনার নাতি হলে তো পিন্ড দেবে! হবেই

না। তখন আপনার তথাকথিত পরলোকে আপনার তথাকথিত আত্মা হাহাকার করবে। কিন্তু তারজন্য আমি দায়ী হব না। আমি নিজে উপবীত ত্যাগ করব না। বেঁচে থাকলে পিন্ডদান করব। কিন্তু বেঁচে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করবে? সঙ্গিনীহীন জীবন কে চায়?'

তখন বাবা একটু নরম হন। মা কিন্তু গরম। বলেন, 'তোমার জন্য আমাদের এত গর্ব, তুমি এত বড়ো বিদ্বান, কিন্তু তোমার জন্য আমাদের লজ্জার সীমা থাকবে না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।'

নিরুপম পড়ে যায় বিষম দোটানায়। শ্যাম রাখবে না কুল রাখবে। এসব কথা নীলনয়নীকে বলতে সাহস পায় না। তাহলে সে সোজা জবাব দেবে, আমাকে বিয়ে করতে হবে না। তুমি কুলই রাখো। আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলব যে, তোমার বাবা-মা এই বিয়েতে রাজি নন কাজেই এ বিয়ে হবে না। কিন্তু মাকে বোঝানো শক্ত হবে। আমাকে চেপে ধরবেন, 'তুমি যাকে খুশি বিয়ে করো কিন্তু বয়স থাকতে থাকতে বিয়ে করা চাই। আমরা তো চিরদিনই বাঁচব না। তোর সময়মতো বিয়ে দিলে নাতির মুখ দেখে যেতে পারব!'

মায়ের পীড়াপীড়িতে বিব্রত হয়ে নীলনয়নী নিরুপমকে বলে, 'আমার এখন উভয়সংকট। তোমাকে যদি বিয়ে করতে না পারি তাহলে অন্য একজনকে বিয়ে করতে হবে। কী করে সেটা সম্ভব? একজনকে ভালোবাসব আর-একজনকে বিয়ে করব? আমার দ্বারা তেমন কাজ হবে না।'

নিরুপম বলে, 'তোমাকে আমি তেমন কাজ করতে বলব না। তুমি আমাকে ভালোবাস এইটে আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এরজন্য যদি কুলত্যাগ অবশ্যম্ভাবী হয় তবে তাই হোক কিন্তু বিয়ে আমি করবই —আর কাউকে নয়, তোমাকেই।' এটাও একপ্রকার বাগদান।

এরপরে সে লাইফ ইনসিয়োরেন্সের এজেন্সি নেয় ও নীলবরণের দেওয়া ফ্ল্যাটে গিয়ে বসবাস শুরু করে দেয়।

তা সত্ত্বেও নিরুপমের দোনোমনো ভাব কাটে না।

শেষে একদিন দেখা যায় নীলনয়নী গিয়ে নিরুপমের ফ্ল্যাটে হাজির হয়েছে আর এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন সে-ই গৃহিণী। রাত্রেও সেখানে থাকতে চায়, থেকেও যায়।

তখন নিরুপম বলে, 'লোকে ভাববে কী? এটা যে বিয়ে না করে লিভিং টুগেদার।'

নীলনয়নী বলে, 'তোমার যদি এতই মনে লাগে তবে তুমি কালকেই গিয়ে সিভিল ম্যারেজের নোটিশ দিয়ে দাও। আনুষ্ঠানিক বিবাহ কয়েক মাস পরে হবে, তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।'

তখন নিরুপমের আর পালাবার পথ থাকে না। সে নোটিশ দেয়।

নোটিশের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর গৌড়ের আইন অনুসারে সিভিল ম্যারেজ হয়ে যায়। উভয় পক্ষের প্রিয় বন্ধুরা সাক্ষী থাকেন। কিন্তু গুরুজনেরা কেউ আসেন না।

তারপর ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে ঘোষ পরিবারে আনুষ্ঠানিক বিবাহ দেওয়া হয়। কন্যাপক্ষের অনেকে যোগ দেন। কিন্তু বরপক্ষের কেউ আসেন না। বরকর্তার স্থান নেন নিরুপমের এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক, বধূবরণ করেন অধ্যাপকগৃহিণী। যথারীতি বউভাত হয়। নীলনয়নীর রান্না আমন্ত্রিতরা সকলেই খান ও খেয়ে তারিফ করেন।

বিবাহে নিরুপম এক কপর্দকও বরপণ নেয় না। যা দেওয়ার তা নীলবরণ তাঁর কন্যাকেই দেন।

তারপর তারা রাসেল স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গুছিয়ে বসে।

বছর কয়েক বেশ আনন্দেই কাটে, যদিও নিরুপমের মনে কাঁটা ফুটে থাকে যে তার মা-বাবা তার বিবাহকে স্বীকৃতি দেননি। এমন কথাও তার কানে আসে ওর বাবা নাকি বলেছেন, 'ও যার সঙ্গে আছে সে ওর সহধর্মিণী নয়, সঙ্গিনী।' আর মা নাকি মন্তব্য করেছেন, 'সঙ্গিনী কেন? বলো রক্ষিতা।'

নিরুপমের ধারণা ছিল আর ওর বন্ধুরা বলেছিল, একটি নাতি হলে ওর মা-বাবা দেখতে আসবেন ও মেনে নেবেন। কিন্তু তেমন কিছু ঘটে না। কেবলমাত্র তার দিদি কল্যাণী তার জামাইবাবু সত্যব্রতকে খোঁজ নিতে পাঠান, কী হয়েছে, ছেলে না মেয়ে।

হিতৈষীরা পরামর্শ দেন, 'ওঁরা দেখতে না আসুন, তোমরা গিয়ে দেখা করেও দেখিয়ে আনতে পারো।'

আর সব মেয়ের মতো নীলনয়নীরও সাধ ছিল শ্বশুর-শাশুড়ি ননদ-দেওরদের নিয়ে ঘরকন্না করতে। একদিন ওরা বাচ্চাকে নিয়ে হরনাথবাবুর বাড়ি যায়। দোতলা থেকে দেখতে পেয়ে নিরুপমের বোন সাবিত্রী নীচে নেমে এসে দরজা খুলে বলে, 'তোমাদের সঙ্গে তো ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তোমরা কেন এসেছ? ফিরে যাও।'

নিরুপম বলে, 'আমরা কি মা-র সঙ্গে দেখা করতে পারিনে?'

সাবিত্রী বলে, 'মা আগে থেকে বলে রেখেছেন, তোমাদের মুখ দেখবেন না। বাবাকেও শাসিয়ে রেখেছেন। যাক, আমি দেখে রাখলুম। বাচ্চাটি তো বেশ সুন্দর হয়েছে। বলব বাবা-মাকে একথা। কী নাম রেখেছ?'

'নিরঙ্কুশ। ও বড়ো হলে হিটলার কি স্ট্যালিন হবে।'

এরপর ওরা আর ওমুখো হয় না। সময়ের ওপর ছেড়ে দেয়।

বছর কয়েক বাদে নিরুপমের দুর্দিন আসে।

স্বাধীনতার পরে বিলিতি কোম্পানিগুলো ব্যাবসা গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করে। তাদের মধ্যে ছিল নিরুপমের ইন্সিয়োরেন্স কোম্পানিও। যারা চলেই যাচ্ছে তাদের পলিসি কিনে কী লাভ হবে? পলিসি যখন ম্যাচিয়োর করবে তখন তো ওরা এদেশে থাকবে না।

নিরুপম পড়ে যায় ধাঁধায়। কোনো দেশি কোম্পানির এজেন্সি নেবে না কি?

ওদের অর্থসমস্যা এমন তীব্র হয় যে, এক এক করে বিলাসব্যসন ত্যাগ করতে হয়। জীবনযাত্রার স্টাইল খাটো হয়। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, ক্লাবের বিল কমতির দিকে যাচ্ছে না। নিরুপম ড্রিঙ্কস খায় ও খাওয়ায়। ব্রিজ খেলে কখনো জেতে কখনো হারে।

নীলনয়নী একদিন সন্ধ্যা বেলা ক্লাবে গিয়ে উপস্থিত হয়। ব্রিজ খেলার টেবিলে নিরুপমের পাশে এক জাঁদরেল পারসি ভদ্রমহিলা। আর নিরুপম ইচ্ছে করে তাঁকে জিতিয়ে দিচ্ছে।

বাড়ি ফিরে নীলনয়নী জিজ্ঞেস করে, 'ব্যাপার কী বলো তো? কে ওই ভদ্রমহিলা?'

নিরুপম বলে, 'ওঁর নাম মিসেস সোডাওয়াটারওয়ালা। পোচখানওয়ালার কী যেন হন। ওঁরা পারসি। ওঁদের অনেকগুলো কোম্পানি আছে। যে কোনো একটাতে আমাকে ঢুকিয়ে দিতে পারেন।'

আর একদিন নীলনয়নী অনাহূতভাবে ক্লাবে হাজির হয়ে দেখে, ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা জোড়ে জোড়ে নাচছেন। তাঁদের মধ্যে নিরুপম আছে। তার পার্টনারকে মেমসাহেবের মতো দেখতে কিন্তু তাঁর বিদেশিনির মতো পোশাক নয়।

নীলনয়নী কিছুক্ষণ নাচ দেখে।

স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফিরে শুধায়, 'ব্যাপার কী বলো তো? মহিলাটি কে?'

নিরুপম বলে, 'উনি মিস শিরিন মেহতা। স্যার ফিরোজ শাহ মেহতার কী যেন হন। ওঁদের হাতে অনেকগুলি কোম্পানি আছে।'

এরপর নীলনয়নী জেদ ধরে, 'আমাকেও রোজ ক্লাবে নিয়ে যেতে হবে।'

নিরুপম বলে, 'সে কী কথা! তাহলে খোকনকে দেখবে কে? আমিই কি বাড়িতে থেকে যাব?'

তখন নীলনয়নী বলে, 'তাহলে বাড়ি থাকো। আমিই তোমার সঙ্গে গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজিয়ে নাচব। সেদিন তোমার স্টেপগুলো মোটেই বাজনার সঙ্গে ম্যাচ করছিল না। ব্লু ড্যানিউব ওয়ালতসের স্টেপস মোটেই ওরকম নয়। আমিও একসময় লেসন নিয়েছিলুম। তখন কথা চলছিল এক বিলেতফেরতা ব্যারিস্টারের সঙ্গে বিয়ের।'

কিন্তু বাড়িতে থেকে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে নাচের জন্য নিরুপমের একটুও উৎসাহ ছিল না। তাতে পরস্ত্রীর সঙ্গে নাচের উল্লাস নেই। আর ব্রিজ খেলার কী জানে নীলনয়নী?

এমনিই করে দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়।

নিরুপম একদিন বলে ফেলে, 'তোমার জন্য আমি কুলত্যাগ করেছি। তাই কি যথেষ্ট নয়? ব্রিজ ত্যাগ করতে হবে, ক্লাব ত্যাগ করতে হবে, ড্রিঙ্কস ত্যাগ করতে হবে? তুমি আমার জন্য কী ত্যাগ করেছ?'

নীলনয়নী এর কোনো জবাব খুঁজে পায় না। আহত হয়। বলে, 'তাহলে তুমি আমাকেও ত্যাগ করো।'

এভাবে দাম্পত্যকলহ বেশিদিন থাকে না। ছেলেকে নিয়ে ওরা আবার সুখী সংসার গড়ে তোলে। কিন্তু খরচ তো কিছুতে কমতে চায় না।

তখন নীলনয়নী একদিন বলে, 'আজকাল দুটো ইনকাম ছাড়া সংসার চলে না। স্বামীর ইনকাম আর স্ত্রীর ইনকাম। আমাকে তুমি অনুমতি দাও। আমিও একটা চাকরির সন্ধান করি।'

নিরুপম বলে, 'তা কি হয়? বংশমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে যে। আমারও, তোমারও। বরঞ্চ স্টাইল একটু খাটো হোক কিন্তু বংশমর্যাদা খাটো হওয়া উচিত নয়।'

কয়েক মাস পরে নীলনয়নী আবার জেদ ধরে। সে চাকরির খোঁজে বেরোবে। রাঁধুনিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে নিজে রাঁধছে। এরপর কি আয়াকে ছাড়িয়ে দিতে হবে?

নিরুপমের জন্য পারসিরা কেউ কিচ্ছু করেননি। সে কোন মুখে নীলনয়নীকে নিরস্ত করবে?

কিছুদিন বাদে অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে একটা সাময়িক ভেকেন্সি হয়। আবেদন করামাত্র নীলনয়নী কাজটা পেয়ে যায়।

নিরুপম তো অবাক। সে বলে, 'দ্যাখো, রেডিয়ো স্টেশনটা হল যত রাজ্যের বাউণ্ডুলেদের আড্ডা। সেখানে গিয়ে তুমি ওদের সঙ্গে মিশবে? তোমার নামে গুঞ্জন উঠবে। কী দরকার গুটি কতক টাকার জন্য মর্যাদাহানি?'

নীলনয়নী বলে, 'গুটিকয়েক টাকা যে আমার বিশেষ দরকার। আর বাউণ্ডুলে যাঁদের বলছ তাঁরা কলকাতার বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা, লেখক-নাট্যকার, সে তারবাদক। ওঁদের সঙ্গে মিশলে তুমিও কালচার্ড হতে।'

নিরুপম ভুল বোঝে। বলে, 'আমি কালচার্ড নই? ওরা কালচার্ড?'

নীলনয়নী মাফ চায়। বলে, 'আমি ওকথা বলিনি, আমি শুধু বলতে চেয়েছি আমি নিজে কালচার্ড হয়েছি।'

নিরুপম সাবধান করে দিয়ে বলে, 'ওদের প্রাইভেট লাইফ মোটেই নিষ্কলুষ নয়। পাঁকের ছিটে তোমারও গায়ে লাগবে।'

এরপর ওদের কারো কারো সঙ্গে জড়িয়ে নীলনয়নীর নামে বেনামি চিঠি আসতে থাকে। কোনো কোনো চিঠি ডিরেক্টর পর্যন্ত পৌঁছোয়। নীলনয়নী আশা করেছিল রেডিয়োতে টিকে যেতে পারবে। কিন্তু ওঁরা ওকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যবস্থা করেন।

নিরুপম বলে, 'আমি জানতুম, তোমার জন্য যাদের চাকরি হয়নি তারা ঈর্ষায় জ্বলছিল। তুমি আমাকে কিছু সময় দাও। আমি ইনকাম বাড়াব।'

কিন্তু নীলনয়নীর রোখ চেপে গিয়েছিল যে, সে-ও প্রমাণ করে দেখাবে সে উপার্জন করতে পারে। সে প্রেসিডেন্সি কলেজের হাই সেকেণ্ড ক্লাস ইংরেজি অনার্স পাওয়া ছাত্রী। অন্য কারও চেয়ে কম কোয়ালিফায়েড নয়। ট্র্যাভেল এজেন্সিতে ওর মতো মেয়েরা কাজ করছে। কেউ কেউ হোটেলের রিসেপশনিস্ট। সরকারি দপ্তরেও মেয়েরা হানা দিচ্ছে। যথেষ্ট সম্মানও পাচ্ছে। একটি মেয়েকে সে চেনে। তার আপিসের চাপরাশি পিয়োনরা তাকে বলে মেমসাহেব। দিদিমণি বললে সে সাড়া দেয় না। অথচ সে কোনোদিন বিলেত যায়নি, কোনো নামকরা কলেজেও পড়েনি।

নিরুপম কিন্তু মনে করে মেয়েরা আপিসে গিয়ে তাদের মাহাত্ম্য হারিয়ে ফেলেছে। কেউ যাদের দেখতে পেত না, যারা অন্তঃপুরে বাস করত, তারা যেন পর্দার বাইরে এসে খেলো হয়ে যাচ্ছে। আর সবটাই হচ্ছে গোটা কতক টাকার জন্য। দেশসেবা বা লোকহিতের জন্য নয়।

নীলনয়নী একটা সরকারি দপ্তরে চাকরি পেয়েও যায়। মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে দেরি হয়।

নিরুপম বলে, ‘কী, আজ বস-এর সঙ্গে মোটরবিহারে বেরিয়েছিলে নাকি?’

নীলনয়নী চটে যায়। বলে, ‘তোমার বড়ো ছোটো মন। তোমার আসল চরিত্র ফুটে বেরোচ্ছে। মনুর মতো তুমিও মনে করো, ‘‘ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রম অর্হতি’’। মেয়েরা কেউ স্বাধীনতার যোগ্য নয়। অথচ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কত মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।’

মনোমালিন্য ক্রমে আরও তীব্র হয়। নিরুপম অভিযোগ করে, তার ছেলেটি অবহেলিত হচ্ছে। সে-ই আবার আবদার ধরে, তার আর একটি সন্তান চাই। সেটি হবে কন্যা।

নীলনয়নী বলে, ‘তুমি কখনো গর্ভধারণ করনি। সন্তানপ্রসবের যে যন্ত্রণা তা-ও তোমার অজানা। কেউ কেউ তো আঁতুরঘরেই মারা যায়। আমার তো রীতিমতো ভয় করে আবার মা হতে। তোমার কী? তুমি আবার বিয়ে করবে। এবার ব্রাহ্মণকুলে। আমার এই ছেলেটি ভেসে যাবে। এর ঠাকুরদা থাকতেও ঠাকুরদা নেই, ঠাকুমা থাকতেও ঠাকুমা নেই, পিসি থাকতেও পিসি নেই, খুড়ো থাকতেও খুড়ো নেই। এর মাতৃকুলে যারা আছে তুমি তো তাদের কাছে একে যেতে দিচ্ছ না, দেবেও না।’

নিরুপম শুধায়, ‘তুমি কি আর কখনো তাহলে মা হবে না?’

নীলনয়নী বলে, ‘আপাতত নয়। আগে সেটলড হই। চার-পাঁচ বছর পরে তোমাকে আর একটি সন্তান উপহার দিতে পারি। কিন্তু সে যে কন্যাই হবে এমন কথা দিতে পারব না।’

নিরুপম হেসে বলে, ‘কেউ দিতে পারে না। আচ্ছা, তোমাকে মা হবার জন্য চাপ দেব না। কিন্তু তা বলে কি এই মাঝখানটার সময়টা আমি তোমার সঙ্গে শুতে পারব না? আমাকে ব্রহ্মচারী হতে হবে?’

নীলনয়নী একটু ভেবে বলে, ‘আমি বুঝতে পারছি তুমি কী চাও। আমি তোমাকে ডিনাই করব না। কিন্তু তোমাকে কষ্ট করে সরঞ্জাম ব্যবহার করতে হবে। আজকাল তো সকলেই তা করছে।’

কিছুদিন পরীক্ষার পর নিরুপম বলে, ‘স্বাভাবিক মিলনের সিকির সিকি আনন্দ আমি পাইনে। আমার ওপর এই দায়টা না চাপিয়ে তুমি নিজেই যদি নাও! তোমাদেরও তো কতরকম সরঞ্জাম আছে!’

এভাবে দুজনের মধ্যে আবার কলহের সূত্রপাত হয়।

একদিন নীলনয়নী বলে, ‘এর একমাত্র সমাধান, স্টেরিলাইজড হওয়া। আমি রাজি আছি। তুমি যখন খুশি তখন আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। আমারও আর সন্তানধারণের আতঙ্ক থাকবে না।’

নিরুপম গম্ভীর হয়ে বলে, ‘তার মানে আমি দ্বিতীয় সন্তানের মুখ দেখতে পারব না। নারী। নারী সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য তার নাম মাতৃত্ব। মহামতি হিটলার বলেছেন, নারীর জগৎ হচ্ছে ক্যুখে, কিণ্ডের, কির্খে। সোজা বাংলায় রান্নাঘর, আঁতুড়ঘর, ঠাকুরঘর। তুমি যদি আর কখনো আঁতুড়ঘরে না যাও তবে তোমার নারীজন্ম বৃথা।’

নীলনয়নী হাসে। ‘আমি তো বললুম, তুমি আর বছর চার-পাঁচ সবুর করো। আঁতুড়ঘর তো আমি যাবই, শুধু মাঝখানকার ক-টা বছর বাদ যাবে। তবুও তোমাকে ব্রহ্মচারী হতে বলছিনে। আজকাল সবাই যা করে তুমিও তাই করবে। এটা এখন কমন প্র্যাকটিস।’

নিরুপম মোটেই সন্তুষ্ট হয় না। সে সরঞ্জাম ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়। তখনকার মতো এই সমস্যা অমীমাংসিত থাকে।

নীলনয়নী একাই যা করবার করে। কিন্তু তার মন থেকে আশঙ্কা যায় না। অনেক দিন থেকে সে আলাদা শুতে অভ্যস্ত। সেটা শিশুর জন্য। শিশু বড়ো হওয়ার পরেও দেখা যায় সে একলাই শোয়, স্বামীকে প্রশ্রয় দেয় না।

একদিন নিরুপম ওর শোবার ঘরে ঢুকে ওকে একটি চমক দেয়। কোনোরকম সাধাসাধি না করেই উপগত হয়। তখন নীলনয়নীও একটা পালটা চমক দেয়। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে এমনভাবে প্রবেশপথ রোধ করে যে নিরুপম ব্যর্থ হয়।

রাগ করে নিরুপম বলে, ‘এর ক্ষমা নেই। নারী সবসময়ই পুরুষকে প্রবেশপথ ছেড়ে দেবে। এটাই নিয়ম। তুমি আমাকে আজ ইমপোটেন্ট বানালে।’ খাট থেকে নেমে যায় নিরুপম।

এরপর দেখা যায়, নীলনয়নী রোজ শোবার ঘরে খিল দেয়। নিরুপম মনের রাগ মনে পুষে রাখে।

কিছুদিন পরে ওদের টাকার টান পড়ে। নিরুপম অনেক চেষ্টা করেও অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। তখন নীলনয়নী কোনখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে আসে।

নিরুপম বলে, ‘টাকাটা পেলে কোথায়? বাপের বাড়ি থেকে? আমি বিয়ের সময় পণ নিইনি। পণপ্রথায় বিশ্বাস করিনে। বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিলে সেটা প্রকারান্তরে বরপণ।’

নীলনয়নী তাকে আশ্বস্ত করে বলে, ‘বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিইনি। নিয়েছি গোপালদার কাছ থেকে। তিনি বলেছেন, পেয়েবল হোয়েন এবল।’

গোপালদা ছিলেন একজন গান্ধীপন্থী কংগ্রেস নেতা। বার বার জেল খেটেছেন। চিরকুমার। তাঁর অনেক টাকা। তিনি সেই টাকার ট্রাস্টি। কাজেই কেউ চাইলেই দরাজ হাতে দিতেন। ফেরত চাইতেন না। কেউ ফেরত দিত, কেউ দিত না।

নিরুপম ক্ষুব্ধ হয়। বলে, ‘খদ্দরের ভেক ধরে যতসব ভন্ডসন্ন্যাসী। ব্রহ্মচারী নয়, বামাচারী, তোমার দাদা যা দিয়েছে তা দাদন। একদিন শোধ করতে হবে যৌবন দিয়ে।’

নীলনয়নী ভীষণ খেপে যায়। বলে, ‘আমি তোমার সঙ্গে ঘর করতে চাইনে। কালকেই চলে যাচ্ছি।’

নিরুপম বলে, ‘যাচ্ছ যাও কিন্তু খোকনকে নিয়ে যেয়ো না। খোকন আমার। আমার বংশধর। ভট্টাচার্য বংশের সন্তান।’

নীলনয়নী বলে, ‘তাহলে তুমি ওকে ভট্টাচার্য বাড়িতে রেখে এসো। ও তোমার সঙ্গে একলা এবাড়িতে থাকতে পারে না। আয়া ওকে মেরে ফেলবে।’

নিরুপম চুপ করে শোনে। ভট্টাচার্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার মতো মুখ তার নেই। আর আয়ার জিম্মায় ওকে ফ্ল্যাটে রাখতেও অনিচ্ছা। ও তো সত্যি চায়নি যে নীলনয়নী চলে যাক।

ওদিকে নীলনয়নী যাওয়ার জন্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছে। আলাদা করে গুছিয়ে রাখছে খোকনের জিনিস। ওদের এই ঝগড়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কেউ একজন মধ্যস্থ হলে ভালো হত।

নিরুপম তার দিদি কল্যাণীর বাড়ি গিয়ে বলে, ‘তুমি কি আমার ছেলেকে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারবে?’

দিদি সব কথা শুনে বলেন, ‘দুই বংশের ঝগড়া অনেক দূর গড়িয়েছে। তুই তোর বউ ও ছেলেকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যা। দুজনকে ওখানে রেখে আয়। মায়ের সঙ্গে ছেলের বিচ্ছেদ ঘটাতে যাসনে।’

জামাইবাবু সত্যব্রত ভট্টাচার্যও সেই একই পরামর্শ দেন।

নিরুপম নীলনয়নীকে বলে, ‘চলো তোমাকে বাপের বাড়ি রেখে আসি। খোকনও তোমার সঙ্গে যাবে।’

নীলনয়নী মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, ‘তুমি আমাকে বন্দি করে রেখেছ, বাঁদির মতো খাটিয়েছ। আমি ঘর ঝাঁট দিয়েছি, বাসন মেজেছি, তোমার জুতো পালিশ করেছি। তোমার সেবার জন্য কী না করেছি! অথচ তুমি আমাকে বলেছ, আমি রোজ পাঁচখানা সাবান কেন ব্যবহার করি। একখানা হাত ধোয়ার জন্য, একখানা গা ধোয়ার জন্য, একখানা শৌচের জন্য, একখানা বেবির জন্য, একখানা কাপড়কাচার জন্য। আচ্ছা, এর কমে কোনো ভদ্রমহিলার চলে? অথচ তুমি নিজে রোজ এক টিন সিগারেট খাবে, এক প্যাকেটে তোমার কুলোবে না। তোমাকে নিয়ে আমি হদ্দ হয়েছি, আর সহ্য করতে পাচ্ছিনে। আমার সঙ্গে যাবে বলছ। সেখানে গিয়ে তুমি থাকবে আমার সঙ্গে না ছেড়ে চলে আসবে?’

নিরুপম চুপ করে থাকে।

নীলনয়নী বলে, ‘আমি বুঝতে পেরেছি, এটা ইবসেনের ডলস হাউস। তুমি আমাকে নিয়ে নোরার মতো খেলা করেছ, একটুও ভালোবাসেনি। পুতুল করে রেখেছ। আমাকে বাইরে বেরোতে দাওনি। যদি আমি

বাইরে বেরোলুম, আমাকে সন্দেহ করলে। পাছে আমি পরপুরুষের প্রেমে পড়ি। অথচ আমি তোমায় সন্দেহ করিনি। ক্লাবে গিয়ে আমাকে না জানিয়ে তুমি পরনারীদের সঙ্গে ডান্স করেছ। তুমি যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও তো চলো, কিন্তু দু-দিন বাদে ছেড়েই যদি চলে আসবে তো শুধু শুধু যাওয়া কেন? আমার ভাবনা তোমার জন্য নয়, খোকনের জন্য। তোমার সবাই আছে, ওর কেউ নেই। আমার সঙ্গে গেলে দাদামশায় পেত, দিদিমা পেত, মাসি পেত, মামা পেত, ভাই-বোনও পেত। কিন্তু ওরা সবাই শূদ্র। তোমরা ওদের ঘৃণা কর।'

নিরুপম প্রতিবাদ করে বলে, 'না না নেলি, আমরা ঘৃণা করি না। ওটা তোমার ভুল ধারণা। আমি তোমাদের ওখানে থাকতে চাই না পাছে লোকে বলে আমি ঘোষেদের ঘরজামাই। তাতে আমার আত্মসম্মানে লাগবে। পুরুষমানুষের আত্মসম্মানই সব।'

নীলনয়নী বলে, 'নারীরও আত্মসম্মান আছে। আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে কেন? শ্বশুরবাড়িতে একটা রাতও আমি থাকতে পারিনি। সাবিত্রী কীভাবে আমাকে ফিরিয়ে দিল! যেন সমস্ত বাড়িটা অপবিত্র হয়ে যেত। এইসব লোয়ার মিডল ক্লাস মানুষদের সঙ্গে বাস করলে আমিই অপবিত্র হয়ে যেতুম। আমাকেই দিনে তিন বার সাবান মেখে চান করতে হত। না নিরুপম, এর কোনো ক্ষমা নেই। আজকের দিনে এ ব্যবহার অমার্জনীয়। ওরা আমাকে রিকগনাইজ করেনি। আমিও ওদের রিকগনাইজ করব না। আমার শুধু ভাবনা আমার বাচ্চাটার কী হবে।'

নিরুপম ভেতরে ভেতরে জ্বলে। উত্তর ভেবে পায় না। মাথায় খেলে যায় হিটলারের উক্তি। ফাইনাল সলিউশন। ইহুদিদের বেলায় তিনি যা প্রয়োগ করেন।

এরপর নিরুপমকে ঠিক প্রকৃতিস্থ বলা যায় না। আসলে লোকটা খারাপ নয়, কিন্তু যে-কাজটা করে সে-কাজটা খারাপ।

সে-রাত্রে নীলনয়নী শোবার ঘরের দরজায় খিল দিতে ভুলে গিয়েছিল। রাতের মাঝখানে নিরুপম গিয়ে ওর পাশে শোয়। ওর ঘুম ভেঙে যায়। একহাতে নিরুপমের গলা জড়িয়ে ধরে ও বলে, 'ডার্লিং, তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? দু-দিন বাদে ঠিক ফিরে আসব।' এই বলে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকাল বেলা যারা ওর ঘরে ঢোকে তারা দেখতে পায় নিরুপম নীলনয়নীর পায়ে মাথা খুঁড়ে কাঁদছে ও বলছে, 'নেলি, আমায় ক্ষমা করো। আমি তোমায় মারতে চাইনি। তুমি বেঁচে ওঠো।'

খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওকে ধরে নিয়ে যায়।

পোস্টমর্টেমে ধরা পড়ে নীলনয়নীর গলায় আঙুলের দাগ। ফরেনসিক পরীক্ষায় সেই দাগ মিলে যায় নিরুপমের আঙুলের ছাপের সঙ্গে। নিরুপম পুলিশকে বলেছিল, ঘটনাটা ঘটে গেছে ঘুমের ঘোরে। পরে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে তার স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। প্রত্যক্ষদর্শী ছিল না, কিন্তু সার্কামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স নিরুপমের বিপক্ষে যায়।

চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়ারির পর ওকে দায়রায় সোপর্দ করেন। বিচার হয় হাই কোর্টের সেশনস বিভাগে। জুরির সাহায্যে বিচার।

জুরি কেন যে ওকে অব্যাহতি দিল সেটা রহস্য থেকে যায়।

তিন

নিরুপম সেই যে উধাও হল, তারপরে বছরে এক বার আসত তার ছেলের জন্মদিনে। এক রাত থাকত, তারপর আবার নিরুদ্দেশ।

নিরঙ্কুশ যখন সাবালক হয়ে তার মাতুলালয়ে চলে যায় তখন থেকে নিরুপম আর ছেলের জন্মদিনে আসে না। শুধু একখানা পোস্টকার্ড পাঠিয়ে দেয়। তাতে শুভকামনা জানায়। কিন্তু ঠিকানা দেয় না। ডাকঘরের মোহর থেকে জানা যায় সে কখনো হরিদ্বারে, কখনো দ্বারকায়, কখনো শ্রীরঙ্গমে, কখনো কাঞ্চিপুরমে, কখনো বেনারসে, কখনো পুরীতে।

সাত-আট বছর বাদে পোস্টকার্ড আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে কি সে মৃত? তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। হয়তো হিমালয়ের কোনো গুহায় বসে নির্জনে তপস্যা করছে যাতে তার পাপমোচন হয়।